

**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**  
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১০৮/২, নবগঙ্গা বিল্ডিং, বর্ধমান - ৭৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সত্যেন্দ্র নন্দন
Title : বৈরা (BIVAV)	Size : ৫.৫" x ৪.৫"
Vol. & Number : 18/1 18/2 18/4 19/2	Year of Publication : Sep - 1995 Jan - March 1996 Feb - 1997 Oct - 1997
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সত্যেন্দ্র নন্দন, বর্ধমান (১৮৮৮)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

অপ্রকাশিত বিভূতিভূষণ

বহুরের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে স্বর্ণকমলে ভূষিত

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর “লাল দরজা”-র সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

কমলকুমার মজুমদারের অগ্রস্থিত দুর্লভ রচনা

সোমেন চন্দর গল্পের অপ্রকাশিত নাট্যরূপ

ও

অসামান্য গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন

# বিভূতি

সম্পাদক :

মহেন্দ্র মেহতা

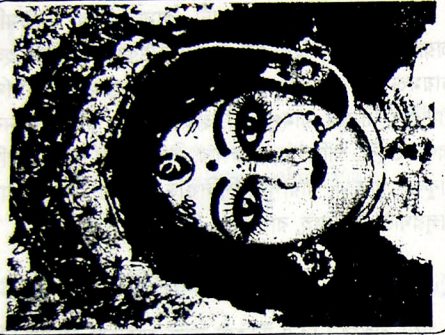
বিশেষ শরণবালীন সংখ্যা



১৪০৪



“শঙ্খো শঙ্খো  
মঙ্গল গাও  
জননী এসেছে  
দ্বারে”



বাণেশ্বরীজীবনে দেবী' দু'টি  
অবিভিন্ন জট স্রষ্টব্য জন্মী  
যাপে। স্বপ্নের পর পুণ্য পূজায়  
উজ্জ্বলিত হয় সেই একই স্মৃতি।  
স্বর্গলোক থেকে হঠকৎ-পলিতে হঠ  
দুঃ, সুখী ও শান্তির ভগ্না প্রার্থনা।  
দুঃখগণদের অনপ-উদ্ধার  
দীনভক্তিভেদে বিকসী স্রষ্টা-এরও প্রার্থনা,  
স্বপ্নের জীবন ভাবে উদ্ভূত 'সু',  
সুখী ও শান্তিতে। আনন্দবজ্র পূর্ণ  
গৌরব সবার নিমন্ত্রণ।

**Digdigm**

উৎসবে আনন্দে  
কলকাতার সেরা কেঁটারার  
১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪  
সেই ২৪-২৫-২৬/১৫৪১/১৫৪২  
আমি ১৫ - ১৬ - ১৭ - ১৮ - ১৯ - ২০ - ২১ - ২২ - ২৩ - ২৪  
কলকাতা, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪  
১৫/১৫৪১, ১৬/১৫৪২, ১৭/১৫৪৩, ১৮/১৫৪৪, ১৯/১৫৪৫, ২০/১৫৪৬, ২১/১৫৪৭, ২২/১৫৪৮, ২৩/১৫৪৯, ২৪/১৫৫০  
ফোন: ৬৪১-০১০২



**বিভাব**

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক  
বিশেষ শরণকালীন সংখ্যা ১৪০৪

সূচি

অপ্রকাশিত বিভূতিভূষণ : মনন ও বিধুতি ॥ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১  
পুনর্মুদ্রণ  
কমলকুমার মজুমদারের অগ্রস্থিত রচনা ॥ সুরত রুদ্র ১৮  
নাটক  
সোমেন চন্দ  
সংকেত গল্পের প্রথম নাট্যরূপ ॥ ভূমিকা, বাঁধন সেনগুপ্ত ৩৫  
প্রবন্ধ  
আদালতের পবিত্রতা ও বিচারকের মর্যাদা  
সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় ৪৭  
উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সংকট  
ভারত-বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ॥ আবদুর রউফ ৭৮  
গল্প  
অনেকদিন পরে একদিন ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৪  
দুর্বাধ্য ॥ প্রমুদ রায় ৬২  
বৃহৎ ॥ কার্তিক লাহিড়ী ৬৮  
বেকুন্ঠের কোটাল ॥ সুনীল দাশ ৮৫  
গণেশতন্ত্র ॥ আদিনাথ ভট্টাচার্য ৯৮  
ল্যাপিস ল্যাজুলি ॥ এষা দে ১১২  
হারানোর বৈঠকখানা ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১২২  
মাতামহী ॥ বন্দনা সান্যাল ১৩১  
হেমন্তের সি. আর. ॥ মৃত্যুঞ্জয় সেন ১৩৬  
পুরাতনী  
শরণচন্দ্রের অন্যরূপ ॥ কল্যাণী দত্ত ১২০  
বিশেষ ক্রোড়পত্র ১  
উপন্যাস : স্যালামান্ডার ॥ মানব চক্রবর্তী  
বিশেষ ক্রোড়পত্র ২  
চিত্রনাট্য : স্বর্ণকমল প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছবি 'লাল দরজা' ॥ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত  
ভূমিকা : বিপ্লব রায়চৌধুরী











বিভূতিভূষণের মূল পাণ্ডুলিপি

Expenditure  
for 1911-12

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The names are: "John", "Mary", "James", "Elizabeth", "Thomas", "Sarah", "Michael", "David", "William", "Margaret", "Charles", "Anne", "George", "Catherine", "Alexander", "Isabella", "John", "Mary", "James", "Elizabeth", "Thomas", "Sarah", "Michael", "David", "William", "Margaret", "Charles", "Anne", "George", "Catherine", "Alexander", "Isabella". The dates are: "1810", "1811", "1812", "1813", "1814", "1815", "1816", "1817", "1818", "1819", "1820", "1821", "1822", "1823", "1824", "1825", "1826", "1827", "1828", "1829", "1830", "1831", "1832", "1833", "1834", "1835", "1836", "1837", "1838", "1839", "1840", "1841", "1842", "1843", "1844", "1845", "1846", "1847", "1848", "1849", "1850", "1851", "1852", "1853", "1854", "1855", "1856", "1857", "1858", "1859", "1860", "1861", "1862", "1863", "1864", "1865", "1866", "1867", "1868", "1869", "1870", "1871", "1872", "1873", "1874", "1875", "1876", "1877", "1878", "1879", "1880", "1881", "1882", "1883", "1884", "1885", "1886", "1887", "1888", "1889", "1890", "1891", "1892", "1893", "1894", "1895", "1896", "1897", "1898", "1899", "1900".

অপ্রকাশিত বিভূতিভূষণ : মনন ও বিধতি

সম্পাদনা : তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিস্ময়কর, অনুসৃত, একক এবং নিজস্ব চরিত্র। এই সবকিছু বিবেচ্যেই আমি সচেতনভাবে ব্যবহার করলাম। কল্পালের প্রগাঢ়কারী যুগে ওই শক্তিশালী প্রবণতা এবং জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে লেখা শুরু করে আর কে এমন নিরুদ পদসঞ্চারে প্রথম সারির আসন দখল করে নিতে পেরেছিলেন? অন্য কেউ? বলা যায় 'Saw the World in a grain of sand, / Heaven in a wild flower, / Held infinity in the palm of his hand, / And eternity in one hour'। আর কেই বা প্রাণাত্যন্তরে জগত্‌তববের সীমারহাড়া পার হয়ে এসে প্রেমিক করেছে প্রকৃত সাহিত্যি কালজয়ী হয়, আন্ত, অসু্যাপ্রসৃত, কালাপাহোড়ী সমালোচনা নয়? 'অপ্রকটিত বিভূতিভূষণ' সম্পাদনা করেছে গিয়ে এসে প্রথম প্রকট। শিখের গীত মনে হতে পারে, কিন্তু সহাদয় পাঠকবর্গ এবং সম্পাদক মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমাকে একটি সহ্য করুন। গতস্পর্ধু কোনো সাহিত্যেতে পাই যেহেতু নিজের কবিরের সামান্য ব্যাখ্যা এবং উদ্ভাটন। ব্যস্ত সম্পূর্ণ হয়না, তাই নিজের ক্ষুদ্র সমর্থন পাঠকের করে দু একটি কথা বলেন নিতে হারি। আমায়ও তো বহুসম দিক অর্শতকে দৃষ্টিয়ে, বিভিন্ন গোলামেই অসুস্থতা একটি একটি করে পূর্বের কর্মক্ষমতা গ্রাস করছে। সম্পূর্ণ স্তব্ধ হবার আগে এমন কিছু কথা বলে যেতে চাই যা হঠাত আমি ছাড়া আর কারো জানা নেই। পাঠিতেরে বিদ্ধ দিয়ে নয়, আমি নগণ্য লিপিব্যবশী, অনেক বিজ্ঞ এবং উন্মুক্ত লেখকের রয়েছে। বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করবার জন্য, কিন্তু গবেষকের পূর্ণ হিসেবে এমন অনেক তথ্য আমার ভান্ডারে রয়েছে যা গবেষকদের জ্ঞেয় নয়। ভবিষ্যতের পাঠক এবং বিভূতি-অনুরাগীরা জন্ম আমি আমার তথ্যের ভান্ডার আমুক্য করে দিয়ে যেতে চাই। (হোক তা সামান্য, হোক তা বিজ্ঞানের কাছে অকিঞ্চিৎকর, উম্মুর সেই সামান্যটিও দিয়ে আমি মনে হতে চাই।) মনে পড়ছে মায়ের কাছ, আমার সমস্ত তথ্যের বৃহত্তম উৎস তো তিনিই। মনে পড়ছে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল। কিন্তু সুমথনাথ ঘোষের কাছ। কত কথা শুনেছি তাঁদের কাছে। তখন শুনেছি আভ্যন্তর বসে, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হিসেবে। আজ তা অমূল্য সম্পদ। বিভূতিভূষণ সহজে বাকি যা জানা, তা এসেছে তাঁকে নিয়ে আজীবন কাজ করছে করতে।

দিনলিপি লেখক হিসেবে বিদ্যুতভূষণের খ্যাতি সর্বজনকীৰ্ত্ত। তাঁর দিনলিপিকে প্রধানত গিনীত ভাণ্ডে ভাগ করা যায়। প্রথম, অমরকান্ধী বা আশ্বকথনের সহ বিদ্যুত run on ধরনের গদ্য দ্বিতীয়, দ্বয়ঃ সংক্ষিপ্ত পুরিসরে সৈন্যদল ঘটনার বিবরণ। তৃতীয়, খুবই বীজাকাকার দিনের খবর বা ভাষণের কৃত্যাবলী। প্রথম শ্রেণীকে যে চমকাণুলি পড়ে তার বেশিরভাগই প্রকাশিত, যেমন ‘মুন্ডির রেখা’ (এটির প্রথম সংস্করণের জন্য সত্যজিৎ রায় একটি অনবদ্য প্রচ্ছদচিত্র এঁকে দিয়েছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন কাল্যাকটা পাবলিশার্স), ‘তৃণাশ্রু’, ‘উৎকল’, ‘হে অরণ্য কণা কণ’ , ‘অভিযাত্রিক’, ‘উদ্যিমুখর’ ইত্যাদি। এগুলির বাদ প্রধানত অমরকান্ধীতর ও দার্শনিক জীবনোপলব্ধির। তাঁর অমরও দুইয়ম, প্রকৃত ও মানস। পিতা মহানন্দ যৌবনে



পদরজে প্রায় সমগ্র ভারত পার হয়ে খাইবার গিরিবর্ষের মুখ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন, বিবৃতিভূষণের রঙেও ছিল উদ্ভরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যাবাবরবৃত্তির বীজ। বেশির ভাগ দিনলিপিই কোনো দুটি entry এক জায়গায় বসে লেখা নয়, আর অরণ্য অঞ্চল হলে এই বাবধান প্রায় সবক্ষেত্রেই পদরজে অতিক্রান্ত। দর্শনাধী অধুমিত বিখ্যাত দেখবার জায়গাগুলির চেয়ে সাধারণের চলাপথের বাইরে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়ে তোলা তথাকথিত ব্রাত্য স্থানই ছিল তাঁর পছন্দ। সভাসমিতির কাজে অথবা সাহিত্যিক বন্ধুদের দলে মিশে ভারতবর্ষের বড় শহরগুলিতে বা দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থানে যথেষ্ট ঘুরলেও ভ্রমণসূচী তৈরির বিষয়টা যখন নিজের হাতে, তখন কিন্তু বেছে নিয়েছেন সারাদা বনভূমির কুমড়ি কী খলকোবাদ বনবাগলো, অথবা নিজের গ্রামের পাশে ইছামতীর তীরে কাঁচিকার পুল, আকাইপুর বা সাতভেয়েতলা। আর মানসভ্রমণে তো বিবৃতিভূষণ সম্রাট, আমাজন অববাহিকার উচ্চমন্ডলীয় অরণ্য থেকে পলকে তাঁর গতি ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর পাঁরে অবস্থিত এম-৩১ (মেসিয়ার-৩১, এন্ড্রোমিডা বা উত্তর-ভাদ্রপদ) নীহারিকায়, মহাসরট যুগের বাম্প-ওঠা জলাভূমি থেকে বর্তমানকে ছুঁয়ে অনাগত ভবিষ্যতে — to the last syllable of recorded time. এই অপ্রকাশিত রচনাংশের টিকার সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে সংযোজিত হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দিনলিপিগুলি কখনো তারিখ সম্বলিত মুদ্রিত ডায়েরি বা তৈরি করে নেওয়া field book ধরনের খাতায় লেখা। মুদ্রিত ডায়েরির সবই বীধাই করা, তৈরি খাতা কখনো শক্ত মলাটে বীধানো, কখনো সেলাই করে নেওয়া কিছু পাতার সমাহার। এগুলির আকার ৫' x ৩' ১/২, ৬' x ৫', কখনো বা ১০' x ১২'। Field book বললাম এই কারণে যে, ভ্রমণের সময় এই ধরনের একটি খাতা লেখকের পকেটে থাকত। পথ চলতে চলতে যেখানে ইচ্ছে হলেই বসে পড়ে পকেট থেকে খাতা আর কলম বের করে পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দিচ্ছেন, কিছা তাত্ক্ষণিক উপলব্ধির প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করছেন। ত্রিশের দশকের এমন একটি সফল, লম্বা খাতা আমার কাছে রয়েছে। এটির কিছু অংশ প্রকাশিত। ইংরেজি ও বাংলায় লেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন চমৎকার বিবরণ বিশ্বাস্যতঃ দুপাশা। এই খাতার ইংরেজি অংশটুকু অপ্রকাশিত। তার কারণ, আমার মনে হয়, বিবৃতিভূষণের হস্তলিপির দুপাশ্যতা এবং যিনি পাতুলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন তাঁর যোগ্যতার নুনতা।

তৃতীয় পর্যায়ের দিনলিপিগুলি একান্তই সংক্ষিপ্ত, কখনো বা মাত্রই ৩/৪ পংক্তির entry। এগুলির ক্ষেত্রে পাঠের আনন্দের চেয়ে তথ্য উদ্ঘাটনের আনন্দই বেশি। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ (বিবৃতিভূষণের জীবনের শেষ বছর) পর্যন্ত এমন অনেক ডায়েরি বিবৃতিভূষণ রেখেছেন। অবশ্য পাঠের আনন্দ নেই এ কথাই বা বলছি কেন, ওই ছোট ছোট রচনাংশেও প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা, প্রশান্ত উপলব্ধি বা অকস্মাৎ ঝলসে ওঠা সত্যের উদ্ভাস দেখি। বিশেষ করে ১৯৫০-এর ডায়েরিতে।

যাকে ঠিক ডায়েরি বলে বিবৃতিভূষণের দিনলিপিকে সে শ্রেণীভুক্ত করা যায়না। বরং একে journal বা belle letters-এর গোত্রে ফেলা যেতে পারে। মধ্যযুগে স্যামুয়েল পিপ্স (Samuel Pepys) বা আধুনিক যুগে আঁদ্রে জিঁদ এই ধরনের জর্নালের স্রষ্টা। তন্ময় ধারাবাহিকতা এই গদ্যের লক্ষণ।

ত্রিবিধ এই দিনলিপির বাইরে বিবৃতিভূষণের আরো এক ধরনের রচনা আমরা পাচ্ছি, যাকে কোন শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায় তা ভাবনার বিষয়। কখনো খাতায়, কখনো না-বাঁধা খুচরো কাগজে, কখনো টুকরো চিরকুট বা পুরনো খামের পেছনে এসব রচনা পাচ্ছি। ভবিষ্যতে কী লিখবেন তার খসড়া, যেখানে বসে লিখছেন সেই বারান্দার পাশ দিয়ে বেড়ে ওঠা নারকেল গাছের গুড়িতে কেমন সুন্দর একটি কাঠকোঁকরা বাসা বেঁধেছে, কিছা লেখার মাদুরের ওপর বেড়ালাছানার কলম লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে, কানাই জেলে এইমাত্র তাজা খরসা মাছ দিয়ে গেল—এসব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে জানাচ্ছেন ইছামতীর দুই তীরে যে জনপদ তার হাসিকারোর ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লেখার বাসনা। এই উপন্যাস 'ইছামতী' (১৯৫০-৫১) তে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত খসড়া লেখার বহু পরে প্রকাশিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব খসড়া সান্নিধ্যিক, বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত স্মরণিকায় পূর্ণ। কারণ কোনোদিন প্রকাশিত হবে ভেবে লেখক এ খসড়া তৈরি করেন না। এখানে প্রকাশিত অংশটি এই খসড়া ধরনের রচনা। ১০' x ১২' মাপের কাগজে লেখা। অংশটিকে আমি দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি, প্রথমংশ খুবই বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়াংশ কিছুটা একতানা।

ব্যক্তিগত স্মরণিকা যে সব সময় লিখেই রাখতেন তা নয়। ১৯৪৮ সাল নাগাদ একদিন বনগ্রামের কাছে আমসোরে দেশের বাড়িতে (চালকি-বারাকপুর গ্রাম) এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল। বাবা তাঁর লেখার জিনিসপত্র একটা চামড়ার সূটকেন্সের ভেতর রাখতেন। মা দেখলেন বাবা সূটকেন্সটা খুলে খুব ব্যস্তভাবে তার ভেতরে কী খুঁজছেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন — কী খুঁজছেন? কিছু হারিয়েছে নাকি?

বাবা বললেন — এর ভেতরে একটা দেশলাইয়ের বাস্তু ছিল, কোথায় গেল বলতে পারো? ওটা আমার খুব দরকার। —ওতে তো একটা মাত্র কাঠি ছিল। সকালে উনুন ধরানোর জন্য নিয়েছিলাম, তারপর ফেলে দিয়েছি।

বাবা চমকে উঠলেন। — ফেলে দিয়েছি। সর্বনাশ! কোথায়?

দুজনে মিলে রামায়ণের পেছনে আগছার জঙ্গল, কচুবন আর ছাইগাদা ঘেঁটে খালি বাস্তুটা উদ্ধার করে আনলেন। বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে সেটা আবার সূটকেন্সে রেখে দিয়ে বললেন — কাল বিকেলে দেশলাইয়ের বাস্তুটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা লেখার প্লট মাথায় এসেছিল। তখন লিখে রাখতে পারিনি, দরকারও হবেনা, ওই দেশলাইটা আবার হাতে নিলেই সব মনে পড়ে যাবে।

দেশলাইয়ের বাস্তুটি আমার কাছে এখনো রয়েছে।

বিবৃতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে আশির উর্ধ্বে, এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু লেখককে ভাল করে জানতে হলে তাঁর প্রতিদিনের অন্তরঙ্গ জীবনকথা জানতে হবে, যেখানে লুকিয়ে থাকে তাঁর সমস্ত রচনার উৎস, সমস্ত দর্শনের শেকড়। বিবৃতিভূষণের ক্ষেত্রে এ কাজ অনেকটা সহজ, কারণ তাঁর ভ্রমণকাহিনী-দিনলিপি-স্মরণিকা-খসড়ার ভেতর তা বিবৃত রয়েছে।

এর পরে থাকছে বিবৃতিভূষণের অপ্রকাশিত খসড়া। টিকা ও মুদ্রিত অংশের সম্যক ব্যাখ্যা



একেবারে শেষে দেওয়া গেল। খসড়ায় বিভূতিভূষণের বানান ও যতিচিহ্ন অবিকৃত রইল, যেমন তিনি লিখেছিলেন।

প্রাক্কথন ও টিকার ক্ষেত্রে কখনো 'বিভূতিভূষণ' কখনো 'বাবা' লিখে ফেললাম, পাঠকেরা মার্জনা করবেন।]

### বিভূতিভূষণের খসড়া

(ismail 1.2.26)

(দুপাঠা কত বড়োবুড়ীর গল্প)

একটা লোক নানা অদ্ভুত গল্প করে ...

১. ভুওসংহিতা ...
২. কোনারকের চুধক ...
৩. (দুপাঠা)
৪. Boomerang হৌড়া
৫. নুটা মন্তর
৬. শিউলীপুকুর দিয়ে অণু ও হরিহর গাড়ী করে আসছে ... (শিষ্যবাড়ীর আদর)
৭. বড়োবুড়ীদের গল্প
১০. উড়ো সাপ — তালগাছে থাকে — ফক্লুদ্দিন গল্প করে — আবদুল্লা সমর্থন করে — ঘোড়ার মত ডাকে — গাছে ফল হয়না — যে বৎসর চলিয়া যায় সে বৎসর ফল প্রথম হয় তেতো... একজন দূর বিশেষ থেকে সাপুড়ে এসে সাপ চায় —
১১. উড়োসাপের ডানার হাড়ে বাত ভাল হয় — ডায়মন্ড হার পরে জমিদার সেরেস্তার কাজ করে — তার গল্প
১২. ভালুক ও শালবন — ভালুকে মাটি খুঁড়ে — টাকা পেল — বাঁকুড়া জেলার জ্যোৎস্নাভরা শাল-পলাশের বন —
১৩. সাহেব সান্নিকিতে ভাত খায় — বড় বিদ্বান লোহার পাহাড়ের ঠিকানা দেয় — বড়মানুষ করে দিয়ে যায় —
১৪. এইসব Climax-এ উঠিয়ে এক গল্প ...
১৫. টাঁড়বারো — ধরমপুরে মহিষের ভূত — রাখাল। কালো, লম্বা চেহারা — বুনে মহিষের পাল ঘন জঙ্গলে চরায় — কেউ কেউ দেখিয়াছে।

Apu II V.I

### ১. Story of Education :-

যে শিক্ষা স্কুল-কলেজে পড়িয়া হয় নাই, শুধু মনে জিজ্ঞাসা জাগাইয়া ইয়াছিল। মন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই কতকগুলি ভাব মনে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় — তাহা ভাল না। জগতের সমস্ত দ্রব্যের উপরে যখন তাহার কৌতূহল জন্মিল, তখন তাহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল — প্রাকৃতিক ভূগোলের শিক্ষা — বিজ্ঞানের শিক্ষা ইত্যাদি —। সে যখন আবার গ্রামে আসিল তখন — প্রথমে বাহিরে বাহিরে খুব বেড়াইত ... অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে — সেই আতুরী ডাইনি ইত্যাদি — তিনবৎসর ... তখন ছিল নয়, এখন

এগারো ...

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

A great change when Apu came back to their village in Apu II, he appreciated the advent of spring for the tenth time / he first noticed the wonderful country sky.

Apu II - এর বড়শালুয়ের বাড়ী একটা Pathetic character-young woman অপমান হয়ে আসে — গোপনে কাঁদে, — কেউ পোছে না - অপুর সঙ্গে ভাব হয় —

A plot - একটা বুড়ীর ছেলে মরে যায় — ৬০ বছর বয়সে- বুড়ীর ৮০ — সেই ৬০ বছরের ছেলে যখন শিশু ছিল — তাহার জমা, জুতা তোলা আছে ওর বাস্রে।

Apu II - বৈকালে নৌকা করিয়া নদীতে একা একা বৈঠা বাহিয়া বেড়ানো — (দুপাঠা) Creek. কলমী শাকে নারায়ণের শায়ণ -। দুরের স্বপ্ন ... Big game. স্কুলে থাকিয়া পাশ করিয়া বাহির ইয়াই collage life এর স্বপ্ন দেখা ..... স্কুলে একদিন অবিচার ..... মাষ্টারে মারে - শনিবারে বাড়ী আসে — মার হাসিমুখ দ্যাখে - ভাবে - আর কি আমার তো সব গিয়াছে! ... আর হাসিমুখ কিসের? ...

মা তাহাকে - দূরে কোথাও পাঠাতে

Apu II - তাহার মা ভাল রাখে - বড় মানুষের বাড়ী রাঁধিয়া দ্যাখে কে ভাল বলে — সবাই মাতাল (?) ইয়াছে - কে তাহাকে পুঁছিয়ে? ...

রাঁধুনী বামন ইঁকার খোলে ষি চুরি করিয়া মার খায়—অপু যে বাড়ি বিবাহ করে পুরাতন বন্ধিফু পাড়াগাঁয়ের জমিদার ঘর (দুপাঠা) অন্নপূর্ণা ভাজের খাওয়া ...

Apu I - এই একটা বড় ভোজ ... বড় atmosphere - দই এর হাড়ি চুরি করে আনে হরিহর — তার consequence অপুর ছাঁদ আনার chapter সেটা বাদ দিয়েচ — develop করে। ...

শিষ্য বাড়ির অধ্যায়। অপু বাড়ী আসিয়া মারা যাওয়া যাওয়া হয় ...

Apu II - আঁকোড় ফুলের মাদকতা - বোড়িংয়ের পিছনে—আঁকোড় ফুলের গন্ধ ...

Apu II - রন্ধনের জন্য সর্বস্বজয়ার সৃষ্টিয়া ... বড়লোকের বাড়ী অপমান — একজন

### দেবতার ব্যাখ্যা

পৃথিবী ক্রমে মৃদুগতিতে আবর্তিত হচ্ছে ... হিমবর্ষী রাত্রি ... ৪০ দিনে একদিন ... ৪০ দিনে একরাত্রি। ভয়ানক শীত, ভয়ানক গ্রীষ্ম।

অনেকদিন পরে পৃথিবী দেবতা এল ... সেই সুন্দর পৃথিবীতে ...

ভয়ানক অন্ধকারে, হিম নাক্ত্রিক শূন্য পার হয়ে যাচ্ছে ... কী ভয়ানক হিম ...

বহুদূরের এক আবর্তিত সূর্যের উজ্জাপে কিছু ঠান্ডা হোল ...

এক গ্রহ ... ফল, ফল, পাখী, হাসিমুখ - বিশাল শূন্যে ৪০ বছর অনবরত ভীষণ গতিবেগে চলেও পৌঁছানো যায় না ...

হঠাৎ অনন্ত শূন্যের এক কূল পাওয়া গেল ... পাখী গাইচে, ফুল ফুটে আছে, গরম মৃদু হওয়া ডরা কোন অজানা মাতৃভূমি ...

## A short story

ধাওতাল সাহেব ... moneylender... সরল ... বলে, এখন না, রাতে এস ... টাকা গুণতে জানে না। বলে, গুণে নাও ... ঠকায় ... দুখে পড়ে। (আজ ধাওতাল সাহেব সঙ্গে আলাপ হোল)। জিজ্ঞেস করলাম — তুমি তমসুক ছিড়েছিলে? বলে—হ্যাঁ, সেটা একটা তমসুক। ৪.৫.২৪ [ ]

## A short story

ছেঁট ছেলে। দৌরাখা করে। মায়ের জিনিস লুকায়। একদিন একটা জিনিস পাওয়া যায় না। মা বকে।

ছেলে মারা যায়। অনেকদিন পরে পাইলারের এক ঘুলঘুলি থেকে জিনিসটা বেরোয়। অনেক বৎসর পরে। মার আর যৌবন নাই। সেই ছেলে—সেই হাসিমুখ—কট্টক রাঙা মুখখানা মনে পড়ে। ...

বলে খপি ছাক আঁডো — ভিডি — খপি ছাক —

গান গায় — এই যে গঙ্গা পুণ্য ঢারা

বিমলমুরটি চরণ পালা (?)

বিশ্বনাথের চরণতলে বইছে কুতুহলে

খোকা কি একটা লুকিয়ে রাখে... অনেকদিন তার

মৃত্যুর পরে ঘুলঘুলি থেকে বাহির হয়েছে ...

বলিয়া ঘাড় দেলায়। ... এক গালে চুমু খেতে দিয়ে অন্য গালটা ফিরিয়ে থাকে — মা দেখে বলে — ও, ভুলে গিইচি —

ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া চৌকির তলায় লুকায়। খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। মা টানিয়া (বাহির) করে। ভয়ে

বলে—আমি খপি ছাক খাবো না —

— খাবিনে তো?

ঘাড় নাড়িয়া আশ্বস্ত করিবার সুরে বলে—না।

তারা ভূত না, ভবিষ্যত না

তারা অনন্তের

বাংলাদেশের জন্য তার মন কেমন কর্ত ...

মধ্যে দিয়ে চলেছে ... মনটা তাহার ছুটিয়া যাইত সেই বীশবনের মধ্যে। নদীর পাশের সোনালো ভাঙা মাঠের ঐক্যফুলের নোপের পাশ দিয়ে ... বড় ঝঞ্ঝপ্রেস থানা যেন ছুঁতে ... গান গাইত — ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি —

নদীতে জল নিয়ে চলে যাচ্ছে বাঙালীর মেয়ে। দেখে তার চোখ দিয়ে জল আসতো ...

বর্ণনা করা মানে বুঝিয়ে দেওয়া। বিশদ করে জিনিস বুঝিয়ে না দিলে অনেক জিনিস অস্পষ্ট থেকে যায় ...

প্রবালদ্বীপে যারা বাস করে তাদের চারিধারে নীল মহাসমুদ্র ... নারিকেলকুঞ্জের সারি—মাথার উপর নীল আকাশ ...

কিন্তু এক একটা হঠাৎ উদ্ভাস ঝঙ্কা আসে ... দেখা যায় একখানা কুঁড়েও ঠিক নেই। ...

## A plot -

## 1. The Prodigal son ...

বিভু — ... গোড়া থেকেই

খারাপ। মুখে মাছি ভন্ন ভন্ন করছে ... শেষ ...

## 2. The worshipper of Shiva.

## V. Imp. Apu II

অনেকদিন পরে অপূর সঙ্গে তার মার দেখা হোল — ৫/৬ বৎসর পরে? — অপূরের বাড়ি মা থাকে — তারা আশ্রয় দিয়েছে — বড় বনেন্দী ঘর — অপূর দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা — তারা অবাক, এমন ছেলে মা ছেড়ে ছিল? তাদের ঘরে জায়গা দেয় — একটি মেয়ে আছে সে বাড়ী — সুন্দরী — আগে ওর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে — বিয়ে করবে না—একা। Love ... একদিন ওরই লেখা বার করে। অপূ দাগ দেওয়া ... আমার লেখা আপনি পেলেন কোথা? ... বিস্মিত — আপনার লেখা? ... হ্যাঁ, আমার। পেলাম ... Portfolio খুলে দেখায় ... (See—) এদের অপূকে দেখে পছন্দ হয়। বিয়ে দেবে — মা বিয়ে দিয়ে ছেলে নিয়ে বাড়ী ফেরে? ... সেই বাড়ী — সেই বন সেই দুর্গা আজ কোথায়?

## The End

## Apu II -

লিখতে লিখতে ভাবতো হয়তো South America র এক নির্জন (?) ranchman এখন এ লেখা পড়ছে ....

## V.I

Apu II এর General (দুপাঠা) এইরাপ। অপূ খেলিয়া খেলিয়া বেড়ায়, নষ্ট হইয়া যাইতেছে, হাট বাজার করে, কড়ি খেলে, গরু চরায়, এইসময় একদিন প্রাকৃতিক ভূগোল পাইল, একখানা ইংরাজি বই পাইল — সেই (দুপাঠা)

## (দ্বিতীয় পর্ব)

দুপুরের শান্ত নীল আকাশে এক একদিন সে চাহিয়া থাকিত :- আপনমনে মনে ভাবিত:- তাহাদের গ্রামের ছোট নদীটার ঘাটে এতক্ষণ তাহার রাজকাকা মান করিতে নামিয়াছে :- দা-ঠাকুর, এত বেলা যে হোল?

— এই একটু হান্ডাঙায় তাগাদা করে এলাম বাপু,

যে দিনকাল পড়েছে, তাতে তোমার বাড়ী বয়ে যে কেউ টাকা দিয়ে যাবে, সে দিন নেই —

হয়ত তাদের ছোট নদীতে নৌকা বাহিয়া যাইতে যাইতে অকুর মাষি বলিতেছে :-

— ও কুড়ুনীর মা, বেগুন বাচুবা — না খাবার জন্যে তুলুচে? ...

ওখানে বাবলাবন, শীতের দীর্ঘ ঠান্ডা ছায়া শিরীষ গাছটার তলায় ঢলিয়া-পড়া বৈকালের আভাস দিতেছে, ফেব্রুয়ারি গাছে ডাঁড় বীধা রসের গন্ধ বাহির হইতেছে — হয়ত সেই লাল মহাজলদের দেশে বধু এতক্ষণ আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া আছে, এটো বাসন উঠানের ছেঁ-



তলায় জড়ো করা, কাকে ঠুকরাইতেছে, বাড়ীতে সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন যৌত্রময়ী রাত্রি দুপুর ... বাহিরের বিচালী গালা হইতে নতুন (?) কলাই এর, ধানের নাড়ার গন্ধ বাহির হইতেছে ...

নয়ত তাদের বনে ঘেরা বাড়ীটা - কিছুকিচ্ পাখী ডাকিতেছে - সেই মিষ্ট নিশেদ শান্ত বিকাশের ছায়া — সেই দূরের অশথ গাছটা।

৫০০ বছর পরে কোথায় থাকিবে এরা? এই অতাত্ত আগ্রহের প্রাণযাত্রা, নিতানূতন মহোৎসব কল্পনা, ছোটখাটো জীবনযাত্রার সুখ ও ঐশ্বর্য ...?

আবার নতুন মুখ, নতুন চোখ, নতুন মন এইরকম আনন্দে, সুখে, প্রাণভরা আগ্রহে ঘর-কমা শুরু করিয়া দিবে (?)

নীল, নিঃসীম আকাশ, মাথার উপরে দূর-দূর প্রসারিত ... নীল, নীল এমন নীল! একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে — সেই ছেলেবেলাকার মত — দূর হইতে দূরে, দূরে — বহুদূর শূন্যে একটা ক্ষুদ্র বিন্দুর মত কোথায় চলিতেছে — অনন্তের পথে পথযাত্রীর মত! ...

ইতিহাসের Ancient World এর উপর তাহার অদ্ভুত আসক্তি আছে। সে দেখিতে পায় চোখের সম্মুখে — সে যখন জন্মায় নীতি তাহার হাজার বছর আগে তাহার সব গিয়াছে — তাহাদের অস্পষ্ট পদশব্দ মহাকাশের বায়ুপথতলে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে — দিন দিন (....) Alexander কে দাখে — হাসিয়া মদ খাইয়া জীবনকে স্ফুর্তি করিয়া উড়াইয়া দিল — তাহাদের সঙ্গে কতদিনের কত হাসিমুখ ভরুণ তরুণী আসে ... কত Twister (?), কত Horace ... তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, কত দ্রাক্ষাকুঞ্জে, নীল সমুদ্রের ধারে, মাথায় ওলিভ গাছের নতশাখা বাঁধিয়া চাদের আলোয় তারা নৃত্য করে। মরুবালু খুঁড়িয়া বহুতল ফিট নিম্ন হইতে খুঁড়িয়া বাহির হয় ...

তাদের অতীতকালের অলসক্ক রাগরক্ত পায়ের চিহ্ন ... পাথরের আবড়া-খাবড়া দেওয়ালের গায়ে তাদের নত হাসিখুসির অদৃশ্য শিলালেখ, ... ঠাণ্ডা, ভাঙা মেজের বড় পাথরের নিচে অন্ধকার গর্তে ছোট আখারে বদ্ধ তাদের মণিহার গুপ্ত ছিল — তাহা বাহির হয় ... কতদিনের কত আনন্দের নিদর্শন!

দূর অতীতের বনে বনে যেসব ফুল ফুটিত, যেসব পাখী বৈকালের ছায়ায় আধ-শুকনা ডালে বসিয়া গান গাহিত, এই সব মক্সপ্রান্তরে আজও তাদের নিদর্শন বাহির হয়, তাদেরই সম্মিলিত — পুরানো দিনের নাগরিকদের প্রতি দিবস (?) মধ্যাহ্ন রাত্তানো — যে দিবস, যে মধ্যাহ্নের আজকাল কোনো খোজ মেলে না, সীমাহীন কালসমুদ্রে কত দিন বিলীন হইয়া গিয়াছে ...

একটি ছোট্ট বালকের সমাধি গ্রীসের কোন অজানা প্রান্তরের বুকে (.) তাকে বড় ব্যথিত করে, সেই যে তার বাবা লিখিয়া রাখিয়াছিল :—

This child of ten years

Philip his father laid here.

His great hope Nichoteles.

সুন্দর মুখ (.) সুন্দর রং (.) পরীবারকের মত লাগবড়ার দশ বৎসরের বালক নিকোটেলিসকে

নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে সে যেন দেখে ... রাস্তা রাস্তা সোনালী চুলের রাশ — ডাগর ডাগর চোখ ... গ্রানাইট পাথরের কত কথায় তার পিতৃস্নেহ গ্রীসের নির্জন প্রান্তরের বুকের সমাধিক্ষেত্রে অমর হইয়া আছে ...

V. Imp.

Apu II এর কোনো জায়গায় Continuous narrative না দিয়ে একটা part শেষ করে আনা— এইরকম ভাবে আরম্ভ কর্তে হবে —

অনেকদিন হয়ে গেছে — প্রায় ছয় বৎসর কেটে গিয়েছে। অপু এখন ১৪ বছরের ছেলে-স্কুলে পড়ে। বোর্ডিং এ থাকে।

সকালবেলা। স্কুলে ইনস্পেক্টর আসবে। হেডমাষ্টার নোটিশ দিয়েছেন যে, সব ছেলে খাতাপত্র নিয়ে ১০ টার মধ্যে হাজির হবে। ...

abrupt ভাবে একটা লম্বা দৌড় দিতে হবে across time (.) নইলে পালা যাবে না।

ভবিষ্যতে অপু বহুত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। Fiji, Kenya, Durban — New Zealand (.) Pacific Isles — ইহাদের অদ্ভুত Landscape, immense possibilities গুলো দিতে হইবে। This will be an untrodden ground. African forests - falling stars - Egypt, Grey Desert - green isles in the Pacific ...

Apu II এ একজন দৃষ্ট্যবান যুবকের বর্ণনা — যে যুবক অপু নিজেই — অধ্যয়ন — আর্ট—চিত্রাভ্রমণ—নানা হানের নানা দেশের atmosphere - love -

কি যেন মুখে বলা যায়না — অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় — দূরে — পোড়ো ভিটার কথা মনে পড়ে। অপু বেগের পানা থায় — দূরে মায়ের কলসীগুলো পোড়ো ভিটার গড়াগড়ি যাচ্ছে ভঙ্গলে অন্ধকারে (.) ভাবে — কতদিন আগে এই সব হাঁড়ি কলসী মা কি ভেবে তুলে রেখেছিল — কত আশা, কত উৎসাহ ওর পেছনে — তারপর কোথায় গেল কে? কোথায় গেল মা — কোথায় তার সংসার?

তার ছেলে সেই অপু এখন দৃষ্ট্যবানের তেজে মানুষ হয়ে উঠেছে — সে মেয়েলি অপু আর নাই। Morality, Truth — বিদেশ-বিভূঁই বেড়িয়ে সে cosmopolitan, bold শিল্পী, cosmic life এর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক।

দূরের অন্ধকারে অনন্ত শূন্যে যেন সব জ্যোতির্ময় গ্রহ—অন্ধকারে ডুবে ডুবে ঘুরছে—কত জীব কত বিবর্তনের ইতিহাস ওদের পেছনে —

দূরে এই মেঘাচ্ছন্নকার রাতে চাইলেই নিকষকৃষ্ণ চক্রবালের ওপারে কোথায় সেই সব অজানা গ্রহলোক, সেই পোড়ো ভিটের মতই রহস্যময় হয়ে দেখা দেয় ...

[এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কয়েকবছর বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে খেলাত ঘোষেরের বিস্তীর্ণ জমিদারিতে ম্যানেজারের কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। 'আরগ্যক' উপন্যাসের পটভূমি যে ভূভাগ। তখনো তিনি সে অর্থে লেখক হয়ে ওঠেন নি। ১৯২৩ সালে মাঘ মাসে প্রবাসীতে 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়েছে, দু একটি গল্প আরো এদিক ওদিক। কিন্তু ভবিষ্যতের পূর্ণ



লেখকসত্তা বিকশিত হতে শুরু করেছে নির্জন প্রবাসে রচিত এইসব খসড়া। এর কোনো মূল বিষয় নেই, তথাকথিত ধারাবাহিকতাও নেই। কখনো 'পথের পাঁচালী'-র খসড়া করবেন, কখনো ব্যক্তিগত চিন্তা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন, কখনো বা অন্য কোনো গল্পের কাঠামো লিখে রাখছেন যাতে ভুলে না যান।

খসড়ার শুরুতেই ওপরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা 'Ismail', অর্থাৎ ইসমাইলপুর কাছারিতে বাসে অংশটি লিখিত। এর পরে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে কিছু প্রায় সাপেক্ষিতক বাক্যাংশ। কোনোরকের চতুকের কথা 'পথের পাঁচালী'-তে আছে। অল্প পাঠশালায় বসে এসব গল্প শুনত। সত্যের কাছে 'নূতী মস্তুর'। ১৯২৬ সালে এ গল্প লেখার কথা ভেবেছেন, লিখেছেন ১৬/১৭ বছর পরে। এ গল্পের উৎস সম্বন্ধে একটি তথ্য জানাই। বিশেষ দশকে বাবা 'Masterpiece Library of Short Stories' নামে একটি বারো-খণ্ডের বইয়ের সেট কেনেন। তখন সস্তা- গভার বাজার, কিনেওছিলেন কিস্তিতে, তবু এই বইয়ের ধাক্কা তাকে পরবর্তী দু চার মাস প্রায় আলুতোতে আর ভাত খেয়ে কাটাতে হয়েছিল। সম্ভবত এই সেটের থেকেই তিনি পড়েছিলেন একটি স্প্যানিশ ছোটগল্প — 'The Wizard Postponed', গল্পটি চতুর্দশ শতকে রচিত, লেখকের নাম Don Juan Manuel. Juan Manuel রাজা তৃতীয় ফার্নান্ডোর পৌত্র। 'নূতী মস্তুর' এই গল্পেরই ছায়ায় রচিত। আগ্রহী পাঠক Alberto Manguel সম্পাদিত ও হার্বার-কলিনস্ (ফ্রেমিংগো) প্রকাশিত 'Black Water : The Flamingo Anthology of Fantastic Literature' (১৯৯৪) সংকলনের ৫০৭ পৃষ্ঠায় গল্পটি পড়ে দেখতে পারেন (উৎসনির্দেশের জন্য তথ্যগত বন্দোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম)।

দশ নম্বরে পাঁছ ফকরুদ্দিনের নাম। ফকরুদ্দিন ছিল আমাদের গ্রামের লোক, পেশায় শিল্পী — অর্থাৎ যারা রসসংগ্রহের জন্য খেজুরগাছ কাটে। বাবা একে 'সই' বলে ডাকতেন, বন্ধুড় পড়িয়েছিলেন এর সঙ্গে। মাকে বলতেন — শুড় তৈরির ব্যাপারে সই একজন বড় শিল্পী, অমন আর কেউ পারেনা।

চোদ্দ নম্বরে যে গল্পের চূষক রয়েছে সে গল্পও বাবা লিখেছেন অনেক পরে। নাম — 'ধনটন কাকা'। তবে খসড়ায় রয়েছে লোহার পাহাড়, গল্পে তা বদলে হয়েছে কমলা-র খনি। পরনোয়ে টাডবারো। 'আরণ্যক' উপন্যাস সবাই পড়েছেন, বন্য মহিষের দেবতা টাডবারোর পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই।

এর পরে খসড়ার নতুন পর্ব। শুরুতেই লেখা — Apu II, অর্থাৎ অণু কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের খসড়া যখনই লিখেছেন, তাকে 'Apu I' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'-এর মূলদ্রিত বিবৃতি যত, দুই উপন্যাসের খসড়াও প্রায় তত। একজন বড় সাহিত্যিকের সৃষ্টির পেছনে কী শ্রম ও নিষ্ঠা থাকে এই পাতাগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু সৃষ্টির আনন্দের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মনে পড়ে ফ্রান্সোয়া মরিয়াক এর কথা — A writer's life is a dog's life, but it is the only life worth living. খসড়ায় শিল্পকের প্রহারের কথা আছে, বোধহয় মনে মনে ডিকেন্সও ছক অনুসরণ করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অণুর চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাবেনা বলে তা করেন নি। ছোজের বাড়ি থেকে হরিহর দই-এর ইপিডি চুরি করে আনছে এই প্রসঙ্গও সম্ভবত একই

কারণে উপন্যাসে রাখেননি।

'দেবতার ব্যাধ' নামে একটি sub-head এর পরেই পাঁছ। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত 'দেবযান' উপন্যাসের নাম দেবেন ঠিক করেছিলেন 'দেবতার ব্যাধ'। তারই খসড়া করেছেন ১৯২৬ সালে, লিখেছেন প্রায় কুড়ি বছর বাদে। পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে (উদ্ভিদতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব ছাড়াও) বিভূতিভূষণের গভীর পড়াশুনা ছিল। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থসংগ্রহ বিভিন্ন অনিবার্য কারণে উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছোননি, কিন্তু যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যেই রয়েছে Russell, Sir Arthur Eddington, Sir Oliver Lodge, James Jeans, Robert Ball প্রমুখ মহাপুরুষদের গ্রন্থ। 'দেবযান' বিভূতিভূষণের বিতর্কিত উপন্যাস কিন্তু বিতর্কে প্রবেশ না করেও আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের মহাজাগতিক চেতনা একাত্তই বিজ্ঞানসম্মত। এখানে যে কয়েকটি পংক্তি রয়েছে তা পৃথিবীর যে কোন প্রথম শ্রেণীর সায়েন্স ফিকশনের স্তর হতে পারে। বিশাল আন্তর্জাতিক মহাশূন্য পার হয়ে যে দ্বীপবিশ্ব-এর কল্পনা এই খসড়ায় বিভূতিভূষণ করেছেন বিজ্ঞান তার সম্ভাবনা আর অস্বীকার করেনা।

পরেই রয়েছে একটি ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত ছক। মূল চরিত্র ধাতাল সাথ। এই চরিত্র পরে 'আরণ্যক' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গল্প হিসেবে আর লেখেননি।

পরের ছোটগল্পের ছকটির বিষয়বস্তু লেখকের প্রিয় theme 'বাটি চচ্চড়ি' গল্পে মৃতা বধুর চরিত্র এই খসড়ায় উল্লিখিত শিশুরই প্রতিচ্ছবি। 'কোদার রাজা' উপন্যাসে একটি শিশুর মুখে আধো আধো বুলিতে এই ছড়াটি বসিয়েছেন লেখক।

মহাসমুদ্রের বুকে ছোট প্রবাল দ্বীপে ঝড় ও জলোচ্ছাসের কথা লিখেছেন কিছু পরে। চীন-জাপান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কিশোর উপন্যাস 'মরণের ডংকা বাজে' এবং অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'হীরা মাণিক জ্বলে'-তে এই ধরনের ঘটনা থাকলেও আলাদা ভাবে কোন গল্প লেখেননি। ধ্বংসলীলার বর্ণনা যেভাবে রয়েছে তাতে মনে হয় বিভূতিভূষণ Tsunami-র কথা বলছেন।

এই অংশের পরে খসড়া পাশাপাশি দুটি স্তম্ভে বিভক্ত। বাদিকের স্তম্ভে সামান্য দু এক পংক্তি, ডানদিকের স্তম্ভটি Indent ধরনের। এখানে অণুর বিবাহ সম্বন্ধে লেখক যা ভেবেছেন তা 'অপরাজিত' তে নেই, ব্যবহার করেছেন 'উন্নতি' নামে ছোটগল্পে গোকাচ চরিত্রে।

খসড়ার প্রথম পর্ব এখানেই সমাপ্ত।

মুদ্রার দ্বিতীয় পর্ব পূর্ববৎ খণ্ডিত নয়। প্রথম থেকেই অণুর স্বগত চিন্তা Run on গদ্যে চলেছে বেশ কিছু দূর। নিকোটিনিসের সমাধিক্ষেত্রের বর্ণনার পরে সামান্য Space, তারপরে Apu II-এর নৈবৃত্তিক খসড়া পুনরায় শুরু। এই পর্যায়ের একদম শেষের দিকে অণুর চিন্তা এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিভূতিভূষণের কল্পনা মিশে যাওয়ায় অংশটিকে পুনরায় 'দেবতার ব্যাধ'র স্মরণিকা বলে মনে হয়। প্রসঙ্গহীন খণ্ডাংশ, কখনো বা অনামনম্ভতার ফল হিসাবে গুরুচণ্ডালী, প্রাচীন নিম্নরেণু বনানী এবং যতি চিহ্নের বিরলতা—এসব সত্ত্বেও সমগ্র মূদ্রিত রচনার মধ্য দিয়ে চিন্তাশীল একটি ধ্রুপদী মনের প্রকাশ পরিস্ফুট। বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য কবীর সঙ্গে পাশাপাশি হেরেও পড়লে এই অংশের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।]



## কমলকুমার মজুমদারের অগ্রস্থিত রচনা পুনর্মুদ্রণ

সম্পাদনা : সূর্যত রুদ্র

'রোজনামা' ধারাবাহিকভাবে বেরুতে শুরু করে 'জনসেবক' পত্রিকায় ৬ ফাল্গুন ১৩৬৮ সালের রবিবার। 'সাহিত্য বিচিন্তা' শিরোনামে ছাপা হয় 'রোজনামা'। 'সাহিত্য বিচিন্তা' 'শিরোনামে' অনেকের লেখা ছাপা হয়েছে জনসেবক পত্রিকায়।

কমলকুমার মজুমদারের এই দীর্ঘ লেখা তারপরের রবিবার অর্থাৎ ১৩ ফাল্গুন থেকে আলাদাভাবে 'রোজনামা' শিরোনামে ছাপা হতে থাকে।

২০ ফাল্গুন, ২৭ ফাল্গুন, ৪ চৈত্র, ১১ চৈত্র, ১৮ চৈত্র, ২ বৈশাখ। এর মধ্যে একটি রবিবার ২৫ চৈত্র তার লেখা দেখতে পাহিনি।

## রোজনামা

II ১ II

"বল ভালবাসা, দেখা হবে  
কোন সে নদীর ধার?"

এই নিত্য দিবা শব্দনিচয়ের পিছনে কোন বেলাবতী রাজকন্যা নাই, ইতঃমধ্যে দুর্গম কানন নাই, বঞ্জা নাই; কেন না সেই নাই। সুদূরপ্রসারী প্রান্তর আছে আরও দূরে দিগন্ত লেখা। এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে আবেগ যখন আপনার প্রতিধ্বনি শুনিয়া অত্যধিক ব্যাকুল হইয়াছে এখানে তাহারই প্রস্থান।

অথচ আদিমতা সন্ধ্যা দেখিলে, মৃত্যুর জন্য যখন মানুষ প্রথম অশ্রু বর্ষণ করিল, আপনার দীর্ঘশ্বাস শ্রবণে চকিতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কোন উদ্ভূত পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, দেহত্যাগের পর 'দেহ' নক্ষত্র হইয়া যায়?

তখনও 'বল ভালবাসা' বলিয়া প্রশ্ন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইহার পর বধ কাল গিয়াছে, যখন পথপ্রমজনিত পিপাসায় আমি অবসন্ন। উদার আকাশের গ্রহনক্ষত্রের ইশারায় অর্থহীন, কেন না, আর পথ নাই; আর আমার দেহই যখন একটি বজ্র, অমোঘ, নির্বাণ বাতুল ঠিকানা মাত্র, তখনই ভালবাসার সহিত সাক্ষাতের একান্ত সময়। বসন্ত এই সামান্য বাসনা আমাদের প্রত্যেককেই, দ্রাব্যিক প্রত্যেককেই কন্টকিত করিয়াছে।

নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রে শুনিয়াছি, কেহ যেন ভূতচালিত কণ্ঠস্বরে বলিয়াছে, "পুনরায় অন্ধকার দিব; সে প্রোতধিনী অন্ধকারে ভূমি নিশ্চিন্তে অবগাহন করিতে পারিবে, ভূমি শান্তি পাইবে।" আমি সমাচার শুনিয়াছি মাত্র, কারণ এখন আমি এতদিন পর পিঙ্গলার মত জাগিয়াছি।

বৈশেষিকদর্শন - পিঙ্গলা আপনার প্রিয়াপদের জন্য, রাজ জগরণের পর ঘুমাইয়াছিল, যেমন বালিকা বধু একটি রানিয়া আর চুড়িসকল চূর্ণ করে, কেন না চুড়ির শব্দ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

যেখানে জাগিয়া আছি, তাহারই অনতিদূরে কিছু কিছু আলোর বর্তমানতা, মাধো মাধো কখন ক্রম বিলীয়মান কভু বা ঘন নিবপট কুমাশা, তথাপি আলো বর্তিত, অগ্নি শিখা প্রতীয়মান। দুঃসহ 'পায়েন' নীত যাহারা গাহিতে গাহিতে দুর্ধ্ব হইয়া উঠিয়াছিল তাহারাই আঙুন জ্বালিয়াছে।

এ অগ্নি নচিকেতাগ্নি নহে।

অবশ্য এ অগ্নি লাভের জন্যই নচিকেতা যম সকাশে গমন করেন নাই। মানুষ মারই শাসনে ন্যায় জীর্ণ, একথা উপলব্ধি করত আপন পিতাকে নচিকেতা সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করে যে তাহাকে যমকে অপর্ণ করা হউক। নচিকেতা যমকে বলেন, হে মৃত্যো! আপনি এইরূপ গুণসম্পন্ন স্বর্গলোক লাভের হেতুভূত অগ্নি বিষয়ক তত্ত্ব বিদিত আছেন। অতএব আমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও স্বর্গকাঁষী, মং সকাশে সেই অগ্নির কথা বলুন। আপনি এই অগ্নির বিষয় কহিলে স্বর্গার্থী যজ্ঞমানগণ সেই অগ্নি সঞ্চয়ন পূর্বক স্বর্গলোক লাভ করত দেবর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব অগ্নি বিষয়ক তত্ত্ববিজ্ঞানই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা।

যম কহিলেন, 'স্বর্গপ্রদ এই অগ্নিই তোমার নামে প্রথিত হইবেন অর্থাৎ যে অগ্নি সঞ্চয়ন দ্বারা স্বর্গসাধন হয় তাহার নাম নচিকেতাহয়ি হইবে'।

যাহারা আঙুন জ্বালিয়াছে তাহারা বীভৎস প্রান্তর হইতে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছে, তখন কাহারও মুখে 'পায়েন' গুঞ্জন ধ্বনি ছিল, কোথাও অজ্ঞ পরিভাষ্য তীরসমূহ, কোথাও ঈজিপ্তীয়দের বেতের ঢাল, অন্যত্র কাঠের ঢাল সকল, বিপক্ষের পলাতক সৈন্যসকল, বাগীর সৈন্য সকল, গ্রীকদের আগমনে ফেলিয়া উঠাও, হায়! সারথিশূনা রথগুলি পড়িয়া আছে ফলে সমিধের অভাব নাই। ইহার আঙুন জ্বলিতেছে, তাহারা মাংস কলসাইতেছে, এই গড় আলোকে তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত হয়।

উজ্জয়িনীতে একদা বধ পূর্বে টি ভাকরাল নামে এক প্রসিদ্ধ জুয়াড়ী ছিল। প্রতিদিনই সে হারিত, বিজয়ী জুয়াড়ীরা তাহাকে দয়া পরবশ হইয়া সায়াংকালে একশত কড়ি মাত্র লিভ। টিভাকরাল এ কড়ি সকল দিয়া কিছু গোধুমচূর্ণ কিনিত। সেই গোধুমচূর্ণ একটি ভাঙা মাটির পাত্রে কোনরূপে গড়িয়া ক্ষণে যেনো কাহারও প্রিয়জন নিশ্চয়ই — কেন না মানুষ প্রিয়াপদ — হয়ত পুড়িতেছে, চিতার আঙুন গোধুমচূর্ণ পিষ্টকগুলি সেকিত, এবং মহাকালের মন্দিরের প্রদীপ হইতে ঘৃত চুরি করিয়া মাখাইয়া থািত।

যে অগ্নি আলোয়ার মত। কিয়দংশ মন্দিরস্থিত পবিত্র হোমায়ির ন্যায় যে অগ্নিকে অতীব স্নেহে বধীসী আনধিনীরা যাহারা আর পূজসম্ভবা নহেন — তাহারা লালন করিতেন, এ অগ্নি কতবার না বিধস্ত হইয়াছে। একদা যখন মিডস ডেলফীর মন্দির অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। একদা, অন্যস্থানে রোম প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সমুজ্জল অগ্নি মিথারিভেটিক যুদ্ধে, অন্যভাবে পুনরায় তাহাদের গৃহযুদ্ধে, গুণু মাত্র যে বিনষ্ট হয় এমত নহে, উহার বেদী পর্যন্ত ধ্বংস হয়।

হায় সে অগ্নি জড় উদ্ভূত নয়।

এই দিবা অগ্নি রোমানেরা বিশ্বাস করিত এই মর জগত হইতে লাভ করা যায় না, ইহা শুদ্ধ, ইহা সুন্দর। যে হেতু, এই অগ্নি মানুষের চেতনায় আছে। ইনি বিরাট অগ্নির অংশ হেতু ইনি বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয়রূপ কন্দুর (গুহামায়া) নিবপ্ত আছে।



ইহা যন্ত্র-সম্ভব, ফলে, The kindled with concave vessels of brass, formed by the conic section of a rectangle, whose lines in circumference meet in one central point —

এইরূপ যন্ত্রটি ভাস্কর্য সূর্যের সম্মুখে রাখা উষ্ণতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এই নিমিত্ত যাহারা সর্বপাশ বিমুক্ত ব্রহ্মবিরহিত চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক প্রকৃতির দ্বারা ইহা সম্ভব (or else because virginity like fire, is barren and unfruitful) ফলে বহু কুমারীজন সে অগ্নি রক্ষা করিতে আপন জীবন যৌবনকে উৎসর্গ করিল।

'ভেস্টাল' কুমারীরাই হোমায়ি রক্ষা করিত। ক্রমাগত অগ্নির সাহচর্য লাভ করিত। যদি কখন কপাল দোষে, অগ্নি সঞ্চারিত উষ্ণতায়, অন্য আর উষ্ণতা রোম সকলকে হরষিত করে, আর যে, দীর্ঘায়ত রোমকূপ শ্বাস গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হয়, তখনই তাহার অতীতের অন্ধকার নিচয় সম্মুখের পথ রোধ করে।

বীজহীন নিষ্পাপ কুমারী জীবন, যখন কলঙ্ক, যাহা হোমায়িকে বিদূষ - জীবনকে অবসন্ন করিয়াছে — তাহার অবসান 'কলিন গোট'। এই কলিন গেটে সেই জীবনের জীবন্ত সমাধি। মন্দির হইতে বহুদূরে একটি কূপের নিচে একপাশে ছোট কক্ষ। এই কক্ষে, রম্য সূঠাম একটি শয্যা রচিত, যে শুভ্রতা অর্থাৎ যেন কোন এক ইদানীং কালের শিল্পী মহা ইতস্ততঃ ছাড়িয়া গিয়াছেন, বহু পূর্বে কোন এক কবি ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই শয্যার নিকট একটি প্রদীপ — সমস্ত প্রতীকত্ব লইয়া যাহার শিখা স্থির — নিকটে কিছু আহ্বারের সামগ্রী। বিছানা, আলো আর আহ্বার; সভ্যতার প্রাপ্তি যোগ!

ছোট শোভাযাত্রা চলিয়াছে, মধ্যে একটি ডুলি। ডুলি বাহকরা ধীরে ধীরে চলিতেছে। এই ডুলিতে একজন ভেস্টাল কুমারীকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে কুমারী আত্মসত্যকে অপমান করিয়াছে। যাহার পতন হইয়াছে। এই পতিতাকে কেহ যাহাতে দেখিতে না পায় তাহার জন্য তাহার আপদমন্তক আবৃত, তাহার ত্রন্দন যাহাতে কেহ শুনিতে না পায় তাহার জন্য ডুলি সুরক্ষিত। ডুলির সঙ্গে প্রধান পুরোহিত এবং আরও অনেকে আছেন। ডুলি এখন পবিত্র নগরীর ফোরামের মধ্যবর্তী পথে।

পথচারীজন অবনত মস্তকে, এহেন মর্যাদাসিক শোভাযাত্রা দেখে। হয়ত দুঃখিত হয় কিন্তু শোক করে না, কেন না এ এই ভেস্টাল কুমারী শ্রদ্ধাকে অবমাননা এবং 'ভেস্টাল' মন্দিরকে যে মন্দির নুমা নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার সাদৃশ্য গোলাকার (obicular) - অবশ্য পৃথিবীকে কল্পনা করিয়া ইহা গঠিত নয়, ইহা সারা বিশ্ব সংসারের নিরহঙ্কার পৌত্তলিক কল্পনা; যাহার মধ্যে পীথাগোরাসওরা অগ্নির অস্তিত্ব, তাহার উপাদানকে স্মরণ করিয়াছে — সেই মন্দিরকে অপবিত্র করিয়াছে।

ডুলি নিষ্কারিত স্থানে আসিয়া থামিল; পুরোহিত উর্ধ্বলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মস্তপাঠ করিলেন, ডুলির অর্বর উন্মোচন করা হইল। ভেস্টালকুমারী কূপের সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া যাইতেই সিঁড়ি তুলিয়া মুক্তিকা-রাশি গৃহর পরিপূর্ণ করিল...

Pythagorean concept of silence দেখা দিল।

অনেক আলোর কথা আমাদের এই বিনিমিত রজনীতেমন হইয়াছে। প্রশ্ন সকল - ক্ষেত্রই

দারুণ অন্ধকার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে — আলোতে সে অন্ধকার পরিদৃশ্যমান হয়।

'ভালবাসা' বলিতে কি যে ভাবা উচিত তাহা কখনও ভাবি নাই। Morte de arthur এ আছে, সার প্যল্যুস যখন ইতারডের বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া মর্মান্বিত হন তখন তিনি আর আপনাকে সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন না, তাহার সেবকদের কহিলেন, 'আমি আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিব না, আমার মৃত্যুর পর আমার দেহ হইতে হৃদপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া দুইটি রূপার পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে দিলে।'

সার প্যল্যুসের প্রেম নিশ্চয়ই রামান্তিকদের শেষ।

II ২ II

### রাত্র একাকিনী

নিম্নে আমরা সকলে বর্তমানবৎ। হয়ত আমাদের ছোট প্রশ্নের বাক্যনিচয় শুধুমাত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, প্রতিধ্বনিত কি তাহার একমাত্র উত্তর!...

It strikes an awe.

And terror on my aching

Sight; the tombs

And monumental caves

Of death look cold.

And shoot a chillness to

my trembling heart.

Give me thy hand; and

let me hear thy voice.

Nay, quickly speak to me

and let me hear.

My voice — my own offrights me

with its echos.

Congreve - Mourning birds.

আমার স্বরের প্রতিধ্বনি আমাকেই আতঙ্কিত করে। চরাচরে অতিকায় শীতলতা মুহ্যমান; স্তম্ভভার কাঁধে হাত দিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছি। এবং প্রতিধ্বনি অত্যন্ত নির্মম হইয়া দেখা দিবে, বৈজ্ঞানিক কৌশল যাহার একমাত্র পরিণাম।

[ মা্যকবেথের অধ্ব্য আছে Macbeth's first words echo the last words of the witches' — গ্লিয়রসন। ]

এই অগণিত একের সূক্ষ্মতার মধ্যে, ক্রমবর্ধমান প্রতীক্ষার মধ্যে কখন বা দূরত্ব ভাঙিয়া আমাদের স্মৃতি নিপট হইয়া উঠিবে... একটি আলোড়ন শোনা যায় 'Mon ame est triste Jusqu'a la morte' ইহা বসন্তুর কণ্ঠস্বর!



‘আমার আত্মা মৃত্যু পর্যন্ত মনমরা’ — এই গির্জা পিছনের দেওয়ালের রঙিন কাচের চিত্র বিচিত্র কি অসম্ভব রঙ লাভ করিয়া প্রকৃতিজনকে চমৎকৃত করিত। তখন কম্পমান ক্রমবিলায়মান অর্গানের পর্দার ধ্যানভিমিত্তে আওয়াজ ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। উপরে সৌরলোক মৃদু, নিম্নে দামাল সমুদ্র। এ গাষ্টীয় শ্রবণে, মানুষে অন্ধকারের অশরীরী দেহে সন্মোহে হাত দিতে চাহে। তৎকালীন স্বর একে অন্যের সহিত আলাপের কালে দেখা দিয়া আনৈসর্গিক মরজগত সৃষ্টি করে; বৃক্ষের পত্রসকল পাখা ঝাড়া দেয়! রামান্টিক ভালবাসা, ধূলি ধূসরিত ভূষণ দিবা রমণীর নায় মধা আকাশে উদ্ভাসিত। একদা সিভালরী ছিল, কিন্তু সেই সিভালরীর মধ্যে কোন চেহারা ছিল না। এলিনর দ্যকিতেন ম্যারি দ্য শ্যাম্পেও অনুকূলে এই ঘমাক্ত সিভালরী অনুপ্রাণিত হইল। এক অপূর্ব চেহারা আসিল। রামান্টিক লাভ ইত্যাদির আরও অনেক পুঙ্খালি মনোভাব।

বেতালে আছে, মন্দাবতীর চিত্তাভ্যাসকে — একজন ব্রাহ্মণকুমার অযাচিতাবলস্বরী হইয়া — শয্যা স্থানীয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। যখন মৃতসঞ্জীবনী পুথি আসিল। মন্দাবতীর ভ্রমরাশির উপর এক মুষ্টি মস্ত-পূত ধূলি নিক্ষেপ হইল, মন্দাবতী চিঠিয়া বসিলেন। তিনজনের মধ্যে কে তাহার স্বামী হইবার যোগ্য এই মীমাংসায় রাজা বিক্রমাদিত্য বসিলেন যে তাহার ভ্রমরাশি আলিঙ্গন করত এই স্বপ্নাশনেই দিবারাত্র — মন্দাবতীর — তপস্যায় রত ছিল সেই তাহার স্বামী হইতে পারে; কারণ প্রগাঢ় অনুরাগের অনুকূপ কাহ্নি সে করিয়াছে।

রামান্টিক ভালবাসায় মথিত হইয়া সার পালয়স তাহার হৃৎপিণ্ড নিবেদন আশা করেন। কেননা সুন্দরী ইতারদা তাঁহাকে চাহে নাই। তাহাকে অনেক রূপে অপমান করে, সার পালয়স হাসিমুখে তাহা সহ্য করেন।

এমন আছে অনাগ্রে — তখন, রাখালরা সকলেই গায়ককে তাহার প্রেমের গান গাহিতে অনুনয় করিল, গাহিতে গাহিতে একদা সে রূঢ় সত্য প্রকাশ করিল।

When I spoke to the maid

of Berocal

Teresa, of thy worth and  
thy shape

‘You think’ she said ‘you  
are in a angle’s thrall

And, yet for idol you  
adore ape”

অবশ্য বেরকাল কন্যার এই উত্তরের পর অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সহসা এমত সময় একটি অল্পবয়সী যুবক আসিয়া দুঃসংবাদ দিল। ‘আমাদের ক্রাইসোসতোম, আরে যে বিখ্যাত ছাত্র এবং রাখাল ছিল! সে মারা গেছে’।

সকলেই বিস্মিত এ হেতু খবরে। ‘সকলের ধারণা ক্রাইসোসতোম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। মারসেলার জন্য তার ভালবাসা না পেয়ে মরেছে। মারসেলা খুব বড় লোকের মেয়ে এবং সে রাখালি হয়ে এ তম্রাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াত’।

‘মারসেলার জন্য মরেছে?’ একজন প্রশ্ন করিল।

‘হ্যাঁ হে, মারসেলার জন্য’, বলিয়া পুনরায় কহিল, ‘সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সে ক্রাইসোসতোম উইল করেছে শেষ ইচ্ছে জানিয়ে গেছে... তাকে মুরদের মত মাঠেই কবর দেওয়া হবে — কবর দেওয়া হবে একটা ছোট পাহাড় তলে, সেখানে করনা আছে, ঠিক সেখানেই একটি কবর গাছে ছায়া... লোকে তার মুখ থেকে শুনেছে, এ জায়গায় ক্রাইসোসতোম সর্ব প্রথম ... মারসেলাকে দেখে। এ হাড়াও আরও অনেক কিছু সে বলে গেছে ... কিন্তু সে সব কথা আমাদের পাদরী শহাি বলেছেন রাখা হরে না ... সেগুলো বড় জঙ্গলী জঙ্গলী ... কিন্তু তার বন্ধু আমব্রোজিও ... সেও দারুণ ছাত্র ... সে ক্রাইসোসতোমের সঙ্গে রাখাল বেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। ... সে বলেছে তার শেষ ইচ্ছা পালন করতেই হবে... এতে সারা গ্রাম হাসিতে ফেটে পড়েছে — কিন্তু তারা জানে ক্রাইসোসতোম যা চেয়েছে তা হবেই — ‘তাকে দারুণভাবে কবর দেওয়া হবে — আমি যাই’।’

\* \* \*

ডন কুইজট পিটারকে জিজ্ঞাসা করিল — ব্যাপারটা কি? এ মৃতই বা কে আর সেই রাখাল মেয়েটিই বা কে।

পিটার কহিল, মৃত যুবক — সালমানাকে অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যার্জন করে। সে সত্যই অল্প বয়সে অত্যন্ত খ্যাতনামা হইয়াছিল। ছেলোটী সালমানাক থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই সে স্কলারদের যে টিলে আঙরাখা হয় তা ফেলে দিয়ে রাখালের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরলে মানে সাজগোজ করলে — এবং তার বন্ধু আমব্রোজিও তার মতই রাখালের বেশ ধারণ করলে। বলতে ভুল গেছি, আমাদের ক্রাইসোসতোম দারুণ পদ্য লিখতে পারত, সে ক্রিসমাস ইভের জন্য ক্যারল লিখত, সেগুলো গ্রামের ছেলেরা গাইত। করপাস ক্রিস্তির জন্যে নাটক লিখত, সেগুলো ছেলেরা অভিনয় করত। সকলেই স্বীকার করত তার লেখার মত লেখা হয় না...! ক্রাইসোসতোম আর তার বন্ধু আমব্রোজিও দুজনই হঠাৎ একদিন রাখালের বেশ নিল। এতে সকলেই খুব অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এর মানেটা কি...? কেন হঠাৎ এই পরিবর্তন!... অনেক দিন পরে আদত কথাটা জানা গেল ... যে মারসেলার জন্য...। মারসেলা মাঠে মাঠে রাখালীয়া বেশে ঘুরে বেড়াত... আর ক্রাইসোসতোম এই রাখালি মারসেলার জন্যে রাখাল হল।

II ৩ II

ডন কুইজট পিটারের কাহিনী শ্রবণে যারপরনাই হতবাক। আপনাব রক্তের সহিত এখানে এই সূত্রে কোন বাক্যলাপ করিবার নাই, সেখানের আলোড়িত, কর্মবাহু তরঙ্গ সকল শান্ত, তরঙ্গ সকল বাধহীন।

কুইজট সন্তবধঃ এই প্রথম প্রশান্তি দেখিলেন, যে প্রশান্তি প্যান দেবতার (আরকাডিয়ান দেবতা) সিরিসজ-বারিশে থাকে, যেমন সে স্বর হলে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ফেড়ে; কুইজট অগণন তারকারাজির প্রতি অন্যবার রক্ষ বনস্পতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

হায়ত মানসচক্ষে দেখিলেন, গোলাপের প্রতি ক্রত পদে সকল সৌন্দর্য ছুটিতেছে অথচ



তাহা ঘর্মাক্ত নহে, অথচ পরিশ্রান্ত নহে।

First beauty crept into a rose : (হারবার্ট জর্জস)

ডন কুইজট, 'আঃ' নাইট অব দ্য সাড কাউন্টেনান্স! তিনি মহা আবেগে কহিলেন, 'তারপর ...

মাসসেলা, অপরূপ সুন্দরী ছিল। অল্প বয়সে তার পিতামাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মারসেলা, বালিকা, অল্পবয়সী রাখালিয়া বেশে সবুজ প্রান্তরে মাঠে আপনার নিরীহ পশুশাবকাদিকে গোচারণে লইয়া যাইত।

মারসেলার সৌন্দর্য কথা অনেককে মুগ্ধ করিল। মারসেলা প্রভুত্বের ফোয়ারা যেমত, নিশ্চয় কম্পিত, নিশ্চয় রসময়ী, অথচ স্থাবর অনেকেই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল; কিন্তু রূপসী মারসেলা কহিল, 'আমি এখনও মনস্থির করি নাই, বিবাহের দায়িত্ব লইবার মত তাহার সামর্থ্য নাই' এবং রাখালিয়া বেশে অন্যান্য রাখালির সহিত সেও বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

হায় অন্তরতম দীর্ঘশ্বাস।

ধনী পুত্ররা রাখালিয়া বেশে সতত ভ্রমণ করিত; ইহাদের মধ্যে ক্রাইসোসতোম একজন। ক্রাইসোসতোম লোকে বলে, মারসেলাকে ভালবাসিত না, তাহাকে পূজা করিত।

মারসেলা এই সকল অযাচিতাবলী রাখাল যুবকদের সহিত সাধারণভাবে মিশিত, তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিত, কিন্তু কেহ যদি তাহার পাণিপীড়ন প্রার্থনা করিত তাহা হইলে কটিকিত মারসেলা তাহা প্রত্যাখান করিত। ইত্যাকার ব্যবহারের ফলে এই অঞ্চলে অত্যধিক ক্ষতি সাধন হয়। প্লেগ রোগও এইরূপ ক্ষতি কখন করিতে পারে নাই।

মহাশয় আপনি যদি এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন তাহা হইলে অহরহ এক অদ্ভুত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। এই প্রতিধ্বনি শুধু পীড়িত আত্ম ভগ্নহৃদয় প্রেমিকদের মর্মান্তিক চীৎকার প্রতিধ্বনি, উপত্যকা বিদীর্ণ প্রায়।

এখান হইতে কিয়ৎ পরিমাণ দূরে অনেকগুলি বাঁচ বৃক্ষ আছে, যাহার গাড়ে এই প্রেমিকগণ মারসেলার নাম উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও মারসেলার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকরা অতীব চাতুর্যের সহকারে 'মুকুট' উৎকীর্ণ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ মুকুট পাইবার যোগ্য।

সেই বৃক্ষসকলের তলে দেখা যাইবে কোথাও একজন প্রেমিক রাখাল, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, আবার কোথাও অন্যান্য আপনার বক্ষে করাঘাত করিতেছে। হায় হায় রবে আকাশ বাতাস রক্তিম। দূর হইতে আপনি উহাদের প্রেমের বৃকভাঙা সঙ্গীত শুনিতে পাইবেন।

এমন যুবক অবশ্যই আছে যাহাদের অশ্রুসিক্ত চক্ষুর্দ্বয় সারা রাত্রি নির্মলিত হয় না, সকালের সূর্যে দেখা যায় সে উদাস হইয়া আছে। এমনও আছে, অত্যুগ্র গরমে বালির উপর শুইয়া ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এই সকল ভগ্নহৃদয় যুবকবৃন্দের মধ্যে মারসেলা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করিয়া ফিরে। তার মনে এতটুকু রেখাপাত করে না। আমরা ইতরজন, শুধু মাত্র অপেক্ষা করিয়া আছি কে মারসেলার দম্ভ চূর্ণ করিলে তাহা দেখিব। চতুর্ন আগামীকাল্য সেই মন্দভাগ্য ক্রাইসোসতোমের কবর

দেওয়া দেখিতে যাইব।

ডন কুইজট কহিলেন, 'নিশ্চয়ই ... তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ এইরূপ একটি অভূতপূর্ব ঘটনা শুনিয়া যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে।

মহাশয় আপনাকে ত আমি সব কথা না জানানার দরুন বলিতে পারিলাম না। কল্যাণ নিশ্চয়ই পথে অনেক রাখালের সহিত দেখা হইবে যাহারা আমাদের আরও রোমাঞ্চকর ঘটনা সকল বলিবে।

এহেন আখ্যায়িকা শ্রবণে ডন কুইজটের মন উত্তলা হইল। উপরে অর্থে আকাশ নিম্নে তিনি, এই ব্যবধানের মধ্যে একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নাম জালসিঁদা।

\* \* \*

সকালের আলোয় পৃথিবী আপনার বিচিত্র বর্ণে দেখা দিয়াছে।

খানিক পথ তাহার অতিক্রম করিবার পর, তাহার হতবাক। সম্মুখে একটি ছোট শোভাযাত্রা আসিতেছে। সকালের আলোক তাহাদের মুখমন্ডলে আছে, এখনও সেখানে রাত্র রহিয়াছে। এই শোভাযাত্রায় জনগণ সংখ্যা ছয়জন মাত্র, ইহারা সকলেই রাখাল।

এই রাখালগণের সাজ পোশাক বিস্ময়কর, পরনে কৃষ্ণজিন চর্ম, মস্তকে সিঁপ্র মালা পরিশোভিত, হস্তে পাতন এই শোভাযাত্রার পশ্চাতে দুইজন অশ্বারোহী: তাহারা, দেখিলেই মনে হয় ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ইহাদের সহিত পদব্রজে তিনজন পরিচারক বর্তমান।

দুইদল নভ্রভাণ্ডে দুই দলকে অভিবাচন করত যাত্রা সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। দেখা গেল দুই দলই কবর দেওয়া দেখিতে যাইতেছে।

\* \* \*

ইতিমধ্যে দেখা গেল, দূরে দুইটি বিরাট পর্বতের মধ্যবর্তী পথে প্রায় বিশজন রাখাল যুবক, যাহাদের পরনে কৃষ্ণ জিন চর্ম, মস্তকে সিঁপ্র মালা ছিল, কাহারও মস্তকে ইউ মালা, উহারের মধ্যে ছয়জন একটি কফন বহন করিয়া আনিতেছে। এই কফন বহনবিধ পুষ্পমালায় ভূষিত।

এই দৃশ্য দেখিবার সঙ্গে একজন রাখাল কহিল, 'নিশ্চিত উহার ক্রাইসোসতোমের দেহ আনিতেছে।'

শবযাত্রীরা কফন রাখিয়া যখন কবর খনন করিতে শুরু করিয়াছে, তখন ডন কুইজট সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন — কেননা ডালা ছিল না, মৃত সম্পূর্ণভাবে রাখালের বেশে ভূষিত। ব্যয়ক্রম ভিন্নিগ হইবে বড়োয়ার।

যুবককে সন্নিহিত খুব ভাল দেখিতে ছিল। দেখিলেই বুঝা যায় তাহার জীবনও খুব সুন্দর ছিল। এই দেহের পাশে কফনের মধ্যে, সারি সারি গ্রন্থরাজি, এবং বহু মোহরকৃত, বহু খোলা পত্রও ছড়ান ছিল। যাহারা সকলেই এই স্থানে উপস্থিত, যথা দর্শক, কবর প্রস্তুতকারক ইত্যাদি, সকলেই এক অদ্ভুতমৌন অবলম্বন করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে একজন এই অশরীরী স্তব্ধতা ভঙ্গকরত কহিল, 'আমরোজিও দেখিও, এই স্থানই



ত নিমিষ্ট হান'।

হাঁ এই সেই স্থান। এই সেই ভয়ঙ্কর স্থান যেখানে আমার বন্ধু তাহার প্রথম প্রেম মারসেলাকে করে, আর হয়। নিষ্ঠুর মারসেলা সেই প্রেম প্রত্যাখান করে। যাহার ফলে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু মৃত্যুবরণ করেন।

এবং ডন কুইজট ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমব্রোজিও বলিতে লাগিল, মহাশয়.....

II 8 II

'ক্রাইসোসতোম ভালবাসিয়াছিল, এবং প্রতিদানে ঘৃণা লাভ করিয়াছিল .... সে পাথরকে দ্রবীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ক্রাইসোসতোম হাওয়ার পিছনে ছুটিয়াছিল, সে মরুভূমিতে বোদন করিয়াছিল। একটি রাখালিয়া যে তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, মানবজাতির মধ্যে অমর করিতে চাহিয়াছিল — মহাশয় যে কাগজগুলি আপনি দেখিতেছেন সেগুলি আমার কথার সাক্ষ্য দিবে, অবশ্য এগুলি আপনি পড়িতে পারিবেন না। কারণ, তাহার নির্দেশ মত কাগজগুলি পুড়িয়া দিতে হইবে। ....'

এ বাঞ্ছা ভিভালদো কহিল, 'ইহা উচিত নহে, তাহার লেখা বিশ্বস্তির অতলে ডুবিতে দেওয়া উচিত হইবে না ... মারসেলার নিষ্ঠুর জীবন মানুষের কাছে চিরতরে একটি উদাহরণ হইয়া থাক ... আমব্রোজিও, আমাকে উহার মধ্য হইতে কয়েকটি দাও।'

আমব্রোজিওর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কয়েকটি কাগজ সে টানিয়া লইল। তাহার মধ্যে একটির নাম 'হতাশার সঙ্গী'। আমব্রোজিও কহিল, ক্রাইসোসতোমের ইহা শেষ লেখা, মহাশয় ইহা আবৃত্তি করুন।

O bitter transformation!

Whilst limpid truth is turned to pack  
of lies?

O tyrant of love's state, fierce jealousy,

With cruel chains these hands together dies

With twisted rope, couple them, rough  
disdain,

But woe is me. With bloody victory.

Your memory is by my suffering slain,

And now I die and since all hope

I've lost

Ever in life or death, to prosper now

I obstinate, will rest in fantasy.

অবশেষে আছে।

Despairing song, I beg thee not to  
grieve.

এই রাখালিয়া ঐতিহ্য বনে বনান্তরে নহে মনে আপনার প্রজাব বিস্তার করে। কোথাও কোথাও ভয়ঙ্কর হতাশাও দেখা দেয়।

এমন আর এক রাখালের কথা আমরা কবি স্পেনসারের উক্তিতে পাই :

One day, (quoth he) I sat, as was my  
trade under foot of mole.....

There a strange shepherd chanc'd to  
find me out ;

Whether allured by my pipe's delight  
Whom, when I asked from what place  
he came

And how he high?....

The shepherd of the Ocean by name  
And said he came far from the main  
sea deep.

'দি সেপার্ড অফ দি ওসন' অনেকেই ধারণা করেন ইনি স্যার ওয়ালটার। স্যার ওয়ালটারের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, গভীর জীবনসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিহাসেই অল্প, তথাপি তাহার নিজের উক্তিতে, মানুষ মাইক্রোসক্সাস এবং "for out of the earth and dust was formed the flesh of man" ইহা তাহার ব্যক্তি জীবনের বহন ধাবনা নিয়ত স্রোতের শব্দ।

তাঁহার এলিজাবেথের প্রতি, যদি বলা হয় ভালবাসা, একনিষ্ঠতা সূত্র ছেলেমানুষী অথবা রাখালিয়া ভাব অভিযুক্তনা আমাদের অস্থির করে। অবশ্য এ রাখাল কখনও প্রলম্বিত শ্রিপ্র বৃক্ষের ছায়া, দেখিয়া অথবা সবুজতার উপর সাক্ষা মিশিরের মহিমা দর্শনে, বিশেষত কোন আরকাডিয়াকে আপনার প্রেমের গীত গাহিতে নিশ্চয় বলে নাই!

কেন না ইনি স্যারের রাখাল।

কোন দিন ইনি আপনার প্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নাই। তিনি তদানীন্তন সহজ সরলতায় জানিতেন আমি আছি এবং আমার প্রেম আছে। যখন তিনি টাওয়ারে নিক্ষিপ্ত হন সে সময়ে একদিন তাহার জানালা দিয়া তখন ব্র্যাকফোর্ডার স্টেয়ার্সের নিকট নৌকা বজরা ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন, খবর হয় রানী সার জর্জ কেরীরা আলয়ে গিয়াছেন।

র্যাগে এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত। তাহার ধারণা হয় যে তাহার শত্রুরা রানীকে ইচ্ছা করিয়া এই পথে আনিয়াছে— যাহাতে র্যাগে ব্যথিত হন, তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায় ... ইহার কিছুদিন পরে তিনি রানীকে লেখেন। এ পত্রে একথাই মনে হয় তিনি অসম্ভব ভাষাবিদ ছিলেন। I am now left behind her in a dark prison, all alone. While she was yet near at hand that I might hear of her once in two or three days, my sorrows

where less. But even now my heart is cast into the depth of all misery — I was wont to behold her riding like Alexander, hunting like Diana, walking like Venus; The gentle wind flowing her fair hair about her pure cheeks like a nymph sometime sitting in shade like a goddess, sometime singing like an angel, sometime playing like orpheus.

এখানে প্রকাশ থাকে যাঁর উদ্দেশে এবম্বিধ উচ্ছ্বাস তার বয়স তখন ৬০। এলিজাবেথ এই চিঠির কথা শ্রবণে নিশ্চয়ই উল্লসিত হন।

11 ৫ 11

সার ওয়ালটারের জীবন আমাদের নিকট বিস্ময়কর চিত্র। এ জীবন কোন শুদ্ধ গণনায় আসে না। কেন সর্বরূপে আদিমতা ইহাকে মস্তমুগ্ধ করে — নিবিড় বনমালা, সবুজতা যেখানে আকাশকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং সেখানকার জনগণের অদ্ভুত জেনাকি গোনা জীবন, যাহারা মৃত প্রিয়জনের মস্তক সহজে নানাবিধ পালকের দ্বারা ভূষিত করে অথবা দক্ষিণ ও বিনোকার আরওয়াকস (জাতি) যাহারা গতসু গৃহস্বামীর অস্থি চূর্ণীকৃত করত পানীয়ে মিশ্রিত করিয়া স্বজনরা এবং গৃহকর্ত্রী সকলেই পান করেন। (Discovery of Juliana) এবং সেই স্থানে থাকিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙ্গভূমি ইংলন্ডের ফিরিবার বাসনা তাহাকে নিশ্চয়ই উদ্গীৰ্ব করিয়াছে কিন্তু সেখানেও দেখা যায় একটি অস্থির আদিমতা তাহার মধ্যে আরোচ হইয়াছিল।

দ্বীপের নেশায় তখন ইউরোপ মথিত। পুনরায় পাত্র পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষীণায় জাগরণের মধ্যে সে আপনার ক্রান্তিকে দেখিয়াছে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না সে কোন ক্রান্তি, কোন অবসাদ। মানুষের আপন দেহ নিবন্ধ একটি সহজাত অবসাদ আছে যাহার নাম দুঃখ।

অবশ্য সাধারণভাবে ইতিহাসে ইহাকে ক্রান্তি বলা হয় না, ইহাকে আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা বলা হয়। যাহা হউক যে শান্তি তাহার ঘরে লাভ করেন নাই ... কেননা আমরা পরবর্তী কালে সার ওয়ালটারের জীবনে দেখি।

তথাপি তিনি শেরবোরনে যখন চলিয়া যান তখন গ্রন্থ, কাব্য, বৃক্ষরোপণ, বাগান-করা ইত্যাদি নানা প্রকারের গ্রাম্য কালযাপন বিধিতে তিনি the hours borrowed from ambition — অতিবাহিত করিতেন। এখানেই তিনি লেখেন :

Heart tearing cares and quivering fears

Anxious sighs, untimely tears

Fly fly to courts

Fly to fond wordlings sports.

এবং পরে :

Fly from our country pastimes, fly

Sad troop of human misery!

Come serene looks,

Cleares crystals brooks.

শেরবোরনে তিনি সতিহি আপনাকে সম্যকভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এসময় সাগরের রাখাল উপলব্ধি করেন যে মানুষকে অবশ্যই নিঃশ্বাস লইতে হয়। একথা তিনি স্পেনসারের সহিত যখন ( একটি তদনীন্তন পত্রে দেখা যায় 'My Lord of Esse had chased Haleigh from court') কিলকোলমানে কটান তখনও মনে হয়।

সার ওয়ালটার স্পেনসারের সাহচর্যে সেই সুন্দর রোমান্টিক দূর্গে কাব্যলোচনার সময় অতিবাহিত করিয়াছে।

শান্তির মাধুর্য যেন তখনকার বীজমন্ত্র হইয়াছিল। দেবাব্দ সব সময় চাহিয়াছিলেন, 'আচাক্ষু'। গ্রাম্য নিশ্চলতা, সময় সেখানে মানুষের অনুবর্তী, মানুষ যেখানে শুধু মাত্র মন, সেখানে দাঁড়াইয়া যদিও দরবারের তুলনায় বলিতে গিয়া কিছু হৃদয়বৃত্তি দেখা গিয়াছে।

Two harmless lambs

are butting one another

Which done, both bleating

run each to his mother

And wounds are nearer found

Save what the ploughshare

gives the ground

এরপরই দেখা যায়

Go let the driving

Nergro seek

For germs hid in some

forlorn creek

We all pearls scorn,

But what the dewy morn

Congees upon each

little spire of grass

Which careless shepherds

beat down as they pass

এরই অবশেষে

Blest silent groves

O may ye be

For ever mirth's best nursery

আদিমতা এইরূপে ক্রমে সৃষ্টি দর্শন করে। যে আদিমতার স্মৃতি উড়ন্ত পাখির ঝাঁক ছিল, যাহার ছায়া খব শ্রোতবহ বরনার উপরে ক্ষণিক থাকিয়া খটিতি উর্ধ্বে বন্ধুরে বিলীযমান, মেঘ উপত্যাকায় আত্মীয় অথবা —

“এই রাজন্যবর্ণের একজনের ক্রী যথার্থ রূপসী, আহা কি সুন্দর কি সুন্দর কালো তাহার



চোখ, কি সূঠাম গড়ন, অজস্র সুদীর্ঘ কেশভার ভূমি চুষন করে, তাঁহার আদব- কায়দা দেখিলে বিম্বিত হইতে হয়; ভদ্রমহিলা যথাংশীলা, তাহার হস্ত মদের পাত্র ধীরে ধীরে পান করিতে করিতে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন, সব সময় আপনার সৌন্দর্যের জন্য একটা মিষ্টি গর্ব ছিল।

আমাদাস ও বরেল যখন তাঁহাকে লেখেন as if we had been in the midst of, some delicate garden."

যে লাজুক বাগিচার ঝরা পাতা সকল সমুদ্রে তরঙ্গতড়িত হইয়া নাবিকের নিকট নক্ষত্ররাজি।

সাগরের রাখালকে উপলক্ষ করিয়া পুনর্বাস যে কাব্য তাঁহার অন্তরীক্ষে তাহাকে স্মরণ করিয়া —

Why do if send this  
rustic madrigale  
That may thy tune ful  
car unseason quite?

In whose high thoughts  
pleasure built her bower

II ৬ II

স্টোইকদের মধ্যে কেহ বলিতে পারে "O imagination! go away... for I want thee not অবশ্য এখানেই এই উক্তির শেষ নাহে কেননা অবশেষে আছে, "কিন্তু তুমি তোমার পুরাতন রীতিতে আসিয়াছ" (ওরেলিয়স)

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কল্পনার আবেগকে এই ভাবে দূরে যাইতে অনুময় করা শুধু নহে, ইনি কাব্য ত্যাগও করেন। এই স্টোইকের ভাবধারা কতকাল পর্যন্ত বিস্তার করে তাহা আমাদের অল্প অল্প জানা আছে।

ঠিক হে কল্পনা তুমি আমার মধ্যে আপনাকে ঘনকৃষ্ণ মেঘের ন্যায়, বিস্তার কর — আচ্ছন্ন কর। আমাকে প্রাবৃত কর। এমন একটি মনোভাব অনেককাল ব্যাপিয়া ছিল, অনেকটাই উদাত্ত কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়াছে।

কাব্যপ্রেরণা অবশ্যই আমরা তাহার — স্যার ওয়লটারের ইতিহাস রচনাতে দেখিতে পাই, আদিম মনোভাবে, সমস্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, তথা দিগন্তমুখীন সহসা ঋজু একটি রেখায় পরিণত হইয়া, বহু উর্ধ্বে নক্ষত্ররাজির দিকে—নিগূঢ় কৃষ্ণকায়্য বিষ্ময়ের দিকে আঁধা মেলিল, তখন আমরা জনসাধারণ হতবাক, বিব্দমাত্র....।

"By his own word, and by this visible world. God perceived of men, which is also the understood language of almighty vouch safed to all creatures, whose hieroglyphical characters are un, numbered...."

(প্রিফেস টু দি হিষ্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড ওয়াস্টার র্যালো)

এ ধরনের চিত্রণের মূলে যে আবেগ যে সত্যতা যে বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি, তাহা কচিৎ অন্যত্র দেখা যায়, অবশ্য নক্ষত্ররাজিকে Thomas Browne একস্থানে unhuried বিশেষণ ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মতার আভাস দিয়াছেন। উপরোক্ত কতিপয় লাইনে যে সৌন্দর্য বোধ দেখা যায় তাহার তুলনা নাই। এখানে প্রকাশ থাকে hieroglyphical বাক্যই যে আমাদের নব্য মনকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা নহে। সমগ্র ভাব যেন বা একটি সুন্দর নমনীয় বক্র রেখায় পরিণত হইয়াছে।

তাহারই নিজের উক্তি, Our fancy is compared to the moon in which we seem to live and grow as plants.

(Ibid)

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখা যায়, ইহা শুধুমাত্র তাহার কলমি- শাক, অথবা আপেল খাওয়ার জন্যই নহে। এই সম্পর্ক যে কি প্রকারের তা বিশেষরূপে বলা নিঃস্প্রয়োজন; প্রকৃতি মানুষের সকল তত্ত্বই জানে, তাহার মধ্যে অজস্র রক্তিমতা আছে এবং ধমনীর মধ্যে যাহা রক্ত।

রক্তিমতা ব্যতীত আর একটি তথ্য আর একটি জ্ঞান বর্তমান, যাহা সবুজতা, যাহা লাক্ষণ-হরিণ শাবক সোহাগে আরও সত্য, সুন্দর এবং বিশেষ রূপে সবুজ।

আমাদের দৈনন্দিন গণনার সংখ্যা এই দুই তথ্য যে কতবার একের যোগফল, ফলে একটি সংখ্যা, তাহা আমরা জানি না। তথাপি বলা যায় ইহাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকাইয়া আছে, নিঃশাস তাহা নিশ্চিত জানে এবং তাহাকে লইয়া আমাদের নিঃশাস প্রহর গনিতোছে।

পেসটোরাল কবিতার মধ্যে সভ্যতা ত্যাগ, এবং তাহার কল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন সরলতা যোগলব্ধ। এখানে ছোট একটু দূরত্ব যাহা সত্যই নিকটতমের জামিতিক অভিব্যঞ্জনা ব্যতীত আর অন্য নহে।

And pipe to me -I'll tend thy goats the while....

এখানে এ সময় শূন্যতা নহে। এখানে সময় বিস্তৃত এখানে সময় বস্তু। যে বস্তুকে হাতে করা যায়, যে সময় আদর যায়।

এখন বাটলির গন্ধ! এখানে আসিয়া আমাদের মন চমকিয়া উঠে।

II ৭ II

আমরা সারা ভারতীয় হিন্দুরা রাখাল বড় ভালবাসি। একটি অল্পবয়সী রাখালই আমাদের জীবনের সর্বতরক চিত্রারের শেষ এবং সর্ব উচ্চ সিদ্ধান্তের প্রতীক। ফলে গোচারণ তুমি আমাদের যে আনন্দ দেয়, গো-পাল আমাদের যে চরম স্নিগ্ধতা বিতরণ করে, এবং প্রিয়মিলন ব্যাকুলতায় যে অধীরতা দান করে এমন কোথাও আর করে না।

সকালে ভৈরোতে যখন 'জাগো মোহন পেয়ারে' গীত হয় তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, উদার প্রাণ্ডরে আনন্দ উৎক্ষিপ্ত নবজাত বাচ্চুরে আরবার গ্রীড়া দর্শনের জন্য মন

আমাদের ঘুম জানে না। ক্রমাগত বাঁশীর ধ্বনি সূর্যের তীব্রতা ক্ষয় করে, অথবা কলস লইয়া গ্রামবাসিনীরা যখন জল লইতে যায় পূনর্বাসী সন্ধ্যায় গো-ক্ষুর উখিত ধূলিকণা দেখিয়া গৃহাভিমুখী পক্ষীকূল ঝড়ম্ভমে ভীত হইয়া কলসের তুলে ... এ সকল নিতানৈমিত্তিক ঘটনা আমাদের কোনক্রমেই ক্রান্ত করে না।

সমস্ত সবুজতা, নদীমালা, গিরি কন্দরে যেখানে এতাবৎ বিদ্যাধরী কিম্বদন্তীর বিহার করিয়া ফিরিত অবশ্য আজও তাহারা আসে; — এবং শুনিয়াছি সুপ্তি আচ্ছন্ন বনভূমির মধ্য দিয়া তির্যক, আলোকরশ্মি দর্শনে বিমিত, ঋ, প্রস্তরবৎ হইয়া সেখানেই সমস্ত কিছু ভুলিয়া পুনরায় সেই তির্যক আলোক দেখিবার মানসে অন্যও দণ্ডায়মান। সেই স্থানেই আমাদের অত্যন্ত আপনার জন মাধব খেলা করেন, ‘বাদ্যতে মৃদু বেণুম’ বাঁশী বাজান।

যাহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা কবি, কেননা কাব্যের মধ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব এবং অন্যক্ষেত্রে তাহাতেই কাব্যের অমরত্ব তাঁহারা বসুন্ধরা দর্শনে ‘ভাবাবিস্তি হন’ ভগবান রামকৃষ্ণ মহাপ্রভু, ভগবান শঙ্কর জয়দেব ইহারা সকলে অনেকবারই গোচারগভূমিকে, নদীকে প্রণাম করিয়াছেন। আমরা দাস্যভাবে স্বীকার করত সমগ্র প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি। কেননা আমাদের প্রেম এই সকল প্রান্তর বিস্তৃতির মধ্যে স্বাধীন লাভ করে। হে নলিন্দা! তুমি অরণ্যবাসী জনগণের প্রিয় সূত্রাং আমাদেরও প্রিয়!

অন্যত্র অপ্রকৃষ্ট চেতন বৃক্ষলতাদি এবং গো পশুপক্ষী প্রভৃতিও তোমার সেই সুন্দর রূপদর্শনে ইচ্ছাষিত হয়। তাহা আমরা জানি।

একদা যখন, ভগবান অদৃশ্য হন তখন, তাঁহার লীলা সঙ্গীরা  
গায়ত্রে উত্তরমুখের সংহতা  
বিচি কুরামতকনবন্ধনাদ্বন্দ্বন।  
বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং  
বনস্পতীন।।

(রাসপঞ্চোধ্যায় ২য় অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক)

উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে গোপীগণ বন হইতে বনান্তরে সেই কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এবং অচেতন তরুলতাদিকে — আকাশের ন্যায় সর্বভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থিত নিত্য বিদ্যমান সত্তারূপী ভগবানের কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

শুধু তাহাই নহে —

হে অশ্বখ! হে পিপ্ল! হে বটবৃক্ষ, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেছি প্রেম, হাস্য একভাবে অবলোকন দ্বারা নন্দ-তনয় আমাদিগের মনপ্রাণ হরণ করিয়া গিয়াছিল, তোমরা কি দেখিয়াছ? হে কুরুবক, হে অশোক, হে নাগকেশর হে পুরাণ, হে চম্পক, মাননীদিগের দর্পহারী হাস্যবদন রামানন্ড শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন তোমরা কি দেখিয়াছ?

এবং এই ভাবে প্রত্যেকেই তাহারা জিজ্ঞাসা করে। স্বা —!

হে মালতি হে মল্লিকে হে জ্যতিযুধিকে, সেই মাধব যীয কবস্পর্শন দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি জন্মাইয়া গমন করিয়াছেন। তোমরা দেখিয়াছ?

সমস্ত বনপ্রদেশ বৃক্ষলতাদির সহিত মানুষের কি অপূর্ব সম্পর্ক? কেন না এখানে এই

পরিদৃশ্যমান বিশাল প্রকৃতির অণুতে অণুতে তিনি বিরাজমান — ইদানীং তিনি আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন!

ফলে লীলা সঙ্গীরা পুনরায় এই চিন্তা করিল যে ‘পৃথিবী সর্বদাই সেই ভগবানের চরণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি উনবিংশ চিহ্নে তিলকাক্রান্ত হইয়া পরমাস্ক্রিত হইয়াছেন, সুতরাং কৃষ্ণ বিরহিণী এই দুঃখিনীদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন কেন।

এই ভাবিয়া অন্বেষণকারী সকলে সহসা সকলেই স্থভিত। কেননা এই বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন বনপথে একটি সুন্দর হরিণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই অগ্রগামী হরিণীকে গ্রীবা পরিবর্তনে যাইতে দেখিয়া ব্রজগোপীগণ ভাবিয়াছিলেন আমাদিগকে প্রেমোপদ লাভের — কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইবার জন্যই হরিণী গ্রীবা পরিবর্তনে আমাদিগকে আহ্বান পূর্বক অগ্রগামিনী হইতেছে।

আমাদের কাব্যের মত এত অধিক উন্নত হইয়া কোথাও দেখা দেয় নাই। অন্যান্য দেশে তথা যুরোপে প্রায়ই অধমরা লোকদের মনোবাসনায় কাব্য সঞ্জীবিত।

আমরাও ভাগ্যবান ... উহা ব্যতীত আমাদের আর ভাবিবার চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই। আমরাও মরিয়ছি।

আমাদের ধারণায় রাখাল বলিতেই এক দিব্য রূপের কল্পনাই বুঝায়। এবং এই রাখালের বাঁশী ধ্বনি আমাদের উন্মত্ত করিয়া তুলে।

কেন বাঁশী বাজায় বড়ই কালীনীর অই কুলে।

বাঁশীর শব্দে মোর আউলিল রন্ধন!

শুধু ইহাই নহে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পাচন ধরিয়া আমরাও কত বারই না রাখালরূপ অনুভব করিয়াছি। কতবার যখন গ্রামাঞ্চলে, গৃহস্থেরা রাখাল ভোজন করাইয়াছে ( অনেকটা পিকনিকের মত) কতবার না অন্যতুতভাবে আমরাও রাখালদের সহিত মিশিয়া গিয়াছি।

|| চ ||

আমাদের জানা নাই যে দুর্দুরাশ্বে, যে ব্যাকুলতা, যে শোক সঙ্গীত আমরা বৃক্ষলত কবিতায় দেখি তাহাতে কতটা ব্যতির গন্ধ আছে। তাহার মধ্যে না থাকিলেও পরবর্তী যুগে তাহা ছিল।

অবশ্য ব্যতিকে একদা ল্যাম বলেন, This is our peculiar and household planet; আমরা সকল সময়ই ব্যতি ব্যক্তিটিকে কষ্টপ্রসূ অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু সত্যই কি সকল সময়ই তাহার ব্যতিক্রম নাই?

আমরা যাহারা শহর-প্রণয়ী তাহাদের নিকট দূর গ্রামাঞ্চল ফলিক মোহ আনিলেও কাব্যের মধ্যে সেই বাস্তবতা যতটুকু বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমাদের সুন্দর করে, মেহ করে।

খিক্রিটাস পাচ্চাতা-সাহিত্যের পাস্টোরাল ব্যাঙ্কনার আদি।

O raise, read muses,

, raise a country-song

এটি সেই থইরসিস রাখালের গীতের ধূয়া, যে গীতে দাপনিসের বেদনা ছিল। সে সৌন্দর্যের প্রাণো বনের ভয়ঙ্কর পশুরা পর্যন্ত বিমুগ্ধ — এমনকি গো-বলদাদি — তাহারা তাহার পদতলে



বসিয়া কাদিয়াছিল। সকলই তাহাকে ভালবাসিত।

এই সরলতা যেখানে সমস্ত জীব প্রাণী মাত্রই বিশ্রামরত, যেখানে সকলেই ভালবাসার জন্য কাদিতে প্রস্তুত। একে একে সকলে আসিয়া প্রশ্ন করে, 'বল কাহাকে তুমি ভালবাস?'

এইখানেই সেই ধূয়ার বাক্যপদবিন্যাসে হের-ফের হইল। O muses, raise again the country-song পূর্বে শুধু মাত্র অনুনয় ছিল। গ্রামাগীতি গাও! এখন পুনরায় গীত শুনাও?

দাপনিস অলস স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে বৃথাই শেষ করিয়াছে। কারণ এখন সেই কুমারী কখন বা কখনার নিকটে বারেক বনাঙ্গলে ভ্রাম্যমাণ; দাপনিস একদা তুমি সতিহি রাখাল ছিলে, গোপালক ছিলে, অবশেষে তুমি but now like a goat herd thou!

এখানে আমরা আমাদের ক্রান্তির সম্মুখে দুইটি অপূর্ব চরিত্র লাভ করিলাম, ছাগ-পালক বা বিষয়কর তাহারা আমাদের ভাষায় আরও যেন বা লাজুক আরও গোপনচারী, যখন তাহারা দেখে ...

... Sees his flock at their wanton.

amorous playing.

বেচারী ছাগপালক তখন আপনাকে আর সংযত রাখিতে পারে না — He weeps and says to himself Ah would I were one of you.

এই চিরকালের অস্থির মনোবৃত্তি — কোন কিছুই যে লাভ করে নাই, যে দূর হইতে সকল কিছুই দর্শন করিয়াছে — যে আপনার মত করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে, পুনরায় প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা লইতে ছুটিয়াছে।

আপন মৃত্যুর একটি ভূয়ো আশায় আপনাকে পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছে। অথচ রাখাল একদা শ্রিপূসারের উক্তিতে

Daphnis thy want

Was once that

Love were a

Poltry-foeman.

ইহার কিছু পর ধূয়ার পদবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে।

এখানে বেদনা একটি শান্ত দ্বিপ্রহর, যে দ্বিপ্রহরে সমস্ত কিছুই পরিচ্ছন্ন, সমস্ত কিছুই আপন স্থানে পূর্ণ অবস্থায় বর্তমান, অথচ শূন্যতা ব্যথিত বাঁশী ধ্বনিত মতে মূর্ত হইয়া উঠে। যেখানে ধীরে বায়ু আঘাত পত্রনিচয় মর্মরিত হইয়া কিছু বেদনা শূন্যতা প্রশমিত করিতে ইচ্ছুক। পরে আর একটি অব্যর্থ ইচ্ছার সম্মুখীন আমরা হই।

Turn magic wheel,

and draw my love to me!

সিসিলি দ্বীপের এই আশা আমাদের চমৎকৃত করে। ইহার মধ্যে অনেক আশা থাকিলেও প্রথমত ইহা কাব্য-কাব্যের আধার ...

## সোমেন চন্দ : গল্পের প্রথম নাট্যরূপ 'সংকেত'

নাটক

বাঁধন সেনগুপ্ত

The Dacca Anti-Fascist Conference which was successfully held yesterday, myself presiding, was preceded by the tragic death of stabbing of Somen Chandra Cahnda, a progressive writer and Secretary E.B. Railway Workers Union. Apprehending serious danger the police opened fire which also resulted in one death. Mr. Samsul Huda, Mr. Jyoti Bose, Mr. Shenhansu Acharya, Mr. Suren Goswami and myself did not altogether escape assault while proceeding to the pandal.

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'সোভিয়েট সুহৃদ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত ফ্যাসী বিরোধী সম্মেলনের সভাপতি সেদিনের প্রখ্যাত বাঙালী কমিউনিস্ট কৃষক নেতা বঙ্কিম মুখার্জীর প্রেরিত এই তারবার্তার মাধ্যমে (৮ই মার্চ ১৯৪২) ঢাকায় সোমেন চন্দ্রের নৃশংস হত্যা সংবাদ দেশের সংবাদপত্রের নজরে প্রথম আসে। ঐ দিন সম্মেলন শুরু হবার ঠিক আগেই স্থানীয় গুন্ডারা অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে সম্মেলন পন্ড করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু উদ্যোক্তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে গোড়াতেই সেই অপচেষ্টা রোধা সম্ভব হয়। প্রতিরোধের সময় পুলিশের গুলিতে অখিল দাস নামে একজন হামলাকারী সেদিন মারা যায়। কিন্তু এরপরই সঙ্গী হামলাকারী অখিলের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ অন্যান্য হামলাকারীরা একটু সরে এসে সম্মেলনে যোগ দিতে আসা ঢাকার রেল শ্রমিকের একটি মিছিলের ওপর হামলা চালায়। সেই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন একশ বছর বয়সী ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ওয়ারকার ইউনিয়নের সেক্রেটারী ও তরুণ গল্পকার সোমেন চন্দ। প্রচণ্ড আক্রোশে গুন্ডার দল মিছিলের পুরোভাগে থাকা সোমেনের ওপর বাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ভোজালি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। মাথায় লোহার ডাভা দিয়ে আঘাত করার পর মৃত্যুপথ যাত্রী সোমেনের দুটি চোখও ঝুঁচিয়ে ঝুঁচিয়ে ওরা উপড়ে নেয়। এ দেশে সোমেন চন্দই প্রথম শহীদ যিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ও লেখক যিনি মাত্র একশ বছর বয়সেই মিছিলের লাল পতাকা হাতে ঢাকার রাজপথে যাত্রকের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। অথচ বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেদিনের গল্পকার শহীদ সোমেন ক্রমশঃ বিস্মৃতপ্রায় এবং প্রায় অপরিচিত একটি নাম।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় সোমেন চন্দ্রের 'সংকেত' ও অন্যান্য গল্প ঢাকা প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হবার পর তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'বনস্পতি' ১৯৪৩ সালে কলকাতার মর্ডান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। দুটি গল্প সংকলনেই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসিক মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সোমেন চন্দ্রের সম্পর্কে সেকালেই ধূজীপ্রসাদ লিখেছিলেন, প্রেমেন ও তারাসঙ্কর বাঘা হয়ে রোমাটিক, কারণ দু'জনেই সচেতন নন। সোমেন চন্দ সচেতন ছিলেন, হয়ত পরে ভাষা আসত, যুদ্ধের পর। মুজফ্ফর আহমেদেও আশা ছিল, সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটা বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন।

মাত্র একশ বছর বয়সে প্রয়াত এই লেখকের লেখকজীবনের আয়ু ছিল মাত্র চারবছরের।



তার সাহিত্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের নাম 'সংকেত'। গল্পটি পরবর্তীকালে শ্রীমতী লীলা রায় ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। গোপাল হালদারের মতে, 'সংকেত' পড়িতে পড়িতে সন্দেহ থাকেনা, এ প্রত্যক্ষ জীবনের সাক্ষ্য। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচকও সেদিন 'সংকেত' গল্পটির প্রশংসায় সরব হয়েছিলেন।

শ্রেণী স্বার্থের আঘাত এই গল্পটির অন্যতম একটি দিক। আসলে, চলমান জীবনের রাজনীতি ও শ্রেণীস্বার্থের প্রতিঘাতই এই গল্পের অন্যতম বক্তব্য হিসেবে বিবেচ্য। শহরে স্তম্ভিক শূকর হয়েছে। তাই মালিক ধর্মঘটী শ্রমিকের বদলে গ্রাম থেকে লঞ্চ ভরে নতুন শ্রমিক এনে মিল চালু রাখতে চায়। ধর্মঘটী শ্রমিকেরা বাধ্য হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নবাগত শ্রমিকদের তারা বোকাতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, মালিকপক্ষ ধর্মঘটী ভাঙার কাজে মিলাটির আর পুলিশের সাহায্য পায়। এদের সাহায্যেই আহত বা নিহত ধর্মঘটীদের বকের ওপর দিয়ে জোর করে ঢোকানো হয় গ্রাম থেকে আনা শ্রমিকদের। যাদের দারিদ্র্য-ক্লান্ত নতুন অসহায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে শহরে এনেছে মালিকপক্ষের দালাল। 'সংকেত' গল্পের প্রথম অংশ গ্রামের সেই অভাবগ্রস্ত দরিদ্র সরল মানুষগুলিকে ভুলিয়ে আনার কাহিনী বিবৃত। দ্বিতীয় পর্বে মালিকদের কার্যসিদ্ধির ষড়যন্ত্র চিত্রিত হয়েছে। মালিকের প্রেরিত দালাল বালক মৌলবির কথায় গল্পের নায়ক রহমানের বৃদ্ধ পিতা চাকরি পাবার আশায় রহমানকে শহরে পাঠায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুবক রহমান সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে ফেলে রেখে মৌলবির কথামত লঞ্চে গিয়ে ওঠে। ধর্মঘটের সময় মিলের সামনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জমায়েত ও বক্তৃতা, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্পের চিত্রটি দেখে রহমান বিম্মিত হয়। বিষয়ও ভয়ের মধ্যে সে শহরে এসে দেখেশুনে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। রহমানের বোধোদয়ের নিপুণ চিত্রণে গল্পটি সমৃদ্ধ। এই গল্পে তথাকথিত ভাবের উচ্ছ্বাস বা উত্তোলন কোথাও নেই। অথচ লেখকের দক্ষতার গুণে সমগ্র ঘটনাটি যেন ছবির মতই এই গল্পে ফুটে উঠেছে।

১৯৭২ সালে সন্ধ্যা স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের একশ্রেণী ফেডারার জাতীয় উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে সে দেশের প্রখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে বর্তমান লেখকের আলাপ হয়েছিল। ঢাকায় ৬৮ এ পুরানা পল্টন লাইনের (সরনী বিতান) বাড়িতে বসে সেবার দুই বাঙালার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনার সময় সেদিন সোমেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্রের কথাও উঠেছিল। প্রসঙ্গত তিনি ঢাকার সৃজনী প্রকাশিত একশ্রেণী শ্রদ্ধার্থ 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' নামে একটি সাহিত্য সংকলনের কথা আমায় বলেছিলেন। সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী প্রকাশিত সেই সংকলনের প্রচ্ছদচিত্রটি ঐকিছিলেন সে দেশের খ্যাতনামা পটুয়া কামরুল হাসান। সেই সংকলনেই সোমেন্দ্র চন্দ্রের 'সংকেত' গল্পটির মোজাম্মেল হাসানেন কৃত একটি নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়। নাটকের প্রারম্ভে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৩ সালে সোমেন্দ্র চন্দ্রের প্রথম মৃত্যুবরণীতে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক অজিত গুহ। ১৯৪৮ সালে সোমেন্দ্র মৃত্যুবরণী পালনের পর ঢাকাতেও তাঁর স্মৃতি ক্রমশঃ বিস্মৃতির অঙ্কুরে হারিয়ে যেতে থাকে। তারপর সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে ১৯৬৮ সালে এই সৃজনীর লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠীই সোমেন্দ্রের ২৬ তম মৃত্যুবরণী পালন করেন। এরাই বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে সোমেন্দ্রের রচনা ও সাহিত্যকর্মের উদ্ধার কর্মে আন্তরিক অভিযানের মাধ্যমে

এগিয়ে এসেছিলেন। সোমেন্দ্রের দু'টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ ও অপ্রকাশিত অনেক বচনা উদ্ধারের কৃতিত্বও সৃজনী'র দাবীর তালিকায় আছে।

১৯৭০ সালে ঢাকার এই সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত 'সোমেন্দ্র-স্মৃতি স্মরণ' অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'সংকেত' নাটকটি সর্বপ্রথম ঢাকার বাঙালী একাডেমীতে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। বিশিষ্ট শিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন সৃজনীর শিল্পীসহ ঢাকার 'বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীদ্বন্দ'।

লেখক সোমেন্দ্র চন্দ্রের ছোটগল্পের প্রথান নাট্যরূপ হিসেবে এই নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন প্রকাশন থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সোমেন্দ্র চন্দ্র যে সব রচনাবলী বা সোমেন্দ্র চন্দ্র 'স্মরণগ্রন্থ' (১৯৯২) যা সোমেন্দ্রের ৭০ তম জন্মদিন 'স্মরণ' প্রকাশিত হয়েছিল এর কোনোটিতেই সোমেন্দ্র চন্দ্রের গল্পের কোনো নাট্যরূপ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৩৭ সালে মার পনরো বছর বয়সেই সোমেন্দ্রের লেখা 'শিশুতপন' গল্পটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যা ছিল সোমেন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প। তারপর থেকে আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, সাপ্তাহিক অগ্রগতি, সবুজ বাংলার কথা, মাসিক পত্রিকা 'শান্তি' মিলে মোট এগারোটি রচনা মাত্র দু'বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে বরোয়া তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নবশক্তি' পত্রিকায় যার সম্পাদক ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সেটির পরে আর কোনো সন্ধানই অবশ্যই পাওয়া যায়নি। পরের উপন্যাস 'বন্যা' কলকাতার 'বালীগঞ্জ' পত্রিকায় এক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল সোমেন্দ্রের বিখ্যাত গল্প 'দাস্তা' (পাক্ষিক 'প্রতিরোধ') ও 'ইদুর' (মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকা) যা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৪০ সালে ঢাকা রেডিও থেকে সোমেন্দ্রের দুটি কথিকও প্রচারিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৪০ সালে ২৩শে মে প্রচারিত কথিকার শিরোনাম ছিল 'রিপতান উইনস্টল'। এর পর পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে সোমেন্দ্রের জীবনে রেডিওতে অংশগ্রহণের পথ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবিতাবস্থায় তাঁর কোনো নাটক বা গল্পের নাট্যরূপ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সেই কারণেই সোমেন্দ্রের গল্পের নাট্যরূপের গুরুত্ব সেদিন অনুভব করেছিলাম। আমার সেই আগ্রহের কথা ভেবেই সেদিন ঢাকায় বদরুদ্দীন উমর সাহেব সেই সংকলনের একটি কপি আমায় উপহার দিয়ে তাতে লিখে দিয়েছিলেন —

শ্রী বানেন সেনগুপ্তকে শ্রদ্ধেয়সহ,

বদরুদ্দীন উমর

২৯/২/১৯৭২

সোমেন্দ্রের অজ্ঞত অনুরাগী তথা বাঙালার নাট্যমোদি সহযোদ্ধাদের আগ্রহ ও অবগতির আশায় এপার বাঙালায় প্রথম 'বিভাব' পত্রিকায় তা পুনঃপ্রকাশিত হল।



## সংকেত

মূলগল্প : সোমেন চন্দ  
নাট্যরূপ : মোজাম্মেল হোসেন

- \* চরিত্র —
- \* দশরথ — বৃদ্ধ জেলে।
- \* রামচন্দ্র — বৃদ্ধের আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে।
- \* ইয়াসিন — বৃদ্ধ চাষী।
- \* বলরাম — চাষী, বয়স বছর ত্রিশেক।
- \* আকবর — চাষী, পঁচিশ-ত্রিশের মত বয়স।
- \* রহমান — তাঁতী।
- \* মৌলবী — বিশ বছরের যুবক।
- \* ম্যানেজার — স্ট্রো।
- \* বৃদ্ধ — রহমানের পিতা।
- \* শ্রমিকসমী।
- \* ব্যক্তি।
- \* পুলিশ অফিসার।

## প্রথম দৃশ্য

(নদীর অল্পদূরে গাছের নিচে অন্ধ দশরথ তার জালটি বাছছে। দশরথের ছেলে রামচন্দ্র তামাক সাজছে। নদীর জলের শব্দ, নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতির যাতায়াতের আওয়াজ, শোরগোল। নদী থেকে জনৈক গ্রামবাসী দশরথ, রামচন্দ্রকে ডেকে কুশল প্রশ্ন করে)

- নেপথ্যে : ঐ রামা, আডে যাবিনা?
- রামচন্দ্র : কাকানিও, নাও বিয়ালে যামু।
- নেপথ্যে : দশরথদার শইল কিমুন ও?
- দশরথ : মোডামুডি আছি ও।
- (হঠাৎ অদূরে একটি লঞ্চ ভেড়ার আওয়াজ শোনা গেল)
- দশরথ : (উৎকর্ষ হয়ে) রামা, ও রামা? রামা?
- রামচন্দ্র : (মুখ না তুলেই) ক্যান?
- দশরথ : কিছু ঘনছনি?
- রামচন্দ্র : না।
- দশরথ : (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) দ্যাখতো চাইয়া একটা ইস্টিমার
- ওস্টিমার নাহো।
- রামচন্দ্র : (দশরথের দিকে সন্দেহভাবে তাকিয়ে) তা তাইলে তুমি কিছু
- সেহনা বাবা?

- দশরথ : (স্ক্রুডাবে) চটকে সেহিনা বইল্লুকি কানেও ঘনিনানি। তুই বালা
- কইরা চাইয়া দ্যাখনা। (রামচন্দ্র নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে) ও রামা?
- রামচন্দ্র : ঐ তোমার যে কস্ত, এহানে ইস্টিমার আহিরো কি করতে।
- দশরথ : আরে আওয়াজটাতো ঐ রহমই লাগে। বালা কইরা চাইয়া দ্যাখ তুই।
- রামচন্দ্র : (হঠাৎ খুশি হয়ে) হ বাবা হাছাইতো, একটা লঞ্চ বিরতাছে।
- দশরথ : চটক দুইডা গেলেও কান দুইডা অহনও হজাগ আছে। আমার কতা
- হাছানি।
- রামচন্দ্র : (দশরথের দিকে ঝঁকটা বাড়িয়ে দিয়ে) ন্যাও বাবা টান।
- দশরথ : (হাত বাড়িয়ে ঝঁকটা ধরে টানতে টানতে) আইজ কহিল কি আর
- হেইদিন আছে। অনেক আগের কতা, হেই ছাকিশ সনের তুফানেরও
- আগের কতা—বেলতলীর জমিদার বাড়ির বড় ছেইলা বিলাতন
- আহনেরসম গেরামের পথগাট মিয়া আইতে আইতে জবর কষ্ট পায়।
- হেইর ক্ষমনি পরই নিজের একটা মস্ত ইস্টিমার লইয়া গেরামে আইয়া
- হাজির, হারা গেরামের মাইনসেরে তাজ্জব বানাইয়া দিল হেই রহম
- গটিনাকি আর আইজ অম। হেই মানুষ আর নাই হেই কিরতিও
- আর নাই। (ইয়াসিনের প্রবেশ)
- রামচন্দ্র : কাকার কি খবর?
- ইয়াসিন : আর আমাগো একটা খবর, কি যে আইছে, আকাল আর যাইতেইনা
- দেশেরথন। হ্যাশে তোমার খবরাবর্তা কি দশরথদা? মাছ-টাছ
- লাগেনি?
- দশরথ : আর কইওনা ইয়াছিন মিয়া। গাঙ্গে মাছই কইয়া গ্যাছে মনে অম।
- হারাদিন খ্যাপাইয়াও আদা বাছি মাছ অমনা, আর মাছই মাইনসে
- খাইব কি দিয়া বাত জোডানই দায় অইয়া পরনে। (ঝঁকটা ইয়াসিনের
- কাছে যায়) ন্যাও দর। (বলরামের প্রবেশ)
- বলরাম : (ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে) কাকানিও?
- ইয়াসিন : হ বলরাম।
- বলরাম : কি যে আইছে দূরেরথন তোমারে চিনতেই পারি নাই।
- ইয়াসিন : কইথনে আহিলা।
- বলরাম : গেছিলাম শিকদার সাবের বাড়ি। গেছি কাইল কাম করছিলাম। টাছা
- পাওনা আছিল। আহনের সময় দেখলাম একটা লঞ্চ বিরা রইছে।
- হ্যাশে খবর হাছানি?
- রামচন্দ্র : কি খবর দাদা?
- বলরাম : ঐ লঞ্চে কইরা নাই এক বাবু আইছে, মিলের লেইগা মানুষ নিব?
- ইয়াসিন : ঐ ঠিকই। মানুষটা একটা কারখানার বরকতা।
- বলরাম : তোমরা যাই কও, আমার খালি মনডায়া ক্যা এই খবর মিছা।

- ইয়াসিন : তোমারতো খালি হগলভাতেই সন্দ। (আকবর ও রহমানের প্রবেশ, আকবরের হাতে একটা কচি আমের ডাল। সেটা চিবুতে চিবুতে সে মাথা নাড়তে লাগল। ফিক করে একটা থুথু ফেলে দিল।)
- রামচন্দ্র : (রহমানের দিকে তাকিয়ে) রহমান মিয়ান। বিয়াশাদী কইরা একেবারে নয়ামানুষ অইয়া গেছ, চেহারা দেখি চকচকিলা অইয়া গ্যাছে।
- রহমান : দূর, হগলনম মসকরা বালা লাগেনা।
- আকবর : লড়াইয়ের খবর রাখনি ইয়াসিন মিয়া? হেইর লেইগা ফাঁকি দিয়া লোক নিতে আইছে জান?
- ইয়াসিন : (বুড়ো আঙুল আকবরের সামনে নিয়ে) তুমি এঁইডা জান আকবর মিয়া।
- দশরথ : রামা, চল এঁই বালা! অনেক কাম পইরা রইছে। (রামচন্দ্র দশরথের হাত ধরে প্রস্থান করে)
- আকবর : তোমাগো ডর নাই, হারা বুয়া মাইষেগো মেলেটরীতে নিতনা। (বাদশার প্রবেশ)
- রহমান : (দূরের দিকে তাকিয়ে) এঁ যে দ্যাছা যায় বাচ্চা মৌলবী আইতাছে। হার কাছেই আসল খবর পাওয়া যাইব।
- বলরাম : হঁ মৌলবীর কাছেই আসল খবর পাওয়া যাইতে পারে।
- ইয়াসিন : (আকবরের দিকে তাকিয়ে) বাচ্চা মৌলবীর কাছেই এল্যা জিগহিয়া দ্যাছ। আমার কথা হাছা কিনা। বাচ্চা মৌলবী শহরের বেবাক খবরই রাহে। শহরের কোন খবরভা হার কাছে নাই। হুয়া নবাব সাবের লগে বইয়া থানা খাইছে, নবাব সাব হার আতে চুমা খাইছে, এঁই হগল কতা কেনা জানে। (বাচ্চা মৌলবীর প্রবেশ, হাতে একটা খবরের কাগজ)
- মৌলবী : কি খবর আকবর মিয়া, বালা আছনি হগলে? তোমাগো কইজ্যা কিয়ের? (হাসতে থাকে)
- বলরাম : শহরেরখন যে বাবু আইছে, হ্যায় নাহি কাপড়ের কলের ম্যানেজার, কারখানার লেইগা মানুষ নিত আইছে। এঁই কতা ঠিকইনি?
- মৌলবী : ওনারে আমি চিনি। ওনার লগে আমার বধদিনের চিনপরিচয়। তাইন লোক নিত আইছে ঠিকই। রহমান তোমার গরেতো তাত আছে, তোমারে নিব আগে। (হাসতে থাকে)
- বাদশা : ইয়াসিন মিয়া, আকবর মিয়ার কতাই ঠিক। এঁ বাবু মিছা কতা কইয়া আমাগো লড়াইয়ে লইয়া যাইত চায়।
- আকবর : কারখানা কাম দ্যাওনের কতা আদতে আজাইয়া কতা, হাছা কতা কইলে কেইহ যাইত চাইত নাতো হেইর লেইগা কাম দ্যাওনের কতা কয়।

- মৌলবী : আরে মিয়ারা, তোমরা আমারতন বেশি জাননি। আমি কইতাছি যে ওনার লগে আমার কতা অইছে।
- বাদশা : দ্যাশের পুড়ি মাছও বালা। বিদ্যাশে গিয়া হ্যাশে যদি কাম না পাই? অচেনা জায়গায় কাতা জিগহিয়া। কি কও রহমান মিয়া।
- মৌলবী : বালা কতা কইলেও তোমাগো মনে লয়না। এহানে পইরা থাইক্কা না খাইয়া মরবা—হেইডাই তোমাগো বালা।
- রহমান : মৌলবী তা অইলে শহরে কাম পাওয়া যাইবত?
- মৌলবী : তয় আমি কইতাছি কি? কারখানাত গিয়া কাম করবা, মাস কাবারি মায়না পইবা, আরামে থাকবা, এহানে পইরা থাকবা কি করতে। (ম্যানেজারের প্রবেশ) আরে ম্যানেজার বাবু যে, অহন কোন দিকে যাইতাছেন? (সকলে সালাম জানায়)
- ম্যানেজার : (মুদ হাসতে হাসতে) তোমাদের গ্রামটা আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমরাই দেশের গৌরব। কারখানা হওয়ার আগেতো তোমরাই সারা দেশের কাপড় যোগাতে অথচ আজ তোমরা শুকিয়ে মরছ। দেখ আমি কাপড়ের মিলের জন্য তোমাদের এখান থেকে লোক নিতে এসেছি। এখানে এভাবে না খেয়ে শুকিয়ে মরাটা কোন কাজের কথা নয়।
- বাদশা : আমরা গাঙ পইরা মানুষ, আমাগো কি আর শহরে গিয়া পরান টিকব?
- ম্যানেজার : (নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে) সেখানেও তোমাদের এঁই নদীর মত নদী আছে। নদীর ধার ঘেঁষেই চমৎকার ব্যারাক। সেখানে তোমরা থাকবে। হাতের কাছেই হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সিনেমা, যখন যা খুশি কোন চিন্তা নেই।
- মৌলবী : কোন চিন্তা নাই তোমাগো। একেবারে বাবুর লাহন থাকবা। আইজ আছর ওক্ত গিয়া তোমরা ম্যানেজার বাবুর কাছে নাম লাহাইয়া দিয়া আইও (হেসে) কি কও রহমান মিয়া। (মৌলবী ঘড়ির দিকে তাকায়) শশটা বাইজা গ্যাছে, আমার অহন যাওন লাগে। চলেন ম্যানেজার বাবু আপনারে পৌছায়া দেই। (মৌলবী ও ম্যানেজার প্রস্থানোদাত)
- বলরাম : মৌলবী ও মৌলবী —
- মৌলবী : কি, তারাতারি কও?
- বলরাম : আমার বাইয়ের লেইগা বাবুরে এটুট কইয়া দিও।
- মৌলবী : দিমু দিমু (প্রস্থান)
- ইয়াসিন : (সকলের দিকে তাকিয়ে) কি, আমার কতা অহন হাছা অইছেন?



## দ্বিতীয় দৃশ্য

(গামছায় বাঁধা ডিম, চালকুমড়া ও অন্যান্য তরকারিসহ বৃদ্ধের প্রবেশ)

- বৃদ্ধ : (ডিমগুলি ওনতে ওনতে) আরো তিন আলি আঙা গহীনা খুইলাম, আঙা দেহি কম মনে অইতাছে। দুইডা আঙা গেল কই, অ বউ, বউ, হনছনি, আডে ন্যাওনের লেইগা তিন আলি আঙা খুইছিলাম, হেইরতন দুইডা গেল কই? আমারে বেবাকতে মিন্না পাগল কইরা ছারবো? আঙ্ক রহমাইয়া। (রহমান ও ইয়াসিনের প্রবেশ)
- ইয়াসিন : কি অইছে চিন্নাইতাছ ক্যান?
- বৃদ্ধ : চিন্লামুনা, আডে ন্যাওনের লেইগা তিন আলি আঙা খুইছিলাম অহন দেহি দুইডা কম। এই আঙা কয়ডা আর তরকারিগুলি বেইচ্যা দুই-একদিনের আদ প্যাডা খাওন যোগার করতাম।
- রহমান : তোমার গনারওতো মূল অইতে পারে? তিন আলি খুইলে কম অইব ক্যান?
- বৃদ্ধ : তয় আমি মিছা কতা কইতাছিনি। তর বউয়ের কাছে জিগাইয়া দ্যাখ, তর বউয়ে কিছু করছিনি?
- রহমান : তুমি আড করতে যাইবা আমারেতো আগে কও নাই।
- বৃদ্ধ : তরে আবার কি কম? তুমিত সংসারের কোন খবরই রাখনা। এক ওক্ত যোগার করার ক্ষমতাও তোমার নাই। আঙা কই আছে বাইর কর। তর বউয়ের কাছে জিগাইয়া দ্যাখ কই খুইছে।
- রহমান : (রেগে প্রস্থানোদ্যত) দেহি ঐ মাগি আঙা কি করছে (প্রস্থান)
- বৃদ্ধ : আমারই পোরা কপাল, বেবাকতে মিন্না আমারে পাগল না কইরা ছারবো না। যেমন আমার পুতে হেমন আমার বৌও।
- ইয়াসিন : ঠিকইত, যেই দিনকাল পরছে, গরের বউ যদি হিসাব কইরা না চলে তয় কেমনে চলব। (রহমানের প্রবেশ)
- রহমান : (রেগে) ঐ যে বর লোকের জি আনছ, হেই মাগিরই আঙা খাওনের আউস অইছে। মাগির জিব্বাডা আমি টাইন্যা ছিরা ফালাম। ঐ মাগিরে অইজগাই আমি বিদাই করমু।
- ইয়াসিন : মাথা ঠাণ্ডা কর। গরের বৌ কইরা ফালিহিছে অহন কি আর করবা। পাগল অইওনা।
- রহমান : পাগল অমুনা? বাজানে আঙা খুইছে, আঙা বেইচ্যা আড করবো। মাগির কেমন আক্ল হেই আঙা দরল। অরে আমি অইজগাই তালাক দিমু।
- ইয়াসিন : যাউক যা অইছে, হেই লইয়া আর অহন মাতা গরম কইরা কি করবা।
- বৃদ্ধ : আমার অইছে জ্বালা। দুইন্যার এত মানুষ মরে আদ্রায় আমারে চ

উক্কে দ্যাহেনা। জুয়ান পুত থাকতে আউজগা আমার কপালে একব্যালো বাত জুডেনা, হারা জনম তাত চালাহিলাম অহন আর তাত চলেনা।

কি যে বৃদ্ধ লাগছে, হুতাও সোনার দামের লাহান?

রহমান : খালি কাম কাম কর, কাম কই পামু? কাম কাডা দিব?

বৃদ্ধ : আমার কপালের কতা কই।

রহমান : বাল্য কতা বাজন, শহরেরখন এক বাবু অইছে কাজের মানুষ তালশ করতে। এই গেরামে পইর্যা থইক্যা তোমার এই তাত দিয়া বাত জুডব না। আমি শহরেই যামু ঐ বাবুর লগে। বাচ্চা মৌলবীর লগে ঠিক কইরা অইছি। আছর ওক্ত গিয়া নাম ল্যাহইয়া দিয়া আমু।

বৃদ্ধ : শহরে যাবি তুই? তুই, কাম করতে ..... (পর্দা পড়বে)

## তৃতীয় দৃশ্য

(মঞ্চ অন্ধকার। রহমান গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার হাতে একটা পুটলি। রহমানের

বৃদ্ধ বাপ তার পেছনে। বাপ তাকে লক্ষ্যে উঠিয়ে দিতে চলেছে।

দুজনই বিষয়। দূরে শিয়ালের ডাক, বিম্বি পোকের একটানা

আওয়াজ শোনা যাচ্ছে)

বৃদ্ধ : রহমান, রহমান রে —

রহমান : (অন্যমনস্ক) কও। (লক্ষের আওয়াজ শোনা যায়)

বৃদ্ধ : হেয়ানে গিয়া তোমার সংবাদ জনাইও। আমি চিন্তায় থাকুম নইলে।

এতহানি বর অইছ তোমারে ছারা থাখি নাই আমি। বাজন, তরে ছাইরা থাকতে মনডা আমার ছড়ফড় করব। বিন্দাশে বাল্য মতন থাইক। প্যাডের জ্বালায় আজগা তোমারে আমি আমার বোক ছারা করতাছি। (অদূরে লক্ষের বাঁশি শোনা যায়।)

মৌলবী : (নেপথ্যে) কারাও তারাতারি আহ, লঞ্চ ছাইরা দিব।

আকবর : রহমানের চোড়াইয়া আয়। (রহমান ঘুরে বাপের দিকে তাকায়)

বৃদ্ধ : চালায়া অইজ্জা যাও, লঞ্চ ছাইরা দিব।

রহমান : বাজন, তুমি অহনে যাওগা।

বৃদ্ধ : রহমান, গিয়া চিডি দিও কলাম। (রহমানের ক্রত প্রস্থান—বৃদ্ধ গামছা দিয়ে চোখ মুছে)

## পর্দা পড়বে

## চতুর্থ দৃশ্য

(নদীর ধারে লক্ষ্য থেকে সবাই নেমে আসছে। বালুচর। দূরে মিলের সীমানা। চিমনি দেখা যায়। চিমনিতে ধোয়ার চিহ্ন নেই। প্রথমে মৌলবীর প্রবেশ, পেছনে রহমান, বাদশা ও ইয়াসিনের প্রবেশ)

- মৌলবী : লক্ষের হগলতেরে নাইমা আইতে কও। এ যে দ্যাখা যায় গম্বুজের ল্যাহান, ঐটাই ফ্যাক্টরী। (সকলে মিলের দিকে তাকায় — ম্যানেজারের প্রবেশ। প্রথমে আস্তে, পরে ভীষণ কলরব শোনা যায়। হাজার হাজার মিলিত কন্ঠের চিৎকার : 'আমাদের দাবি মানতে হবে'। 'মালিকের জুলুম চলবে না।' 'শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ কর।' 'মালিকের ওণ্ডামি চলবে না।' 'শ্রমিক-কৃষক ভাই ভাই।' 'মেহনতী মানুষ ভাই ভাই।' 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' ম্যানেজার শক্তিত হয়ে একবার মিলের দিকে একবার মৌলবীর দিকে তাকায়, ব্যাপারটা বোঝার জন্য সকলে মৌলবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ম্যানেজারের প্রশ্ন।
- মৌলবী : মৌলবী : বিষয় কি মৌলবী, এত চিন্তাচিন্তি কিয়ের ?
- মৌলবী : ঐ হগল কিছুনা। একটা চাকরি খালি অইলে যেমুন পঞ্চাশটা মানুষ আইয়া আজির অয়, হেই রহম পঞ্চাশটা চাকরি খালি অইছেতো পঞ্চাশ আজার আইয়া আজির অইছে। জোর কহরাই নিব আরকি, মগের মদ্রুক পাইছে।
- বাদশা : ঐ মানুষগুলি কারা ? হারা কাম চায় তয় এমন কইরা কি কইতাছে ?
- মৌলবী : হেই দিয়া তোমার কামকি ? রহমান, বাদশা মিয়া তোমরা হগলে আউগাও। (পেছনের দিকে তাকিয়ে) ঐ প্রিয়নাথ থামলি ক্যান ঐ চানমিয়া, সুপতি, আলীমিয়া তোমরা হগলে আহ (ম্যানেজারের প্রবেশ)।
- ম্যানেজার : সবাই নেমে এসো। এগিয়ে যাও তোমরা। (সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে, শূণ্ণ রহমান হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একটু যুবক প্রবেশ করে)
- যুবক : শুনুন, (রহমান চমকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে) আপনার বাড়ি কোথায় ভাই ?
- রহমান : বনগা।
- যুবক : বনগা, বা : চমৎকার নামতো। আচ্ছা এখান থেকে কতদূর হবে ?
- রহমান : দূর আছে।
- যুবক : এখানে কেন এসেছেন ? বেড়াতে ?
- রহমান : (হেসে) না, বেরাইতে না। এখানে কাম করতে আইছি।
- যুবক : ও : (চারদিকে তাকিয়ে) কিন্তু কাজ যারা এজন করছে তাদের উপায় হবে কি ? ব্যাপার কি হয়েছে জানেন ? ওদের কোন দোষ নেই। তবু ওদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে আপনারদের বসানো হবে। যার আর

- কোন উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনার ইচ্ছে হয়। বলুন ইচ্ছে হয় কিনা ? (রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে) মনে করবেন না আপনিও চিরকাল ওদের সুনজরে থাকতে পারবেন। আপনাকেও ওরা এমন একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। (একটু হেসে) আচ্ছা চলি। (যুবকের প্রশ্ন। বাদশা ও ইয়াসিনের প্রবেশ)
- বাদশা : রহমানের, হারাতো যাইতই দিতনারে মনডায় কয়।
- রহমান : আচ্ছা বাদশা মিয়া—
- বাদশা : কও দেখি!
- রহমান : জোর কইরা গেলে হারা কি করতো ?
- বাদশা : (আমতা আমতা করে) কি করত আবার ? দইরা মাইর দিত। (মৌলবীর প্রবেশ)
- মৌলবী : তোমরা এখানে বইয়া গল্প মারতাহ। হগলতে কারখানার গেটে গেছে। লও তোমরা, অহনই কারখানার গেটে ডুকতে আইব।
- বাদশা : (গোতভবে) কামনে ডুকুম। হারা গেটের মইদো এক্কেবারে ছইয়া পরছে। এইডা আবার কিমুন কায়দা ?
- মৌলবী : অন্য একটা গেট দিয়া যাইতে আইব। তোমরা হগলতে আউগাও।
- ইয়াসিন : (ফুকভাবে) কামের কতা কইয়া তুমি যে কই লইয়া আইলা তুমিই জান মৌলবী।
- মৌলবী : চাকরি আর গাছের গোড়া না, তোমাগো বারিত নিয়া গিয়া দিয়া আইব। লও তারাতারি লও, পিছের দরজা দিয়া ডুকতে আইব। (প্রস্থান)
- রহমান কোচর থেকে বাড়ি বের করে একটা নিজে যায়, একটা বাড়ি বাদশাকে দেয়। তারা সামনের দিকে যেতে উদ্ভত হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার কানে আসে। "ন্যায্য মজুরি চাই, শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ কর, অমন চাই, বস্ত্র চাই বাঁচার মত বাঁচতে চাই, শ্রমিক-কৃষক এক হও। দুনিয়ার মজদুর এক হও।" শ্লোগান শুনে ওরা চমকে দাঁড়ায়। সবাই পেছনে হঠতে থাকে। এমন সময় দুগুন্ঠের বক্তৃতা ভেসে আসে। ওরা হতচকিত হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে।)
- বক্তা : বন্ধুগণ, আমাদের চাষী ভাইয়েরা, আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে কাজ করতে এসেছেন, আমরা সেখানেই আমাদের প্রাণকে পাত করি। আপনারদের শূণ্ণ চাকরির কথা বলেই এখানে আনা হয়েছে। আমাদের কথা আপনারা শুনুন, আমাদের বিশ্বাস করুন। চাকরির কথা বলে যারা আপনারদের এখানে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না। কিন্তু আমরা চিনি। (ম্যানেজারের প্রবেশ বিপীরিত দিক থেকে পুলিশ অফিসারের প্রবেশ দুজনে পরামর্শ করে।) তাদের কাছে আমরা আমাদের



অজ্ঞান-অভিযোগের কথা জানাতে গিয়েছিলাম, তারা আমাদের কথা গ্রাহ্যই করেনি। তারা আমাদের মুখের উপর লাথি মেরেছে। প্রতিবাসে আমরা ঠুঁকি করেছি। মিলের কাজ বন্ধ হয়েছে। আমাদের এই শক্তিকে শিবে ফেলার জন্য আমাদের অগ্নি করার জন্য, মুখের ভাত কেড়ে নেয়ার জন্য, মিথ্যে কথা বলে আপনাদের লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এলেছে। আপনারা তাদের বিশ্বাস করেন না। আপনাদের যতখানি শোষণ-নির্মাতন, যতখানি দুঃখ-দুর্দশা সহিতে হয় আমাদেরও তাই। চাষী ভাইয়েরা, পোহাই আপনাদের ভাই হয়ে ভাইয়ের মুখের ভাত কেড়ে নেবেন না। ভাই হয়ে সকলের শত্রু যে তাকে সাহায্য করবেন না। যে লাথি আজ আমাদের বুকে মারছে সে লাথি থেকে আপনাদেরও রেহাই দেবে না। (প্রোগ্রাম শোনা যায়—হঠাৎ পরপর গুলীর আওয়াজ, আর্তনাদ)

ব্যক্তি :	(জৈনিক ব্যক্তির প্রবেশ)
ব্যক্তি :	(দৌড়ের মধ্যে) পলাও পলাও মিমারা, পুলিশ-মিলিটারী গুলী করিরা মহিরা ফালহিতাছে।
বন্ধু :	বন্ধু গণ, আপনারাও সে লাথি থেকে রেহাই পাবেন না। (হঠাৎ একটি গুলীর আওয়াজ) আমার চাষী ভাইয়েরা (গোজামির শব্দ) (ক্রমত আকবরের প্রবেশ)
আকবর :	রহমান, বাদশা মিয়া শিগগির লও যাইগা, জানে মহিরা ফালহিতাছে। (ছুটে উঠাও এমন সময়ে মানেজার দুজন গুলাসহ গুলের পথ আটকায়)
রহমানের স্বর :	(মক্ষ অন্ধকার হয়ে আসে, রহমানের মুখে আলো পড়ে, রহমানের মনে পড়ে)
স্বীর কষ্টস্বর :	ত লেইগ্যা কি আনমু, অজু?
বাপের কষ্টস্বর :	আমি কি কুমু? আপনের যা মনে কয়।
মৌলবী :	রহমানের এইবার বুদ্ধি কপালাজা ফিরল। (রহমানের মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আসে। আঙ্গু আঙ্গু মক্ষ আলো জ্বলে। মৌলবীর প্রবেশ। মৌলবীর জামার রক্ত)
রহমান :	অ রহমান, লও অহন সব ঠাণ্ডা অহিয়া গেছে। সামনের গেট দিয়াই অহন যাওন যাইবা। (হাত ধরে)
রহমান :	(হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গর্জন করে উঠে) না বামনা। (বল্গল পক্ষক্ষেপে প্রস্থানোদ্যত সঙ্গে ইয়াসিন, আকবর ও বাদশা। পর্দা পড়তে থাকবে।)

সমাপ্ত

## আদালতের পবিত্রতা ও বিচারকের মর্যাদা :

প্রবন্ধ

## সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে

অরুণ মুখোপাধ্যায়

ভারতের মৌলিক বিচার-ব্যবস্থা এখনো প্রায় পুরোপুরি ব্রিটিশ অনুসারী। সে কারণেই বিচারককে অথবা বিচারালয়কে 'মহামান' আদালত' 'ধর্মবিত্ত' প্রভৃতি বলে সম্বোধনের রীতি এখনো প্রচলিত আছে। সম্প্রতি এই সম্বোধন নিয়ে বিতর্ক উঠেছে সমাজে। কেউ বলছেন, ইংরেজের 'অন্ধ' অনুকরণে স্বাধীন ভারতে জাতীয় শাসনের যুগে এ সম্বোধন শুধু 'অপ্রয়োজনীয়' নয়, অকারণ ব্রিটিশ-ভক্তির নিদর্শনও। বিচারককে 'আদালতের মধ্যে শুধু 'স্যার' বললেই প্রয়োজন মিটে যায়। এই সূত্রে সমাজবিজ্ঞানীর সামনে একটি প্রশ্ন উঠে আসে। এ দেশে ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারী মূল বিচার ব্যবস্থা যখন প্রায় অপরিবর্তিত তখন আদালতকে অথবা বিচারককে সম্বোধনের মতো এত সামান্য ব্যাপারে আমাদের জাতীয়তাবোধ এত উৎফুল্ল উঠলো কেন? আমার মনে হয় - প্রমাণিত এত সরল নয়। এর শেকড় অন্যদিকে, আরও গভীরে - আসলে এ প্রশ্ন আদালতের পবিত্রতা ও বিচারকের মর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। কেন না লক্ষ্য করা যাচ্ছে - আজকাল আদালতের আদেশ অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং বিচারকও মাঝে মাঝেই কটু সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমার এই উপসিদ্ধান্ত সমর্থন পাচ্ছে দেখছি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মহীতোষ মজুমদারের কথায়, যখন তিনি তার আকস্মিক মৃত্যুর কয়েক মাস আগে এক সাফল্যকারে বলেন, 'দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি সমাজের মানুষের অবহেলা ও অবমূল্যায়নের মনোভাব ক্রমেই বাড়ছে।' এটাই যখন বাস্তব ঘটনা তখন বিচারকের হাতে আদালত অবমাননার অভিযোগের (১৯৭১ সালের সংশোধন পর্যন্ত) মোক্ষম জটিলের প্রয়োগ জড়াজ্ঞা কোন গতান্তের থাকে না। তবে কালক্রমে সে অস্ত্রের ধারও কি অক্ষয় রাখা যায়? আদালতে দাঁড়িয়ে একবার ফর্মা প্রার্থনা করলেই অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালত অবমাননার কঠিন দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ ভাবে চলার বিপজ্জনক সামাজিক প্রবণতা দেশকে মনোভোজের মুখে ঝেঁলে দেবে সন্দেহ নেই। আবার এর মাধ্যমে আদালত ও বিচারক নিয়ে অনেক প্রশংসা তৈরী হয়ে যায়।

কিন্তু কেন এমন হলো? অবশ্যই এ অবস্থা একদিনে হয়নি। এমন হওয়ার কারণগুলো কী কী হতে পারে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে সেগুলো একবার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। প্রথমেই বিচার্য - স্বাধীনতার আগে ও পরে অবস্থা কি একই রকম ছিল? এখানে প্রমত্ত বিচারক মহীতোষ মজুমদারেরই মতান্তর আবারও প্রশ্রিয়ানযোগ্য মনে হয়। তিনি বলেছেন 'ব্রিটিশ আমলে বিচার বিভাগ স্বল্পে জনসাধারণের ভয়, সমীহ ও সম্মানের মনোভাব ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে আমাদের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর, আমাদের এ মনোভাবের পরিবর্তন হতে শুরু করে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের প্রভুত্ব মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে, তার মধ্যে মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার এ প্রসঙ্গে সবুই



ওকৃতপূর্ণ। ফলে নাগরিকদের দ্বারা প্রশাসন, এমন কি বিচারবিভাগের গঠনমূলক সমালোচনা অগ্রহণীয় নয়। কিন্তু আদালতের আদেশ লঙ্ঘনের ঘটনা যখন ঘটতে থাকে এবং বিচারক যখন অথবা নিমিত্ত হন তখন সংকটের স্বরূপটা বোঝা যায়। এই মতের সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন যে; শুধু বিচার-বিভাগের ক্ষেত্রেই নয়, আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন-কানুন, নীতি-নিয়ম, সাধুতা-সদাচরণকে বৃদ্ধাশ্রম দেখানোর প্রবণতা জনসাধারণের মধ্যে খুবই বেড়ে গেছে। গণতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে, মানুষের অধিকারের নামে কর্তব্যবিমূৰ্খ পরিবেশে এসব ঘটছে প্রশাসনিক শৈথিল্য ও রাজনৈতিক দৌরাঘাটের ঘাড়ে চেপে।

সমাজবিজ্ঞানীরা আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে টেনে এনে বর্তমান বিচার বিভাগের দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করবেন নীচের তালিকাটি ধরে: এক, ভারতীয় সংবিধানে ও বাস্তব প্রয়োগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অনেকটাই মিথ্য। দুই, সমাজে মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয় সর্বাঙ্গিক নৈরাজ্যের জন্ম দিচ্ছে। তিন, বর্তমান বিচার-ব্যবস্থার নিজস্ব দুর্বলতা এখানে কটেনি।

আমি তাত্ত্বিকভাবে জানি, দেশে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচারকার্য - এই তিন রাষ্ট্রীয় পরিচালন-কর্মের মধ্যে বিচার বিভাগ সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। কেননা বিচারকই হলেন প্রকৃত সত্যের আধিদর্ভা এবং জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থের নিরক্ষর রক্ষক। তাই বিচারককে তাঁর ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে বিচার বিভাগকে ততখানি স্বাধীনতা দেওয়া নেই। সাংবিধানিক নিয়মের মধ্য দিয়ে, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে যে আইন আইনভা প্রণয়ন করে তাকে ভারতীয় বিচার বিভাগের নস্যাৎ করে দেবার স্বাধীনতা নেই, সেই জনস্বার্থবিরোধী অথবা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থরক্ষার কথা জেনেও সে ক্ষেত্রে একজন আমেরিকান বিচারক তেমন আইনকে যেআইনী অথবা চ্যালেজ বলে ঘোষণার স্বাধীনতা ভোগ করেন। ভারতীয় বিচারবিভাগের এই সীমিত ক্ষমতা লোকচক্ষুে তার ইমেজকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করে।

দ্বিতীয়ত, এ দেশে বিচারক নিয়োগের এক বড় ভূমিকা প্রশাসন পালন করে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বিচারবিভাগের নিরক্ষর স্বাধীনতা নেই। এটাও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে এবং জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বিচার বিভাগের একটা বড় অসহায় দুর্বলতার দিক হল - বিচারকালে বিচারকের প্রশাসনের ওপর নির্ভর করতেই হয়। তখন যদি পুলিশ ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রশাসনের যথার্থ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে স্বার্থ হয়, অসহায় বিচারক প্রমাণের অভাবে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন না, অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিই শাস্তি পেলো যায়। যেখানে বিচারক ঠিক বৃকতে পারেন যে পুলিশের শৈথিল্যের সোপে তাঁর বিচারকার্য নিরপেক্ষ ও সঠিক হলো না তখন পুলিশকে তিনি মৃদু অথবা কখনো কঠোর ভঙ্গীতে করে ছেড়ে দেন। কিন্তু ন্যায়বিচারের স্বার্থে পুলিশের এই ধরনের দোষ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করার স্বাধীনতা ভোগ করেন না তিনি। এ অবস্থায় বিচার-ব্যবস্থার প্রতি সামাজিক আস্থা তৈরী করা বেশ শক্ত।

শুধু আইনসভা ও প্রশাসন থেকে, এমন কি রাজনৈতিক পাণ্ডাদের থেকে মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করাই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ বিচারকার্যের চরম অনুকূল পরিবেশ নয়, এটা বহিরের অবস্থামাত্র, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারকের মর্যাদা ও আদালতের পবিত্রতা নির্ভর করে বিচারকের প্রার্থিত গুণাবলি ও তাঁর কর্মদক্ষতার ওপর। বিচারকের কাজ অবশ্যই একটি বৃত্তি, তবে সে বৃত্তি তাঁর কতগুলো বিশিষ্ট গুণ ও অপরিহার্য দক্ষতা দাবী করে, যেমন বিচারক হবেন সর্বদা সভ্যসন্ধানী, তাঁর থাকবে সুতীতির অন্তর্দৃষ্টি ও অজ্ঞাত সজ্ঞাপ্রতি এবং দেশের আইন-কানুন সম্বন্ধে গভীর ও বিশ্বস্ত জ্ঞান, তাঁর থাকবে আইন-কানুনের দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যার ক্ষমতা ও দেশের মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে অধুনাতন জ্ঞান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথার্থ বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সর্বোপরি বিচারের অবিলম্ব রায়দানের যোগ্যতা। অন্যান্য বৃত্তিতে যোগ্যতার মাপকাঠিতে কেউ ভালো, কেউ ভালো নয় বলে চিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু বিচারকের বৃত্তিতে এমনটি খাটে না - ভালো বিচারক এবং ভালো বিচারক নয় - এমন ভাগাভাগি কখনই হতে পারে না, কেননা সব বিচারককেই সমান ভালো বিচারক হতেই হবে, এসব ভাবাবলী নিয়ে আদর্শ বিচারক হয়ে উঠতে হবে। নতুবা বিচারকের বৃত্তি তাঁর জন্য নয়, অযোগ্য বিচারক কখনই সমাজের কাছ থেকে সম্মান ও মর্যাদা দাবী করতে পারেন না। কথায় বলে, 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে', তেমনি বিচারক দিয়েই যেখানে আদালতের পবিত্রতা ও বিচারের মূল্যায়ন হয় সেখানে অপরিহার্যভাবে আদর্শ বিচারক নন, এমন বিচারকের আদালত অবমাননার রায় জারি করার অধিকারই থাকার কথা নয়।

এ সব যুক্তির তাৎপর্য হলো - মেধা, জ্ঞান, মনন ও হৃদয়বৃত্তির এক উন্নত স্তরের মানুষই সমাজে বিচারক হবেন, তখনই বিচারক হবেন স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, মহামান্য এবং তাঁর আদালত হবে পরিষ্কার পীঠস্থান। সে বিচারককে অমান্য করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোথায় পাৰো তাঁরে? আমাদের অভ্রান্ত, যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞায় এমন বিচারক কি ভূভারতে সহজলভ্য? তাহলে বর্তমানে বিচারকের ভাবমূর্তিটা কী রকম তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

এ দেশের বিচারকগণ অন্য গ্রহের মানুষ নন, এ সমাজেরই সন্তান। কিন্তু যে সমাজে বড় হয়ে তাঁরা বিচারকের পদ পেলেন সে সমাজটার স্বরূপ কী? আমার মনে হয়, এর এক কথায় উত্তর হলো - আমাদের সমাজটা বহুরূপে অসুস্থ, মূল্যবোধে অবক্ষয়িত। কিন্তু এর ব্যাধা কী? আমাদের স্বরণকালের সামাজিক ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুটি মহাযুদ্ধ ও একটি মহাদুর্ভিক্ষ আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের মেরুদণ্ডটি প্রায় পুরোপুরি ভেঙ্গে দিয়ে যায় এবং তার পরের বাকি ইতিহাস তারই ক্ষয়প্রাপ্ত হারের পৌনঃপুনিকতা। ফলে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, সরকারি ও রাজনৈতিক স্তরে মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয়ের অবস্থাটি প্রকটিত হয়ে ওঠে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় অসাধুতা, দুর্নীতি, করপচতা, স্বার্থপরতা, কালোবাজার, কালোটাকা, ভেজাল, স্বজনপাষণ ও বাহ্যিক জীবনে চিহ্নিত হল সুদ, কালোবাজার, কালোটাকা, ভেজাল, স্বজনপাষণ ও ফকিরাবাজি নাম নিয়ে। আজ যে কোন বৃত্তির মানুষই এমন অসুস্থ সমাজের প্রেক্ষাপটে যেখানে একজন বিচারক অর্থাৎ আদর্শ বিচারক বিরল ব্যতিক্রম হতে বাধ্য, কেননা এই অসুস্থ



সমাজের বাইরে বিচারককে এবং বিচারশালাকে সুস্থতার ঘেরাটোপের মধ্যে ইনসুলেট করে রাখা যে আজ আর মোটেই সম্ভব নয় একথা অস্বীকার করার যুক্তি কারুর আছে বলে মনে হয় না।

এ সিদ্ধান্তটি মাথায় রেখে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কেউ যদি আদালতের ওপর একটি তথ্যচিত্র তৈরী করতে চান, তাহলে তিনি কি দেখতে পাবেন তার একটা বাস্তব রূপরেখার বর্ণনা এই ভাবে দেওয়া যায়: প্রথমেই ক্যামেরাটি আদালত কক্ষের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরিয়ে নিজে দেখা যাবে সেখানে চোর, পকেটমার, দালাল, টাউট, ধান্দাবাজ ও অসহ্য আইনজীবীতে গিস্ গিস্ করছে অর্থাৎ এক বিশৃঙ্খল অসামাজিক আবহাওয়ায় আদালতের চারদিককার বাসিন্দা ভারী, বিষাক্ত ও কলুষিত হয়ে আছে। এবার ক্যামেরাটিকে আদালত কক্ষের ভেতরকার দৃশ্যের দিকে ফেরান — দেখা যাবে এ কক্ষে একটি ঘুরে ঘুরে মামলা চলছে, বিচারক গম্ভীর হয়ে মনোযোগ দিয়ে সে মামলার গুনাগুন গুনছেন এবং তাঁরই আসনের তিন হাত দূরে পেশকারের টেবিলের ড্রয়ারটি কারোঙ্গি নোটে ভরে উঠছে। এই তথ্যচিত্রের পরিচালকের যদি সাহিত্য-চর্চাটা পড়া থাকে তা হলে এ দৃশ্য দেখে তাঁর নিশ্চয়ই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' নামের সেই বিখ্যাত গল্পটির কথা মনে পড়বে যেখানে বাবা ইতিহাস লিখছেন, আর তাঁর পুত্র একই সময়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়ে ইতিহাস তৈরী করছেন। এই তথ্যচিত্রটি এক অবক্ষয়িত সমাজের অংশ-চিত্র সম্ভবত নেই। এখন প্রশ্ন হল: এ আদালত কক্ষটিকে কি খুব পবিত্র স্থান ভাবতে হবে? এ বিচারককে কি আদর্শ বিচারক জ্ঞানে সম্মান জানাতে হবে ধর্মারতাবার বলে? সমাজের মানুষের সামনে তো বটেই, বিশেষত সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এ প্রশ্নটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নটি থেকে আরও প্রথমতঃ সমাজবিজ্ঞানীদের বিচারক কি সেই মূল্যবোধহীন, অসহ্য সমাজের প্রতিনিধি নয়? তাঁর প্রতি সমাজের মানুষের মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব? প্রয়াত বিচারক মহোদয়ের মজুমদার বিচারকদের প্রতি যে ক্ষীরমান সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে আপশোস করেছেন এও কি তার অন্যতম কারণ নয়?

এই প্রশ্নদে বিচারক করা হন, কিভাবে বিচারকরা নিযুক্ত হন এ প্রশ্ন তোলাও আবশ্যিক। বিচারক মানেই যখন আদর্শ বিচারক তখন আমরা ধরে নিতে বাধ্য যে, বিচারক নিযুক্ত হবেন সমাজের উন্নতমানের মননশীল গোষ্ঠী থেকে, যাকে ইংরেজিতে বলে 'ক্রিম অব্ দ্য সোসাইটি'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 'ক্রিম অব্ দ্য সোসাইটি' এক দুর্লভ মানবগোষ্ঠী। এটা আসলে 'মিডিক্রিট'-র যুগ। মেধা ও মননে আমরা দ্বিতীয় মানের (সেকেন্ড র‍েট) সমাজেই আজ মূলত বাস করি। সে সমাজ থেকে তারা ল'ডিশিপ্স স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর হয়ে, বিচারকের পদপ্রার্থী হয়ে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়ে বিচারক নির্বাচিত হন এবং প্রবীন আইনজীবীদের বিচারক পদে নির্বাচিত করা হয়। একবার বিচারকের পদ পেলে তাঁরা সকলেই প্রমোশন পেয়ে ক্রমে উচ্চআদালতে বিচারক পদে উন্নীত হন। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়ত শুধু এক আদর্শের টানে বিচারক পদ গ্রহণ করেন। বাকি অধিকাংশই 'একটা চাকুরি পেয়েছি টুকে যাঁই' এমন মনোভাব নিয়ে বিচারক হন। চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে এর থেকে বেশি মাইনের অন্য চাকুরি পেলে তাঁরা বিচারক-বৃত্তি হয়াত গ্রহণ করতেন না। এর ফল হল - আজ

অধিকাংশ বিচারকই মেধা, মনন, জ্ঞান কর্মদক্ষতায় সাধারণ মানুষ, অথচ তাঁর হওয়ার কথা 'নেকস্ট টু গড'। ভগবানের পরেই তাঁর পূজনীয় স্থান, মর্যাদার আসন। তাছাড়া প্রায় সব বিচারকই একটি সোসাইটির মানুষ। বর্তমান সমাজের জটিল আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান তাঁদের আছে কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। আজ কার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যায় যেটি আজ আশুপাক্যের মতো রূপ নিয়েছে - যার টাকা আছে সেই মামলায় জিতে যায়? এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, না বিচারক নিজেরা? সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিচারকদের যোগ্যতা, চারিত্রিক নিষ্ঠা ও জীবনব্যাপনের অভ্যাস নিয়ে সন্দেহ-বিক্ষ প্রশ্ন প্রকাশেই তুলেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রামস্বামীর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের তেড়াজেড়াজে যেভাবে দক্ষিণভারতীয় রাজনৈতিক চক্র বানচাল হয়ে গেল তাতে বিচারকদের ইমেজ মোটেই উজ্জ্বল হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আদালতের প্রতি আস্থা, বিচারকের প্রতি মর্যাদাবোধ যদি সমাজের মানুষের কমে গিয়ে থাকে তার আরও একটি কারণ বিচার-ব্যবস্থার নিয়ম-কানুনের মধ্যেই নিহিত। যদিও মামলায় হেরে যাওয়া গেলকি উচ্চ আদালতে আপীল করার অধিকার এক প্রাচীন ও স্বীকৃত প্রথা এবং এ দিয়ে মামলার পুনর্বিচার করে অপূর্ণতা, ভুল-ভ্রান্তি শুধরে নেবার সুযোগ থাকে, তবুও সংশ্লিষ্ট বিচারকের যোগ্যতার ওপর এ-প্রকার একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে। নিম্ন আদালতে বিচারকের রায়ে হেরে যাওয়া পক্ষ যখন উচ্চ আদালতে আপীল করে জিতে যায় তখন নিম্ন আদালতের বিচারকের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেক সময় সন্দেহের অবকাশ তৈরী হয়ে যায়। এ প্রতিক্রিয়া যে সব সময় যুক্তিহীন সে কথা বলাও যেমন শক্ত তেমনি সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ হবেই একথাও বলা যায় না। এর ব্যাখ্যা হল—অনেক সময় বিচারক-নিরপেক্ষ অনেক কারণ থাকে। যেমন পুলিশ তত্ত্বের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ অথবা দ্ব্যর্থক, অন্যান্য নথিপত্র দুর্বল ও অপ্রতুল, সাক্ষ্য দুর্বল, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, অযোগ্যতায় আইনজীবীর যুক্তি দুর্বল প্রভৃতি। অসহ্য বিচারক তখন এসবের প্রতিভূতে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে ব্যর্থ হন। প্রকৃত দোষী মুক্তি পায় সন্দেহের ছিন্নপথে। এক্ষেত্রে তখন বিচারকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা সমাজের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া আর একটি প্রশ্ন এ প্রশ্নদে উঠে আসে। নিম্ন আদালতের একজন বিচারকের রায় যদি উচ্চ আদালতে বার বার বাতিল হয়ে যায় তাহলে বিচারবিভাগ এ ঘটনাকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন? তার জুডিশিয়াল সার্ভিস রেকর্ড কি অমলিন থাকে? তা কি তাঁর পদোন্নতির অন্তরায় হয়? হয় বলেই তথ্য থেকে জেনেছি। তাহলে স্বীকার করতেই হবে — বার বার বাতিল হওয়া রায়ের প্রতিক্রিয়া শুধু সামাজিক স্তরেই নিবদ্ধ নয়, বিচার-বিভাগের প্রশাসনিক স্তরেও বিদ্যমান। এক উভয় সংকটের অবস্থা — আপীলের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের সুযোগ দিলে গিয়ে বিচারকের যোগ্যতা নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। সম্প্রতি দূরদর্শনের এক সাক্ষাৎকারে কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান ও নামী আইনজীবীর আপন-প্রথা সম্বন্ধে মতামতে এ রকমই লক্ষ্য করা গেল। বিচারকের মর্যাদা রক্ষা ও ন্যায় বিচারের অনুকূলে আপীলের বিরুদ্ধে কোন প্রথা এখনো ভাবা হয়নি বলেই মনে হয়।



বর্তমান সমাজে বিচারকার্যে রাজনৈতিক দলনেতার অন্তর্ভুক্ত অনুপ্রবেশের ঘটনা খুব বিরল নয়। অনেক সময়েই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা ও বিচারকার্যে নিরপেক্ষতার মেরুদণ্ডটি সোজা করে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এখানেও বিচারকের উভয় সংকট: উদাহরণ স্বরূপ — অভিযুক্তের বেইলির আবেদন নাকচ হয়ে গেলে বিপরীত পক্ষ খুশি হবে আর অভিযুক্তের পক্ষ বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়াবে — বিচারক এ পাটির লেজুড় হয়ে কাজ করছেন। তবে মামলায় এক পক্ষের বিরাগভাজন বিচারকে সব সময়েই হতে হয়। তাঁর অস্বস্তি অনুদান ও সত্যদৃষ্টিই তাঁকে সমাজের সামগ্রিক অমর্যাদাবোধ থেকে রক্ষা করেছে।

পরিশেষে আলোচ্য ভারতীয় বিচার-কার্যের ক্ষেত্রে ‘বিলম্বিত বিচার-বন্ধনার সামিল’ — এই বহু কথিত ব্যাকটিংর সামাজিক তাৎপর্য, বিশেষত এর দায় বিচারকের ওপর কতখানি বর্তায়? একথা স্বীকার্য যে, ভারতে জনসংখ্যা বিপুল বৃদ্ধির আর একটি কারণ হল — যে ধরনের মামলা আগের যুগে তেমন ছিল না এখন সেগুলো দেখা দিচ্ছে। যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। এই বর্ধিত মামলা মোকদ্দমার তুলনায় আদালত ও বিচারকের সংখ্যা তেমন বাড়েনি। কলকাতার হাইকোর্টে জমে থাকা মামলার সংখ্যা এখন ২ লক্ষ ৩৩ হাজার এবং ১২ জন বিচারকের পদ শূন্য পড়ছে আছে। পঞ্চদশ বছর আগের মামলার এখনও মীমাংসা হয়নি এমন অবিশ্বাস ঘটনারও নজির আছে। নিম্ন আদালতগুলোর অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। সর্বভারতীয় চিত্রটি প্রায় একই রকমের। ফলে আদালত ও বিচারকে ঘিরে জন অসন্তোষ বাড়ছে। অভিযোগটা এসে পড়ছে আদালতের প্রধান চরিত্র বিচারকদের ওপর। দোষটা মূলত বিচারকদের নয়। দোষটা প্রথমত মামলার সংখ্যার, দ্বিতীয়ত বিচার ব্যবস্থায় জটিল নিয়মাবলীর। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, কোন কোন বিচারকের মামলার বিলম্বিত নিষ্পত্তির কারণ তাদের নিজস্ব ষ্টাইল অব্ ফাশন। কিন্তু সমাজ তা মেনে নেবে কেন? তখন সে বিচারক সমালোচনার আবের্তে পড়ে যান।

এই বিধ্বস্ত বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সমাধানের সূত্র খোঁজা চলছে। আদালতের ও বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিচারব্যবস্থার কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা চলছে। চিন্তা করা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা নিয়মাবলীর সরলীকরণের কথা। লোক আদালত, পারিবারিক আদালত, মানব অধিকার কমিশন প্রভৃতি ব্যবস্থা সেই বিকেন্দ্রীকরণ প্রচেষ্টারই এক একটি অংশ। এ ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজনের তুলনায় এখনও খুবই অপ্রচলিত তেমনি এর পরিচালন-পথ বাধাও আশংকার বিষয়। স্বর্ভাব্য, পারিবারিক আদালত উদ্বোধনের দিনে আইনজীবীদের বেআইনী আক্রমণের মতো সাম্প্রতিক ঘটনা।

স্বভাবতই বিলম্বিত বিচার সব চেয়ে বেশি আঘাত করে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষদের যারা মামলার খরচ দীর্ঘদিন বহন করতে পারে না অথবা বেশি ফি-এর উকিল নিযুক্ত করতে পারে না। অনেক সময় অসম্ভব বিলম্বের জন্য মামলা মান্যপথে ছেড়ে দেয়। কখনো জেদ করে মামলা চালাতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশ্রয় হয়ে যায়। কখনো মামলার নিষ্পত্তির আগেই তাদের মৃত্যু হয়। তাই বিলম্বিত মামলায় তাদের আদালত সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলে, বিচারকের ওপর দোষ আরোপ করে। কেউ কেউ মামলার অনিবার্য প্রয়োজন বোধ করেও বিলম্বের ভয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় না। অবিরত মুখ বুজে সধ্য করে। মনে মনে আদালতের নিদামন্দ

করে। নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য ‘লিগ্যাল এইড’ ব্যবস্থা এখনো তেমন ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। তবুও নিম্নবর্ণের মানুষেরাই আদালতকে এখনো ঠিক ভক্তি না করলেও সমীহ করে। কিন্তু সমাজের ধনী লোকদের আদালত সম্বন্ধে ‘কুছ পরোয়া নেই’ ভাবটাই বেশি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত মামলার বিপরীত পক্ষ যদি অর্থে-সামর্থ্যে দুর্বল হয়। টাকার জোরে বেরিয়ে যাব মামলা জিতে — তাদের এমন একটা আদালত-কটাক্ষপাত-করা মনোভাব এখনো সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়নি এদেশে।

কথায় কথায় আদালতের পবিত্রতা ও বিচারকের মর্যাদা রক্ষার জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগের অল্প প্রয়োগের বিধানটিকে আমাদের কিছুটা কুন্মিত মনে হয়েছে। এ দিয়ে শুধু ভয় দেখানো যায়, ভক্তি ফেরানো যায় না। তার জন্য প্রয়োজন বিচার-কার্যের গুণগত মান ফেরানো, যার ফলশ্রুতি সঠিক, অবিলম্বিত রায়দান। আদালতের রায়ের সমালোচনা কম বেশি সব দেশে সব সময় হবেই। কয়েকটি আশু বিচার ব্যবস্থার সংস্কার-মূলক কর্মসূচী নিতে হবে।

যেমন

এক,

বিচারালয় ও বিচারকের সংখ্যা দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে।

বিচারালয়ের বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচী এর মধ্যেই পড়বে।

দুই,

বিচারকদের যোগ্যতার মান আরও উন্নত করতে হবে।

তিন,

রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন সম্বন্ধে বিচারকে আরও কঠোর হতে হবে।

চার,

বিচারালয়ের দৃষ্টিত আবহাওয়া অবিলম্বে দূর করতে হবে।

পাঁচ,

‘লিগ্যাল এইডের’ ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে।

ছয়,

সমাজকে দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও অবহিত ও সচেতন করতে হবে।

সাত,

বিচার কার্যের নিয়মের দ্রুত সরলীকরণ করতে হবে।

অন্তত আগামী প্রজন্মের জন্য এক সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজসেবার মঙ্গলদীপটি প্রোজ্জ্বলিত হোক, এ কামনা শুধু সমাজবিজ্ঞানীর নয়, যে কোন শুভাকাঙ্ক্ষী সামাজিক মানুষের অধিষ্ঠ।



## অনেকদিন পরে একদিন

গল্প

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বিনয় সরকারের মনে দুটো কথা বিকেল থেকেই তোলপাড় করছে।

এক নম্বর : এখনো কি কেউ ফুলোফুলো পাউরুটি দুধে ভুবিয়ে টসটসে হলে তাই তুলে নিয়ে চিনিতে ঠেসে তবে খায়?

দু'নম্বর : বুড়ো কাকে বলে?

দ্রামান্তার ওপর পুরনো বাড়ির দোতলায় খোলামেলা ফ্রাট, ফাঁকা। ভাদ্র মাসের বিকেলবেলা। চা খাওয়া হয়ে গেছে। বিনয় বউয়ের দিকে তাকালেন। বউয়ের নাম সুতপা। তিনি চোখে চশমা দিয়ে সকালের কাগজ দেখছেন। ডাটির ওপর একগুঁড়ি পাকা চুল।

বইয়ের তাকের ওপর কোয়ার্জ ঘড়ি। তার কাছে তাকিয়ে বিনয় মিনিটের কাঁটা দেখতে পাচ্ছেন না। আলো পড়ছে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি বউয়ের মুখে তাকালেন। সুতপা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ দেখছে। উঠানে টবে টগর গাছটি বেশ বড় হয়েছে। গাছটা তুলে বড় টবে বসানো দরকার। বাড়ন্ত শিকড়ে গাছের গোড়া ঢেকে গেছে।

এইসব সময় অনেক — অনেক পেছনে ফেলে আসা নানান দিনের একটু অধট্ট অবস্থা মত উঁকি মারে। একটা কথা। কিংবা হেসে একখানি মুখ। নয়তো একটা রাস্তার খানিকটা। এক ঝলক হাসি। খোঁয়াটে পেছন দিক থেকে।

হঠাৎ সুতপা মুখ তুলে বললেন, যাও না। হেঁটে এসো।

কোথায় যাবো?

কেন? ফুটপাথ ধরে হেঁটে এসো।

কলকাতার ফুটপাথ দিয়ে আর হাঁটা যায় নাকি!

তাহলে এদিক সেদিক ঘুরে এসো।

ভাবছি —

কি ভাবছো?

কিছু না সুতপা।

তবু শুনি।

বিনয় তার বউয়ের মুখে তাকালেন। ভাবছিলাম — এখনো কি কেউ?

আর বলতে হবে না তোমাকে। বলে হেসে ফেললেন সুতপা। কতদিন তো বাইয়েছি তোমাকে। কি?

সেই তো দুধে পাউরুটি ভুবিয়ে নিয়ে চিনি লাগিয়ে খাওয়া।

কবে খেলাম? ছোটবেলায় আমাদের পাশের বাড়িতে অচিন্ত্যকে ওর মা দিতেন। অচিন্ত্য বারান্দায় বসে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খেতো।

সে তো পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তারপর আমিই তো তোমাকে কতবার দুধ পাউরুটি খেতে দিয়েছি।

কবে? আমার মনে নেই সুতপা।

যদি ইচ্ছে করে ভুলে যাও তো কি করবো। আমিই বিয়ে হয়ে এসেছি তা ছত্রিশ সাঁইরিশ বছর হয়ে গেল। এর ভেতর অন্তত কুড়িবার তোমাকে দুধ পাউরুটি খেতে দিয়েছি।

দিয়েছো?

হ্যাঁ। যতবারই তোমার ওকথা মনে পড়ছে—ততবারই।

অচিন্ত্যর বাবা স্টেশন মাস্তার ছিলেন। বরিশাল এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ড্রাইভারকে তিনি বলে রেখেছেন। ড্রাইভার স্টেশনে ঢুকে ইঞ্জিন থামিয়েই ছুটে গিয়ে অচিন্ত্যর বাবাকে পাউরুটি এগিয়ে দিত।

সে পাউরুটি কি আলাদা কিছু ছিল?

নিশ্চয়। কেমন ফুলো ফুলো। দুধে ভিজলে পাউরুটির নরম গা বুলে পড়ত। কলকাতার পাউরুটি তো। — বলতে বলতে বিনয় সরকার ধুতি পাঞ্জাবি পরতে লাগলেন।

এখন আর তেমন পাউরুটি পাওয়া যায় না?

না!! এখন সব পাউরুটি সমান হয়ে গেছে। — বলে মাথা আচড়ালেন বিনয় সরকার। আয়নার দিকে তাকিয়ে।

সেই আয়নায় স্বামীর মুখ দেখার চেষ্টা করে সুতপা বলতে লাগলেন, আসলে আমাদের তো বয়স হল। হালকা কাবলি ভূতো পায়ে গলাতে গলাতে বিনয় সরকার জানতে চাইলেন, বয়স হওয়া কাকে বলছে?

সুতপার বলতে ভাল লাগছিল না। তবু বলল, বয়স হওয়াকেই বলছি। মানে বুড়ো হয়ে আসা—

বরোবার আগে বিনয় ফের জানতে চাইলেন, বুড়ো হয়ে আসা কাকে বলছো? এই চুলে পাক ধরা? দাঁতে ব্যাথা? চোখের জন্যে চশমা নেওয়া?

উহু। অনেকে তো অনেক বয়সেও চশমা ব্যবহার করেন না।

তাহলে?

সুতপা ওছিয়ে ওছিয়ে বললেন, এই ধরো নিজের ব্যবহারের জন্যে নিজেরই অজান্তে সবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াকে — নিজে বুঝতে পারছি না — কেন কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না — অথচ নিজেই দায়ী —

কথাগুলো খুব গোলমালে লাগল বিনয় সরকারের। তিনি হাঁটবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার রাস্তায়। সন্ধ্যা হয় হয়। মোড়ে মোড়ে পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে। মেট্রো স্টেশনের মুখে ফুচকার ডালা ঘিরে ভিড়। টিকিফের জন্যে ভিজে ছোলা, সন্ধ ছোলা, মুড়ি। তারও লাইন।

চেনা পেন্টেল পাম্প। চেনা ব্যাক। চেনা মোড়। সব পার হয়ে অনেকটা চলে এসেছেন বিনয় সরকার। নিজের অজান্তে নিজেরই ব্যবহারের জন্যে আমিও কি সবার চেয়ে আলাদা হয়ে গেছি? গেলাম? ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। ব্যবহারটা ভাল করতে হবে। বৈঠক কিছু দেখে চটলে চলবে না। হাসি হাসি ভাবটা ফুটিয়ে তোলা চাই মুখে। সবাইকে হেসে করার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে।

আরও কিছুটা এগিয়ে ভীষণ ভিড়। বিনয় সরকার ফিরতে লাগলেন। ব্যাক বাড়িটাকে গোমড়া মুখো লাগল তার। মানে বুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু পেন্টেল পাম্পটা সন্ধ্যাবেলায় জেলে

দেওয়া আলেয় বিশাল এক হোর্ডিং সমেত বেশ হাসি হাসি লাগল তার। তার মানে এখনো বুজো হয়নি।

এই বিনয়? কোথায় যাচ্ছিস?

এভাবে কেউ তাকে ডাকে না। বিনয় সরকার তমকে দাঁড়ায়। নীল জিনসের ওপর কালো টি শার্ট। চমৎকার ফিগার। দিবা আগেকার এরল? টাইপ গৌফ। মাথাটি ব্যাকব্রাশ। কানের কাছে সাদা।

আমি দীপক।

ঠিক প্লেস করতে পারছি না। মাফ করবেন।

মারব থাঙ্গড়। আমি দীপক হালদার। তুই বিনয় সরকার। আমার নতুন বুশ শার্ট গায়ে দিয়ে তুই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি। কচি কলাপাতা রঙের —

এক বলকে মেঘে ভরা আকাশের মতই সব কিছু ঝুলে পড়ল বিনয় সরকারের মনে। সামান্য ঢেনা ঢেনা ডাব ভেসে আসছে।

আরে আমি সেই দীপক। আমি, শচীন আমরা সবাই অষ্টমীর দিন ঘোড়া ভাড়া করে সাদারন অ্যাভিনিউ দিয়ে রাইডিং করেছিলাম—নাইশিন ফিফটিতে।

ওঃ! হোঃ! তাই বল? দীপক যে —

মনে পড়েছে? বেকুব ছাড়া কেউ সাদারন অ্যাভিনিউ দিয়ে অষ্টমী পূজোর বিকেলে ছ'বন্ধু মিলে ঘোড়া দাবড়ায়?

তবে দাবড়েছিল কেন?

শো। একটা শো হবে তাই। বেশ তীরের মত ঘোড়ার পিঠে টগবগ করে সাদারন অ্যাভিনিউ দিয়ে উড়ে যাওয়া। সবাই তাকিয়ে দেখবে। মুটিয়ে গেছিস বিনয়। বল — কেমন আছিস?

যেমন দেখছিস। — বলতে বলতে কলেজ জীবনের গোড়ার দিককার দীপক, শচীন — আরও কারও কারও তখনকার মুখ দেখতে পেলেন বিনয়। অনেকের নাম মনে নেই। তবু মুপঙলোয় যেন গর্জন তেল মাথানে। সব চকচক করছে।

কি করছিস? সেই ওকালতি?

এখন আর কোর্টে যাই না দীপক।

অনেক পয়সা হয়েছে। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে যাচ্ছিস! ভাল। ভাল। তুই-ই ওকালতিতে সাইন করবি জানতাম।

কি করে?

এত ফাইন গুল মারতিস। আমরা গুনতাম তোর গুল — আর মনে মনে হাসতাম বিনয়। পরে যখন গুনলাম — তুই কালো কোর্ট গায়ে কোর্টে যাচ্ছিস — তখনই জানতাম সাকসেসফুল উকিল হবি। তোর গুলগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হোত।

চল। আমার বাড়ি যাবি।

দীপক হালদার তমকে দাঁড়ালেন ফুটপাথে। এখন?

হ্যাঁ। এখনই যাবি। কারও সঙ্গে দেখা হয় না। কেউ আসে না। তুই গেলে আমার বউয়েরও ভাল লাগবে।

চল।

দুই বন্ধু কলেজ জীবনের পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে পাশাপাশি হাঁটছেন। দীপক হালদার বললেন, বিলেত থেকে ফিরে আমার লেট ম্যারেজ। একটি মেয়ে। কলেজে বটানি পড়ায়।

বিয়ে দিয়েছিস?

নাঃ! প্রপার ছেলে পাচ্ছি না। দে না একটা ছেলে। তোর?

দুই ছেলে। দু'জনই প্রেম করে বিয়ে করে কেটে পড়েছে।

তা হোক। নিজের সংসার চালাতে পারে তো?

খুব ভালভাবেই পারে দীপক। আমাকে কিছু কিছু দিতে এসেছিল দু'জনই। নিইনি। আমার তো চলে যায়।

এ হেঃ! এটা ভুল করেছিস। টাকা অনেক সময় সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখে। তারা কোথায়?

এই কলকাতাতেই থাকে। আমি যেখানে থাকতাম — তার কাছাকাছিই এখনো আছি। দীপক। তুই?

একটা ফ্ল্যাট বিলেত থাকতেই বুক করেছিলাম নয়তো বালিগঞ্জ সার্কুলারে এখন ফ্ল্যাট কিনতে পারতাম না। যাবি একদিন। দেখে আসবি।

বেরোতে হয়?

বিশেষ নয়। আমার তো কনসালটেশ্বর কাজ বিনয়।

নিজের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বিনয় সরকার বললেন, চল ছাদে গিয়ে বসি। একটু বাতাস পাওয়া যাবে। কলকাতার ভাড়ার ফ্ল্যাট। কিন্তু পুরনো দোতলা। সিঁড়ি আছে বলে ওপরে গিয়ে বসা যায়। দুটো বেতের চেয়ার বিকেল হলেই ঠিকে কাজের লোক দিয়ে ওপরে তুলে দিয়ে যাবেন সুতপা।

ভাতে গিয়ে বসলেন দুই বন্ধু। সুতপা চা নিয়ে এসে খানিকক্ষণ গল্প করলেন। ছাদের বারোয়ারি টিনের চেয়ারে বসে। তারপর একসময় উঠে গেলেন। মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। দু'চারে ভরা। কাছাকাছি হাইরাইজের ফ্লোরে ফ্লোরে আলো। রাস্তার গোলমাল ছাদে পৌঁছতে পৌঁছতে ফিকে।

তুই গুল দিয়েও তোর কথার বাঁধুনি ছিল খুব সুন্দর। তাই ওকালতিই তোকে স্টুট করেছে বিনয়।

বিনয় সরকার হাসতে হাসতে বললেন, গুল দিয়ে ওকালতি করা যায় না। সওয়ালা করতে লাগে ল' পয়েন্ট। বুঝলি দীপক।

এবার দীপক হালদার আদর্শ বন্ধু নিয়ে কয়েকটা কথা বললেন। যেমন : এখন আমাদের হাতে গোনাগুনতি সময়। এই সময় আমরা যতটা পারি নিজের ভেতর দেখাশুনা করব। সম্পর্ক রাখব। সবাই সবাইকে ফোন করব। কেননা এর পর তো আর কোনদিন দেখা হবে না।

কিসের পর? — তা আর জানতে চাইলেন না বিনয় সরকার।

দীপক হালদার বললেন, তোর তপনকে মনে পড়ে?

কোন তপন বলত?



আরে তপন শিক্ষার। ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল। সেই যে যার সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছিল। আমি ঝগড়া করিনি দীপক। নাস্তা ছিল সঙ্গে আমাদের কলেজের গোলকিপার। সেই তো আচমকা লাথি মেরে বসলে তপনকে। আর আমি হয়ে গেলাম দেখী।  
ওসব কলেজ জীবনের কথা ভুলে যা।  
নাস্তার লাথি বেকায়দা জায়গায় লেগে গিয়ে তপন একদম বেড-রিডিন হয়ে গেল। আর আমাকে সবাই দায়ী করতে লাগল।

ভারি সুন্দর দেখতে ছিল। একবার তো কথা হয়েছিল — তপনকে নিয়ে দম্মা মোহন ছবি তোলা হবে। তপন হবে মোহন।  
শেষ অর্ধি তো ছবিটা হয়নি। তাই না?

ওরা প্রদীপকুমারকে নিল তপনের জায়গায়। সিনেমায় না গিয়ে ভালই করেছিল তপন।  
ওমুখ কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার হয়েছিল।

হয়েছিল বলছিস কেন?  
আগেই রিটায়ারমেন্ট নিতে হয়েছে তপনকে। প্যানক্রিয়াসে ক্যানসার।  
ছাদে কোন আলো নেই। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না।  
বিনয় জানতে চাইলেন, সেই বাড়িতেই আছে?

হ্যাঁ তবে বুদ্ধি করে বেশ কয়েক বছর আগে সময়মত বাড়িটা কিনে নিয়েছিল শরীর ভাল থাকতে থাকতে। নয়তো এখন তপন খুব অসুবিধের পড়ে যেত।

বিনয় বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন। বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। তেতলা বাড়ি। পুরো বাড়িটাই ওদের ভাড়া নেওয়া ছিল। একতলায় ওর শাবার চেম্বার। ডাক্তার ছিলেন। দু'ভাই। তপন ছোট। দাদা সি এ পড়ছেন তখন। তপন বিছানায় শুয়ে। বিনয় সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় তপনের ঘরে। তপনকে গিরে ঘরভর্তি লোক। বিনয় ঢুকতেই সবাই তার দিকে তাকালে।  
বিনয় মনে মনে বিড় বিড় করে বললেন, আমি নাস্তাকে লাথি মারতে বলিনি। নাস্তা রগচটা গোলকিপার। আমি কিছু বলার আগেই নাস্তা ধাঁই করে ..... তপন ফুটপাথে পড়ে গেল। পাশেই পার্ক। সবাই ছুটে আসছে। পার্কের গায়ে কলেজ। খোলা জানলা দিয়ে ফিজিক্স ল্যাবরেটরির খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

দিন চারেক পরে দীপকের সঙ্গে বিনয় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছেন। একতলায় সেই চেম্বার নেই। তার বদলে বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ। সাত আটটি বাচ্চা ছেলে বসে পড়ছে। একজন অল্পবয়সী মেয়ে — দিদিমণি হবেন — তাদের খাতা দেখছেন। দোতলায় উঠে প্রথম ঘরখানাতেই তপন শুয়ে। বিছানায় টেলিফোন। ঘরের জানলা বন্ধ। এয়ারকুলার চলছে। একটু বিবাহিত মেয়ে তপনের পায়ের তলা ভিজ়ে তোয়ালে নিয়ে মুছে দিচ্ছে।

তপন শুয়ে শুয়েই বলল, এসো বিনয়। বোসো। এসো দীপক।  
বিনয় বুঝলেন, হয় দীপক ফোনে তপনকে বিনয়ের কথা বলেছে। নয়তো নিজে এসেও বলে যেতে পারে — বিনয়কে নিয়ে আসছি একদিন।

সেই একদিন হল আজ। এখন সন্ধ্যাবেলা। খোদা দরজা দিয়ে দশ বায়েটি বাচ্চা ছেলেকে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় যেতে দেখা গেল। সাধারণ আটপৌরে শাড়ি। কপালে বড় করে সিঁদুর।

একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন।

তাকে দেখিয়ে দীপক বলল, রমা। তপনের বউ। আর এই হচ্ছে বিনয়।  
বিনয় হাত তুলে নমস্কার করলেন। রমা বললেন, পুরনো বাড়ি। সিঁড়ির নিচে পিলার তুলে ঘর বাড়ানো ছিলো তেতলায়। ঠিক এমন সময় —  
রমার কথা সম্পূর্ণ করল তপন। ঠিক এমন সময় আমি বিছানায় পড়লাম।  
রমা বললেন, সারা বাড়ি বালি কিচকিচ করছে। অথচ কাজ বন্ধ করারও উপায় নেই।  
স্টুডেন্ট বেড়ে যাচ্ছে।

তপন বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, রমা ইংরেজি ভাল জানে। আশপাশের সব স্কুলে ভর্তির জন্যে বাচ্চাদের তৈরি করে দেয়। চারমাসের ক্র্যাস কোর্স।

রমা লজ্জা পেলেন। না না। আমি একা পড়াই না। পাঁচ ছ'জন দিদিমনি আছেন। তারাও পড়ান। স্পেসটা পড়ে আছে দেখলাম — তাই গিয়ারাটোরি স্কুল খুলে দিলাম।

বিনয় বুঝলেন, রমার এই স্কুল এখন এবাড়ির ভরসা।  
বিছানায় বসে বউ মত মেয়েটি তপনের পায়ের পাতা মুছিয়ে চলেছে ভিজ়ে তোয়ালে দিয়ে। তাকে তপন বলল, যাও মা — দু'কাপ চা করে নিয়ে এসো আমার বন্ধুদের জন্য —

রমা বললেন, আমার মেয়ে। কাছেই শ্বশুরবাড়ি। এবেলা ওবেলা এসে বাবাকে দেখে যায়।  
বিনয় বললেন, এখন চায়ের দরকার নেই কোন। দীপক — তুমি কি চা খাবে?  
না না। চায়ের দরকার নেই। বেশ তো মেয়েটা বাপের কাছে রয়েছে বাবার পা মুছিয়ে দিচ্ছে।

তপন শুয়ে শুয়েই বলল, তা হয় নাকি? বন্ধুরা এলে চা না হলে জমে কখনো? যা তো মা চা করে নিয়ে আয়।

মেয়ে পালক থেকে নামতে নামতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খাবে?

না।

বাবার জন্য কির?

ও কি? তোর বাবা কি আর চা খায়?

তপন শুয়ে শুয়েই বলল, চা আর এ জীবনে খাওয়া হবে না।

বিনয় দেখলেন, শক্ত সমর্থ তপনের শরীরের অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। কনুইয়ের হাড় পেন্সিল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, এখন কষ্ট কিছু কম?

তপন চিৎ হয়ে শুয়ে। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ওবুধের ওপর আছি। ব্যথা বাড়তে থাকলে ডাক্তারকে টেলিফোন করা হয়। তিনি এসে ঘুম পাড়িয়ে দেন। থাক ওসব কথা। অন্য কথা বল। ওকালতি করে যাচ্ছে?

না। আর কোর্টে যাই না। বাড়িতেই থাকি।

ভাল। ভাল।

তোমার কী সুন্দর চেহারা ছিল তপন। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম তোমাকে।  
ওসব কথা থাক।

তুমি সিনেমা করবে — শুনেছিলাম।

থাক না ওসব কথা। একবার অবশ্য কথা উঠেছিল। বহুদিন আগে।

এখন সময় একজন দিদিমনি ওপরে উঠে এসে রমাকে জোরে জোরে বললেন, একবার নিচে আসুন তো দিদি।

আবার কি হল? — রমা সিঁড়ির দিকে ফিরলেন।

তপন বলল, তুমি একবার দেখে এসো।

সিঁড়ির মুখে টেবিলের ওপর গ্যাস। তাতে কেটলি। কেটলির মুখোমুখি তপনের মেয়ে দাঁড়িয়ে। চোখ কেটলিতে। চোখে জল। তেরছা হয়ে বসায় বিনয় সব দেখতে পাচ্ছেন।

এখন ঘরে শুধু তপন, দীপক আর আমি। আমার গলা বুজে আসছে। আমি পালক্কে উঠে বসে তপনের ডান হাতখানি ধরলাম। ছাঃ করে উঠল। বেশ গরম।

হাত ধরায় তপন অবাক হল। কিন্তু সেটা ঢাকতে পাতলা করে হেসে বলল, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা বিনয়।

বিনয় বলল, সব সময় তোমার গা এমন গরম থাকে নাকি?

ক্যানসার ডিটেস্ট হবার পর থেকেই দেখছি — গা গরম থাকে। সব সময়।

বিনয়ের মনে হল, ক্যানসার আর ডিটেস্ট — এই দুটি ইংরাজি শব্দ দিয়ে রোগটাকে যেন তপন হালকা করতে চাইছে। বাংলায় বললে যেন, ক্যানসার ছড়মুড় করে একদম গায়ের ওপর এসে পড়বে। তখন আর আটকানো যাবে না। যেন চলছে লিভার ডিটেস্ট হবার পর — কিংবা রোগটা ধরা পড়ে যাবার পর —। জ্বর বা ক্যানসার তো চোর নয়।

আমি এবার তপনের ডান হাতখানি দু'হাতে ধরে বললাম, সেদিন আমার কোন দোষ ছিল না তপন।

তপন অবাক হল। কবে? কি বলছো?

মানে — সেদিন পার্কের পাশে আমি কিছু বলার আগেই —

কোন্ পার্ক? আরে?

কলেজের পাশে তপন। আমি কিছু বলার আগেই রগচটা নান্টা —

কোন্ নান্টা?

বিনয়ের চোখে জল এসে গেল। নান্টা তোমায় যখন লাথি মারলো — তু তু করে কৈদে ফেলল বিনয়।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল তপন। কী ছেলোমানুষী করছো? সেসব কথা কবে ভুলে গেছি। ওসব কেউ মনে রাখবে নাকি! তুমিও যেমন পাগল।

আমার কোন দোষ ছিল না তপন। তুমি ব্যাথা পেয়ে ফুটপাথে পড়ে গেলে।

আমার কিছু মনে নেই। সে কবেকার কথা।

সবাই মিলে ধরাধরি করে তোমাকে এ ঘরে নিয়ে এল। পেছন পেছন আমিও এসেছিলাম।

তাই বুঝি?

তোমাকে এই পালক্কেই শোয়ানো হয়েছিল।

তপন হেসে ফেলল। এই পালক্কে? চিনলে কি করে?

ওই যে তোমার মাথার কাছে পদ্মের কাজ। আমি ভুলিনি তপন। এই প্রায় পঞ্চাশ বছর

আমি ওই কাঠে খোদাই পদ্মের কাজ চোখ বুজলেই দেখতে পাই। আমাকে ক্ষমা কর তুমি। সেদিন আমি মনে ভয়ঙ্কর কষ্ট পাই।

নান্টার লাথিতে কষ্ট পেলাম আমি। আর তুমি কষ্ট পেলে!

সবাই সেদিন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারিনি। যেন আমিই লাথি মেরেছি তোমাকে।

এই দ্যাখে! আমি ভুগছি ক্যানসারে। আর তুমি কবেকার কথা তুলে কান্দতে বসলে। রাখো তো ওসব। এখন চা খাও।

তপনের মেয়ে দু'কাপ চা রাখলো বিছানার ওপর। বিনয়ের শরীর ধরধর করে কাঁপছে। তাতে পালক্কে দুলে গিয়ে চায়ের কাপ দুটোকে চা সমেত প্লেটের ওপর শব্দ তুলে কাঁপাতে লাগল।

দীপক বলল, থামো বিনয়। থামো। চা পড়ে যাবে।

তপনের মেয়ে বাবার বন্ধুর চোখে জল দেখে অবাক হয়ে গেছে। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে নড়তে পারল না।

তপন হো হো করে হেসে উঠল। ভাঙা ভাঙা গলার সে হাসি সিলিং অর্ধি উঠে ধপাস করে বিছানায় পড়ে গেল। আচমকা ধোয়ারা বন্ধ করে দিলে আকাশ বেয়ে ওঠা জলের দানাগুলো এমনভাবেই নিচে পড়ে যায়। জল দেখা যায়। হাসি দেখতে পাওয়া যায় না। গুনতে পাওয়া যায়।

হাসি থামিয়ে তপন আঙুলে আঙুলে বলল, তোমার হোল গিয়ে উকিলের মেমারি। ঠিকই বলেছো। এই ঘরে — এই পালক্কেই আমাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন। নান্টার লাথি খেয়ে আমি হাঁটতে পারছিলাম না। বাবা ডাক্তার ছিলেন বলেই তাঁড়াতাড়ি —

বিনয় হাউ হাউ করে কৈদে উঠল। তপনের হাত দু'খানি ধরে সে বলল, আমি তখন উকিল ছিলাম না তপন। আমি তোমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিলাম।

কেউ লক্ষ্য করেনি — কখন রমা এ ঘরে ফিরে এসেছে। সে ধমক দিয়ে উঠল, কী ছেলোমানুষী হচ্ছে। চা পড়ে যাবে যে। এসব কথা নিয়ে কেউ কান্দে নাকি! কবেকার কথা —

বিনয় সরকার যেই টের পেলেন রমা এ ঘরে চলে এসেছে অমনি তিনি তপনের হাত ছেড়ে দিলেন। খুব লজ্জায় ডান হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে দেখতে পেলেন, বরিশাল এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন প্ল্যাটফর্মে চুকছে। ইঞ্জিনের গায়ে ইংরাজিতে লেখা ই বি আর। ড্রাইভার গাড়ি ডেডস্টপ করে নেমে আসছে। মাথায় বড় রুমাল বাঁধা। মুখে, গলায় কয়লার কালি। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। নীল প্যান্ট। ডান হাতে বড় মাল কী একটা।



## দূর্বোধা

প্রফুল্ল রায়

গল্প

মাদুরী যখন তাদের মাস্টি টোরিড বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটটায় ফিরে এল, দশটা বাজতে বেশি দেরি নেই।

ডোর-বেল টিপতে কাজের লোক নগেন দরজা খুলে দিয়েছিল। বারোশ স্কোয়ার ফিটের এই ফ্ল্যাটটায় ঢুকলেই বিরাট ড্রাইং-রুম-ডাইনিং রুম। তার ওধারে পর পর তিনটে শোওয়ার ঘর, কিচেন, স্টোর, ইত্যাদি। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ এসে দু-চারদিন থাকলে তাদের জন্য একটা মাকারি মাপের গেস্ট রুমও আছে এক কোশে।

ড্রাইং রুমে পা দিয়েই চমকে উঠল মাদুরী। সুরজিং ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। ভঙ্গিটা আলস্য মাখানো, যেন কোথাও যাওয়ার তাড়া বা ব্যস্ততা নেই। অথচ আজ ছুটির দিন নয়।

অনাদিন নটা বাজতে না বাজতেই স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে তাদের নিজস্ব মেরুন রঙের নতুন মার্কসি-ওমনিটা ড্রাইভ করে অফিসে চলে যায় সুরজিং। সে একটা নাম-করা মাস্টি নাশালন কোম্পানির একজিকিউটিভ। বয়স বাহাম তিনগার। মাকারি হাইট। বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের বাই-ফোকাল চশমা। পরনে চিলেচালা পাজামা-পাঞ্জাবি।

মাদুরীর বয়স আটচল্লিশ। পাতলা, মেদহীন শরীর। গায়ের রং একটু চাপা হলেও সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিগুলো এখনও বিলীন হয়ে যায় নি।

কাল সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি মাদুরী। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। মাথাটা যেন ছিড়ে পড়বে। কপালের দু'পাশের রগদুটো সমানে লাফাচ্ছে। সে ঠিক করে রেখেছিল, বাড়ি ফিরে স্নান চুকিয়ে শুয়ে পড়বে। একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমের একান্ত প্রয়োজন তার। কিন্তু কে জানতো, সুরজিং আজ অফিসে যাবে না। তাকে দেখতে দেখতে শারীরিক কষ্ট বা অস্বাস্থ্যের ব্যাপারগুলো আর মনে রইল না মাদুরীর অদ্ভুত এক দৃষ্টিশক্তি, নাকি প্রবল ভয় তার মাদুমন্ডলীর ভেতর দ্রুত চারিয়ে যেতে লাগল।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে কয়েক পলক মাদুরীর দিকে তাকিয়ে থাকে সুরজিং। তারপর বলে, 'তোমাকে কিরকম যেন দেখাচ্ছে? শরীর ব্যাপক নাকি?'

'না আমি ঠিকই আছি।' কোনওরকমে উত্তরটা দিয়ে রুদ্ধস্বরে মাদুরী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আজ অফিসে গেলে না?'

'না। প্রচুর ছুটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, একটা দিন না হয় না-ই গেলাম। কী, ঠিক করি নি।' সুরজিং একদৃষ্টে মাদুরীর দিকে তাকিয়েই রইল।

আবছা গলায় কিছু একটা বলল মাদুরী, বোঝা গেল না।

সুরজিং এবার বলল, 'মনে হচ্ছে, সরাসরাত তোমার ঘুম হয় নি। সোজা বাথরুমে চলে যাও। স্নান করে এক কাপ কড়া চা খাও, শরীরটা ঝরঝরে লাগবে।'

মাদুরী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। যান্ত্রিকভাবে মাথাটা হেলিয়ে দিল শুধু।

সুরজিং বলল, 'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

অনিবার্যভাবেই যে এই প্রশ্নটা উঠবে, মাদুরী তা জানতো। মা খুব অসুস্থ, এইরকম একটা অজুহাত তৈরি করে কাল ভবানীপুরে মেজদার ফ্যাটে গিয়েছিল সে। মা ওখানেই থাকেন। ভবানীপুরে অবশ্য ঘণ্টা খানেকের বেশি থাকে নি মাদুরী। ওখান থেকে সোজা চলে গেছে লোক টাউনে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে বাড়ি এসেছে।

মাদুরী বলল, 'অনেকটা ভাল।' বলেই মুখ নীচ করে, এলোমেলো পা ফেলে, নিশাদে নিজস্বের শোওয়ার ঘরে গিয়ে আটচাড বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

লোক টাউনে কোনওরকমে চোখমুখে জল ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিল মাদুরী। দাঁত রাশ করা হয় নি। এখন বেসিনের সামনে বিরাট আয়নায় নিজের রাত-জাগা, বিপাক্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে রাশে পেস্ট লাগাতে গিয়ে ধমকে গেল সে। আয়নার প্রতিচ্ছবিটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল যেন। মাদুরী অনুভব করল অদৃশ্য কোনও টাইম মেশিন তাকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাল সকালে মায়ের অসুস্থতার যে কারণটা খাড়া করে মাদুরী ভবানীপুর গিয়েছিল সেটা খুব জোরালো নয়। এমনকিই কিছুদিন ধরে মায়ের শ্বাসকষ্ট চলছে। কখনও বাড়ে, কখনও একটু কমে। কাল কিছুটা বেড়েছিল; তবে সেটা এমন বাড়াবাড়ি কিছ নয় যে তক্ষুনি ছুটতে হবে। আসলে মা নয়, বিনির জন্য তাকে কাল যেতে হয়েছে। রাতে লোক টাউন থেকে ফেরাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিনি বা লোক টাউনের কথা সুরজিংকে বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা বুঝতে পারছিল না বলেই মায়ের শ্বাসকষ্টের অছিলাটা খাড়া করনতে হয়েছে।

কিন্তু বিনিকে সারিয়ে যার মুখটা এই মুহূর্তে চোখের সামনে কোনও অদৃশ্য টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে সে নিরুপম। ভালবেসেই একদিন তাকে বিয়ে করেছিল মাদুরী। সুপুরুষ, শিক্ষিত এবং অভিজাত বংশের ছেলে নিরুপমের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাতে না পারলে বৈতে থাকার কোনও মানে হয় না।

বয়ের পর রঙিন স্বপ্নটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বছর তিনেকের মধ্যেই সব আচ্ছন্নতা কেটে গিয়েছিল।

মাদুরীর জন্ম বনেদি বংশে হয় নি। নিরুপমের মতো অর্থবানও তারা নয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় ওরা তা-ই। তবে পরিবারের সবাই খুব শিক্ষিত।

দু'জনের সম্পর্কটা যে ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করেছিল তার কারণ আজিজাতা নয়। বনোয়ানা নিয়ে আজকাল কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। তফাতটা ছিল রুচির, এবং জীবন যাপন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার।

নিরুপম ড্রিং করত। মদ্যপানটা ইসলামী জলভাতের মতো ব্যাপার। যদিও মাদুরী বিশেষ পছন্দ করত না, তবে মেনে নিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে নিরুপম লম্পট ছিল না। নারীঘাটত কোনও স্ক্যান্ডালে তাকে কখনও জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় নি। তবে তার চরিত্রের যে মিকটা মাদুরীকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছে বা ক্রুদ্ধ করে তুলেছে সেটা এইরকম।



নিরুপম চাকরি টাকারি করত না। ওর ছিল খুব বড় আকারের বিজনেস। রেলওয়ে থেকে শুরু করে নানা সরকারি ডিপার্টমেন্ট, ফাইভ-স্টার হোটেল থেকে বিরাট বিরাট প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে লক্ষ লক্ষ টাকার মেটেরিয়াল সাপ্লাই করত। আর এই সাপ্লাইয়ের অর্ডার বার করার জন্য যতদূর নীচে নামা সম্ভব, নামতো। মোটা টাকার ঘুষ, বড় বড় হোটেলের রাতভর পাটি, এসব তো সামান্য ব্যাপার। এমন কি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আনন্দদানের জন্য হোটেলের কামরা 'বুক' করে মেয়েদের পাঠিয়ে দিত। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল টাকা, টাকা আর টাকা। অর্থের ব্যাপারটা তার মাথায় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ভর করে ছিল। সেটাই তাকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে সততা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে পরিভ্রান্ত একটা মাপকাঠি থাকে। নিরুপমের সঙ্গে বিয়ের পরও সেটাকে কোনওভাবেই বিসর্জন দিতে পারে নি মাধুরী। ওটা উত্তরাধিকার সূত্রেই তার পাওয়া। টাকা, বিদেশি পারফিউম, কালার টিভি, ফ্রিজ, মিউজিক সিস্টেম — এসব তো কাজ বাগানোর জন্য আকছার দিতে হয় কিন্তু তাই বলে মেয়েমানুষ ঘুষ? এটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছিল না সে। এই নিয়ে গুরু হয়েছিল অশান্তি, তিক্ততা। একদা যে নিরুপমকে না পেলে জীবন বার্থ হয়ে যাবে মনে হয়েছিল, এখন থেকে চিন্তা শুরু হল এরকম একটা নোংরা, জঘন্য লোকের সঙ্গে বাকি দিনগুলো কাটাবে কী করে? চোখ কান বুজে থাকলে কোনওরকম সমস্যাই হতো না। কিন্তু মাধুরীর মধ্যে ছিল এক ধরনের একগুয়েমি, নাকি গুচিবাই? সে কিছুতেই নিরুপমকে সহ্য করতে পারছিল না। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি এমন একটা পর্যায় পৌঁছে গেল যে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হল না। বিয়ের চার বছরের মাথায় ডিভোর্স নিয়ে ভবানীপুরে বাপের বাড়ি ফিরে এল সে।

বাবা তখনও জীবিত। তা ছাড়া মা আর তিন দাদা আছেন। তাঁরা অবশ্য প্রথম দিকে মাধুরীকে মিটমিট করে নেবার জন্য অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু কারও কথা শোনে নি সে। পরে বিবাহ বিচ্ছেদটা যখন অনিবার্য হয়ে উঠল তখন আর বাধা দেন নি।

মাত্র কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনটাকে নিশ্চিহ্ন করেই দিতে চেয়েছিল মাধুরী কিন্তু সেটা পারা যায় নি। বিয়ের পরের বছরই তার মেয়ে বিনির জন্ম। কিন্তু তাকে পায় নি সে। কোর্টের রায়ে সে নিরুপমের কাছে থেকে গিয়েছিল। তবে যখনই ইচ্ছা হবে মাধুরী লেক টাউনে নিরুপমদের বাড়ি গিয়ে মোরেক দেখে আসতে পারবে। সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের ওই একটাই পিছুটান থেকে গিয়েছিল।

বাপের বাড়ি ফিরে আসার বছর দেড়েক পর বাবা মারা গেলেন। দাদারা ভবানীপুরের পুরনো বাড়ি প্রোমেটারদের হাতে তুলে দিয়ে হাজার কোয়ার ফিটের একটা করে ফ্ল্যাট পেলেন। মা পেলেন নগদ দু লাখ টাকা। পিতৃ-সম্পত্তিতে মোদেরও আইনসম্মত অধিকার আছে। তাই মাধুরীও বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেল।

মাধুরীর প্রতি দাদা-বৌদিদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কেউ কখনও তার অনাদর করেনি। কিন্তু সময় কাটেনিই হয়ে উঠেছিল বড় রকমের সমস্যা। দিনগুলো তখন মাধুরীর কাছে বড়

বেশি দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একটা চাকরি নিয়েছিল সে।

বড়দা আর ছোটদার বদলির চাকরি। নিজের নিজের ফ্ল্যাটে তলা দিয়ে তাঁদের একজন চলে গেলেন দিল্লীতে, একজন বাঙ্গালোরে। মাধুরী মেজদার কাছে থেকে গেল। মা বছরে দু'মাস করে দিল্লী আর বাঙ্গালোরে দুই ছেলের কাছে থেকে আসেন, বাকি সময়টা ভাবানীপুরে। এদিকে চাকরি বাবুরি করলেও জীবনটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল মাধুরীর। যেন সামনে কোনও লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। একটা দিন ছবও আরেকটা দিনের কার্বন কপি। এইভাবেই যখন সময় কাটছিল সেই সময় হঠাৎ দু'র সম্পর্কের এক মাসিমা একটা সম্বন্ধ নিয়ে এল। ছেলোট অর্থাৎ সুরজিং তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয় — সচ্চরিত্র, মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির একজিকিউটিভ, কোনওরকম বদখোয়াল নেই। তবে সামান্য একটা খুঁত আছে। সুরজিতেরও আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী বাঁচে নি; বিয়ের আড়াই বছরের মধ্যে মারা যায়। ছেলেমেয়ে নেই। মাধুরী ডিভোর্সি না হলে এমন একটা সম্বন্ধ আনতে সাহস করতেন না মাসিমা।

সব শোনার পর মনে হয়েছিল ছেলোট বেশ ভালই। মেজদা, মেজ বৌদি এবং মা বোঝাচ্ছিলেন, অযাচিতভাবে এমন একটা সম্বন্ধ যখন এসেছে তখন না বলা উচিত হবে না। বড়দা এবং ছোটদাকে চিঠি লিখলে তাঁরাও জানিয়েছিলেন, মাধুরী যেন এ বিয়েতে রাজি হয়।

মাসিমাই একদিন সুরজিংকে সঙ্গে করে ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিলেন। তার সঙ্গে আলাপ করে বাড়ির আর সবার মতো মাধুরীরও ভাল লেগেছিল।

সেই যে সুরজিং এসেছিল, তার তিন মাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর বাঁশ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময় কাছাকাছি থেকে সুরজিংকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে মাধুরীর। মানুষটার একটা দিক খুব খোলামেলা। কখনও কখনও মনে হয় সে খুবই হৃদয়বান, সননুভূতিশীল এবং সত্যিকারের প্রেমিক। কিন্তু তার আরেকটা দিক দুর্বোধ্য। সেখানে সে খুব চাপা, উদাসীন, হয়তো কিছুটা শীতল। সব মিলিয়ে যেমনই হোক, মাধুরীকে কখনও অসম্মান করে নি সে। তার আচরণে এতটুকু ক্রটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ড্রিংক করেন না, পার্টিতে যাওয়ার অভ্যাস নেই। অফিসের কাজে বাইরে না গেলে ঠিক ছুটার ভেতর বাড়ি ফিরে আসে।

বিয়ের পরই সুরজিতের জন্য চাকরিতে রেজিট্রেশন দিতে হয়েছিল মাধুরীকে। তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু খুব তাঁড়া গলায় সুরজিং লেগেছিল, চাকরির প্রয়োজন নেই তোমার। আমি যা স্যালারি আর পার্কস পাই তাতে আমাদের মতো পাঁচটা ফ্যামিলির রাজার হালে চলে যাবে।

সুরজিতের শান্ত কণ্ঠস্বর এমন এক দৃঢ়তা ছিল যে আপত্তি করতে সাহস হয় নি মাধুরীর। তার মনে হয়েছে, সুরজিং কি প্রাচীন পন্থী, স্ত্রী চাকরি করুক, এটা কি সে চায় না? পরে কখনও কখনও ভেবে দেখেছে, হয়তো প্রচণ্ড অধিকার বোধ থেকেই এটা করে থাকবে সে। বুঝিবা সুরজিং বোঝাতে চেয়েছে, মাধুরী সম্বন্ধে সে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই শেষ কথা। এই নিয়ে মাধুরী আপত্তি করতে পারত কিন্তু করে নি। একটা সম্পর্ক তার নষ্ট হয়ে গেছে। জীবিত্যা



শেষ হয়ে যাক, তা সে চায় নি।

একটা ব্যাপার মাধুরী লক্ষ্য করেছে, নিজের মৃত প্রাক্তন স্বামী তাকে নিয়ে স্বল্পকালের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোনও দিন নিজের থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি সুরজিৎ। একদিন কৌতূহলের বশে মাধুরী জানতে চাইলে সে বলেছিল, 'আমি পেছন দিকে তাকাতে পছন্দ করি না। যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

নিরুপম, বিনি এবং মাধুরীর আগেকার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে মাসিমার কাছে সবই শুনেছিল সুরজিৎ কিন্তু বিয়ের পর এ ব্যাপারে কখনও আগ্রহ দেখায় নি। অতীত অতীতের মধ্যে বিলীন হয়ে থাক, এটাই হয়তো সে চায়।

সুরজিতের সঙ্গে বিয়ের আগে ভাকে মাঝে মাঝে লেক টাউনে গিয়ে বিনিকে দেখে আসত মাধুরী। কিন্তু বিয়ের পর যেতে সাহস হতো না। সুরজিৎ বেরিয়ে গেলে ফোন করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলত। এইভাবেই এতগুলো বছর বিনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে সে। কাল সেই বিনির বিয়ে হয়েছে। নিরুপম ফোনে হাতজোড় করে বলেছিল, 'তোমাকে আসতেই হবে।'

বিনিও বার বার বলেছে, 'তুমি না এলে হবে না মা।'

মেয়েটা চিরকালের মতো পরের ঘরে চলে যাবে। লেক টাউনে না গিয়ে পারে নি মাধুরী। কিন্তু সুরজিৎকে তা জানাতে ভরসা পায় নি। মায়ের অসুস্থতার নাম করে চাতুরিটুকু করতে হয়েছিল তাকে।

বিনির বিয়ের লগ্ন ছিল মাঝরাতে। সন্ধ্যার দিকে থাকলে কাল রাতেই ফিরে আসতে পারত মাধুরী। বিয়ে শেষ হতে হতেই ভোর হয়ে গেল। কাল তাই আর ফেরা সম্ভব ছিল না। ....

মান সেরে, পোশাক পালটে, চুল টুল আঁচড়ে ড্রইং রুমে চলে এল মাধুরী। এখন নিজেকে অনেকখানি তাজা মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরকার সংশয় এবং ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। সে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ অফিসে না গিয়ে সুরজিৎ বাড়িতে থেকে গেল কেন?

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় সুরজিৎ। বলে 'এসো। বসো এখানে।' কিচেনে কাজের মেয়ে মমতা রান্না করছিল, তাকে বলল, 'দু কাপ কড়া চা করে দাও দিদি।'

একটু পর চা খেতে খেতে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'বিনির বিয়ে ভালভাবে মিটেছে তো?' হতচকিত মাধুরী শুধু বলতে পারে, 'তুমি—তুমি —'

সুরজিৎ এবার যা বলে তা এইরকম। কাল অফিস থেকে ডুবানীপুরে ফোন করে মায়ের খবর নিতে গিয়ে জানতে পারে, মাধুরী ওখানে নেই, জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। কোথায় সে যেতে পারে, বার বার জিজ্ঞেস করলে সরল, ভালমানুষ মা বিনির ব্যাপারটা বলে দেন।

শুধু হয়ে বসে থাকে মাধুরী।

সুরজিৎ বলল, 'তুমি ফিরে আসবে, সে জন্য আজ ছুটি নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম।' মাধুরী কিছু বলল না।

সুরজিৎ এবার বলে, 'মেয়ের বিয়েতে যাবে, আমাকে বললেই তো পারতে।' মায়ের নাম

করে একটা অজুহাত খাড়া করার দরকার ছিল না?'

সুরজিৎ কি ক্ষিপ্ত হয়ে আছে? মুখ তুলে যে তার দিকে তাকাবে, তেমন শক্তিকুণ্ড যেন আর অবশিষ্ট নেই মাধুরীর মধ্যে। শিথিল গলায় বলে, 'তুমিই তো একদিন বলেছিলে অতীত নিয়ে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরজিৎ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাই বলে মেয়ের বিয়েতে যেতে দেবো না, এমন অমানুষ নিষ্ঠুর আমাদের ভাবলে কী করে?'

ধীরে ধীরে এবার চোখ তুলে তাকায় মাধুরী। অতীত বলতে সে কি শুধু নিরুপমকেই বুঝিয়েছিল?

সুরজিৎ বলে, 'বিনি আর জামাইকে একদিন আমাদের এখানে খেতে বেলো, কেনম?'

বাইশ বছর একসঙ্গে কাটানোর পরও মানুষটাকে আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে মাধুরীর। তবু সুরজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতা মন ভরে যায় তার। ব্যাপসা গলায় বলে, 'বলব।'

শেষ হয়ে যাক, তা সে চায় নি।

একটা ব্যাপার মাধুরী লক্ষ্য করেছে, নিজের মৃত প্রাক্তন স্ত্রী বা তাকে নিয়ে স্বপ্নকালের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোনও দিন নিজের থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি সুরজিৎ। একদিন কৌতুহলের বশে মাধুরী জানতে চাইলে সে বলেছিল, 'আমি পেছন দিকে তাকাতো পছন্দ করি না। যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

নিরুপম, বিনি এবং মাধুরীর আগেকার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে মাসিমার কাছে সবই শুনেছিল সুরজিৎ কিন্তু বিয়ের পর এ ব্যাপারের কখনও আগ্রহ দেখায় নি। অতীত অতীতের মধ্যে বিলীন হয়ে থাক, এটাই হস্ততো সে চায়।

সুরজিতের সঙ্গে বিয়ের আগে ভাকে মাঝে মাঝে লেক টাউনে গিয়ে বিনিকে দেখে আসত মাধুরী। কিন্তু বিয়ের পর যেতে সাহস হতো না। সুরজিৎ বেরিয়ে গেলে ফোন করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলত। এইভাবেই এতগুলো বছর বিনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে সে। কাল সেই বিনির বিয়ে হয়েছে। নিরুপম ফোনে হাতজোড় করে বলেছিল, 'তোমাকে আসতেই হবে।'

বিনিও বার বার বলেছে, 'তুমি না এলে হবে না মা।'

মেয়েটা চিরকালের মতো পরের ঘরে চলে যাবে। লেক টাউনে না গিয়ে পারে নি মাধুরী। কিন্তু সুরজিৎকে তা জানাতে ভরসা পায় নি। মায়ের অসুস্থতার নাম করে চাতুরিত্ব ক করতে হয়েছিল তাকে।

বিনির বিয়ের লগ্ন ছিল মাঝরাত্রে। সকোর দিকে থাকলে কাল রাতেই ফিরে আসতে পারত মাধুরী। বিয়ে শেষ হতে হতেই ভোর হয়ে গেল। কাল তাই আর ফেরা সম্ভব ছিল না। ....

মান সেরে, পোশাক পালটে, চুল টুল আঁচড়ে ভূইং রুমে চলে এল মাধুরী। এখন নিজেকে অনেকখানি তাজা মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরকার সংশয় এবং ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। সে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ অফিসে না গিয়ে সুরজিৎ বাড়িতে থেকে গেল কেন?

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় সুরজিৎ। বলে 'এসো। বসো এখানে।' কিচেনে কাজের মেয়ে মমতা রান্না করছিল, তাকে বলল, 'দু কাপ কড়া চা করে দাও দিদি।'

একটু পর চা খেতে খেতে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'বিনির বিয়ে ভালভাবে মিটেছে তো?'

হতচকিত মাধুরী শুধু বলতে পারে, 'তুমি—তুমি —'

সুরজিৎ এবার যা বলে তা এইরকম। কাল অফিস থেকে ভরানীপুরে ফোন করে মায়ের খবর নিতে গিয়ে জানতে পারে, মাধুরী ওখানে নেই, জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। কোথায় সে যেতে পারে, বার বার জিজ্ঞেস করলে সরল, ভালমানুষ মা বিনির ব্যাপারটা বলে দেন।

শুধু হয়ে বসে থাকে মাধুরী।

সুরজিৎ বলল, 'তুমি ফিরে আসবে, সে জন্য আজ ছুটি নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম।' মাধুরী কিছু বলল না।

সুরজিৎ এবার বলে, 'মেয়ের বিয়েতে যাবে, আমাকে বললেই তো পারতে।' মায়ের নাম

করে একটা অভ্যুত্থান খাড়া করার দরকার ছিল না?'

সুরজিৎ কি ফিণ্ড হয়ে আছে? মুখ তুলে যে তার দিকে তাকাবে, তেমন শক্তিত্বকুণ্ড যেন আর অবশিষ্ট নেই মাধুরীর মধ্যে। শিথিল গলায় বলে, 'তুমিই তো একদিন বলেছিলে অতীত নিয়ে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরজিৎ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাই বলে মেয়ের বিয়েতে যেতে দেবো না, এমন অমানুষ নিষ্ঠুর আমাকে ভাবলে কী করে?'

ধীরে ধীরে এবার চোখ তুলে তাকায় মাধুরী। অতীত বলতে সে কি শুধু নিরুপমকেই বুঝিয়েছিল?

সুরজিৎ বলে, 'বিনি আর জামাইকে একদিন আমাদের এখানে খেতে বসে, কেমন?'

বাইশ বছর একসঙ্গে কাটানোর পরও মানুষটাকে আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে মাধুরীর। তবু সুরজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তার। স্বাপসা গলায় বলে, 'বলব।'



## বৃহৎ কার্তিক লাইডী

গল্প

নিবিড় এই প্রথম পা রাখতে চলেছে কলকাতায়। কলকাতা! মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, শিউরে উঠছে অন্তর্গত শরীরের শিরা উপশিরা সব, ঐ নামের মধ্যে কি কোনো যাদু আছে? নিবিড় বৃকতে পারছে না তবু, শরীরের রোম খাড়া হয়ে উঠছে, এটা চোরা আনন্দ না উত্তেজনা স্ট্রেচিং বোঝার ক্ষমতা নেই তার এখন। অথচ লোদানায় কতটুকু বা কথা হয় কলকাতা সম্বন্ধে, মাঝে মাঝে হয় তবু, আর তাতেই একটা ধারণা গড়ে ওঠে — কলকাতা মস্ত শহর, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে, ট্রাম চলে সেখানে, হাওড়া ব্রিজের নিচে কোনো খাধা নেই, পৃথিবীর হেন জিনিষ নেই যা পাওয়া যায়না কলকাতায় বাঘের দুধ থেকে সাপের মাথার মণি, আছে আকাশ ছোয়া কত কত তলা বাড়ি, ফাইওভার, মাটির তলায় পাতাল রেল, ডিস্ট্রিয়ারা মোরোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর আরও আরও কত কি...

লোদনা ধানবাদ জেলার কয়লাখনি অঞ্চল, সেজনা এখানে পাটনার কথাই বেশি হয়, পাটনা বিহারের রাজধানী — প্রশাসন পুলিশ-শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুর কেন্দ্র হচ্ছে পাটনা। অঞ্চল কলকাতার সঙ্গেই ধানবাদের যোগাযোগ বেশি। পূর্ববঙ্গের যে গাড়ি হাওড়া ছেড়ে গ্র্যান্ড কর্ট লাইন ধরে, সেই গাড়ি ধানবাদের উপর দিয়ে চলে যায় গোমা গয়া মোগলসরাই পেরিয়ে পেরিয়ে কানপুর দিল্লি শব্দে আরও অনেক জায়গায়।

পাটনার সঙ্গে ধানবাদের সরাসরি দ্রুত রেল যোগাযোগ হয়েছে এই সেদিন। এখন পাটনা থেকে গভীর রাতে ছাড়ে গঙ্গা-দামোদর এক্সপ্রেস, সেই ট্রেন ভোর ভোর এসে পৌঁছয় ধানবাদ, অবশ্য সরাসরি বাসরুটও আছে। কিন্তু ঘন্টার বিচারে ধানবাদ থেকে কলকাতাই কাছে হয়, পাটনা পৌঁছতে প্রায় ঘন্টাতানেক বেশি সময় লাগে। তাছাড়া দিনরাতে বহু ট্রেন পাওয়া যায় কলকাতা যাওয়ায়।

অবশ্য খোদ ধানবাদে কলকাতার কথা বেশি হয়, না পাটনার—তা নিবিড় ঠিকঠাক জানে না। কিন্তু ধানবাদ থেকে ন/দশ কিলোমিটার ভেতরে লোদনায় কলকাতার কথাই চেয়ে পাটনার কথাই বেশি ওঠে। ধানবাদে বেশি বাড়িলি থাকার জন্যই শুধু নয়, ধানবাদ খনি-অঞ্চলের কেন্দ্র বলেই ব্যবসার খতিয়েই কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ বেশি স্বাভাবিক হয়। লোদনাতে এক সময় অনেক বাড়ালি ছিল, এখন খুব কম, ক-খর আছে তা হাতে গোনা যায়। বাড়ালি বলেই কি নিবিড় অ-দেখা কলকাতার জন্য একটা টান বোধ করে, যে টান রক্তের গভীরে শব্দহীন এবং শ্রোতও মুখর নয় — যক্ষুর মত। তার বহুবুদ্ধিবাহু সহপাঠী বেশির ভাগ বিহারী, তাই বাতচিত করতে হয় হিন্দিতে, হিন্দি প্রায় বহুবুদ্ধিবাহুর মত হয়ে উঠেছে। তবু কোনো বাড়ালি তারিক্কি করলে কলকাতায় কিছু হলে উছলে ওঠে সেই চোরা রক্তের টানে, সব বাড়ালিই কি তেমন উছলে ওঠে মনে মনে? সে জানে না, তবে এই উছলে ওঠা গোপন করতে পারে না কিছুতেই, তার চিহ্ন ফুটে ওঠে মনের এখানে সেখানে, আর তা ধরে ফেলাতে পারে বিহারী বন্ধুরা বিশেষ ক্ষেত্রে, তাই কি তারা প্রায় খুলে মেশে না বাড়ালি বন্ধুদের সঙ্গে তেমন ভাবে, নাকি সেই কুকড়ে যায় তখন?

নিবিড় এই প্রথম পা রাখতে চলেছে কলকাতায়। শরীরের রোম সব খাড়া হয়ে উঠছে, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে তবে, তার গতি থামার মুখে। তখন বোচকা পুটলি বস্তা মানুষের গোত্রায় নিবিড় এসে পড়ে দরজার মুখে, আর ট্রেন থামতে না থামতে হুড়মুড়িয়ে মানুষের নামার গোত্রায় পা হড়কে পড়ে যায় প্ল্যাটফর্মে — প্রায় মূখ খুবড়ে। ভাগিনাস হাত দিয়ে ঠেকিয়েছিল তার পড়ার অনেকখানি, নিবিড় প্ল্যাটফর্মের শানে মূখ লেগে ফুটি ফেটে হয়ে যেত চোখ নাক সব। নিবিড় উঠতে চেষ্টা করে, ততক্ষণ আরও আরও যাত্রী নেমে চলেছে হুড়মুড়িয়ে সেই কামরা থেকে, পিছনের কামরার যাত্রীরাও ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে পড়ন্ত মানুষটির হাল উপেক্ষা করে। নিবিড়ের শরীর খেলতে যেতে চায় সেই চলন্তপ্রোতের চাপে। নিবিড় ভদ্র দেবার কামরায় দু' হাতের তালুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, তখন কে যেন তাকে আলতোভাবে তুলে দাঁড় করায় ও হাসে। নিবিড় দাঁড়ায়, হির হয়ে দাঁড়াতে পারেনা তবু, পেছনের যাত্রীদের চাপ অব্যাহত আছে, ফলে তাকেও সামিল হতে হয় সামনে চলার স্রোতে, তাকাবার ভাবার ফুরসত নেই একেবারে।

নিবিড় চলতে থাকে সামনের দিকে যেন সারি দিয়ে, কিন্তু সেই সারিও অটুট থাকছে না সামনে থেকে আসা যাত্রীদের সঙ্গে — তারা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ট্রেন ধরার জন্য। নিবিড় দেখছে — কেবল কালো মাথা সামনে পিছনে সবদিকে, আর উপরে খুলন্ত টিভি-র পর্দায় ফরফরিয়ে উড়ে যাচ্ছে ছবি, মাইকের গোঙানি কখনো গ্যাঁক গ্যাঁক, কিছু ঘোষণা হচ্ছে তার মাথামুত্থ বোঝার উপায় নেই — কেবলই শব্দ, কানে ঢুকছে কানের পর্দা ফাটতে যেন। সামনে পেছনে দুপাশে চাপ অব্যাহতই আছে, এর মধ্যে মাঝ উপচে পড়া ঠেলা ট্রিল নিয়ে কুলিরা বিকট আওয়াজ করতে করতে তাদের চলার রাস্তা থেকে তফাত যেতে বলাচ্ছে, আর এই হৈ চৈ হুটগোল ছাপিয়ে নাকে এসে আছড়ে পড়ছে চাপা দুর্গন্ধ মাছের ছানার পচা ঘোষার পেছনের লাইনের ফাঁকে পড়ে থাকা শু বা বমি-র।

নিবিড় নাকে রুমাল চাপা দেবে কি, স্বস্তিতে একটা দাঁড়াবে তার উপায় নেই এখন, পিলপিলিয়ে লোক ঢুকে পড়ছে প্ল্যাটফর্মের গভীরে ট্রেনের কামরায় একটা বসার জায়গা পাবার জন্য শুধু। মানুষ আসছে তো আসতেই — অবিরল প্রবাহ এক, নিবিড় অবাক হবারও সময় পাচ্ছেনা, চলতে হচ্ছে সামনের দিকে শুধু। তবু এই চলার বেগ দারুন নয়, লোকের পর্ব লোক, সামনের জনের পিঠের উপর পেছনের জনের পর্ব, মধ্যে মধ্যে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, তবু এইভাবে মানুষের ওপরে মানুষ, মানুষের পেছনে মানুষ সেই তদন্ত যতদূর সেই শেষ কামরা অবধি — শরীরের সঙ্গে শরীর, চাপের উপর চাপ, উষ্মতার পর উষ্মতা।

তখন মোটর গাড়ির হর্ন শুনে তাজব্ব বনে দেখে — প্ল্যাটফর্মের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে, দু-একটা গাড়ি মধুর অতি মধুরতায় চলে যেতে চাইছে বা খুঁজতে চেষ্টা করছে দাঁড়বার জায়গাটুকু।

কামরা পেরিয়ে ইঞ্জিন ছাড়িয়ে যোরােনা ফটক থেকে বেরিয়ে নিবিড় এসে পড়ছে বিস্তৃত অঞ্চলে এক, কিন্তু এই অঞ্চলের টুটি চেপে ধরছে একের পর এক লোকান — বইয়ের ফস্ট-ফ্লোর ফ্লোরের ফ্লোরের ফ্লোরের, তারি কি মধ্যে মধ্যে আসছে সাবান থেকে প্লাস্টিকের মাখার জন্য, আর নিবিড়রা বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরে এত এত লোক নিয়ে তখন তখন, তখন

অফিসের ফুলের কলেজের ফিরি করার বেলা পেরিয়ে যাচ্ছে কেবলই, ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে, ভুলেপন নেই কারো, যে যার লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান, দাঁড়াবার সময় নেই আর, মধ্যে মধ্যে মেজাজ ঠিক থাকে না তবু।

নিবিড়েরও মেজাজ বিগড়িয়ে যেতে চায়। সে চলছে এই সার ধরে, অথচ হঠাৎ ধাক্কা খিটকে পড়ছে, কোনমতে পড়টা রুখে সামিল হতে চাইছে সারে, তখন আরেকজন নিয়ে নেয় এ জায়গা, দেখে চলতে পারেন না বলার আগেই সেই যাত্রী ডুবে গেছে এ দূরের মাথার মধ্যে যেখান থেকে সে আসছে এখন। বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু করার কি আছে এই মাথার পর মাথার সমুদ্রে, সেই সমুদ্র কোলাহলে ব্যস্তভায়ে ছুটে চলায় মুখের এখন, কেবল তার এক এক উর্মি এগিয়ে যাচ্ছে ফিরে যাচ্ছে অতীতের দিকে তখন।

নিবিড়ও তাই করছে এখন মানুষের গটিরির ভিড়ে চাপে — এই চলমান সোতে, তার মধ্যে প্রাইভেট গাড়ি এবং ট্যাক্সি দূরে লাল ডাকগাড়ি মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনের শব্দ দোকানের নিয়ন-সাইন-বোর্ড মাইকের গোঙানি এবং রেলিভ... অসংখ্য সার সার কখনো কখনো বেস-না মানুষের চলার টানে নিবিড় ঢুকে পড়ছে এক শৌদলের মধ্যে এখন, শিলানের মত শৌদলের ফটক, তার মাথায় লেখা — অনুগ্রহ করিয়া টিকিট দেখান রিজ শো ইওর টিকেট। নিবিড়ের দৃষ্টি চোখ বরাবর থেকে যাচ্ছে বলে সেই এ লেখাটি দেখতে পায়না, ফটক দিয়ে দেখিয়ে যাবার মুহূর্তে একটা কালো হাত তার গতি রোধ করে — টিকিট এই কথাটি কানে গেলে নিবিড় লজ্জা পেয়ে বুক পকেট থেকে টিকিট বের করে যেই প্রসারিত হাতে দেয়, আর তখন টিকিটের টানে দু-একটা খুচরো কাগজ পড়ে যায়, নিবিড় সরি বলে টুকরো কাগজ উঠিয়ে নেবার বদলে শৌদলের গভীরে ঢুকে যায় চাপে। কিছুটা স্টান জমি সেই গুহার, তারপর সিঁড়ি নিচে নামার, নেমে চওড়া গলির মত বাঁধানো রাস্তা, সেই রাস্তার মাথায় আবার সিঁড়ি — উপরে ওঠার।

নিবিড় শৌদলের মধ্যে ঢুকে তরতরিয়ে এগিয়ে যায় যেমন, তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ে তেমন, আর অন্যদের পেছন পেছন যেতে যেতে একটু ফাঁকা পেলে দৃষ্টি উপরে এধার সোবার ঘোরে। সে দেখে ডানদিকের এক কোণে চোখের অন্তরালে প্রায় টিনের বা লোহার হালকা পাতে অস্পষ্ট লেখা — ইয়ুজ সাবওয়ে ফর ক্যাব এন্ড ফেরিঘাট, কিন্তু তার দৃষ্টি ক্যাব এন্ড ফেরিঘাট এড়িয়ে ইয়ুজ সাবওয়েতে ন্যস্ত হয়। আর সাবওয়ে মনে হতে উচ্চলে ওঠে তৎক্ষণাৎ, বাবা তো সাবওয়ের কথাই যেন বলেছিলেন, সে মনে করতে চেষ্টা করে বাবার কথা, আর ভুল যায় বাবা যে সাবওয়ে ধরার কথা বলেছিলেন তাতে কিছুদূর গিয়ে সে দেখতে পাবে তীরচক্র দিয়ে লেখা — ক্যালকাটা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড।

তা মনে পড়ে না আর, সাবওয়ে লেখা দেখতে পেয়ে সে ঠিক রাস্তায় এসেছে বুঝে একটু জোরে পা চালাতে চেষ্টা করে, তখন ভিড় হৈঁচৈ টেনেলেগেলেগে হুজু ইত্যাদির কথা মনে পড়ে না, বরং খুশি হয় এখন, কারণ পেছনের জনশ্রোত যদি চাপে না রাখতো তবে সে ঠিক রাস্তা ধরতে পারতো না এত সহজে।

বাধা কি তাই বলতে চেয়েছিলেন কলকাতার লোকজন খুব কোঅপারেটিভ? সরাসরি না হলেও ভেলিপ্যাসেঞ্জারদের চাপ খড়োখড়ি দৌড়ানো এক মহা উপকার করে দিল এইভাবে,

নইলে সে কি পারতো এ গঞ্জাম থেকে বেরিয়ে আসতে, ভিড়ের শব্দের এ জট বুলতে? আহ! হালকা লাগছে বেশ, প্র্যাটিকরনে মুখ খুবড়ি পড়ে যাবার কথা মনেই পড়ে না আর। বুকের ভার নেমে গেছে এখন, পেছনেও চাপ নেই কোনো। নিবিড় ডানদিকে তাকায় — টিকিট ঘর, টিকিটের জানলা পর পর, ইংরেজিতে লেখা প্র্যাটিকরন টিকেট আর এস. টু বাংলায় প্র্যাটিকরন টিকিট দুই টাকা, আর টিকিট ঘরের মাথায় লেখা — প্র্যাটিকরন টিকেট এন্ড অল সুবাবানু স্টেশন ইত্যাদি...

যাত্রীদের জন্য এক বন্দোবস্ত! দৃশ্যে মন ভরে ওঠে, এজন্যই লোকে কলকাতা আসতে চায়, কলকাতাকে ভালোবাসে। তখন টের পায়না সে হাওড়া স্টেশনের চত্বরে আছে, হাওড়া কলকাতা নয়, কলকাতা ঢোকান দরজা মাত্র। এই সব উত্তেজনা খুশিতে ডগমগ নিবিড় জানেনা যে এই ভুতল রাস্তা তাকে তার ঈদিল জায়গায় পৌঁছে দেবে না, দিতে পারতো যদি সে কলকাতার পথ-ঘাটের অক্সিডেন্ট জানতো, অল্প স্বল্প জানলেও একে ওকে জিজ্ঞেস করে পৌঁছে যেত ঠিক জায়গায়।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে এবার চোখে পড়ে ডান বাঁ দুদিকের দু-টি বোর্ডের উপর। ডানদিকে লেখা ইংরেজিতে — ফেরিঘাট, তার পাশে তীর চিহ্ন নির্দেশ করছে কোনদিকে যেতে হবে, তার নিচে লেখা চাদপাল ঘাট, তার নিচে বাতুর ঘাট। বাঁদিকে সেই ইংরেজি লেখা তীর চিহ্ন দিয়ে — তার নিচে লেখা শোভাবাজার বাগবাজার, তার নিচে কান্দীপুর বরানগর তার নিচে আর্মেনিয়ান ফ্যারলি প্লেস।

এসব নাম তার একেবারেই অজানা, তবে কি সে ভুল জায়গায় এসে পড়লো? পাশ দিয়ে যাওয়া এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে তিনি লেখা যা আছে তাই হুড়হুড়িয়ে আওড়ে গেলেন। নিবিড় জিজ্ঞাসা করার সুযোগটুকুও পেল না যে সে যেখানে যেতে চায়, এই রাস্তা তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে কিনা। কিন্তু কোথায় যাবে সে? দ্রুত পকেট হাতড়াতে থাকে, কয়েকটা একটাকা দুটাকার নোট উঠে আসে। উত্তেজিত হয়ে প্যাটের পকেট শার্টের পকেট হাতড়ায়, নাহু, আর তখন খোলা হয় — সে বাড়ী হাত পা, সূটকেশ নেই, এবং...

সূটকেশ, সূটকেশ, এধার ওধার দেখতে দেখতে ঘুরে দাঁড়ায়, কোথায়, কোথায়? যতদূর দৃষ্টি যায় — নাহু, কোথাও নেই, সাবওয়ে অনেক ফাঁকা, স্পষ্ট দেখা যায় অনেকখানি, সূটকেশের চিহ্ন নেই কোনো। তা হলে? নিবিড়ের বুক কঁপে ওঠে, তবে কি সূটকেশ ছিল না সঙ্গে? নিবিড় মনে করতে চেষ্টা করে — হাঁ, বাবার কথায় সে সাইড ব্যাগ না নিয়ে সূটকেশ বেছে নেয়, ছোট সূটকেশ আটপাশে কেশের নয়। বাবা বলেছিলেন সাইডব্যাগ থেকে কাগজপত্র তুলে নেওয়া যায় চট করে, সহজে কেটে ফেলতে পারে ব্যাগের পেট ব্রুড দিয়ে, তাছাড়া ফেরার টাকা পরস্যা রাখারও অসুবিধে, তাই সে নেয় সূটকেশ, আর খোয়া ভরে দেয় সার্টফিস্টে মার্কশীট দরকারী কাগজপত্র, এক প্রহ্ন ধোয়া শার্ট প্যান্ট, তার নিচে ফেরার ভাড়া ইত্যাদি তাকে দেখিয়ে দেয় — একবারের নাম দু-দুবার খোয়া তাতে দেখিয়ে দেয় যাবতীয় কিছু, আর সে প্রায় বুকের কাছে ধরে রাখে সূটকেশ প্রায় প্রাণভোমরার মত সপাটে।

হাঁ, মনে পড়ছে ট্রেন প্র্যাটিকরনে ঢুকতে থাকলে তখন হাতে ছিল সূটকেশ, তারপর বাঁচকা পুঁটলি মানুষের চাপে এক গোঞ্জাম দরজার মুখে — তখনও হাতে ছিল সূটকেশ,



তারপর মুখ খুবড়ে প্র্যাটিফরমে, উঠতে গিয়ে পারছিল না, তখন একজন তাকে ধরে দাঁড় করায় এবং হাসে, তখন কি ছিল হাতে সূটকেশ? নড়াচড়ে দাঁড়াবার জো ছিল না তখন, পেছনের যাত্রীদের এমন চাপ, তাকে চলতেই হয়। এ হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় নিশ্চয়ই হাত থেকে ছিটকে পড়ে সূটকেশ, মানুষের চাপে খেঁচলে যাবার ভয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাই ছিল তখন একমাত্র লক্ষ্য ও কাজ, ফলে সূটকেশের কথা মনেই আসেনি, আর খাড়া হয়েও টের পায়নি — সূটকেশ নেই, মনেও পড়েনা তা।

নিবিড় ছুঁতে থাকে তখন।

বাঁ হাতের দিকে টিকেট কাউন্টার, প্র্যাটিফরম টিকিট কাটার কথা মনেও পড়ে না আর, সে ফিরে আসতে চাইছে সেই আদি জায়গায় সেই প্র্যাটিফরমে যেখানে পড়ে যায় একসময়...

যে সিঁড়ি বেয়ে নিবিড় নেমে আসে সাব—ওয়েতে, সেই সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে এবার। খোঁদলের স্টান মেঝে পেরিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে ছুঁতে থাকে, ছোটোর কি উপায় আছে, একটুখানি ফাঁকা পেয়েছে, কিন্তু তারপর, যে কে সেই — মানুষ ছোটোর গতি হাটার মত করে দেয়।

কোন প্র্যাটিফরমে নেমেছিল তখন? খেয়াল করেনি, খেয়াল করার দরকার মনে করেনি, বরং বলা যায় খেয়াল করার সুযোগ পায়নি যাত্রীদের নামার তোড়ে। অবশ্য কোন প্র্যাটিফরমে গাড়ি ঢুকছে নিতা যাত্রীদের কাছে সেটা বেশ জরুরি, তারা সেই দরজার দিকে এগিয়ে যায় নামার জন্য, তাদের তাড়া আছে, বাড়তি সময় হাতে নিয়ে আসে না মোটে। কিন্তু যে প্রথম আসছে বা কালেভাত্র একবার এবং যার হাতে সময় আছে, তার কাছে গাড়ি ন' নম্বরে ঢুকলে বা দশ এগারো চার পাঁচ বা অন্য প্র্যাটিফরমে ঢুকলেও তাই। তাছাড়া কেউ কখনো ভাবে কি যে প্র্যাটিফরম ছেড়ে যাচ্ছে — ফিরে আসবে আবার সেখানে একটু পরেই খোঁজ করতে?

নিবিড়ের ভ্রুততা পদে পদে বাধা পাচ্ছে, তাই সে সোজা আসতে পারছে না। আচমকা মানুষের এক একটা চেউ এসে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে সেই রাস্তা থেকে — একটু দূরে আরেক রাস্তায়। সে অবশ্য ঠেলেটুলে চুকে পড়তে চাইছে প্র্যাটিফরমে, আর দৌড়তে চেষ্টা করে।

তখন যাত্রীরা পিল পিল করে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন ধরার জন্য, কামরায় ওঠার জন্য। ঠিক তখনই উল্টো দিকের যাত্রীদের আরেক চেউ আছড়ে পড়ে এক আবার তৈরি করছে তখন, মধ্যে মধ্যে বিকট শব্দ করতে করতে কুঁচুরা দিয়ে চলছে মালবোঝাই টেলা ট্রলি যোগে-ভ্যান বা ভেভারের কামরায় তোলার জন্য। গিজ গিজ করছে লোক, এর মধ্যেই তাকে খুঁজে পেতে হবে সেই জায়গাটি তু...

কিন্তু এই প্র্যাটিফরমেই কি সে নেমেছিল? সব প্র্যাটিফরমের চেহেরাই তো একরকমের। সে দেখে — ধানবাদে যে গাড়িতে চাপে তার রং এখন যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তা থেকে আদালদ, সবুজ হলুদে মোশানো। নিবিড় এগিয়ে য়ে থাকে প্র্যাটিফরমের শেষপ্রান্ত অধি, তারপর ফিরতে থাকে পাশের প্র্যাটিফরমে যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার কিনার খোঁয়ে ঠেলেটুলে ধাক্কা খেতে গেতে খুব...

সূটকেশের চিহ্ন নেই কোথাও, তাই সেই প্র্যাটিফরমের মাথায় এসে ডানদিকে ঘুরে আরেক

এক প্র্যাটিফরমে ঢোকে। একই চাতালের দু-পাশে দুটি প্র্যাটিফরম, চাতাল — তবু তার উপরে আচ্ছাদন আছে আজবেদসের, আছে পান-সিঞ্চেট চায়ের লোকান, মেঝের প্রাস্টিকিটি বিছিয়ে নানা খেলনাপাতি এবং দু-একজন হকার নিজের শরীরকে করে তুলেছে সেকান সেন্টপিন চিক্রনী চাবির রিং ইত্যাদি খুলিয়ে খুলিয়ে। আর প্র্যাটিফরম ভরে আছে মাল-পত্র নিয়ে যাত্রী কুলি — বিদায় জানাতে আসা বন্ধ বান্ধব আত্মীয়স্বজন ইত্যাদিতে।

এত মানুষ? সূটকেশ খুঁজতে খুঁজতে অবাক হয়ে যাচ্ছে নিবিড়। এত লোক কলকাতা আসে, এত লোক চলে যায়। একে একজন প্রায় ধরাশায়ী করে হৈ-হৈ করতে করতে কয়েকজন যাত্রী কামরার গহ্বরে হারিয়ে যায়। নিবিড় টাল সামলাতে সামলাতে এসেছে আবার। পেছন থেকে চাপ আসছে, হঠাৎ হঠাৎ উল্টো দিক থেকে ছুটে আসা মানুষ সব তার ঘাড়ে পড়তে পড়তে উধাও হয়ে যাচ্ছে কোথায়।

নিবিড় এ প্র্যাটিফরমে খোঁজ শেষ করে পাশেরটার খুঁজতে শুরু করেছে। সে গাড়ির দিকে নজর দেবে, না, প্র্যাটিফরমের দিকে? দৃষ্টি নত হলেও সেই ফাঁকা জায়গা পায়না, যেখানে থাকতে পারে সূটকেশ। কোথায় পাবে সূটকেশ তবে, এভাবে খুঁজলে কোনোদিনই পাবেনা তা, তখন একজন যাবি-উর্দি পাত্র লোক দেখে পুলিশের কথা মনে হয়। তাই তো পুলিশকে বললে, সে ভ্রুত এ লোকটিকে দেখতে পায়না, আর হুড়হুড়িয়ে বলতে থাকে সব কথা। উর্দিপরা লোকটি অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে, তখন নিবিড়ের ভুল ভাঙে। সে বুঝতে পারে — এই মানুষটি পুলিশে কাজ করে না, কোনো কোম্পানীর গার্ড মাত্র, তবে তার কাছে জানতে পারে — টেশনেই পুলিশ অ্যাসিস্টেন্ট বুথ আছে, কিন্তু কোথায় আছে সে জানে না। আর নিবিড় কোথাও একজন পুলিশকে দেখতে পায়না। অতএব হাঁটতে থাকে, এবং আরেকটা প্র্যাটিফরমে চুকে পড়ে — সেখানেও সেই একই অবস্থা, মানুষের পর মানুষ, হৈ চৈ, ঠেলাঠেলি, ভেভারের উৎপাত, ইঞ্জিনের হুইসেল এবং...

সূটকেশ নেই কোথাও...

নিবিড় পা বাড়াতে গিয়ে থামে, এখন ক-টা বাজে, একটার সময় ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউ দিতে হবে, চাকরি...

এতক্ষণে ইন্টারভিউয়ের কথা মনে পড়ে, আর সে অস্থির হয় — ইন্টারভিউ-এ যেতে হবে, সে এইজন্য এসেছে কলকাতায়, কিন্তু ক-টা বাজে? যেতে যেতে একজনকে জিজ্ঞেস করলে সন্কেল বোঝে কানে যেতে নিবিড়ের সমস্ত গিলা উপশ্রী উত্তেজনা ফুলে ফুলে ওঠে, আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছতে হবে সেখানে, তার আগে তো ফিফটিফ হতে হবে ওয়েটিং রুমে গিয়ে। চঞ্চল হয়ে ওয়েটিং রুম কোনদিকে জানার জন্য এদিক ওদিক তাকায়, কে একজন এ দিকে বললে সে এ লোকটির নির্দেশিত দিকে তাকাতো গিয়ে অবাক হয়ে যায়, যেন সেইমাত্র সে আবিষ্কার করেছে — সূটকেশ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শরীর হিম হয়ে যেতে থাকে, তবু আর আধঘন্টা মাত্র, ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে, একটায় ইন্টারভিউ মনে হতে — কোথায় ইন্টারভিউ এই প্রশ্নটি তার পা-কে একেবারে জমট করে দেয় এ জায়গায়, তাই তো, এবং প্রায় স্বয়চ্ছালিত যন্ত্রের মত তার হাত তখন তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে শাট প্যান্টের যাবতীয় পকেটে — জামিয়া আন্ডার উয়্যারের

ফাঁকে গেঞ্জির মধ্যে এমন কি জুতোয়। কোথাও পায়না সেই স্থানের হৃদিস, বড়মামার সেই অমোঘ টেলিগ্রাম—

টেলিগ্রামে জানান হয়েছিল — ২৬-এ ইন্টারভিউ বেলা একটার, আর তো কিছু লেখা ছিলনা তাতে। তবে কি মামা ভেবেছিলেন আগে সে যাবে তাঁর কাছে, তারপর তিনি নিয়ে যাবেন নিবিড়কে নিয়ে অফিসে। তিনি নিশ্চয় ধরে নিয়েছেন নিবিড়তা তাঁর ঠিকানা জানে, আর জানবেই বা না কেন, বড়মামার সঙ্গে মা-র যোগাযোগ আছেই চিঠির মাধ্যমে, তাছাড়া নিবিড় ফর্ম ভর্তি করে বড়মামার ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি করে পাঠান। তাই অফিসের ঠিকানা টুকতে ভুলে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই, বড়মামার ঠিকানা তো জানাই, বড়মামার সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সব সমস্যার সুরাহা হবে, তিনি হয়ত ইন্টারভিউটা ম্যানেজ করে দেবেন দেরি করে গেলেও।

কিন্তু বড়মামা থাকেন কোথায়? তার ঠিকানা...

নিবিড় মনে করতে চেষ্টা করেও খেয়া নিশ্চয়ই ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিল, আর সে টুকরো কাগজটা পকেটেই রাখে — হাঁ হাঁ মনে পড়ছে কলকাতার ভাড়া প্রাস কিছু খুঁচুরা টাকাও বুক পকেটেই রাখে এবং দেখেও নেয় আবার করে।

নিবিড় বুক পকেটে হাত ঢালায়, বুক পকেট ফাঁকা। তবে কি খেয়া মামার ঠিকানাটা সূটকেসে ঢুকিয়ে দেয়, সে শুধু কলকাতার আসার ভাড়া প্রাস কিছু বাড়তি টাকা রেখে দেয় পকেটে? ধানবাংদে টিকিট কাটার সময়েও তো কিছু কাগজপত্র ছিল পকেটে কিন্তু এখন?

সে মনে করতে চেষ্টা করে বড়মামার ঠিকানা তবু, হাঁ হাঁ এস. এন. যোগ্য রোড মনে হতেই শংশয় জাগে, না না বোধহয় এস.এন.রায় রোড, নাকি এস.এন.বানার্জি রোড। নিবিড় মাথা খুঁড়ছে, ক্যালকাটা লিখে .... পিন নম্বর লেখে — সাতলক কত কত, মনে করতে পারছে না, কখনো মনে হচ্ছে সাতলক দশ কখনো বারো কখনো বা সাতলক একষটি... মামার নিশ্চয়ই ফোন আছে, সেই নম্বরটা... খেয়া কি টুক্রে দিয়েছিল ফোন নম্বরটা? সেটা মনেও তো ... মন লাফিয়ে ওঠে। সে প্যাট শার্টের পকেট উল্টে পাল্টে দেখতে থাকে, এতক্ষণে একটা চিরকুট পায়। চার ভাঁজ করা চিরকুট, উত্তেজনার হাত কাঁপে, খুলতে গিয়ে ছিড়ে যায় খানিকটা। এ অবস্থায় খুলতে গেলে ছিড়ে ফেলবে আরও, নিবিড় নিজেকে শাস্ত করতে চায়—

সব সুখ লিঁছে তুমহারি সবনা।/তুম রক্ষক কাছ কো ভর না।/ আপন তেজ সম্ভারো আপো।/তানো লোক হাঁকতে কাঁপে। আওড়াতে থাকে শ্রী হনুমান ছাটীসা, ভাতে শরীরের শিরা সব ঠান্ডা হয়ে আসে, তখন সে চিরকুটটা সটান মেলে ধরে চোখের সামনে। একটা রসিদ পোস্টাফিসের যেন, কালো সীলের খানিকটা আছে সেখানে, খুঁশিতে উছলে ওঠে — বড়মামাকে রেজিষ্ট্রি করে ফরম পাঠায় — এটা হচ্ছে তার রসিদ। এখানে লেখা থাকবে বড়মামার নাম আর ঠিকানা, সংক্ষেপে থাকলেও তা থেকে বের করে নিতে পারবে, আর তখন — পাওয়ার আনন্দে চোখ চকচক করে ওঠে। কিন্তু রসিদের একটা বর্ণও পড়া যাচ্ছে না এমন দুমড়ে মুচড়ে গেছে সেটা, কেবল সি আর এল কোলমাত উদ্ধার করতে পারে। নানাভাবে উলটে পাল্টে চিরকুটটা ধরেও বের বেশি কিছু বের করতে পারেনা। ফলে রাগ

হয় আর সেই রাগের টানে আবার চলতে শুরু করে। কি করবে এখন তবে? চলতে চলতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার খুঁজে পাচ্ছে নিজেকে, এইভাবে এইভাবে পৌঁছে যাচ্ছে আদি হাওড়া স্টেশনের শেষ প্ল্যাটফরমে — সামনে ওভার ব্রিজ, সে ঘাড় উচিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, নজরে পড়ে তীরচিহ্ন — ওয়ে টু প্ল্যাটফরম নম্বর এইটিন টু ট্রোয়েনটিওয়ান।

বাবা আঠারো একশ ইত্যাাদি নম্বর কি বলেছিলেন? নিবিড় মনে করতে চেষ্টা করে, ওভার ব্রিজের কথা তা বলেননি, বলেছিলেন সাবওয়ের কথা, তাহলে? নিবিড় বুঝতে পারে, ওদিকে গিয়ে কোনও লাভ নেই, আর সে তেমন প্ল্যাটফরমে নামেনি ট্রেন থেকে। অতএব ফিরতে থাকে পেরিয়ে পেরিয়ে তেরো বারো এগারো দশ পর পর প্ল্যাটফরম, আর আওড়াতে থাকে—

কোন সো সঙ্কট মোর গরীব কো।/ জো তুমসো নই জাত হৈ টারো।। বেগি হয়ে হনুমান মহাপ্রভু।/ জো কুছ সঙ্কট হোয় হমারো।। আর এসে পড়ে এক ফটকের কাছে, দেখে একজন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে। এ ভাবে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন কৌতূহল বোধ করে এগিয়ে আসে তার দিকে। প্ল্যাকার্ডে লেখা — ফর নিবিড়কৃষ্ণ ফরম লোদনা... বিশ্বাস করতে পারে না, নিশ্চয়ই ভুল দেখছে সে, তাই চোখ রগড়ে কয়েকবার চোখ বন্ধ করে খুলে পরখ করতে চায়, হাঁ তারই মনে।

নিবিড় দ্রুত সরে আসে এ প্ল্যাকার্ডধারীর কাছে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি নিবিড়কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করছেন?

হাঁ

আমি নিবিড়কৃষ্ণ

আপনি? তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠে স্বাভাবিক হয়, ফরম লোদনা?

হাঁ, এ কোলফিস্তে—

প্ল্যাকার্ডের কাগজটা ছিড়ে লাভাটা এতটুকু করে নেয় সে, তারপর নিবিড়ের দিকে তাকিয়ে হাসে, সোয়েব পাঠিয়েছেন আমাকে

সোয়েব?

হাঁ বললেন, ভায়ে আসছে কোলফিস্তে, ওকে রিসিভ করে সোজা নিয়ে যেও এল এন্ড এস অফিসে, একটায় ইন্টারভিউ...

কিন্তু এখন তো একটা বেজে গেছে

কি বলছেন আপনি? সে অবাক হয়ে তার হাতঘড়ি দেখে, সবে তো দশটা পঞ্চাশ, কোলফিস্ত লেট করেছে সতেরো মিনিট আর আপনার লেগেছে তিন মিনিট এখানে আসতে!

একটা বাজেনি তাহলে? সে অবাক হয়ে বিড়বিড় করতে থাকে, আমি তাহলে এতক্ষণ কি করছিলাম? আমার সূটকেসেটাই বা...

জ্বলোক হাতঘড়ি তুলে ধরে নিবিড়ের সামনে, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো, যথেষ্ট সময় আছে তবু আমরা এখনি রওনা দেবো, আসুন আসুন, আগে যাবো ভালাে বুখলেন না, টেনশন হবে না, ভদ্রলোকের তর সয় না, চলুন চলুন।

নিবিড় তাকে অনুসরণ করে।



তারা গেট পেরিয়ে দু-একটা দোকান পাশে রেখে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। নিবিড় বৃক্ষতে পারে এবার সে সাবওয়েতে নামছে। বাবা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমন — আরো চিহ্ন ক্যালকাটা বাসস্ট্যাণ্ড, হাওড়া বাসস্ট্যাণ্ড। ভদ্রলোক তাকে কলকাতা বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে নিয়ে চলেছেন, তারপর একের পর এক বাসের জঙ্গল ও দঙ্গল পেরিয়ে তারা উঠে পড়ে খয়েরি রঙের ছোট বাসে। আর অবাক কাণ্ড তারা বসতেই বাস চলাতে শুরু করে লোকের বাসের প্রাইভেট কারের টায়ারি ঠেলার বাহ ভেদ করতে করতে তখন।

আগুন তো এই প্রথম কলকাতায় : নিবিড়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বলে চলে, আমরা পুরনো হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছি, আরেকটা ব্রিজও হয়েছে, সে এক অপর ব্রিজ, তিনি হাত তুলে নিচে প্রবাহিত গঙ্গাকে নমস্কার করলেন, আমরা এখন ফাইওভার দিয়ে যাচ্ছি, নিচেও রাস্তা আছে, কি যে জাম্বু হতো মশাই আগে, তিনি চোখ বুজে সেই জটের দৃশ্য ভাবলেন বোধহয়; ঐ যে চার্চ — খুব পুরনো। গির্জা কলকাতার, ঐ যে রাইটার্স... ভদ্রলোক সমানে বকে চলেছেন, আর নিবিড় যানবাহন মানুষ বাড়ির সমুদ্রে পাড়ি দিতে দিতে চলেছে কোথায়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশ-ছোয়া বাড়ির গোটিটা দেখতে চায়, এত উঁচু, এ যে আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে, ঐ উপরে যারা থাকে, নিবিড় ভাবতে পারছে না কিছুতেই অত উপরে কি করে থাকতে পারে মানুষ।

অথচ সে ঢুকে পড়ছে দশতলার একটা ঘরে ইন্টারভিউ দেবার জন্য তখন। তার সামনে এক দুই তিন চার... কত কত জন বসে আছেন। ইন্টারভিউ নেবার জন্য তৈরী হয়ে, আর নিবিড় বসতে না বসতেই শুরু হয়ে যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন : আপনার নাম বাবার নাম লেদনার ল্যাটিটিউড কত কোকিং কোল কি টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট কে পেয়েছে এসটিভি আই এসডি কি — ট্রাম কিসে চলে... যেমন ঝড়ের বেগে প্রশ্ন হয়ে চলে তেমন ঝড়ের বেগে উত্তর দিয়ে চলে নিবিড়।

বিলগেট কে এ ব্রিফ হিষ্ট্রি অভ টাইম কার লেখা ফ্রাঙ্ক ওরেল কেন বিখ্যাত টিম্বাকটু কি...

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তরের পর উত্তর। এবং হঠাৎ নিমন্ত্রণ হয়ে যায় ঘর, থেমে যায় চরচার যেন — কোনো শব্দ নেই কোথাও, নিবাত নিম্নশব্দ এই ঘর বাইরের কলকাতা। সেই স্তব্ধতার ভিতর থেকে যোঁবাত হল —

জ্যেন ইমিডিয়েটলি শার্প টু-ডে বিমের অফটারনুন...

আচমকা খুশির বন্যায় লাফিয়ে উঠতে ভুলে গেল নিবিড়, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কিছু বলতে গেলে গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হয় মাত্র

সেই শ্লেষ্মা জড়াণো শব্দ যে মাইকের, এতক্ষণ টের পাচ্ছে নিবিড় প্র্যাটফরমের এক কোণে দাড়িয়ে ভিড়ের হেঁচ-র মধ্যে তবু

তবে কি সে যায় নি সেখানে? প্র্যাকটিভ হাতে ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া, বাসে ওঠা, সেই ঘর, ইন্টারভিউ, একের পর এক প্রশ্ন, মধ্যমণির সেই যোগশ গ্যেন ইমিডিয়েটলি...

এসব তো এখনি যাঁটে গেল, নাকি... নিবিড় অবিশ্বাস করতে পারছে না এই সব ঘটনা, এতক্ষণ তবে কোথায় ছিল সে? কো-থা-য়—

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় প্র্যাটফরমের ভিড় চিৎকার ধ্বস্তাধরিত দুর্গন্ধ-র বিচিত্র রৌরবে। খোয়াল হতে দেখে — সামনে বাইরে যাবার গেট, সেই গেটে কালো কোট পরা কে একজন দাড়িয়ে আছে — বুক-খোলা কোটের ভিতর থেকে শার্টের সাদা অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কে এই ব্যক্তি? হয়,

নিবিড়ের বুক ধক করে ওঠে।

ঝটিতি দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। দৃষ্টি গিয়ে পড়ে আরেক গেটে — সেখানেও দাড়িয়ে আছে কালো কোট পরা একজন, খোলা বুক দেখা যাচ্ছে সাদা শার্ট।

দৃষ্টি সরায় আবার, পড়ে আরেক গেটে — সেখানেও...

আরও আরও গেটে, সেখানেও দাড়িয়ে আছে কালো কোট পরা এক একজন, আর গেটে

ঝুলাচ্ছে — অনুগ্রহ করিয়া টিকিট দেখান প্লিজ শো ইওর টিকেট

এবং নিবিড়ের টিকিট নেই, তাহলে?

বেরুতে পারবে কি সে? বুক কাপতে থাকে

যদি ঐ কালো কোট পরা লোকটা একটা আনমনা হয়, সরে দাঁড়ায়, বা কারোর সঙ্গে গল্প করে, বা দাড়িয়ে থাকতে থাকতে একটু ঝিমোয় বা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দৃষ্টি নিগ্ন হয় কাপে, তবে সে টুক করে গলে যাবে গেট দিয়ে, বেরিয়ে আসবে বাইরে, তখন, আহ!

কিন্তু কোথায় যাবে সে?

নিবিড় অসহায় হয়ে দেখতে থাকে চারধার এখন...





হয় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হলে তাদেরও তেমনই হবে এমন দাবি করা যায় না। কারণ, দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং ধর্মীয় সমাজের গঠনের অনেক তারতম্য আছে। এসবের খুঁটিনাটি আলোচনার মধ্যে না গিয়ে একটি মূল প্রশ্নকে সামনে রেখে এগোন যেতে পারো।

প্রশ্নটা হল, ধর্মের সেকুলারাইজেশন ভারত এবং বাংলাদেশে কোথায় কতটা হয়েছে?

অনেকেই হয়ত জানতে চাইবেন, ধর্মের আবার সেকুলারাইজেশন কি? নতুনত, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যা সম্পর্কে যারা কিছুটা ওয়াকিলবাহার তাঁরাই জানেন, ধর্ম জিনিটটাও ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার বিচার বিশ্লেষণের বিষয় বস্তু। আমি অশ্রদ্ধা প্রকাশ্যে করে অত একাডেমিক স্তরে নিয়ে যেতে চাইছি না। এক্ষেত্রে সেকুলারাইজেশন বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, রাষ্ট্র থেকে তো বটেই, ধর্মকে তার নিজস্ব ইনস্টিটিউশনের গণ্ডি থেকেও বের করে এনে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিচার বুদ্ধি এবং উপলব্ধির বিষয় বস্তু করে তোলা। অর্থাৎ ব্যক্তি ধর্মকে অস্বীকার না করলেও কোনও ধর্মীয় ইনস্টিটিউশনের আধিপত্য মানবে না। ধর্মগ্রন্থে কোনও কিছু লেখা থাকলেও তা যদি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবকল্যাণের পরিপন্থী হয়ে পড়ে তবে ধর্মগ্রন্থের সেই বাণীকেও অগ্রাহ্য করার হিম্মত ব্যক্তি রাখবে। যা কিছু পবিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে, সে সবের তাৎপর্য সে নিজের বুদ্ধি বিচার এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে তারপর গ্রহণ কিংবা বর্জন করবে। একে ধর্মবিশ্বাসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বলা যায়।

স্যার সৈয়দ আহমদ, কবি মহম্মদ ইকবাল, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ আধুনিক মনের মানুষেরা ধর্মকে বর্জন করেননি। কিন্তু যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যও তাদের ছিল না। ধর্মকে তাঁরা এমন আপন সৃজনশীল ব্যাখ্যার দ্বারা যুগোপযোগী করে পুনর্নির্মাণ করে নিতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই গোড়া মৌলবাদীরা তাদের পছন্দ করেননি। তাঁদের অপরাধ, আধুনিক সময়ে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কাছে যেমন প্রত্যাশিত সেইভাবেই তারা ধর্ম এবং বিশ্বাসের বিরোধকে মিটিয়ে ফেলার প্রয়াসে ধর্মীয় ধ্যান ধারণাগুলির পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন।

ধর্মের এইরকম সৃজনশীল ব্যাখ্যাটা হিসাবে প্রকৃতিসম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধর্ম বিষয়ে তাঁর স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যৌর্য একটি গভীর ভাবে পরিচিত তাঁদের নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে আপাত দৃষ্টিতে অনেক বেশি গোড়া ধর্মিক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তিনিও ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। অন্ধবিশ্বাস তাঁর একেবারেই ছিলনা এমন কথা হিন্দুতে বলা যায় না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রক্ষেপে তিনি ছিলেন আপোষহীন। মানুষের দ্বারা মানুষের প্রতি অবচার কিংবা অত্যাচারের প্রক্ষেপে কোনও রকম ধর্মীয় অজুহাতকে বরাদ্দ রাখতে তিনি সম্মত ছিলেন না। এসব ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি বিচার ছিল পুরোপুরি মানবতাবাদী। সেই যুক্তি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলোও তিনি পরোয়া করতেন না। তখন তিনি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি থেকে এমন এক ধর্মের কথা বলতেন তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কোনও মিল কেউ খুঁজে পেত না। এই ধরনের ধর্মবিচারকেও আপেক্ষিক অর্থে ধর্মের সেকুলারাইজেশন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তির আপন উপলব্ধির ধর্ম আর ইনস্টিটিউশনাল বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ভারতে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও ধর্ম

নিয়ে এরকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণার কিছুটা প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। নাস্তিকদের কথা অবশ্য একেবারেই স্বতন্ত্র তাঁদের সংখ্যা এদেশে নিতান্তই মুষ্টিমেয়। বেশির ভাগ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাসের ভিত্তি হল ধর্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ সৃজনশীল ব্যাখ্যা।

বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের সম্পর্কে কি একই কথা বলা যায়? অন্তত তাঁদের ভেতর একটা উল্লেখযোগ্য অংশও কি তাঁদের ধর্মীয় চেতনাকে গাভানুগতিক অন্ধবিশ্বাসের গজালিকা প্রবাহের, বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে? বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কারণ ইসলাম ধর্ম এতটাই সমগ্রিকেন্দ্রিক, এক ধরনের রেজিমেন্টেশন এই ধর্মে এতটাই বেশি যে এই ধর্মের অনুসারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হওয়া খুবই কঠিন। মুসলমান সমাজে ধর্মের সৃজনশীল ব্যাখ্যা করা মানেই নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। ফলে বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগই ধর্মকে ব্যাপারে নিরব থাকেন। সমাজে সবার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে হবে এই অজুহাতে বিভিন্ন উপলক্ষে নানারকম অর্থহীন আচরণে নিজেদের সামিল করে ধর্মীয় সমাজের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। ব্যতিক্রম যারা আছে নতুনত তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ব্যতিক্রম ঘাঁড়ের হওয়ার কথা ছিল সেই মার্কসবাদীরাই সম্ভবত সবচেয়ে আপোষমুখী। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে কিংবা ভোটাভাবাদের সমর্থন খোঁয়ানোর আশঙ্কায় তাঁদের বেশির ভাগই এমন আচরণ করতেন তাতে কখনো কখনো মনে হতে পারে যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোথায় কোনও দ্বন্দ্ব আছে? অন্তত পশ্চিমদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এরকমই মনে হয়েছে। একে এক ধরনের ভণ্ডামি ছাড়া আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। কেবলমাত্র ‘মুসলমান’ মার্কসবাদীদের সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ ঢালাও ভাবে করলে সম্ভবত সত্যের অপলপ হয়ে।

আলোচনার এই অংশে জোর দিতে চাই বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ওপর। আমরা কোন মনে মনে হয় নিতাদের জীবনযাত্রায় ধর্ম সম্পর্কে তাঁরা এতটাই ভণ্ডামিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এ নিয়ে তাঁদের মনে আর কোনও প্রশ্নও জাগে না। শুধু বাংলাদেশেই বা কেন, সারা পৃথিবীতেই মুসলমানরা যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানে তো বটেই যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানেও এই অবস্থা। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণার খুবই অভাব। সর্বত্রই সামগ্রিক ধর্মীয় জবরপন্থির কাছে আত্মসমর্পণের ছবি। ধর্মকে অস্বীকার না করেও ব্যক্তির নিজস্ব বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী ধর্মের সৃজনশীল ব্যাখ্যার ধারাটি মুসলমান সমাজে কখনোই প্রাবল্য লাভ করে না। ফলে ধর্মীয় মৌলবাদীরা হচ্ছেন মতো গোঁড়ামির প্রচার চালিয়ে, অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বলেও দিবি পার পেয়ে যান। সমাজে তাঁদেরই প্রাধান্য বজায় থাকে।

ধর্মীয় মৌলবাদীদের এই প্রাধান্য বজায় থাকার কারণ দেশের তরুণ প্রজন্ম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের তরফে কোনও নেতৃত্ব পায় না। তারা বুঝতেই পারে না ধর্মকে জীবনে অস্বীকার না করেও, আল্লাহ প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখেও কিভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠা

যায়, কিভাবে ধর্মীয় অদ্বিধ্বাসের উর্ধ্বে উঠে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি বিচারকে আশ্রয় করা যায়। এসব ক্ষেত্রে অতীতের মনীষীদের অবদানও তাদের সামনে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করার মতো কাউকে তারা খুঁজে পায় না। যদিও এক্ষেত্রে কেবলমাত্র অতীতের মনীষীদের অবদান ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আরও বেশি সৃজনশীল ব্যাখ্যার। কারণ ধর্মীয় মৌলবাদীরা এক জায়গায় স্থির (নেই)। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবিচারকে নানারকম কুযুক্তির আচরণে আশ্রয় করার কাজে তারাও অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এসব কুযুক্তির কারণ ছিল করে ধর্মকে তার যথার্থ সম্মোহনযোগ্য রূপ এবং মর্যাদা দেওয়ার কথা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের। বস্তুজগৎ বহির্ভূত অলৌকিক কোনও সত্তার অস্তিত্বকে বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত স্বীকার কিংবা অস্বীকার কোনওটাই করতে পারেনি। ফলে অতি বড় যুক্তিবাদীর পক্ষেও আল্লাহ অস্তিত্ব অস্বীকার করার কিছু নেই। ব্যক্তিগতভাবে কারও যুক্তিবিচারের প্রবণতা নাট্যিকের দিকে হলে অবশ্য আপত্তি করার-ও কিছু নেই।

কিন্তু দেশের তরুণদের চিন্তাভাবনাকে ব্যক্তিগতাত্মবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবিচারের পথে চালাতে চাইলে আল্লাহ অস্তিত্ব অস্বীকার করার পথে সেটা সম্ভব নয়। কারণ, সে কাজে বৈজ্ঞানিক যুক্তির কোনও সুনিশ্চিত প্রত্যয় তাদের দেওয়া যাবে না। এমনকি ধর্মকেও অস্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নেই। ধর্মের মধ্যে, বিশেষ করে পবিত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে যা সম্পদ আছে তার দ্বারা এখনও আশেষ মানবজগৎ সাধন।

সেই সম্পদকে উদ্ধার করতে হবে অদ্বিধ্বাসীদের এবং মতলববাজদের কবল থেকে। ব্যাখ্যা করতে হবে সম্পূর্ণ মানবতাবাদী, ধর্মতত্ত্বভিত্তিক যুক্তিবিচারের নিরিখে। এই ব্যাখ্যা ব্যক্তির বুদ্ধি, বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। সেই কারণেই এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে ধর্মের ব্যক্তিগতাত্মকতা। আগেই বলেছি এ একধরনের সেকুলারাইজেশন-ও' বটে। এ ক্ষেত্রে এই সেকুলারাইজেশন প্রক্রিয়াটির ব্যাপ্তির মধ্যে রাষ্ট্র থেকে ধর্মের বিচ্ছেদ ছাড়াও চিরায়ত ধর্মীয় ইনস্টিটিউশনগুলি থেকেও ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজটি অতিরিক্ত হিসাবে যোগ্য হচ্ছে।

এ ধরনের সেকুলারাইজেশনের প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের অনেক কিছুই বর্জন করা ছাড়া উপায় থাকে না। বিশেষ করে সমষ্টিগত ধর্মচারণগুলির প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে যে কোনও ব্যক্তিবাদী সৃজনশীল ধর্মীয় ব্যাখ্যা মুসলমান সমাজে বিরোধাত্মক হয়ে উঠতে বাধ্য। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সামাজিক জীবনে এই বিরোধাত্মক সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

এই বিরোধে একদিন বাংলায় গুরু করেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হাসনাতের মতো মানুষেরা। 'শিখা' পত্রিকাসম্প্রদিক গোষ্ঠীতে তারা অনেকেই ছিলেন। ধর্মের ব্যক্তিবাদীরা ব্যাখ্যার জন্য তখনকার সমাজে তাঁদের শান্তিও পেতে হয়েছিল। তখন বিরুদ্ধতা ছিল অনেক বেশি প্রবল। তাছাড়া মুসলমানরা তখন অবিভক্ত ভারতের সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু অবস্থানে ছিলেন। আধুনিক শিক্ষা, চাকরি-বাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর হিন্দুদের সমৃদ্ধি এবং প্রতিপত্তি মুসলমানদের স্বাধীনতা অন্য রকম সমস্যারোধের

প্রাবল্য এনেছিল। তাই আত্মতৃপ্তির কাজ তাঁদের বিশেষ এগোয় নি।

কিন্তু বাংলাদেশে এখন তো আর সেই সমস্যা নেই। এখন আত্মওদ্ধিতে বাধা কোথায়? এখন শিখা-গোষ্ঠীর প্রবর্তিত ধর্মের সৃজনশীল যুগোপযোগী ব্যাখ্যার ধারা কেন প্রাবল্য লাভ করেছে না? কেন বাংলাদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা তরুণ প্রজন্মকে ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিবাদীরা হয়ে ওঠার আহ্বান জানানো এবং সেই প্রক্রিয়ায় ব্যাধা করার জন্য তৎপর হবেন না? একাজে তারা যদি অবলোকা করেন ধর্মীয় ব্যাখ্যার অনুসন্ধান স্তর প্রজন্ম মৌলবাদীদের খপ্পরে পড়বেই। ফলে অদ্বিধ্বাসকেই তারা জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করবে। এ অবস্থা যদিদিন চলবে সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে এদেশকে অত্যন্ত উপর-কাঠামো স্তরে আপেক্ষিক অর্থেও মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

আদর্শগত ক্ষেত্রে দেশের তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশকে যদি অদ্বিধ্বাস মুক্ত করা যায়, তাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদীরা যুক্তিবিচারের যদি প্রাবল্য সৃষ্টি করা যায়, তাহলে ধর্মের সেকুলারাইজেশন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির বিকাশ যে ত্বরান্বিত হবে এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটলে সহনশীলতাও বাড়বে। ফলে হিন্দু-মুসলমান গৌণ দ্বন্দ্বের তীব্রতা অনেক কমে যাবে। এমনকি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও পবিত্র ধর্ম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজে অনেক নিরাপদ বোধ করবেন। হয়তো উদ্ভাস্ত চাকমাও তখন স্বভূমিতে আর বিপন্ন বোধ করবেন না।

কিন্তু ধর্মের সেকুলারাইজেশন হলেই, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটলেই সাম্প্রদায়িক সংকটের সমাধান হয়ে যাবে, এমন দাবি অবশ্য করা যায় না। কারণ তারপরেও ধনবাদী সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শোষণ থাকবে। সেই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ের মূল দ্বন্দ্বকে আজাদ করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার গৌণ দ্বন্দ্বটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হবে। রাজনৈতিক দলগুলি যেটা বাগানোর তাগিদেও এই গৌণ দ্বন্দ্বটিকে ব্যবহার করতে চাইবে। এমনকি সমাজবিরাগীরাও সেই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে চাইবে। ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ততদিন কিছু না কিছু পরিমাণে থেকেই যাবে যদিদিন না ধনবাদী সমাজের মূলোৎপাটন সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সুপার-স্টারকার বা উপর-কাঠামোতে যদি ধর্ম সেকুলারাইজেশনের ধারাটি প্রাবল্য লাভ করে তাহলে কথায় কথায় দ্বন্দ্ব লাগানো, সংখ্যালঘুদের বিপন্ন করে তোলা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ, অদ্বিধ্বাস কিংবা ভ্রান্ত ধারণার ব্যাড়াবাড়ি না থাকায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ শক্তি তখন সমাজে প্রাবল্য লাভ করবে।

তাই একথা বলেই আমি আলোনা শেষ করতে চাই, বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসুন ধর্মের সেকুলারাইজেশনের কাজে তরুণ প্রজন্মকে দীক্ষা দিন এই সেকুলারাইজেশনের মন্ত্রে। শিখা-গোষ্ঠী দেখিয়ে গেছেন এই সেকুলারাইজেশনের প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে। এখন অবশ্য তাঁদের অন্ধ অনুসরণে কাজ হবে না। সেই প্রক্রিয়ায় সফল করতে হলে চাই আরও যুগোপযোগী সৃজনশীল ব্যাখ্যা। তরুণ প্রজন্ম সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের অপেক্ষায় আছে।

ধর্মের এই সেকুলারাইজেশনের প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকায় না থেকে



বাংলাদেশের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদেরও এতে সামিল হতে হবে। আমি যতদূর জানি, বাংলাদেশে তাদের সমাজ ভারতের মুসলমান সমাজের মতোই রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতার মূলে আছে মাইনরিটি মেন্টাল কমপ্লেক্স বা সংখ্যালঘুসুলভ মানসিক জটিলতা। তার থেকেও আশঙ্কার কথা, শোনা যায় বাংলাদেশের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগই নাকি ইণ্ডিয়ার দিকে এক পা বাড়িয়ে আছেন। কেবল সুযোগের অপেক্ষা। এরকম পরিস্থিতি কোনও মতেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাদেরও লড়িয়ে মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে টিকে থাকতে হবে। তাদের ছাড়তে হবে পল্যারনীয় মনোবৃত্তি। সংখ্যাগুরু সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যদি ধর্মের সেকুলারাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেন, সংখ্যালঘুরাও স্ব স্ব সমাজে সেই প্রক্রিয়ায় সামিল হবেন, এটাই অভিপ্রেত।

## বৈকুণ্ঠের কোটাল

গল্প

সুনীল দাশ

।। এক ।।

ভালবাসা তো এ ভাবেই থাকে।

বৈষ্ণেয় থাকার স্বাদ, এর আগে কোনদিন, এভাবে তো সে পায়নি। এভাবে সূর্যাস্তের অপেক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত গুণে চলেনি এমন আকুলতায়।

এই যে সন্ধ্যা হওয়ার জন্যে মনপ্রাণ নিয়ে বসে থাকা। একেবারে তৈরী হয়ে থাকা। সন্ধ্যার বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, বাড়িতে বাড়িতে তুলসীমঞ্চের সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার সময়টায় ঘরে ঘরে শাঁক বাজিয়ে দিচ্ছে যখন সবাই, তখনই শ্রীবাসের ঘরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে দেয় হরিদাস।

এই টানটা— এই সবাই মিলে খোল করতাল বাজিয়ে, গান করার টানটা ভেতর থেকে কেন যে এতো প্রবল হয়ে ওঠে, সেটা জানা নেই তার। কিন্তু এই নগর নবদ্বীপের শ্রীবাসের ঘরে বাইরের দিকের কপট বন্ধ করে দিয়ে সবাই যখন নামকীর্তন গানে মেতে ওঠে, গানের তালে তালে দুহাত তুলে নাচতে শুরু করে নিজের শরীরের মধ্যে থেকে ঠেলে ওঠা সুরের আবহে, তখন টের পাওয়া যায় ক্রমাগত সুখের আবহে ভেসে চলা কাকে বলে। শ্রীবাসের ঘরে গৌরাস্র এসে পৌঁছবার আগেই হরিদাস প্রতিদিন হাজির হয়ে যায় সে আসরে। আসরের নান্দীমুখ গড়ে রাখে তারা স্ব স্ব জনাম। তবে যতক্ষণ না গৌরাস্র এসে পৌঁছয়, ততক্ষণ সে কীর্তনের আসর অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা পেরিয়ে, গৌরাস্র আসামাত্র যেন আলাদা একটা আলো ছড়িয়ে যায় শ্রীবাসের ঘরের মধ্যে। সেই চলচল কাঁচা অঙ্গের লাভণির দিকে তাকিয়ে হরিদাসের আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ভালোবাসার নিকষিত হেম যেন একটা দেহে এসে জড়া হয়েছে। নামগান শুরু হয়ে যাওয়ার পর কোথা দিয়ে যে রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যায় — খেয়াল থাকে না কারো। মনে হয় এই তো একটু আগে শুরু হয়েছিল। সবার সঙ্গে মিলেমিশে নাচগানের তোড়ো সময় যে কিভাবে ভেসে চলে যায় কেউ বুঝে ওঠার ফুরসৎ পায় না। রাত ফুরিয়ে ভোরের আলো খুব ধীরে, ফুলের পাপড়ি খোলার মতো বেরিয়ে আসে যখন, নামগান থাকে। থেমে যায় খঞ্জনি আর শ্রীখোলের বোল। ফুলের গন্ধে, চন্দনের সুরভিতে ভরে যায় শ্রীবাসের ঘর। ভালোবাসার কি গন্ধ আছে কোনো? ভালোবাসা তো রূপ-রস-শব্দ-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ এড়িয়ে নয়। কখনো কি পেরিয়ে কোথাও?

সারারাত নিজেকে নামগানে উজাড় করে দিয়ে, আলো ফোটার পর শ্রীবাসের বাড়িতে মান সেরে নেয় কেউ কেউ। তারপর আহারেরও আয়োজন হয়। একসঙ্গে বসে পুড়তি ভোজ সেরে নিয়ে রোজ নিজের ডেরায় ফিরে আসে হরিদাসও। তারপর সারাদিনটা কেটে যায়, অনুভবের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মিহি একটা আনন্দের আবেশ নিয়ে। আজকের ভোররাতটা একটু অন্যরকম হ'ল।

রাতভর নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে গৌরাস্বর দেহকান্তিতে যখন 'যেদ মকরন্দ' বিন্দু বিন্দু চূয়ত, তখন কেমন গভীর এক আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে, সবাইকে ডেকে বলে ওঠেন নিমাই, 'শোনো সবকলে। আমরা আগামীকাল থেকে এখানে নাটকের অভিনয়ের মহড়া দেবো। কৃষ্ণচরিত্র অভিনয় করবো সবাই মিলে, কি বলো?'

'হরিবোল। হরিবোল। কী আনন্দ। কী আনন্দ। কী অপার আনন্দ হবে যে প্রভু' — সদাশিব পণ্ডিত সোম্লাসে বলে ওঠেন। সকালের আলো ফোটেনি তখনো পুরোপুরি। বড় ঘরটার মধ্যে সারারাত ধরে জ্বলা পিলসুন্ডের ওপর পেতলের প্রদীপটার সলতে উসুকে দিতে দিতে গদাধর বলে, 'কৃষ্ণচরিত্র পালার আসর কোথায় বসবে প্রভু?'

সঙ্গে সঙ্গে আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর বললেন, 'আমার বাড়িতে হোক না আসর। অনেক লোক ধরবে আমার উঠোনে।'

পারিবারিক সম্পর্কে নিমাইয়ের মেসো 'হন আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর। মেসো চন্দ্রশেখর বোনপো বিশ্বস্তরের গুণগ্রাহী বরাবর। নিমাইয়ের পাতিভাতে তিনি যেমন মুগ্ধ চিরকাল, তেমনি এই সবাইকে নিয়ে সংঘবদ্ধ হ'য়ে নিমাই যে নিয়মিত নামকীর্তনের রাতভরের আসর বেঁধে যাচ্ছে সেই আসরেও চন্দ্রশেখর মতো থাকেন ব্যসের বাধা তুচ্ছ করে। বৃকের ভেতরে কোথায় যেন মানুষটার একটা নবীন বেরাগ তাজা হ'য়ে আছে। সবাইকে নিয়ে চলতে গেলে বৃকের মধ্যে ওটিকে বরাবর বাচিয়ে রাখা দরকার। ওটা না থাকলে সহজেই বিষয়াসক্তিতে বুড়িয়ে যায় মানুষ।

মেসোর কথায় খুশি হন নিমাই। বলেন, 'হ্যাঁ, মেসো তোমার বাড়ির আঙিনাই হবে প্রশস্ত জায়গা। ভালো করে আসর বসানো যাবে। কিন্তু অভিনয়ের জন্যে শুধু আসর হলেই তো হবে না। নাটকের জন্যে দরকার হবে কত সাজসজ্জা, হরেকরকমের জিনিষপত্র। সেগুলো যোগাড় করবার ভার নিতে হবে আর একজনকে।'

'আদেশ করো প্রভু, এখনই বলে দাও এই ভার কাকে দিচ্ছে?' — সাগ্রহে বলে ওঠেন সদাশিব পণ্ডিত। ঘরের সকলে তাকায় সদাশিব পণ্ডিতের দিকে। আর একটা মতো সদাশিব পণ্ডিতের পরিচয় আছে — 'বুদ্ধিমত্তা'। সকলেই বলে এই ভক্ত মানুষটি সত্যিকারের কাজের মানুষ।

তার দিকে চোখ ফিরিয়ে ভুবন ভোলানো হাসি মুখের রেখায় ছড়িয়ে বলে বিশ্বস্তর, 'ভার তো তোমার কাছেই পড়বে বুদ্ধিমত্তা'। তোমাকে দায়িত্ব দিলে আমরা নিশ্চিন্ত সকলে। আমাদের অভিনয় হবে নৃত্য অঙ্গের বন্ধনে। সেই নাচগান আর অভিনয় নিয়েই তো মেতে থাকতে হবে আমাদের। নাটক অভিনয়ের সবকিছু উপকরণ ঠিকমত যোগাড় করা আমাদের সাধ্যতে কুলোবে না। তাই না গদাধর?'

গৌরাদ গদাধরের দিকে তাকাতই মুখের রেখায় সম্যাস্ত্রচক হাসি ছড়িয়ে যায় গদাধরের। খুব শান্ত। দিগ্ধ, কেমন এক রমণীয় লাবণ্য মাথানো গদাধরের মুখশ্রীতে। গৌরাদের মতো দীর্ঘকান্তি নয় গদাধরের। ওই রকম চওড়া কাধ, আজন্মলিখিত বাহু আর সাবলীল পুরুষের দেহকান্তের মধ্যে কেমন এক বিরাটোমালতা মেশানো ন্যাস তার অবয়ব, তবে মাঝারি মাপের

চেহারার গদাধরের সুন্দর মুখশ্রীতে বেশ এক মায়া মাথানো।

আসর ভেঙে উঠে পড়ার আগে নিমাই বলেন, 'পালার বিষয় হবে কৃষ্ণলীলা মাধুর— রুক্মিণীর স্বয়ংবর আর শ্রীরাধারদর্শন।'

গৌরাদের কথা শুনে দূরে বসা নিত্যানন্দ এবার কাছে এগিয়ে এলেন। খুব কাছে এসে হাসি মুখ করে বললেন, 'তবে তো তোমাকেই রুক্মিণী সাজতে হবে।'

শুনে নিমাই এবার নিতাইয়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে গদাধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রুক্মিণী সাজলে মানাবে গদাধরকেও।'

সদাশিব মন্তব্য করেন, 'তা মানাবে ঠিকই, তবে আসর জমাতে গেলে মহাপ্রভুকেই সাজতে হবে নায়িকা। আমাদের পালার নায়িকা তো রুক্মিণী এবং রাধা।'

'কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার ভাবদুটি তোমার অভিনয়ে প্রাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বিশ্বস্তর।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন শ্রীবাস। 'তোমার কি ভূমিকা হবে শ্রীবাস?' নিমাই শ্রীবাসের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন।

'আমায় রেখো না হয় নারদমুনির ভূমিকায়। তাহ'লে ঘন ঘন নারায়ণের নাম নেওয়ার সুযোগ পাবে।'

'তাই হবে। শ্রীবাস সাজবে নারদমুনি আর শ্রীবাসের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত হবে নারদমুনির চেলা।'

এই সময় অদ্বৈতাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় থাকবে কে?'

উত্তরে নিমাই বললেন, 'আমাদের নাটকে শ্রীকৃষ্ণের কোনো ভূমিকাই থাকবে না। গৃহদেবতা গোপীনাথ হয়ে নিজের সিংহাসনে বসে থাকবেন।'

খুবই উৎফুল্ল হয়ে হরিদাস শুনে যাচ্ছে নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে সকলের আলোচনা। অভিনয়ের আয়োজনের কথা শুনে শুনে সে একবার ভাবে, তার নিজের কি কোনো অভিনয়ের সুযোগ থাকবে? নাটকের পরিচালক মহাপ্রভু কি তাকে আদেশ করবেন কিছু? থাকলে ভালো, না যদি থাকে, তাহলেই বা আনন্দটা কম কিসের? নাটক অভিনয় করার এই উদ্যোগ আয়োজনের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য কি কম আনন্দের?

হরিদাস যখন এই কথাটা ভাবছে, কৃষ্ণদাস নিজের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে গৌরাদের মুখের দিকে, অদ্বৈতাচার্যের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে গৌরাদ তাকালেন হরিদাসের দিকে। অর্থাধর্মী আর কবে! বিশ্বস্তর হাসলেন, বলেন, 'আর আমার হরিদাসকে সাজাবো বৈকুণ্ঠের কোটাল।' — ব্রেহ সুধারস ছড়িয়ে যায় মহাপ্রভুর কণ্ঠধরে।

'ভাই, গৌরহরি! আমি সাজবো বৈকুণ্ঠের কোটাল! আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করে হরিদাসের।'

ঘরের মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অদ্বৈতাচার্য জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু পালা অভিনয় কি বিদ্যক ছাড়াই হবে নাকি? লোক হাসাতে না পারলে আসর মজানো যাবে কি করে? মাঝেমধ্যে মজাটা চাই না?'

'বিদ্যুৎকণের চরিত্রে অদ্বৈতাচার্য ছাড়া অন্য কাউকে তো আমরা ভাবতেই পারি না। অদ্বৈত বলেন বিদ্যক।'



‘বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। বিশ্বজ্ঞরের আদেশে শিরোধার্য।’ বলে এমন মজাদার ভঙ্গিমায় শির নাড়েন অধৈত্যাচার্য যে ঘরের সকলে হেসে ওঠে।

শ্রীবাসের ঘর থেকে নিজের ডেরায় ফিরে আসার পরও সারাদিন হরিদাসের মনের মধ্যে নাটক করার কথাগুলোই ঘুরে ফিরে বাজতে থাকে।

তার বাল্যকাল থেকে এই এতোটা বয়স পর্যন্ত হরিদাস কখনো নিজেকে অন্য একজন সাজিয়ে কিছু করেনি বা বলেনি। হ্যাঁ, ছেলেবেলায় আসরে রাত জেগে মনসার ভাসান শুনেছে অনেকবার। চৈতন্যেশ্বর থেকে জৈনেশ্বর পর্যন্ত সেজে হাতে ত্রিশূল নিয়ে গ্রামের পথ ধরে, এক ঠাকুরতলা থেকে আর এক ঠাকুরতলায় দল বেঁধে কিছু লোক যাত্রা করছে।

হরিদাসের ধারণাও নেই কেমন করে বৈকুণ্ঠের কোটাল সেজে তাকে আসর জমাতো হবে। কিন্তু গৌরহরি বলেছে যখন তখন আর ভয় কি? আর আসর মাতাবে তো একাই— ওই অপরূপ রূপের আধার নিমাই পন্ডিত স্বয়ং। বিশ্বজ্ঞরের ওই দিবাকর্ষি তো রূপের আলেয় ভরিয়ে দেবে রুক্মিণীর ভূমিকাটিকে। নরদেহে নারীর কোমল বিভার ছোঁয়টুকু পেয়ে মানুষের রূপ কি সৌন্দর্যের শেষ সীমায় পৌঁছয় না? আসরের প্রতিটি শ্রোতার দৃষ্টিখনা হবে রাখার ভাবদুটিময় গৌরাসকে রুক্মিণীর ভূমিকায় দেখে।

দেহভান্ডে মানুষ বেঁচে থাকে কিই; কিন্তু, হরিদাস ভাবে, কেবলমাত্র দেহভান্ডটুকুর ভালবাসায় এ ব্রহ্মভান্ডে মানুষের বেঁচে থাকার, তার প্রাণের জন্যে অশেষ টানের শেষ কথা নয়। মানুষ সত্যিকারের বাঁচে, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে, অন্য এক টানে? ছেলেবেলা থেকে এই এতোটা বয়স পর্যন্ত কিসের টানে বেঁচেছে হরিদাস? ভেতরের, অনেক ভেতরের কি এক তেষ্ঠা — আজও বাঁচিয়ে রেখেছে হরিদাসকে? গদাধরকে কথায় কথায় একদিন বলেছিল হরিদাস, ‘গদাই, এক একটা মানুষ অন্য আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যায় কেন বলতো? আর পাঁচজনের মতো হালবলদ, জমিজমেতে, সোনাদানা কোনো কিছুই কেন টানে না তাকে? কেন তাকে আরো অন্য একটা টান, — যে টানটা ঠিক যে কি তা সে নিজেই জানে না, সারাদিা জীবন ব্যাকুল ক’রে রাখে তাকে? এই আশ্রয় দ্যায় না গদাই— যশোর জেলার বুঢ়ন গ্রামে যখনকুলে জন্মেছিলো আমি? গায়ের ঘরসংসারে তেষ্ঠা মিটলো না বলেই তো বুঢ়ন ছেড়ে চলে এসেছিলো বেনাপোলে। সেখানেও তেষ্ঠা মেটে না দেখে এলাম শান্তিপুর। শান্তিপুর থেকে অধৈত্যাচার্য আমায় নিয়ে এলেন এইখানে — নবদ্বীপে। নিয়ে এলেন আমার ভেতরকার তেষ্ঠা মিটাতে।’

‘ওই প্রপ্ৰতা তো, হরিচাকুর, আমিও নিজেকে করে আসছি কত কাজ? আমারও কোনোদিন মতি হ’লো না বিষয়-সংসারে? ভেতর থেকে কে যেন আমায় ঠেলে ঠেলে চারদেয়ালের বাইরে নিয়ে এলো। গৌরহরির সন্ধান যদি না পেতুম, কোথাও তো থিতু করতে পারতুম না নিজেকে। তুমি তো জানো, হরিবাবা নামসংকীর্তনে গলা মিলাই যখন, প্রেমানন্দে যখন বিভোর হয়ে নাচি, তখনই শুধু স্বাদ পাই জীবনের। সুখ পাই যেতে থাকার সার্থকতার। এসব কথা কি গৃহীমানুষকে বোকানো যায়, বলো? বেঁচে থাকার হিসেব তো সেসব মানুষের কাছে আলাদা?’

গদাধরের কথা শুনেতে শুনেতে, চোখ তুলে আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়েছিল হরিদাস।

জলভরা কালো মেঘ স্থির হ’য়ে আছে। দক্ষিণের কদমগাছটা ফুলে ফুলে ভরে আছে কিন দিন হ’ল। সেইদিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে হরিদাস বলে, ‘আমরা জন্ম থেকেই আলাদা গদাধর। কামিনী কাঞ্চন কোনোটাি আকর্ষণ করল না আমাদের। দেহে যৌবন এলো তবু নারীর স্বাদ পাওয়ার জন্যে কখনো উতলা হলাম কই? আমরা জন্ম থেকেই আলাদা হ’য়ে আছি যে ভাই।’

গদাধর হেসে বলে, ‘আলাদা আবার দলবদ্ধও।’

এবার বর্ষার মেঘ আর কদমগাছের মাথা থেকে চোখ নামিয়ে হরিদাস বলে, ‘ঠিক বলেছিল। গৌরহরির প্রেমগানের আসরে আমরা তো কেউ আলাদা নই, গদাধর। বরং দুনিয়ার অনার্য সবাই আলাদা হ’য়ে থাকে আমাদের থেকে। আমরা যখন প্রেমনামে গলা মেলাই, সাধুসঙ্গে নাচি, কৃষ্ণান্মের আশে জাতপাত ভুলে সবাইকে কোলে টেনে নিই, তখন আর আমরা আলাদা কোথায়? তখন কামিনী-কাঞ্চনে সীমাবদ্ধ মানুষদেরই তো আলাদা মনে হয়।’

পরের রাতের আসরে ঠিক হ’ল, কৃষ্ণচরিত থেকে যে নাটক অভিনয় হবে — রুক্মিণীর স্বয়ংবর আর রাধা দরশন, তাতে মথুরার কোটালের সহকারী সাজবে মুরারি গুপ্ত। মুরারি পন্ডিত মানুষ। কিন্তু নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের পন্ডিতদের আচরণে সবসময় যে একটা নাক উঁচু ভাব থাকে — তেমন ভাবটা মুরারির নেই। এই নামকীর্তনের আসরে আরো যত বিদোবুদ্ধিভরা ভক্ত আছেন, গৌরাসের সদগুণে কারো মধ্যে সেটা নেই। এইটা সবচেয়ে ভালো লাগে হরিদাসের।

হরিদাস মুরারি গুপ্তকে শুধায়, ‘নাটকের সব আয়োজন তো পাকা হচ্ছে কিন্তু মহড়া হচ্ছে না কেন? প্রতি সন্ধ্যায় বারবার আউড়ে আউড়ে বলাটা সড়গড় করে না নিতে পারলে, অভিনয় জেঁকে বসবে কি ভাবে?’

শুনে হাসে মুরারি, বলে, ‘আরে বাপু আমাদের অভিনয়ে আবার আগের থেকে অতো ঘষা মাজা লাগবে না কি? আমরা তো সকলে জানি কাহিনীটা এগোবে কিভাবে, কোন ঘটনার পরে কোন ঘটনাটা আসবে — সবই জানা আমাদের। ঘটনার ধারা অনুসারে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকবো। যার যখন পলা আসবে — সে তখন আসরে নেমে শোনাবে তার প্রাণের কথাগুলো। কাহিনীর তালে তালে মনের কথা মিশিয়ে দিতে পারলেই জমে উঠবে আমাদের পালা।’

‘আমরা কে কেন্দ্র সংলাপ বলতো তা আগের থেকে কষ্টই রাখবো না?’

‘যে যার কথা যখন যেমন বলার দরকার — তেমন ব’লে যাবে তার চরিত্র অনুযায়ী। তাত্ক্ষণিক অভিনয়ের তো অন্যরকম মজা।’

মুরারিকে শ্রদ্ধা করে হরিদাস। এই শ্রদ্ধা শুধু মুরারির পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়। মুরারি গৌরাসের সহপাঠী। যমসে গুপ্ত। মানুষটি প্রথম জীবনে বোদ্ধপণ্ডী ছিলেন। পরে প্রভাবিত হ’লেন নিমাইয়ের ভক্তিরাসে। গৌরাসের সহচর এই মানুষটির কাছে গৌরাসের ভাগবৎসজা জলের মতো স্বচ্ছ হয়েছিল। প্রিয় সহপাঠী যে তাকে কৃষ্ণপ্রেমের রসময়মে টেনে নিয়ে গেছে তার পরিচয় আছে মুরারি গুপ্তের ‘পদমাধুরি’তে। প্রাণভরে ওই পদগুলো গেয়ে অপর আনন্দ

পায় হরিদাস।

নয়ান পুড়ুলি করি লইনু মোহনরূপ

হিমার মাঝারে করি প্রাণ।

পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি

জাতিকুলশীল অভিমান।।

তবে এই 'কৃষ্ণচরিত' অভিনয় আসরের প্রসঙ্গে এখন মুরারির আশ্বাসে তেমন নিরুদ্বেগ হতে পারেনা হরিদাস। পালা অভিনয়ের দিনটা যত এগিয়ে আসে, ততই বুকের তলায় দুকদুক কাঁপন বেড়ে যায় তার। কৃষ্ণগ্রন্থে মাতোয়ারা হ'য়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নাচে গানে আত্মহারা হওয়া একরকম। সেখানে কেবা কাকে লক্ষ্য করে? সবাই তো ডুবে থাকে বৃন্দ হয়ে প্রেমসুধারসে। সূরের বাঁধনে সবাই এক সেখানে, কেউ আলাদা নয়। কিন্তু শতশত মানুষের উৎসুক দৃষ্টি আর উৎকর্ষ শ্রুতির নাগালে অভিনয় করা? হরিদাসের ভয় করে। গৌরহরি থেকে শুরু করে হরিদাসের আগে পরে ডাইনে বামে অনেকেই তো নিজগুণে শ্রোতাদের মনোহরণ করবে, তাদের পাশে যখন হরিদাস দাঁড়াবে কোন গুণে? ভালোবাসার গভীরতায় গৌরাসের কাছে মনুষ্য হওয়া যায় কিন্তু তাতে শত শত দর্শক শ্রোতার বাহবা পাওয়া যায় কি?

এরমধ্যে এক রাত পূরন্দর রায়দের বাড়িতে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে মদলচণ্ডীর গীত শুনে এসেছে হরিদাস। যদিও সে আসর আর পালা অভিনয়ের আসর এক হবে না। তবু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আসরের শ্রোতাদের মেজাজ ধরতে চেয়েছে সে। সে আসরে কোথা থেকে এক মদল বাঙালি বৌদ্ধ সম্মাসী এসে হাজির হয়েছিল। তারা নিজেদের 'নেড়া' বলে। তারা নাকি বিশাল একটা গোষ্ঠী — গুণগতিতে বারশের ওপর। ছোট ছোট দলে সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। গল্প করছিল, দুদিন আগে ওরা মায়াপুরে বসুবাড়িতে যক্ষপূজায় রবাবুত হয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে মদ মাংসের এলাহি আয়োজন দেখে তাজব্ব বনে গেছে। কিছুদিন নব্বীপে থেকে গেলে তারা আরো কত কি দেখাবে। নব্বীপের মতো এমন হরেকরকমের মানুষ আর কোথায় পাবে ওরা। একদিকে তত্ত্বমতাবলম্বী কুলাচারী হিন্দুরা, অন্যদিকে মোল্লা কাজী শাসককুলের মানুষজন। হরিদাসদের নামকীর্তনের আসর নিয়ে কত লোকে কত কথাই যে বলে। ঘরের খিল এঁটে নাচগান করে বলে, তাদের ধারণা এরা সব দরজা বন্ধ পঞ্চমকার — মদ্য, মাংস, মুদ্রা ও মেথুনে বৃন্দ হয়ে থাকে।

এখন ঘন ঘন মেসোর বাড়ি যাতায়াত চলেছে নিমাই-এর। অভিনয় অনুষ্ঠানের জন্যে যা কিছু সাজসজ্জাম লাগবে তার আশি শতাংশ এরই মধ্যে যোগাড় করে ফেলতে বুদ্ধিমত্তা খা। বাকি বিশ শতাংশ এরই মধ্যে যোগাড় হয়ে যাবে ঠিক। বাড়ির মহিলারাও এগিয়ে আসছে সাহায্য করতে। নিমাইয়ের মাসি থেকে শুরু করে ও বাড়ির সবাই খুব খুশি — অভিনয় দেখতে পাবে বলে। মেসোর বাড়ি জুড়ে রীতিমত উৎসবের মেজাজ। কদিন দলে এ পাড়া সে পাড়া থেকে বৈদিকরা মা আসর সব আসরে শুনে হরিদাস যেন আরো খানিকটা দমে যায়।

গদাধর হরিদাসের ঘরে এসে মেঝেতে হাঁটুমেড় বসে খবর দেয়, 'শুননাছো, পালা শুনাতে

শটীমা আসবেন — সঙ্গে থাকবেন তাঁর বৌমা বিশ্বপ্রিয়া ঠাকুরানী।

'বলিস কি গদাই। কে বললে?'

'অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি গিয়েছিলুম। অদ্বৈতগিরা বললেন, 'শটীমা আর বিশ্বপ্রিয়াকে আমি আসরে আমার পাশে বসিয়ে পালা শোনাবো। অদ্বৈতাচার্যের বিদূষক দেখার জন্যে তাঁর ঘরগীর যতটা আগ্রহ, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ বিশ্বপ্রিয়া ঠাকুরানীর — আসরে লক্ষ্মীবংশে গৌরহরিকে দেখার জন্যে।'

'তুমি কি সাজবে গো হরিবাবা?' অরুণ জিজ্ঞাসা করে।

'শোননি, আমি সাজবে তো।' বৈকুণ্ঠের কোটাল।

'বৈকুণ্ঠের কোটাল। কী মজা। তবে তো আমি সবার আগে গিয়ে আসরে ভালো করে জায়গা নিয়ে বসবো। দেখাবো বৈকুণ্ঠের কোটালের কেমন হকচাক।'

হরিদাস গলা নামিয়ে বলে, 'কোনোকালে আর একজনের বেশ ধরে তার কথাগুলো তো বলিনি। অভিনয় কিভাবে করতে হয় জানিনি। এই তো প্রথমবার।'

অরুণ বলে 'আরে বাবা প্রথমবার তো সকলেরই। এর আগে তো কেউ কোথায় কোনদিন এভাবে অভিনয়ে আসর বসিয়েছে বলে শুনিনি। তোমার ভয়ের কিছু নেই হরিবাবা। যেখানে গৌরাদ থাকবেন তোমাদের সঙ্গে সেখানে তোমাদের ভয় কি?'

'ঠিক বলেছে অরুণভাই! ঠিক বলেছে।' খানিকটা ভরসা উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে হরিদাস।

আর একদিন শ্রীবাসের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত হরিদাসকে ডেকে বলেন, 'অভিনয়টা নিয়ে তোমার এতো উৎকর্ষ! কেন হরিদাস! আসরে দাঁড়িয়ে তোমার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হবে — সেই ভাবটাই প্রকাশ করবে। আমি তো তাই করবো। আমার দাদা সাজবেন তো নারদমুনি আর আমি ধরবো তার শিষ্যের বেশ।'

'নিতাই কে সাজছে? নিত্যানন্দকে কোন বেশ ধারণ করার কথা বলেছে গৌরহরি?'

'বড়াইবুড়ি।'

'বড়াইবুড়ি? বলা কি?'

'কেন? তুমি কি ভাবো। বড়াইবুড়ি সেজে নিতাই আসর জমাতে পারবে না? দেখো বড়াইবুড়ি সেজে উনি দর্শকদের বাহবা কুড়াবেন।'

শ্রীবাসের দাওয়ায় বসে হচ্ছিল কথাগুলো। শ্রীবাস গির্দা মালিনী এই সময় এক বারকেশ নারকেলকণা নিয়ে বারাদার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে বলে, 'বড়াইবুড়ির বেশেই তো আসর মজানো যায় সবচেয়ে বেশি। গৌরহরি তার প্রাণের দোদরকে তাই তো বড়াই সাজতে বলেছে গো।'

সঙ্গে সঙ্গে গদাধর বলে উঠেছিল, 'নিত্যানন্দই কেবল একলা গৌরাসের প্রাণের দোদর? আমরা কেউ নই? আমাদের এই হরিবাবাকে কি কারো চেয়ে কম ভালোবাসেন মহাপ্রভু?'

কানের ভেতর দিয়ে কথাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছোনোমাত্র যেন ভেতরের পুরোনো বাখাটা চলকে উঠল। হরিদাস শব্দ করে আনে বেননাটাকে। মনে পড়ে যায় এ নিয়ে তাঁর গদাধরের সঙ্গে অনাসময়ে কথা হয়েছে। এ ব্যাপারে গদাধর নতুন আলো দেখিয়েছে হরিদাসকে। তার আগে হরিদাসের বুকের ভেতর অভিনাম ওমরে ওমরে উঠছিল, কাউকে বলতে পারছিল না



সেকথা। আবার না বলতে পারলেও যে বৃকের জালাটা কম ছিল না। ওই কষ্ট, ওই দুঃ কাকে বোকাবো হরিদাস? কে বৃককে?

গৌরাস্থ যেদিন হরিদাসকে বৃক টেনে নিয়েছিলেন সেদিন তো নবজন্ম হয়েছিল যখন হরিদাসের। নিচকুলে জন্মানোব এতদিনের অগৌরব মুহূর্তে ডুবে গেছিল সেই পরমপ্রসন্ন। গৌরহরির ভালোবাসা হরিদাসের অন্তরে পবিত্রশিখরের মতো উঁচু করে দিয়েছিল। কেন যেন মনে হতে শুরু করেছিল হরিদাসের — মহাপ্রভুর প্রেমায় বৃকদেশে বৃখিবা হরিদাসের জায়গাটাই সবচেয়ে বড়। কথায় কথায় শর্তীমাও একদিন বলেছিলেন, 'সব ভক্তই আমার নিমাইয়ের প্রাণের ধন, কিন্তু আমার নিমাই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে হরিদাসকে।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস মনে মনে ভেবেছিল, 'তাই কি? গৌরহরি কি সত্যিই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন হরিদাসকে?' এখন গদাধরের কথায় মনে হ'ল, 'তা কেন? গৌরহরির অন্যতম প্রাণের ভক্ত হরিদাস হ'লো, সবচেয়ে প্রিয়জন হলেন নিতাই — নিতানন্দ'। যে কোনো গুরুভ — বড় মাপের কাজ হরিদাসকে একা করতে দেন না গৌরাস্থ। বেশির ভাগ সময়ে নিতানন্দকে লিঃ দেন সঙ্গে। নলীমা নগর প্রত্ন ঘরে ঘরে নাম সঙ্কীর্তন প্রচারের ভারও দুজনের কাঁধে সমান দায়িত্বে ভাগ করে দিয়েছেন মহাপ্রভু। তাছাড়া গৌরহরির তো নিজমুখেই বলেছেন, 'নিতাই আর হরিদাসই আমার দুই কল্জ। ওদের মধ্যে দিয়েই আমি আছি। থাকাবো।'

গদাধর বলে, 'তোমরা দুজনে যখন একসঙ্গে কৃষ্ণনাম প্রচারে বার হও — গৌরহরির ইচ্ছে বয়ে নিয়ে চলো। আমি দুজনকে দেখি আর ভাবি — তোমরা দুজনে মিলে যেন একজন — যেন একটি মানুষই চলো — মনে প্রাণে এক হয়ে একটি ইচ্ছাকেই পূর্ণ করতে'।

'কিন্তু গদাধর, তোমার কি মনে হয় না, গৌরহরির কাছে নিতাই আমার চেয়ে বেশি দরকারী? হরিদাসকে না হলেও চলবে গৌরাস্থ। কিন্তু নিতাইকে না হ'লে তাঁর চলবে না, নিতাইকে অনেক বেশি প্রয়োজন মহাপ্রভু। তাই না গদাধর?' এই প্রশ্নগুলো মনে এলেও মুখে বলতে পারে না হরিদাস। সে চুপ করে থাকে। নিজেই ভেতরে ভেতরে শাসন করে: 'ভাবনাটি এমন অবৈধব দিকে ভাসতে চাইছে কেন?'

গঙ্গার পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হরিদাস। নবদ্বীপের গঙ্গা তখন কানায় কানায় ভরা। কোটালের বান ভেঙেছে গঙ্গায়। ভরা কোটাল। কোটাল শব্দটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস অনুভব করে, শব্দটা 'এ' ব'দিন হ'ল তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে যেন। এখন মুরারি তো সারাক্ষণই তাকে ডাকে 'বৈকুণ্ঠের কোটাল' বলে। এখন হরিদাস যে মনেপ্রাণে বৈকুণ্ঠের কোটাল চরিত্রের সঙ্গে একায় হ'য়ে আছে।

॥ দুই ॥

দেখতে দেখতে এসে গেল অভিনয়ের দিন। সকাল থেকে আচার্য রত্নের বাড়ির ভেতরে আসার সাজাতে লেগে গেছে সকলে। নিমাইয়ের মাসিও কোমর বেঁধে কাজে লেগেছে।

উঠানভূঁড়ে সামিয়ানা টাঙানো হ'ল। মস্ত বড় একটি চাঁদোয়া খাটানো হ'ল আসরের মাথায়। আশ্রপল্লব খুলিয়ে দিয়েছেন সীতারাসদেবী। সন্দের আশের থেকেই দলে দলে লোক

জমায়েৎ হতে শুরু করেছে। ঢোল পিটিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা করেনি কেউ। লোকের 'নে কানে ছড়িয়ে গেছে অভিনয়ের খবর। পালা শুরু হওয়ার আগে দেখা গেল লোকে লোকারণ্য। তিলধারশের আর জায়গা নেই আচার্য রত্নের বাড়ির ভেতরে।

সন্দের পর অন্যদের সঙ্গে অভিনয়ের জন্য সাজতে বসল হরিদাস। সাজতে বসে দেখতে দেখতে ঘেমে উঠল সে। তার মাথায় পাগড়ি। ইয়া বড় গোঁফ। শট্টা পরেছে। হাতে তার লাঠি। জবর মানিয়েছে হরিদাস প্রকৃষে। মুরারি গুপ্ত হরিদাসের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'হরিবাবা তুমি তো কোটাল বেশেই আসর মাত করে দেবে দেখছি। পেল্লাই ওই গোঁফ জোড়া তোমার মুখের কোমলতাকে ঢেকে দিয়েছে। একবারে অন্য আদল এসে গিয়েছে।'

'তোমারই বা কামটা কি মানিয়েছে মুরারি? আমার একেবারে উপযুক্ত সাকরেন্দ। মনে আছে তো — তোমাকে নিয়ে কিভাবে আমি এ-পাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত আসর চরে বেড়াবো?'

'খুব মনে আছে। তবে জবাবগুলো তুমি ঠিক ঠিক দিও। গৌরহরির রূপ আর ভাবতন্ময়তা দেখে বিভোর হ'য়ে থেকে না। গৌরাস্থের ওই মোহিনী বেশ দেখে তো মোহিত হ'য়ে যাবে সবাই। ও মুখের দিকে তাকালে কি আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করবে কারো?'

কথাটা ঠিকি। এখনই তো রূপ দেখি আখি বুঝে। তবু তো রুক্মিণীর সাজ এখনও পুরো সাজা হয়নি বিশ্বস্তরের। তাতে যদি এই হয় তো খানিক পরে যখন নিমাই ওই বেশে দাঁড়াবেন আসরের মাঞ্চানে, তখন?

বড় বড় লঠন খোলানো হয়েছে আসরে। রঙীন কাপড়ের চাঁদোয়ার নিচে দড়িতে অশ্রপল্লব বেঁধে চৌকোবা করে টাঙানো।

আসর বসছে বাজনা বাজিয়ে।

নাটকের প্রথমাংক হল 'রুক্মিণীর স্বয়ংবর'। নাম গান দিয়ে শুরু হচ্ছে নাটক। গান শুরু করছে মুকুল দত্ত।

হরিদাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে বৃন্দাবন বলল, 'শুনছো তো ঠাকুর — আসরে সবাইকে কিন্তু বেশ গলা তুলতে হবে — খুব লোক হয়েছে তো। মুকুল মামা কেমন গাইছে জোরদার বলা।'

'আহা! কি সুবোলা কণ্ঠের মুকুলের। শুরুতেই আসর জমিয়ে দিয়েছে একেবারে।'

'এরপরেই তো তোমার প্রবেশ, হরিবাবা। এগিয়ে যাও গো, এগোও। জয় গোবিন্দ। জয় মহাপ্রভু।'

বিশাল গোঁফে মোচড় দিতে দিতে আসরে ঢুকে পড়ে হরিদাস। সে ঢুকতে না ঢুকতেই তার অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল সকলে। এক হাতে লাঠি ধরা, অন্য হাত নেড়ে নেড়ে আসরে চক্কর দিতে থাকে হরিদাস। বড় বড় পা ফেলে আসর পাক খায় বৈকুণ্ঠের কোটাল।

গায়ের নট মুকুল দত্ত তাকে শুণ্ডায়, 'কে হে তুমি? কি তোমার পরিচয়?'

কোটাল বেশী হরিদাস দাড়িয়ে পড়ে মাথার পাগড়ি ঝাঁকিয়ে হেসে জবাব দেয়, 'আমি হলাম বৈকুণ্ঠের কোটাল।'

মুকুল দত্ত আবার প্রশ্ন করে, 'তা বৈকুণ্ঠের কোটাল ভাই, তুমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এখানে হাজির যে।'

হরিদাস দাঁড়িয়ে পড়ে, জবাব দেয়, 'না এসে উপায় কি। আমার প্রভুকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি না। আমার প্রভু আখিরাচন্দ্রকে ভক্তি বিতরণ করার জন্যে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এখানে এসেছেন। কথাটা তোমাদের জানিয়ে আমি ইঁসরায় করে দিচ্ছি—হঁ। আর ওই দ্যাব আমার সহকারী কোটাল। ওকে নিয়ে আমি চতুর্দিক ঘুরে বেড়াচ্ছি।'—এই কথাগুলো বলতে বলতে মুরারি ওগুকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস আসরের একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত ছোটোটি গুরু করে দিল। হরিদাসের হাকডাক আর লক্ষ্মণবাল্লভের বাহাদুরিতে জেতারা 'ব' হেসে নুটোপুটি। এই মধ্যে আসরে ঢুকে পড়লেন নারদমুনি। তিনিও একলাটি নন। তাঁর শিষ্যটিও রয়েছে তার পাশে পাশে। নারদমুনির রূপসজ্জায় বিশাল লম্বা পাকা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। তিলক ফোঁটা কেটে এমন বদলে গেছে মুখের আদল যে আসরের কেউ চিনতেই পারছে না অভিনেতাকে। নারদের সাজে কে নামল বোঝা যাচ্ছে না তো।

বৃন্দাবন দাস আসরের মধ্যে মেয়েদের বসবার জায়গাটায় চোখ ফিরিয়ে দেখে। শ্রীবাস গিল্লী মালিনী বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখছে নারদমুনিকে। তারপর ফিসফিস করে তার পাশে বসা যুবতীটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'কে গো সেজেছে নারদমুনি?'

যুবতীটি উত্তরে বলে, 'আমিও চিনতে পারছিলাম দিদি। পাকা লম্বা চুল আর গোঁফ দাড়িতে তো মুখের বেশির ভাগটাই ঢাকা পড়ে গেছে।'

'আমার কর্তা নয় তো রে। চাউনিটা তো দেখছি কর্তার মতই।' মালিনীর মুখের রেখায় হাসি ছড়াতো থাকে। এইসময় সীতাদেবীর বকে ডেকে এক মহিলা বলে 'ওই যে, ওই যে গো তোমার কর্তা—ভাড়ী সেজেছে কেমন।'

সীতাদেবীর কর্তা অদ্বৈত তখন বিদূষক সেজে আসরের মাঝখানটিতে এগিয়ে এসেছেন। তিনি ঝীণা কাঁধে নেওয়া নারদমুনিকে শুধাচ্ছেন, 'কে তুমি? তুমি এখানে এসেছো কি জন্যে?'

আমি হলুম কৃষ্ণের গায়ের। সবাই আমায় নারদ নামে জানে। আমি বিশ্বভুবন ঘুরে বেড়াই। আজ বৈকুণ্ঠে বিদ্যুৎ নেই। গুনলুম নারায়ণ এসেছেন নদীয়াগরে। তারই খোঁজে এখানে এসে জানতে পারলুম—'এই আসরে আজ তিনি অভিনয় করবেন লক্ষ্মীবিশেষ। নারায়ণের সেই লক্ষ্মীরূপ দেখে নয়ন জড়াবে বলেই এখানে হাজির হয়েছি।'

কথাগুলো শোনামাত্র আসরের শ্রেষ্ঠারা কলধনি করে উঠল, 'হরিবোল। হরিবোল। জয় রাধে গোবিন্দ। জয় রাধে গোবিন্দ।'

মালিনী দেবী আবার ফিসফিসিয়ে বলে ওঠেন, 'ওমা! সত্যিই তো। আমাদের কর্তাই তো দেখছি। গলাটা শুনে তবে ধরতে পারছি। মাগো কি সাজটাই না সেজেছেন! চেনবার জো নেই গো।'

গৌরাদ এই সময় সাজঘরে। তাঁর রুক্মিণীর সাজ শেষ হয়েছে সবে। তখন রূপালের মাঝখানটায় গোল করে টিপ আঁকছিলেন তিনি। আঁকতে আঁকতে নারদবিশেষী শ্রীবাসের সংলাপ শুনছিলেন। সমবেত শ্রোতাদের কণ্ঠে হরিধ্বনি শুনে রুক্মিণীর ভাবাবেশ এলো গৌরাদের। ভাববিহীনতায় এরপর মাটিতে বসে পড়ে আঁচড় দিতে শুরু করলেন নিমাই। সেই অবস্থায় সেই রুক্মিণীর ভাবে আচ্ছন্ন মহাপ্রভুকে আসরে আনা হল। শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী তাঁর পরলৈখায় অনুপ্রবেশ করে বলাছেন যে পরদিন প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ যেন তাকে হরণ করে নিয়ে যান।

'হে ভুবনসুন্দর, নিলাজ হৃদয়ে আমি নিমগ্ন তোমাতে। তোমার গুণরাজি যে কানোর ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে দেহতাপ জ্বাড়ে দেয়। চক্ষুর ভূষণ মেটায় তোমার রূপবিভা।'

সত্যি সত্যিই যেন সত্তা বদল হ'য়ে গেছে গৌরাদের। আসরের প্রতিটি দর্শকের কাছে ওই আতি তো আর বিশ্বস্তরের নয়। ওই প্রার্থনা তো স্বয়ং রুক্মিণীর। নিমাই যেন পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়ে গেছেন রুক্মিণীতে।

আত্মপ্রকাশের এমন আশ্চর্য ভাবদৃতি এর আগে কেউ কোথাও কোনদিন কি দেখেছে? বৈকুণ্ঠের কোটাল তো শুদ্ধ হয়ে হাত জোড় করে দাড়িয়ে আছে। তার দৃ'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে যাচ্ছে। আনন্দাশ্রু জীবন সার্থক হ'ল হরিদাসের। ধন্য হ'ল তার দৃষ্টি এমন রূপ দেখে। শ্রুতি সার্থক হ'ল এমন হৃদয়মণ্ডিত আর্তি শুনে।

স্বামীর অভিনয় দেখে বিশ্বপ্রিয়া বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে শুধু। দৃ'চোখ দিয়ে জল ঝরছে অব্যাহারে। বৌমার বাঁ হাত নিজের দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরেছেন শচীমা। আনন্দোন্মাদনে ভেতরে ভেতরে খরখর করে কাঁপছে বিশ্বপ্রিয়া। রূপের এমন আলো। কণ্ঠস্বরের এমন অনুরণন অকল্পনীয়। রুক্মিণীর ওই সংলাপ যে এই মুহূর্তে বিশ্বপ্রিয়ারও বৃকের ভাষা।

প্রথম অঙ্ক শেষ হ'ল এই ভাবসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে। গদাধরের লক্ষ্মী বেশে প্রবেশ থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু। ব্রহ্মানন্দ সেজেছে লক্ষ্মী ঠাকরনের সহচরী। আগের মতই হাঁকডাক করছে বৈকুণ্ঠের কোটাল। 'কোথায় যাচ্ছে যে? কে তোমারা গুনি?' কোটাল প্রশ্ন করে। উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলে, 'আমরা মথুরার মায়ী গো।'

নারদবেশী শ্রীবাস জানতে চাইলেন, 'কাদের কুলের বৌ গো তোমরা? কাদের কুলের বৌ?'

সখী সুপ্রভার ভূমিকায় ব্রহ্মানন্দ পাণ্ডা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, 'একথা জিজ্ঞাসা করছো কেন? কারণ কি?'

নারদ বললেন, 'আছে গো। কারণ আছে বই কি।'

'তোমরা থাকবে কোথায়?'

'তুমিই ঠাই দেখে নাকি? — ব্রহ্মানন্দ জানতে চায়।

এই সময় এগিয়ে এলেন বিদূষক। অদ্বৈত বিদূষকের জবানবিত্তে বলে চলেন, 'পরস্খী হ'ল মাতৃবৎ। কেন তাদের লজ্জা লাও? এরপর সুপ্রভার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেন, 'আমার কর্তামশাইটি একটু নৃত্যগীত প্রিয়। তাই হোক না একটু নৃত্যগীত।'

শুনে রসাবেশে গদাধর নাচে মনোহর আর সময়োচিত গীত গায় অনুচর। গানের সুরে নাচের ছন্দে অন্য এক ভূজন ভেসে ওঠে। অনুচরের গহন থেকে এই ভুবনকেই, এই ভালবাসার ভুবনকেই তুলে আনার জন্যে এমন আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে হরিদাস। জমি বলদ সেনোচাঁদির ফঁদ থেকে বেরিয়ে আসার এই তো সেরা সুযোগ। মনটাকে বড় করে নাও। চালচলা চাদির চৌহদ্দি ফেঁড়ে ডানা মেলে নাও আনন্দের আকাশে। বড় করে বাঁচো ভে ভাই।

গৌরাদ এবার আসরে নামলেন নায়িকার ভূমিকায়। সঙ্গে আছেন নিত্যানন্দ। নিতাই সেজেছে বড়ই। বেকে বেকে হেঁটে চলা আসার মাটিয়ে দিল বড়ইবুড়ি। পাশাপাশি



নিমাই-এর কখনো রাখাভাব, কখনো বা ভাব জগদ্ধাত্রী। কখনো আবার কৃষ্ণগীর ভাবে বিভোর হ'য়ে আছেন পরম প্রেমময়। সিংহাসন থেকে গোপীনাথের মূর্তিকে কোলে তুলে নিয়ে সেখানে বসে পড়লেন গৌরাস। জগৎজননীর ভাব এসেছে মহাপ্রভুর মধ্যে। সে ভাব বিহ্বলতা দেখে, সেই মাতৃস্বরাপিনী বেশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে রইল আসরের প্রতিটি নারী পুরুষ। সার্থক হল তাদের রাতজাগা।

হরিদাস এখন ওই মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে অনায়াসিত কি এক আনন্দে আবেগে বরষার করে চোখের জল ফেলে চলেছে। বৈকুণ্ঠের কোটালের চৌদুটো কেঁপে উঠছে বারবার। কিবা নারী কিবা পুরুষ আসরে যারা জড়ো হয়েছে তারা সকলেই এখন মাতৃবন্দনায় বিহ্বল। আচার্যরত্নের আবার এ মুহূর্তে মা মা ডাকে ভরে যাচ্ছে। সকলের মধ্যে কেমন এক সন্তানভাবের সুখ সঞ্চার করে দিয়েছেন শতীনন্দন। আর সেই মুহূর্তেই বৈকুণ্ঠের কোটালের বৃকের ভেতরটা অদ্ভুত একটা বিদ্যুৎস্পর্শে দুলে উঠল যেন। নিজের মধ্যে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে সে। গৌরহরির সবচেয়ে প্রিয় অনুরাগী হওয়ার সাধটা ভাবে তারমধ্যে এমন প্রকট হ'ল কেন? নিতাই তো অনবরত সূরের আবেগে বলে, 'যে জন গৌরাস ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।' গৌর তো নিতাইয়ের প্রাণ। ভালবাসাকে যখন আপন অধিকারের সীমায় বন্দী করে রাখতে চাই তখন কি সে ভালবাসাকে হত্যা করি না? সে তো একধরনের আত্মক্লিষ্ট প্রীতি ইচ্ছা। কোনো আত্মক্লিষ্ট প্রীতি ইচ্ছায় তো হরিদাস নিজের ঘরদোর ছেড়ে কৃষ্ণপ্রেমের জগতে ছুটে আসেনি। ভগবানকে সমস্ত মনপ্রাণ নিবেদন করবে বলেই কিনা তার এই আকুলতা। তোমার বৃকের মধ্যে যে গৌরপ্রেমের বান ডেকেছে সেই একইভাবে যখন বানভাসি আমার বৃকের ভেতরটা; তখন চলো, ভেসে চলো, দুকূল উজিয়ে চলো ভালবাসার বন্যায়।

জয়ধ্বনিতে মুখর এখন আচার্যরত্নের বাড়ি। কেউ লক্ষ্মীস্তব করছে, কেউ করছে ভক্তী স্তুতি। হরিদাস চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দেখে — পূর্বের আকাশে গোলাপী সমুদ্র জাগছে।

রাত শেষ হ'য়ে এলো। শুরু হবে একটা নতুন দিন।

'কেমন লাগছে এখন হরিবাবা? পালা শেষ করে?' গদাধর কাছে এসে হাসিমুখে শুধায়।

'এ আনন্দ কি ব'লে বোকানো যায় গদাধর?' হরিদাস বলে।

সে অনুভব করে পালা শেষ হ'তে হ'তে নিজের ভালবাসার অধিকারবোধের ঝাঁচটা থেকে বেরিয়ে এসে তার গৌরপ্রেম এতদিনে সত্যি সত্যিই যেন ডানা মেলতে পারল। গদাধরের সঙ্গে গৌরাসের পায়ের কাছে এসে বসল বৈকুণ্ঠের কোটাল। মাতৃস্তনে মুখ রেখে শিশু যেমন অপার আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে — অভিনয় শেষে তোরণের আলোয় হরিদাস যেন তেমন আনন্দে একাকার হ'ল।

আজ হরিদাস যেন নতুন করে বুঝল — নিজের ছোট্ট চৌহদ্দি থেকে ভালবাসাকে বাইরে টেনে আনার আনন্দ কত গভীর। এই বড় অনুভবের বাঁচার পথের শ্রেষ্ঠ পথিক শ্রী গৌরাস। এই কারাগারি দীপ্তর ভজনা একা একা আলাপা আলাদা করে নয়। নয় কোনো নিভৃত নির্জনতায় দীপ্তর ধ্যানে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মৃত্তিকে বুঁজে পাওয়া। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে — একটা সুরের মধ্যে সকলে একাকার হ'য়ে সোচ্চার সঙ্গীতই হ'ল নামকীর্তন। যে অনুভবকে ছুঁতে

চাই, তা একের নয় — সকলের। ব্যক্তির নয় — সমষ্টির। খুলে দাও, খুলে দাও। চারিদিকে যত আত্মসুখের দেওয়াল আছে ভেঙে দাও সব — তবেই মহাপ্রেম — কৃষ্ণপ্রেমের নিকবিত প্রেমের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ভোরের প্রথম আলো এসে পড়ল যখন আচার্যরত্নের আবাসে, হরিদাস তার বৈকুণ্ঠের কোটালের সাজ খুলতে শুরু করল ধীরে ধীরে। কিশোর বৃন্দাবন তখন হরিদাসের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, 'হরিবাবা — একটা পুরো রাত কেটে গেল। কিন্তু মনে হচ্ছে না, এই সব যেন শুরু হ'ল? রাতভর যা দেখেছি — জীবনভর তা ভুলতে পারবো না। যারা দেখতে পেল না, তারা জানতে পারল না কতটা আনন্দ থেকে পুরো ব্যক্তি হ'ল তারা।'

'পুরো ব্যক্তি হ'লে কেন তারা? তোমার দেখার আনন্দটা কি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারবে না বৃন্দাবন?'

'ঠিক বলেছে হরিবাবা। বলবো, যতদিন বেঁচে থাকবো বলে যাবো জনে জনে এই অমৃতের আশ্বাদের কথা।'

হরিদাস কি সেই মুহূর্তে ভাবতে পেরেছিল — সত্যিই ওই কিশোর বৃন্দাবন একদিন শ্রৌয় বৃন্দাবন দাসে পরিণত হয়ে চৈতন্য জীবনী রচনা করবে আর সেই চৈতন্য ভাগবতে খুঁটিয়ে বিবরণ দেবে সারারাত ধরে হওয়া এই পালা অভিনয়ের? কিংবা তার পক্ষে ভাবা কি সম্ভব ছিল — বাংলাভাষায় সেটাই হবে ইতিহাসে প্রথম নাট্যাভিনয়ের বিবরণ আর আলোচনা?

সেই মুহূর্তে হরিদাস শুধু অনুভব করলেন, নতুন দিনের আলো তার রক্তের ভেতর অন্য এক খেলা — বৈকুণ্ঠের ভালবাসার স্বাদ এনে দিয়েছে। বড় আবেগে বৃকের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কোটালের পোশাকটিকে জড়িয়ে ধরল হরিদাস।

## গণেশতন্ত্র

আদিনাথ ভট্টাচার্য

গল্প

নির্বিশেষ — একেবারেই নির্বিশেষ — চেহারাও ওই যে লোকটি এই কাকডোরে ব্রাহ্মমূর্ত্তে অরুণছটার লাল শ্রেণ ধরা আকাশকে পিছনে রেখে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ক্ষিপ্ত অথচ নাতিক্রান্ত পদক্ষেপে পথ চলাচ্ছে, তার নাম গণেশ। বছর দশকে ধরে ঠিক এই সময়ে এই ভাবে রোজ তিরিশ দিন প্রায় সকলেই আলমোদে সে এই পথে চলে — কোলোনি হেরফের হয় না। কদাচিৎ কারও নজরে পড়ে গেলে ভাবলেশহীন মুখখানিকে সে ঈষৎ নামিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নেয়, যেন তার চলমান অস্তিত্বের প্রশংসা একটি একান্ত গোপনীয় গুণ ব্যাপার। অথচ, নজরে পড়ুক না পড়ুক এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই জানে গণেশ এখন কোথায় যায়। এই সময়ে গণেশ প্রভুসদর্শনে চলে।

গণেশের প্রভু মহাদেব — এই শহরে যিনি মহাদেব উকিল নামে সমধিক পরিচিত। মহাদেব নানারূপে বিরাজিত। তিনি একাধারে ডকসাইটে উকিল, কন্সট্রাক্টর, সম্পত্তির দালাল এবং জননেতা — ফলশ্রুতি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। চারদিকে তাকে চক্ষুর্কণ সজাগ রাখতে হয়। গণেশ অনবদ্য দক্ষতারে তার চক্ষুর্কণকে সজাগ রাখবার মনোভা জুগিয়ে চলে। এই কাজে তার দক্ষতা এমন স্বাভাবিক আর সন্দেহহীন এবং মহাদেবের প্রতি তার একনিষ্ঠতা এমনই তদৃগত যে কেউ আর জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামায় না — যেন একটা অভ্যস্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, আলো হাওয়া নিশ্বাস প্রধাসের মতো, যতক্ষণ আছে টের পাওয়া যায় না।

প্রতিদিন ব্রাহ্মমূর্ত্তে মহাদেবের তিনতলা বাড়ির বন্ধ সদরের সামনে গণেশ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে, উম্মুখ একগ্রন্থের প্রতীক করে যতক্ষণ না প্রান্ত দাঁত মাজতে মাজতে নিচের হলঘরে নামেন এবং তৎক্ষণাৎ সদর দরজা খুলে যায়। বিগলিত মুখে জোড়হাত কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে ভক্তের ইষ্টদেবতার মন্দিরে প্রবেশের ভাবগত গণেশ তখন মনোমগ্ন থাকে। ইষ্টদেবতা টুথপেস্টের ফেনাভরা মুখ সামলাতে সামলাতে জড়ানো কিছু শব্দ উচ্চারণ করেন, যার মর্মার্থ একমাত্র ভক্তের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। গণেশ তদৃগত চিত্তে মহাদেবের কথা চূপ করে শোনে। তারপর ঘাড় নিয়ে, প্রভুর নির্দেশে ফিসফিস করে কিছু নিবেদন করে। এই উচ্চারণ প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে গণেশ প্রতিপক্ষের মালায় বন্ধোত্তর গুণ খবরাখবর, জমি বাড়ি সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, শহরের বিশিষ্ট জনগণের মতিগতি ইত্যাদি বিষয়ে মহাদেবের সেদিনকার মতো যেটুকু জানার তা জানা হয়ে যায় এবং পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য গণেশ যথাবিহিত নির্দেশ লাভ করে। অবশেষে অবনত হয়ে প্রণাম করতে করতে গণেশ পিছু হঠাতে থাকে এবং প্রস্থানোদ্যত হয়। ইতিমধ্যে মহাদেব ফকুয়ার পরটে থেকে সোমডানো কয়েকটা নোট বের করে হাতটা বাড়িয়ে দেন। গণেশ চরণামৃত নেওয়ার মুদ্রায় দুহাত জড়ো করে একটি থামে। আলগোছে নোটগুলো তার হাতে এসে পড়ে। মহাদেব আর একমূর্ত্ত দাঁড়ান না। গণেশও বেরিয়ে আসে। সদর দরজা তার পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়।

এইভাবেই চলে আসছে। তবে ইদানীং গণেশের কাজের চাপ খানিকটা বেড়েছে। কারণ

মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন এগিয়ে আসছে — আর মাত্র সাতদিন বাকি। নিয়মিত তথ্য সরবরাহের বাইরে নির্বাচন সংক্রান্ত মৌলিক কিছু খবরাখবরও গণেশের সংগ্রহ করতে হয়। ভোরবেলার নিত্য হাজিরা ছাড়াও গভীররাতে মক্কেল উমেদার পরামর্শদাতারা সব চলে যাবার পর গণেশ চুপি চুপি আর একবার মহাদেবের বাড়ি আসে এবং তার সংগৃহীত তথ্যের খলি উজাড় করে দিয়ে যায়। ফলে তার খানিনি অনেক বেড়েছে। কিন্তু মহাদেব অতি বিবেচক, বাড়তি খানিনি ভালোভাবেই পুথিয়ে দেন।

গণেশের কাছে ইলেকশনের পাঁচপরজারগুলো বেশ কেমন দুর্বোধ্য ঠেকে, কারণ এই ধরনের কাজের দায়িত্ব তাকে এই প্রথম দেওয়া হল। তার মানে এই নয় যে মহাদেব হঠাৎ এইবারই গণেশের দক্ষতার উপর বেশি আস্থাশীল হয়ে উঠেছেন। বরং বলা চলে এতদিন তিনি ইলেকশন নিয়ে বেশি মাথাই ঘামাতেন না। গত চারটে টার্ম তিনি পরপর জিতে আসছেন, তার মধ্যে তিনটে টার্ম একনাগাড়ে চেয়ারম্যান। প্রতিবার বিরাট ভোটের ব্যবধান জিতেছেন, বিশেষ ভাবে হয়নি। কিন্তু এবার হাওয়া অন্যরকম। বিরোধী প্রার্থী বিক্ষুব্ধরূপে বনেদি ব্যবসায়ী, পয়সার জোর মহাদেবের চেয়ে বেশি, তার উপরে মাঝে মাঝে দরিদ্র-নায়ায়ক সেবাসহ নানারকম জনহিতকর কাজের মাধ্যমে এতদক্ষলে তিনি বেশ জনপ্রিয়। এতদিন রাজনীতিতে তার বিশেষ আগ্রহ ছিলনা। কিন্তু এবার হঠাৎ তাঁর খোয়াল হয়েছে নির্বাচনী আসরে তিনি মহাদেবের মুখোমুখি হবেন। যেহেতু তাঁর অর্থবল আছে, প্রতিষ্ঠা আছে এবং তাঁর ভাবমূর্ত্তি পেশাদার রাজনীতির কালিমালিপ্ত নয়, সেই কারণে অনেকেই — বিশেষত ছেলে ছোকরার দল — তাঁর চারদিকে ভিড় করেছে। উপরন্তু মহাদেবের বিরোধী রাজনৈতিক দল তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী মনোনীত না করে পরোক্ষে বিক্ষুব্ধরূপকে সমর্থন এবং সাহায্য করছে। এমতাবস্থায় মহাদেব এবার নির্বাচনের ব্যাপারে রীতিমত চিন্তাগ্রস্ত। অন্যান্যবারের থেকে এবার অনেক বড়ো এবং শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি করেছে। বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রচার অভিযান সুসম্পন্ন করার জন্য নির্বাচনী সমর কৌশলে অভিজ্ঞ বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন। তারাই মনোমগ্ন সংগৃহীত তথ্যাদির প্রামাণ্যতা এবং গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মহাদেবের সংগে আলোচনাক্রমে সৈন্যনিষ্ঠ স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে। কিন্তু কিছু কিছু সংবাদসূত্র আছে যা একান্ত গোপনীয় — একমাত্র মহাদেব স্বয়ং এবং গণেশ ছাড়া অন্য আর কারও পক্ষে যেগুলো দূরবিগম্য। নির্বাচনের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত লোকজন টিকাভাজের, তাদের কাছে সেই সমস্ত গোপন সংবাদসূত্র প্রকাশ করা চলে না। অতএব, ওই বিশেষ কাজের জন্য এবার গণেশকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গণেশের অস্তিত্ব মহাদেবের নির্বাচনী-যন্ত্রের কাছে অপ্রকট, কিন্তু তার সংগৃহীত তথ্যাদি গভীর রাতে শুধুমাত্র মহাদেবের কাছে নিবেদিত হয়ে পরের দিনের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে প্রয়োজনমত গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

কাল রাতে গণেশ খবরাখবর নিয়ে চলে যাবার পর মোটামুটি খুশি মনে মহাদেব তাঁর শয়নকক্ষের সামনের বারান্দায় আরামকেন্দ্রারায় দেহ এলিয়ে দিয়েছিলেন। ইলেকশনের আর মাত্র সাতটা দিন বাকি। এই সময়টাই সবচেয়ে কুসিয়াল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে চিন্তে সময়কে কাজে লাগাতে পারলেই বাজি মাত। গণেশ আজো যে খবর দিয়ে গেছে তাতে মনে হচ্ছে হাওয়া তাঁর অনুকূলপুরেই। হতাশ খোজ নেওয়া কারণ নেই। আরে বাবা, ইলেকশন



একটা যুদ্ধ — একগাদা পদাতিক সৈন্য আর অন্যেকোরা কিছু রথী মহারথী থাকলেই সে যুদ্ধ জেতা যায়না। আসল কথা হল অভিজ্ঞতা এবং স্ট্র্যাটেজি। কালকের যোগী বিমুক্তরণ এই দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সংগে টঙ্কর দিয়ে এঁটে উঠতে পারবে কী করে। এই রকম ভাবতে পেরে মহাদেবের মন বেশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে এবং জিজ্ঞেসেরে গা এলিয়ে দিয়ে তিনি আগামী কালের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ভাবতে থাকেন।

ঠিক এমন সময় তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে আবার কার টেলিফোন! শয়নকক্ষে গিয়ে মহাদেব ফোন ধরেন। আর প্রান্ত থেকে তাঁর চিফ ইলেকশন এজেন্টের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কথা বলতে বলতে তাঁর ভ্রূর কুঞ্জন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়, তারপর ক্রমে তা মিলিয়ে গিয়ে চক্ষুদুটি বিশ্বস্মিত হয়ে ওঠে এবং তাতে যুগপৎ ক্রোধ হিংস্রতা হত্যাশা ফুটে ওঠে। কিছুক্ষণ বাদে দুম করে টেলিফোন রেখে মহাদেব রাগে ফুঁসে নেই ফুঁসতে ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। ইলেকশন এজেন্ট এমোত্রা যে সংবাদ তাকে জানিয়েছে, তা গণেশের পরিবেশিত সংবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিবাচনী প্রেক্ষাপটে গণেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে এজেন্ট সম্পূর্ণ অনবহিত। মহাদেব-গণেশের সংগে গোপনীয় সংবাদসূত্র তার জানার কথা নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে সামগ্রিক নিবাচনী কৌশলের অংগ হিসাবে ইলেকশন এজেন্টের বিশ্বস্ত অনুচরেরা কেমন করে যেন সেই গোপনসূত্রের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সেই সুই থেকে যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে চিত্তাভিহ্বিত হবার বিশেষ কোনো কারণ ছিলনা। কিন্তু অভিজ্ঞ অনুচরদের কেমন যেন মনে হয় সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে কোথাও কিছু গোঁজামিল আছে। অতএব তারা লেগে থাকে এবং অনেক ছলচাতুরীর অনেক মেহনতের পর আসল খবর বের করে আনতে সমর্থ হয়। চিফ ইলেকশন এজেন্ট জানাচ্ছে হাওয়া এবার ভয়ংকরভাবে প্রতিকূল, নিবাচন বৈতরণী পার হওয়া খুবই দুরূহ। পেশীবল প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং সুযোগও সীমিত কার্য প্রতিপক্ষের জনবল অনেক বেশি। এই ধরনের খবর পেয়ে হতাশা আক্রান্ত মহাদেব দ্রুত পদচারণা করতে করতে মাঝে মাঝে হাতের কাছে যা পান তাতেই প্রবল বিরক্তমে মূর্ত্যাবাত করেন। মাথায় আঁচন জুড়ে। একসময় নিরাশাজনিত ক্রোধধারি সংহত হতে হতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সেই কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে গণেশ। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে এক বিশাল ষড়যন্ত্র, উদ্দেশ্যপ্রসঙ্গিত একটি কূটচক্রান্ত — এবং এই সমস্ত অপচেষ্টার নায়ক অপসর্গ গণেশ।

অন্যান্য দিনের মত আজও প্রাথমিকভাবে প্রভু সন্দর্শনে চলেছে গণেশ। যথাসময়ে তিনতলা বাড়ির বন্ধ সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই থাকে বহুক্ষণ, হঠাৎ বা ঘণ্টাখানেক কিংবা তারও বেশি। মক্কেলদের আনাগোনার সময় হয়। তখন ধীরে ধীরে দরজা খোলে। এক লাফে গণেশ হলঘরে ঢোকে। কিন্তু ঘর শূন্য, মহাদেব তখনও নোমননি। ইতিমধ্যে একজন দুঃজন করে মক্কেলের আসা শুরু হয়। গণেশের দীর্ঘ চামচাকীবনে এমন ঘটনা একেবারেই ব্যতিক্রম। সে হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকে। বুকে উঠতে পারে না তার কি অপেক্ষা করা উচিত না চলে যাওয়া। কিন্তু সে যে এসেছিল, প্রভুকে জানতে না দিয়ে চলেই বা যায় কি করে। অথচ বাহিরের সব লোকজনের সামনে তার নিষ্ঠুরতের প্রভু বন্দনাই বা কী ভায়েক সম্ভব। যাই হোক, অনেক ভেবে গণেশ ঠিক করে তিনি না নামা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। তারপর তিনি

নামলে আভূমিপ্রণত হয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখবে। ইশারায় কথা হবে, তাঁর মনের ইচ্ছা বোঝা যাবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ হবে। এইভাবে ভাবতে পেরে সে অনেকটা বস্তি বোধ করে।

এমন সময় মছর অথচ গুরুভার পদধ্বনি শোনা যায়। উপর থেকে নিচে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। বিশাল বপু এবং উদ্ভত ব্যক্তিত্ব নিয়ে মহাদেব দেখা দেন। মক্কেলরা উঠে দাঁড়ায়। গণেশ আভূমি প্রণত হতে হতে তাঁর চোখে চোখ রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু চোখে চোখ পড়ে না, যদিও নুয়ে পড়া অবয়বভেতে মহাদেবের দৃষ্টি ক্ষণভরে আটকে যায়। তাঁর চোখমুখ কঠিন হয়ে ওঠে, বিস্তৃত নাসিকা স্মৃতিতর হয়। হঠাৎ একটি ভয়ংকর গর্জনে হলঘর ফেটে পড়ে — ‘হারামজাদা বেজম্মা ছুটো — বেরিয়ে যা এক্ষণি বেরিয়ে যা এখান থেকে।’ সকলের বিমূঢ় দৃষ্টি ততক্ষণ একটি নাক্স অবয়বের উপর গিয়ে পড়ে — তড়িৎ স্পৃষ্ট মরা ব্যাঙের মতো সেই অবয়ব তিরতির করে পড়ে এবং দরজার দিকে নিঃপ্রাণ একজোড়া কোঠরগল চোখ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে, তাতে সর্বশূন্য বর্ণিরা বোধহীন ভয়ের স্থিরচিত্র। সে অনুভব করে একটা ঘটনা ঘটেছে যার কেন্দ্র সে নিজে, কিন্তু ঠিক কী যে ঘটেছে, কেন এত শব্দ এত গর্জন, কী তার অর্থ কিছুই তার মাথায় ঢাকে না। স্নায়ুমণ্ডলীর সংগে তার মস্তিষ্কের যোগসঙ্গ যেন ছিন্ন। সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

গর্জমান মূর্তি এবার এগিয়ে আসে — রাসকেল, বদমাইশ, কথা কানে যাচ্ছে না? বললাম না বেরিয়ে যেতে।

গণেশ বিবর্ণ চোঁট ফাঁক করে কিছু বলার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটি প্রবল থাবা তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে এবং দরজার দিকে তার মুখটা ঘুরিয়ে প্রাচণ্ড জোরে ঠেলে দেয়। ফলে তার দেহে তীব্রগতিবেগ সঞ্চারিত হয় এবং তার প্রভাবে সে ঝাড়া হয়ে দরজার বাহিরে ছিটকে এসে বারান্দাজোড়া সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে সামনের লনের উপরে হুমড়ি খায়ে পড়ে। সে সংগে সংগে উঠে দাঁড়তে পারে না, তার খুব কষ্ট হয়। উণ্ডুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় সে জুল জুল করে একি ওদিক তাকায়। পিছনে হলঘরের দরজা এবং সামনে গেটের বাইরে রাস্তার উপরে কিছু জটলার উৎসুক এবং উত্তেজিত হাত পা নাড়া তার দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু কোনো শব্দ তার কানে আসে না। এই মুহূর্তে তার মধ্যে কোনো বোধ কাজ করে না, লাল্হিত অপমানিত যে দেহটা মাটি ঝিকড়ে অসহায় পড়ে আছে সেটা যেন তার নিজের নয়, অন্য কার। চেতনাবলি মস্তিষ্ক নিয়ে শরীরের অংগ প্রত্যংগলোকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সচল করে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ন্যাচাতক ন্যাচাতক মাথা নিচু করে কোনো দিকে না তাকিয়ে গেট পার হয়ে বেরিয়ে যায়।

বোধশূন্য ভারশূন্য যার একটা অপার্থিব সহস্রকে টেনে নিয়ে গণেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়িতে ফেরে। সোজা ঘরে ঢুকে সে দরজা করে দরজা বন্ধ করে দেয়। দুই হাতে চোখ ঢেকে কপাল চেপে গুম হয়ে বসে থাকে। এই ভাবে বসে থাকতে থাকতে তার ভিতরে একটি চেতনার জন্ম হয় — সে অপশ্রুতভাবে বৃষতে পারে তার এই নিত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্বের কোনো এক ফাঁক ফোকরে অনির্দেশ্য একটা বোধ বাসা বঁধে আছে, যে বোধ আহত হলে সমগ্র অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেই বোধ এতদিন গভীর অতলে কুণ্ডলী থাকিয়ে ঘুমিয়েছিল,

আজ অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে তা জেগে উঠে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। যন্ত্রণাবদ্ধ সেই বোধ তাকে অস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় — ‘তুমি শুধু মহাদেবের উচ্ছিষ্টভোগী গণেশ নও, মহাদেব-সর্বস্ব গণেশজীবন তোমার আত্মার অপমান, আত্মার অপমানে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কলে পড়া ইদুরের মতো নিছক প্রাণধারণের তাগিদে খাবারের লোভে কবে একদিন কলের মধ্যে আটকে পড়েছিল, নেহাৎ কলের মালিক নিজের প্রয়োজনে তাকে এতদিন বাচিয়ে রেখেছিল, তাই সে বেঁচে আছে। আজ মনে হয় তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, একদিন নির্মম সাঁচুপি আঁর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে টেপটে পিষে ফেলবে। কী করে সে আত্মরক্ষা করবে। সে যে গণেশ, শুণ্ডই গণেশ, আর কিছু নয়।

গণেশের স্ত্রী দরজায় করাঘাত করে। প্রথমে উদ্বেগে চাপা, পরে অধৈর্যে উষ্ণ কঠে বলে — ‘দরজা খোল, কী হয়েছে, এমন করে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে দুম করে দরজা এটে বসে রয়েছে কেন?’ সাড়া নেই। এবার একটু তীব্র কঠে — ‘কী হল, কথা কানে যাচ্ছে না? দরজা খোল, খোল বলছি’। তবুও গণেশ সাড়া দেয় না। বিমিত্ত মুকুন্দনে গণেশের স্ত্রী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় ধাক্কা মারে। তার দশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই ধরনের ঘটনা আদৌ কখনও ঘটেছে কিনা তার মনে পড়ছে না। সে ডেকে যাচ্ছে, দরজা খোলার জন্য কুকুম করছে — অথচ গণেশের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই, এমনটা অভাবনীয়। কারণ বিবাহোত্তর গণেশ চিরকালই স্ত্রীর অত্যন্ত অনুগ্রহ, বাধা। তার স্ত্রী তার মতো নির্বিশেষ নয়, আটসটি বাঁধনে অলগা চটকদার চেহারা একধরনের চুষক ব্যক্তিত্ব আছে যার সম্পর্কে সে নিজে সচেতন এবং এই কারণে সে কোনো প্রভুস্বপ্ন নয়। বেশিক্ষণ কাউকে সাধাসাধনা করা তার ধাতে নেই। গণেশের কোনো সাড়া না পেয়ে গজগজ করবত করতে দুম দুম পা ফেলে সে চলে যায়।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর গণেশের মনে হল তার বন্ধ দরজার বাইরে অনেক মানুষের পদধ্বনি। আবার করাঘাত এবং স্ত্রীর কঠর — ‘দরজা খোল, দেখ কারা এসেছেন’। গণেশ ইতস্তত করে। এবার একটি জলদগ্ধতীর পুরুষ কঠর, তাতে সহানুভূতির ছোঁয়া — ‘দরজা খোল গণেশ, আমরা আছি, তোমার কোনো ভয় নেই’।

গণেশ দরজা খোলে এবং বিমূঢ় স্থানবৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। দলবলং সহ তার দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং বিষ্ণুরূপ। বিষ্ণুরূপ আলতোভাবে গণেশের পাশে হাত রাখেন, তারপর পরম অভ্যর্থনা ভাণ্ডিয়ে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে থাকেন — ‘আজ সকালের পুরো ঘটনা আমি শুনেছি গণেশ। মহাদেব উকিল স্বর্গ ছাড়া কিছু বোঝে না, স্বর্গের বাইরে তার হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই — এ সবই জানা কথা। কিন্তু সে যে এত বড় পাণ্ডু অমানুষ তা তো জানা ছিল না। তোমার কুকুর বিভ্রাটের সংযোগ এমন ব্যবহার করে না, আর সে কিনা তোমার মত এতদিনের বিশ্বস্ত অনুগত সংগীকে — ছি: ছি: ছি: যুগ্মমিশ্রিত ঝিকারে কঠর স্বয়ং বিকৃত করে বিষ্ণুরূপ খামেন।

গণেশ চুপ করে থাকে। তার বকের মধ্যে গলার কাছে অনেক শব্দ অনেক উচ্চারণ টপটপ করে ফুটতে থাকে, কিন্তু কথা হয়ে বেরিয়ে আসেনা। তারপর অকস্মাৎ একটা ঘড়ঘড় জাতীয় আর্তনাদ। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে গণেশ ধপ করে বিষ্ণুরূপের পায়ের কাছে বলে

পড়ে, প্রাণপণে তাঁর নিম্নাংগ আঁকড়ে ধরে দুই হাটুতে কপাল এবং মুখমণ্ডল ঘষতে থাকে। সমস্ত পরিবেশ অদ্ভুত থমথমে। বিষ্ণুরূপ কিছুক্ষণ নিশ্বাসে গণেশের খোঁচা খোঁচা চুলের মধ্যে সহানুভূতির আঙুল নাড়াচাড়া করেন, তারপর দুই কাঁধ ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কঠে বলেন — ‘তোমার কোনো ভয় নেই গণেশ, উঠে দাঁড়াও, আমরা সকলে তোমার সংগে আছি। তিনি তাঁর অনুচরদের দিকে তাকান, তারা সকলে বাড়ি নাড়ে।

এরপর বিষ্ণুরূপ একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে গণেশের স্ত্রীকে দেখতে পান এবং বীর পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে যান। বলেন — ‘গণেশের এখনকার মনের অবস্থা আমি বুঝি। তোমাকেই সব সামাল দিতে হবে। কোনো সংকোচ কোনো না, যখন যা অসুবিধে হবে আমাকে খবর দিও। আমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার।’ বলতে বলতে পকেট থেকে মানিবাগ বার করেন, তার থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট তুলে নিয়ে গণেশের বউয়ের ডান হাতে গুঁজে দেন — ‘তোমাদের অবস্থা আমি জানি, এইটো রাখো। আপত্তি করতে পারবে না। ভেবানো যে একেবারে বিনা স্বার্থে এ টাকা আমি তোমাদের দিচ্ছি। অত মহাপুরুষ আমি নই। গণেশের বিশ্বস্ততা, কর্মদক্ষতা আজকালকার দিনে বড়ো একটা দেখা যায়না। আজ থেকে ওকে আমি আমার কাজে বহাল করলাম। ধরে নিতে পারো এ টাকাটা আগাম দিলাম।’

বিকলের দিকে আবার বিষ্ণুর দূত আসে এবং গণেশকে ডেকে নিয়ে যায়। গণেশের পিঠে আলতোভাবে হাত রেখে আর একবার বিষ্ণুরূপ তাকে পরম আশ্বাসের বাণী শোনান এবং নিশ্চিত থাকতে বলেন। সংকোচে মাটিতে মিশে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় বাকরুদ্ধ গণেশ কয়েকবারের চেষ্টায় অস্ফুটে বলতে পারে — ‘হুজুরের ঋণ আমি চিরজীবনেও শোধ করতে পারবনা। আপনি যা করতে বলেন, আমি তাই করব।’

গাঢ় প্রশান্তিতে বিষ্ণুর চোখদুটি ঈষৎ মুদ্রিত হয় — ‘ছি ছি গণেশ, এ তুমি ভাবতে পারলে। আমি কি কিছু পাওয়ার আশায় তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। একজনদের বিপদের সময় আর একজন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে — এটাই তো মানুষের ধর্ম।’ তারপর কিছুক্ষণ থমে — ‘কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। তোমার সংগে মহাদেব উকিলের এতদিনকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক — হঠাৎ এমন কী ঘটল যে তোমার মত একজন নিরীহ বিশ্বস্ত মানুষের সংগে সে এমন একটা অমানুষিক ব্যবহার করল।’

গণেশ নিজেই জানেনা কেন মহাদেব প্রলয়ংকর মূর্তিতে আজ তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। তাই সে স্পষ্ট কোনো উত্তরও দিতে পারেনা। শুধু বলে — ‘উনি যখন যেমন বলতেন, সাধামত করেছি। কারুর সংগে যোগাযোগ করে কোনো গোপন খবর আনতে বললে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সেই সব খবর এনেছি। হয়তো কোনো কোনো সময় একটু আধুঁ ভুলত্রুটি হয়েছে, তার জন্য অল্পবিস্তর বাকরুদ্ধ করেছেন, কিন্তু আজ কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কী কারণে উনি হঠাৎ এমন দুর্দান্ত রোগে মারধর করলেন, সেই কারণটোও জানতে পারলাম না।’

এইভাবে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গণেশ নিজেকে অনেক হালকা, অনেক সহজ বোধ করে। তখন বিষ্ণু ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে জেনে নেন — মহাদেব গণেশকে কীভাবে কাজে লাগাতেন, তাঁর



কারবার কতদূর বিস্তৃত এবং বিচিত্র, দু'নম্বর ব্যাপার সাধারণ ইত্যাদি অনেক কিছু গোপন তথ্য। কথায় কথায় গণেশ সমস্তই উন্মোচিত করে দেয়।

অবশেষে কঠোর সামান্য একটু উদ্বেগের ভাব এনে বিষ্ণুচরণ বলেন — 'শোনা গণেশ, ভেবে দেখলাম এই সময়টা তোমার একটু সাবধানে থাকাই ভালো। আমরা লোকজন এই কটা দিন ইলেকশন নিয়ে এত ব্যস্ত থাকলে যে তোমার উপর চিন্তামতো ভাব হয়তো রাখতে পারবে না। আমার মাথায় একটা গ্লান এসেছে। তুমি মহাদেবের মার খেয়ে ডুবানেক জখম হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছ। তোমার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং বাইরের কোনো লোককে তোমার সংগে দেখা পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। আপাতত এই ঠিক থাকল, তুমি সোজা এখান থেকে নার্সিং হোমে যাবে। আমি তোমার বাড়িতে বরষা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি এবং তোমার স্ত্রীকে পুরো ব্যাপারটা বোঝাবারও দায়িত্ব নিচ্ছি। ও বুদ্ধিমতী মেয়ে, ঠিক বুঝবে। বাড়ির জন্য তুমি কোনো চিন্তা করো না।'

হতবুদ্ধি গণেশ খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিষ্ণুচরণের অনুরোধবশত একযোগেই হই হই করে ওঠে — 'এর করে ভালো ব্যবস্থা আর হয়না। তুমি কিছু ভেবে বা গণেশ, আমাদের কর্তামশাই যখন তোমার ভার নিয়েছেন, তখন কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই, তোমার চুলের জগা পর্যন্ত স্পর্শ করে।' বিষ্ণুচরণ শুধু বলেন — 'এখানেই খাওয়া দাওয়া করে নার্সিং হোমে চলে যাবে। আমার ছেলেরা তোমাকে ওখানে থাকবার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। ফোনে ডাক্তারের সংগে কথাবার্তা বলে আমি সব ঠিক করে নেব। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। একমাত্র তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ তোমার সংগে নার্সিং হোমে দেখা করতে পারবেনা। সে ব্যবস্থাও আমি করছি। তোমার বাড়িতে বরষা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার স্ত্রী কাল সকালে তোমার সংগে নার্সিং হোমে দেখা করবে। তোমার অবর্তমানে বের যাতে কোনোরকম অসুবিধা না হয়, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, তার পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হবে। মোট কথা, দিন সাতকে তুমি দিবাি আরামে থাকবে দাবো বুঝাবে, কিন্তু নার্সিং হোমের বাইরে বেরোবে না। ইলেকশন শেষ হয়ে গেলে আবার বাড়ি ফিরে আসবে।'

নরায়ণ পাষও মহাদেব উকিলের আমানুষিক নিপীড়নে তাঁরই একান্ত অনুরাগ গণেশ গুরুতর আহত অবস্থায় নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত, সে এখনও সজ্জাহীন এবং তার জীবন সংকটাপন্ন, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাইরের কাউকে তার সংগে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় সংবাদপত্র, পোস্টার, পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী বক্তৃতার মাধ্যমে শহরের সমস্ত অধিবাসী এখন এই খবর জেনে গিয়েছে এবং মহাদেব উকিলকে রাতারাতি বন্দ্যাক বানিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু তাঁর দালালি, টিকাদারি ইত্যাদি সংক্রান্ত বেআইনি সব কারবারের যাবতীয় গোপন তথ্য এখন প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বত্র ভাসমান। ফলে যা হবার ছিল, তাকে তাই হল। নির্বাচনী বৈতরণীতে শুধু মহাদেবের একার নয়, তাঁর নেতৃত্বাধীন দলীয় প্রায় সমস্ত প্রার্থীর ভরাডুবি হল। বিষ্ণুচরণ জিন্দাবাদ ধর্নিতে আকাশবাতিস মুখরিত হল এবং নিরুদ্ধস্থ আধিপত্য বিষ্ণুচরণ নগরের জনজীবনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

নির্বাচনের দিন গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পরের দিন বিষ্ণুচরণের জয়গান মুখরিত জনপদের প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে বউয়ের সংগে রিকশায় চেপে সে নার্সিং হোম থেকে

বাড়ি ফেরে। তার অবর্তমানে বউয়ের কোনো অসুবিধা হয়নি, বিষ্ণুর ছেলেরা তার সব প্রয়োজনের দিকে যথোচিত নজর রেখেছে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে গণেশের বরষা মনে হয়, তার চেহারায জৌলুশ যেন একটু বেড়েছে, আঙের তুলনায় যেন আরও একটু বেশি উচ্ছল। তার কেমন যেন বিহ্বলতার ঘোর লাগে — পাশে বসা এই যে রমণী যার সংগে সে দশ বছর ঘর করেছে, নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য যে তার অন্তরঙ্গতার একমাত্র সঞ্চল, তাকে যেন এই মুহূর্তে কেমন অচেতন মনে হয়। সে আড়চোখে বউয়ের মুখের দিকে তাকায় যখনো আলোছায়া খেলা করে কিন্তু গণেশের সামনে কোনো বিশেষ অর্থ মেলে ধরে না। প্রকাশ্য দিবালোকে জ্যাকীর্ণ রাজপথে রিক্সা চেপে এই স্ত্রীরহস্যের সংগে সে চলেছে, পথচলতি লোকজন তাকে দেখে কুশল প্রশ্ন করছে, হাত নাড়ছে, কেউ কেউ আবার যেন একটু সমীহের ভাব মুখে মুটিয়ে হেসে ঘাড় কাত করছে। গণেশের বেশ ভালো লাগে। ভাবতে ভালো লাগে যেন আজকের এই সংক্রান্তির ঐক্যতো তারও কিছু ভূমিকা আছে আর আরও ভালো লাগে এই গর্ব অনুভব করতে গেলে যে পাশে-বসা রমণী তার বউ — একবারে তার নিজের।

গণেশ বাড়ি ফেরে। সে সব কিছু তার কেমন নতুন নতুন লাগে। মহাদেব থেকে বিষ্ণুতে উত্তরণের সপ্তাহব্যাপী অজ্ঞাতবাসের কালে তার বাড়িতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তার নজরে পড়ে। দাওয়ায় খান দুয়োক নতুন চেয়ার, শোওয়ার ঘরের দরজা দিয়ে উকি মেরে দেখতে পায় সুন্দর জয়পুত্রী কাজ করা একটা চাদরে বিছানা ঢাকা এবং বাঁ দিকে রান্নাঘরের দরজার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে গণেশ একটি ঘুমভাঙা চড়াই পানির হৃদয় পেয়ে যায় কারণ সেখানে তার উচ্ছল বউ বন্ধক থেকে সিলিগুঠির থেকে নল লাগানো গ্যাসের উতানে কী যেন একটা খাবার তৈরীতে ব্যস্ত, কঠে গুনগুন গানের সুর।

ইতিমধ্যে বউয়ের কাছ থেকে গণেশ জেনে গিয়েছে নির্বাচন পর্বের শেষ সাত দিন সে-ই ছিল নেপথ্য নায়ক। তার নির্বাচনের ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজ পোস্টার স্রোতান বহুত। কতলোক স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয়ে গণেশের বাড়িতে এসে তার বউকে সমবেদনা জানিয়ে গেছে। তাছাড়া এই কদিন বিষ্ণুর অন্তরঙ্গেরা নিয়মিত তার সংসারের খোঁজখবর নিয়েছে। এত ব্যস্ততার মধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুচরণও একবার এসেছিলেন। গণেশ কৃতার্থ বোধ করে।

অনেক রাতে অভিনন্দন স্বর্থনি ইত্যাদির পালা সাঙ্গ করে সানুচর বিষ্ণু গণেশের বাড়ি এসে হাজির হয়। নবনির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আজ তাঁকে নতুন পুরপ্রদান নির্বাচিত করেছে। প্রথম অবসরের মধ্যেই তিনি গণেশের বাড়ি আসা কর্তব্য মনে করেছেন — 'কী হে গণেশ, আছে কেমন? খুশি তো?' দাওয়ায় উঠতে উঠতে বাঁ দিকে তাকিয়ে — 'রান্নাঘরের পটি কি আজকে মত চুকিয়ে ফেলেছ নতুন বউ? তবে থাক।' — 'না না থাকবে কেন। গ্যাসের উতুন, আর কতকগুলি বা লাগবে।' — 'নাহ, আজ থাক। কতদিন বাসে গণেশ ঘরে ফিরল। তারপর রাতও হয়েছে অনেক। এত রাতে আর চায়ের ঝামেলায় দরকার নেই। তুমি বরং এই মিষ্টি হাড়িটা থেকে সবাইকে ভাগ করে দাও আর এক গ্লাস জল।' বিষ্ণুর ইঙ্গিতে একজন অনুচর একটা বড় মিষ্টির হাড়ি গণেশের বউয়ের হাতে তুলে দেয়।

'এতক্ষণ ধরে গণেশ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। বিষ্ণুর সহজ অমায়িকতায় আত্মরিক

কৃপায় সে অভিভূত হয়, তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি হৃদয়সম করে ক্রমশ তার ঘোর কাটে। তখন সে বিগলিত বোধ করে। এই কদিনে কত সহজে বিষ্ণুচরণ তাকে আর তার পরিবারকে এমন আপন করে নিয়েছেন, কখন যে তার বউকে নতুন বউ বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছেন — এমন স্বাভাবিক ব্যবহার যেন গণেশের সংগে তাঁর দুস্তর কোনো ফালাক নেই। সে আত্মমুগ্ধ প্রণত হয়, চোখে কৃষ্ণজতার অক্ষ ফুটে ওঠে, আবেগ এবং কৃত্যায় জড়ানো কয়েকটি শব্দ তার কাঁপা ওষ্ঠাধরের ফাঁকে বেরিয়ে আসে — “হজুর সতিাই মহান, আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।”

— “আহা কর কি কর কি, ওঠো!” বিষ্ণু গণেশকে প্রণিপাত অবস্থা থেকে তুলে বসিয়ে দেন। “নিজেকে কখনও দীর্ঘ ভাবতে নেই, সব সময় ভাববে তোমারও একটা দাম আছে, কেউ কারুর কাছে স্বর্গী থাকে না — একসময় না একসময় সব শোধবোধ হয়ে যায়।”

বিষ্ণুর কৃপায় গণেশের একটা পাকা ব্যবস্থা হয়ে যায়। মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি অতিরিক্ত মেসেঞ্জার-কাম-পিওনের পদ সৃষ্টি করে উপযুক্ত বিবেচনায় গণেশকে নিয়োগ করা হয়। তার কাজ মূলত ঘোরাঘুরির — নোটটি জারি করা, চিঠি বিলি করা ইত্যাদি। মাঝে মাঝে জরুরি চিঠি রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে তাকে সদরে পাঠানো হয়। সে যাতে সুচারুভাবে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য পুরসভার থেকে একটি আনকোরা নতুন সাইকেলও তাকে দেওয়া হয়েছে। সকাল সন্ধ্যা যখন তখন গণেশ এখন শহরের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত নতুন সাইকেলে বিচরণ করে। পরনে তার ঝকঝকে উড়ি, চোখেমুখে পরিভূষি, টুংটাং ঘণ্টি বাজিয়ে জনতার মাঝখান দিয়ে গুল চলতে চলতে বিষ্ণুচরণের প্রতি কৃতজ্ঞতার তার হৃদয় ভরে ওঠে।

এমন করে দিন কাটে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে গণেশ কাজ করে যায়। কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসাবে ইদানীং পত্রাবাহকের কাজের অতিরিক্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার তাকে দেওয়া হয়েছে — সকালের দিকে সে পত্রাবাহক, অপরাহ্নে সে বিষ্ণুচরণের খাস বেয়ারা। সহকর্মীদের স্বীয়ায় গণেশ মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করে।

বিষ্ণুচরণ সাধারণত সকালের দিকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের কাজকর্ম সেরে দ্বিপ্রাথরিক আহার এবং সামান্য বিশ্রামের পর বেলা তিনটে নাগাদ পুরসভার অফিসে আসেন। গণেশও তার ঘোরাঘুরির কাজ শেষ করে যেমন করে হোক বেলা দুটোর মধ্যে অফিসে চলে আসে। বলা তো যায় না, যদি কোনোদিন চোয়ারম্যান হঠাৎ আগে এসে পড়েন। আজকাল তার সংগে একটি পোর্টফোলিও ব্যাগ থাকে। ব্যাগের মধ্যে টিফিনবাকসে তার বউয়ের হাতে তৈরী টিফিন থাকে। অফিসে এসে গণেশ টিফিন সেরে নেয়। তারপর ঋতুন দিয়ে চোয়ারম্যানের টেবিল চোয়ার টেলিফোন ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে সাফ করে, ছড়ানো ছিটোনো কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে, বাদিকের দেয়াল টাঙানো পরমহংসদেবের ছবিতে সামনে রাখা ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপকতি জ্বেলে সে প্রতীক্ষা করে। চোয়ারম্যান আসেন এবং তাঁর পরম সন্তোষ ও সপ্রশংস শ্রুতদুষ্টির সিন্ধুভাষ্য গণেশ কাজ করে যায়।

সেদিন সকালের ঘোরাঘুরির কাজটা একটি আগেই শেষ হয়েছে। হাতে এখনও কম করে

ঘন্টাতানেক সময়। উপরন্তু সে তার বসতপাড়া — বলতে গেলে বাড়ির পাশ দিয়েই ফিরছে। ভাবল চুপিসাড়ে বাড়িতে একবার ঢুকে বউকে অবাক করে দিয়ে যাই। বউয়ের অবাক হওয়া মুখের কল্পছবি তাকে টানে। সে নিশ্চয়ে বাড়িতে ঢোকে এবং থমকে দাঁড়ায়। থমকে দাঁড়ায় কারণ সে মৃদু বাক্যালাপ শুনতে পায়। একটি কষ্ট তার খুবই পরিচিত — তার বউয়ের, কিন্তু অপরটি অপরিচিত পুরুষ কষ্টের। লোকটি কে, এই নির্জন দুপুরে সে তার বউয়ের সংগে কী আলাপ করছে জানতে ভীষণ আকুল বোধ করে গণেশ। কিন্তু এতদিনে সে বুঝে গেছে সব জিনিষ প্রকাশ্যে সরাসরি জানা যায় না, জানা উচিতও নয়। দাওয়ায় না উঠে সে নিশ্চয়ে পা টিপে টিপে ঘরে পিছন দিকে জানালার নিচে এসে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে। কথাপকথন কোনো আসে — ‘তা হলে ওই কথাই রইল বউদি, রাত আটটা নাগাদ তৈরী থাকবেন, আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব’।

— “কিন্তু আমার কেমন ভয় ভয় করছে বাচ্চ।

— “ভয়? কেন? কাকে ভয় কীসের ভয়? জরুরি চিঠি দিয়ে বিকেলের দিকে গণেশদাকে সদরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে — অত্যন্ত জরুরি চিঠি, রাতের মধ্যেই ডি.এম এর কাছে পৌঁছানো চাই। (হে: হে: হে: চাপা হাসি)। বিকেলে সদরে রওনা দিলে কাজ কর্ম সেরে রাতের মধ্যে ফিরে আসা খুব মুশকিল, আর যদি কোনোরকম ব্যবস্থা করে ফিরেও আসে তো মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। অতএব, ওদিক থেকে নিশ্চিত। আপনি তো তার দশটার মধ্যে বাড়িতে ফিরেই আসছেন, কেউ টেরও পাবে না। তা হলে এর মধ্যে ভয়ের ব্যাপারটা আসে কোথা থেকে?”

— “কিন্তু তুমি... মানে, বুঝতে পারছ না, এমন করে, হঠাৎ... আমার। আমার ভীষণ...”

নারীকন্ঠের অসংবদ্ধ বাক্যবন্ধকে থামিয়ে দিয়ে পুরুষকন্ঠ শেষ কথাটি উচ্চারণ করে — ‘আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বউদি। যাই ভাবুন আর যাই বলুন মনে মনে আপনি ঠিকই জানেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা আপনারও নেই, আমারও নেই। তৈরী থাকবেন, আজ রাত আটটায়, আমি করে নিয়ে যাব যেমন ভাবে কথা হল ঠিক তেমন ভাবে।’

পদশব্দে বোঝা যায় বাচ্চ নামধারী পুরুষকন্ঠের অধিকারী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গণেশ এবার একটু মাথাটা তুলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে। একটি ছেলে ঘরের ভেতরানো দরজা আধখোলা করে পলকের জন্য দাঁড়ালে, তার বউ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাকে বিদায় দেয়, তারপর দরজা বন্ধ করে সম্ভবত দিব্যানিবার জন্য নরম বিছানায় সজ্জিত খাটের দিকে এগোয়। গণেশের মনে হল এই ছেলোটিকে সে দেখেছে, — কচি মুখ, বোধহয় কৈশোর এখনও পেরোয়নি, কোঁকড়াগুলো চুল, ফকসা ঘোষা রঙ, এর নাম তাহলে বাচ্চ — তার বাড়িতে এবং অন্যত্র যখনই বিষ্ণু সানুচর কোথাও পদার্পণ অথবা বিচরণ করেন। ছেলোটি বিষ্ণুর বিশেষ কৃপাধার।

যেমন এসেছিল, তেমনই চুপিসাড়ে গণেশ নিজের বাড়ি থেকে নিষ্কান্ত হয়। কেউ টের পায় না। সে সোজা অফিসে এসে পৌঁছোয়। অন্যদিন সে অফিসে এসে চোয়ারম্যানের খাস কামরার বাইরে তার নির্দিষ্ট বসার জায়গায় পোর্টফোলিও ব্যাগটা রেখে সাধারণ শৌচাগারে ঢুক ভালো করে হাত মুখ ধুবে যাবে। অফিসে টিফিনের কৌটো বার করে ধীরে ধীরে সুখে বউয়ের হাতে তৈরী খাবার খেয়ে নেয়, কৌটোটা ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার ব্যাগে রাখে। সে যেখানে



বসে সেই বারান্দার কোণে একটা দেয়াল আলমারি আছে। তার মধ্যে ব্যাগটা রেখে সে খাসকামরায় ঢোকে, নির্ধারিত কাজগুলো পূর্ণানুপূর্ণ সমাধা করে বিষ্ণুচরণের জন্য বাইরে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু আজ — যদিও অন্যদিনের থেকে বেশ খানিকটা আগেই সে এসেছে, তবুও মনে হয় যেন বড় তাড়া কিংবা কিছু একটা তাকে পিছন থেকে প্রবল বেগে তাড়া করেছে, একটা নিরাপদ আশ্রয় না পেলে এখনই তার উপরে মোক্ষম থাবা বসিয়ে দেবে — কোনো দিকে না থাকিয়ে গণেশ, চেয়ারম্যানের গা বকেয়া, সোফা এসে দরজা খুলে চেয়ারম্যানের খাসকামরায় ঢুকে পড়ে। এয়ারকন্ডিশন মেশিনটা চালিয়ে দেয় এবং নরম কার্পেটের উপর সাজানো বড় সোফার নরম গদিত গা এলিয়ে বসে পড়ে। চারপাশের নরম অন্ধকার তাকে ঘিরে থাকে আর মেশিনের মৃদু অথচ টনা যান্ত্রিক আওয়াজে জমে যাওয়া নিস্তব্ধতা ধীরে ধীরে তার অজ্ঞত কোষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তার চোখ বুজে আসে, ক্লাস্তিতে নয় শান্তিতে নয় নিদ্রায়ও নয়, কিন্তু এক অনায়াসদিগ্ধ শীতল অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় এক বোধশিশু, যে শিশু প্রথম ক্ষীণ চীৎকারে তাকে জানিয়ে দেয় — সাধবান গণেশ, তোমার উপর নেমে আসছে এক অমোঘ আক্রমণ যা প্রতিহত করতে না পারলে তোমার নিকিত অবলুপ্তি। হাতে আর সময় নেই, এখনই এই মুহূর্তে স্থির করে ফেল অস্তিত্ব রক্ষার রণকৌশল।

কিন্তু গণেশ সহসা কোনো পথ বুঝে পায় না। একদিকে সে, অসহায় অকিঞ্চিৎকর অর্থহীন বার্তাবাহক অঙ্গুলিচালিত খাস পেয়ারা; প্রতিপক্ষ প্রবল পরাজিত সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রতিভা। কেমন করে এ আক্রমণ সে চেকাবে। মহাদেবের বেলায় কোনো আগাম সতর্কবার্তা সে পায়নি, তাছাড়া সেই অতর্কিত আক্রমণে ছিল আত্মার লাল্পনা, অবলুপ্তি নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে জেনে গেছে, আসন্ন আক্রমণের চরম পরিণতি তার আত্মার, তার অস্তিত্বের নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তিতে। সে এখন কী করবে। তার দেহের প্রতিটি কোষ রাস্তা উপরাস্তা রক্তকণিকা একযোগে প্রাণপণে ভাবতে থাকে, ভাবতে ভাবতে মেশিনের জমাট বাঁধা একটানা মুশৃঙ্খল হঠাৎ যেন গর্জন হয়ে যায় এবং সেই সময় তার সত্যোজাত বোধশিশু আর একবার চীৎকার করে ওঠে। গর্জন এবং চীৎকারের একতান তার মরুদেহের চেতনাকে সাফ করতে করতে প্রথমে অস্বপ্নে তারপর ক্রমশ স্ফুটনীয় যে উপলব্ধি পৌঁছে দেয়, তার সারমর্ম — হে গণেশ, আত্মাকে রক্ষা করতে হলে আগে তার স্বরূপ জানো। তোমার আত্মার শক্তি কোথায় নিহিত, তার দুর্বলতম রক্তপথই বা কোথায়, এসব যদি না জানো তবে তাকে রক্ষা করার কোনো রকম তুমি আয়ত্ত করবে কীভাবে। জেনে রাখো, যে কোনো উপায়ে টিকে থাকার দুর্মর বাসনা তোমার আত্মার মূল শক্তি। আরো জেনে রাখো, যে কোনো রকম ঈশ্বরের মণ্ডন, সম্পদের আবরণ আত্মাকে প্রতিপক্ষের লক্ষ্যবিন্দু হিসাবে গড়ে তোলে এবং সেই কারণে আক্রমণে প্ররোচিত করে। তোমার আত্মার যেটুকু ঈশ্বর বা সম্পদ অবলম্বিত আছে, সেটুকুই তোমার দুর্বলতম রক্তপথ। এখনই সমস্ত আবরণ এবং আভরণ ছুঁড়ে ফেলে আত্মাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দাও। দেখবে কেউ আর তোমার সেই উলঙ্গ আত্মার দিকে হাত বাড়ানো বা, তুমিও নিসপত্ত নিরাপত্তায় আবহমানকাল টিকে থাকতে পারবে।

চকিত আলোয় গণেশ যেন পালক বুধা পুঞ্জ পায়। সে অনুভব করতে পারে অবিচল

কর্তব্যনিষ্ঠা কৃতজ্ঞতাবোধ দাস্যভাব প্রভৃভক্তি ইত্যাদি তার আত্মার সম্পদ এবং একটি সদা উচ্ছল স্বাভাবিক সন্দরী চট্টলা স্ত্রীর হওয়ার গৌরব তার আত্মার ঈশ্বর্য। এই সম্পদ এবং ঈশ্বর্যকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলে এখনই আত্মাকে উলঙ্গ করে দিতে হবে। কর্তব্য এবং রণকৌশল স্থির করে নিতে তার আর অসুবিধা হয়না।

নরম সোফার খাসকালীন মরিয়া আশ্রয় ছেড়ে গণেশ দিগন্তে দাঁড়ায়। খাস কামরার অপর প্রান্তে বিলাসলাস্য খাস টয়লেট। এরম কাছের উপর দিয়ে নিশ্চয় পদক্ষেপে সে খাস টয়লেটের দিকে এগোয়। জীবনে এই প্রথম সে প্রভুর টয়লেট ব্যবহার করে। আরোয় করে চোখে মুখে জল ছিটায়, হাত পা ধোয়, ঝরঝরে ফিটফিট হয়ে বেরিয়ে আসে। এতক্ষণে দুটো বাজে। একটু ভেবে নিয়ে আবার সোফায় গিয়ে বসে। ব্যাগ খুলে টিফিনের কৌটো বের করে তারিয়ে তারিয়ে খাবার খায়। খাস টয়লেটে গিয়ে হাতমুখ কৌটো ধোয়। তারপর ফিরে এসে কামরার পর্দাগুলো সরায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির নিচে ধূপ জ্বালায়, ঝাড়ন দিয়ে টেবিল চেয়ার টেবিলকেনে পেনপোর্ট্রেট পেনস্ট্যাণ্ড-এর ধুলোময়লা ঝাড়ে, টেবিলের কাগজপত্র গোছায় এবং অবশেষে পেটফেলিও ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় বিষ্ণুচরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে।

যথাসময়ে বিষ্ণুচরণ আসেন। স্বাভাবিকভাবে গণেশ কাজকর্ম করে যায়। বেলা পাঁচটা নাগাদ চেয়ারম্যানের কলি বেল বেজে ওঠে। গণেশ তার খাস কামরায় ঢোকে। সীল করা কনফিডেনসিয়াল ছাপ মারা একটা খাম তার হাতে দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বিষ্ণুচরণ বলেন — “চিঠিটা খুব জরুরি গণেশ, আজই ডি.এম-এর কাছে পৌঁছেনো চাই। আগে থেকে ঠিক ছিল না, টেলিফোনে এই কিছুক্ষণ আগে ডি.এম. রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। আমি সদরে বলে রেখেছি, রাতে ফিরতে তোমার যদি অসুবিধা হয়, তবে ভাকবালোয় থাকার ব্যবস্থা করে রাখবে। এখনই বেরিয়ে পড়, বাস স্ট্যাণ্ডে যাওয়ার পথে বাড়িতে খবর দিয়ে যেও। যাবার সময় ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে রাহাখরচের টকা নিয়ে নিও। বলা আছে।”

রাত ঠিক আটটায় গণেশের বাড়ির সদর দরজায় টকটক টোকা পড়ে। দরজা খুলে একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে আসে, তার আপদমন্তক চাদরে ঢাকা। রাস্তা যদিও শুভনাম এবং অন্ধকার তবুও সন্তপ্তে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে অবগতিতা নারী অগ্রবর্তী একটি ছায়ামূর্তির অনুসরণ করে। গলিপথটুকু রাস্তা হয়ে পড়ে পার হয়েই বড় রাস্তা, সেখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়ানো। এটা বিষ্ণুচরণের বাড়ির গাড়ি, কাছাকাছি যেতে হলে মেয়েরা ব্যবহার করে। নারীমূর্তি ঘোড়ার গাড়ির ঘেরাটোপে বন্ধী হয়ে চলতে থাকে। সংগী ছায়ামূর্তি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে মিলিয়ে যায়।

ঘোড়ার গাড়ির অদূরে রাস্তায় একটি ঝাকড়া কদমগাছ। তার আড়ালে প্রতীক্ষারত গণেশ। গাড়ি চলতে শুরু করলে গণেশ তাকে সাইকেলে অনুসরণ করে। একসময় গাড়ি এসে একটি গেটের সামনে দাঁড়ায়। খানিক দূরে একটা ঘোঁপের ধারে গণেশ নিশ্চয়ই সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল সুন্দর ঘোঁপের আড়ালে ঢুকে গাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখে। কোচোয়ান নেমে এসে দরজা খুলে দেয়। অবগতিতা রমণী গায়েছে নামে। কোচোয়ানের পিছ পিছ গেটের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘোঁপের ভিতর থেকে বেরিয়ে অশরীরীর মতো নিশ্চয়ই গণেশ গেট

বরাবর রাস্তায় দাঁড় করানো ঘোড়ার গাড়ির অন্তরাল থেকে গেটের ভিতরে দৃষ্টি প্রসারিত করে। সুরকি বিছানো সারু একফালি রাস্তা বিস্তৃত সিঁড়িওয়ালা একটা থমথমে বাড়ির গোড়া পর্যন্ত সোজা চলে গেছে। কোচোয়ানের পিছু পিছু সর্বাংগ আবৃত নারীমুঠে সুরকি বিছানো সেই পথ বেয়ে বারান্দাজোড়া টানা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেবার আগে একটু যেন থমকে দাঁড়ায়। সেইসময় বারান্দার ওপারে একটা দরজা খুলে যায়। নরম আলোর ফ্রেমে ভেসে ওঠা এক অবয়ব হাতছানি দিয়ে রমণীকে ডাকে। সিঁড়ি বেয়ে রমণী উঠতে থাকে। আর এক হাত দিয়ে ফ্রেমে বাঁধা অবয়ব ইঙ্গিতে সংগী কোচোয়ানকে বাইরে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। গণেশ সরে এসে কোণের আড়ালে সুযোগের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে। কোচোয়ান বাইরে এসে গাড়িটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে চালু জমিতে একটা পুরানো বটগাছের অন্ধকারের পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখে যাতে দেবাং কোনো পথচারীর নজরে না পড়ে। এই সুযোগে কোণ থেকে বেরিয়ে গণেশ গেটের মধ্য দিয়ে সোজা ঢুকে যায়। কোনো প্রহরী বা লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই, বাথহায়ে ঘটনার কোন সাক্ষী রাখতে চান না বিষ্ণুচরণ। সুরকির রাস্তার দুধারে গাছগাছালি কোণঝাড় — বাগান কিনা বোঝা যায় না কারণ এখন অন্ধকার — তারমধ্যে একটি সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করে যেখান থেকে গেট থেকে বাড়ি পুরো এলাকায় গণেশ নজর রাখতে পারবে নিজে অলক্ষ্যে থেকে। সিঁড়ি ঘেরা বারান্দার ওপারে দরজা এতক্ষণে বন্ধ। ঘোরাঘুরির সুবাদে অন্ধকার মাথানো এই বাড়িটা গণেশ আগে কয়েকবার দেখেছে, প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে। কিন্তু এটার মালিক যে বিষ্ণুচরণ তা জানত না। এখন চারদিকে শুধু হিশীতল নিরুদ্ভতা। গণেশ অপেক্ষা করতে থাকে। এককক্ষণ বাদে খুঁট করে আওয়াজ হয়। গণেশ শব্দের উৎসের দিকে তাকায়। অন্ধকার থমথমে বাড়িটার নরম আলোর ফ্রেমে দুটো মূর্তি ভেসে ওঠে। নিশ্বাস বন্ধ করে গণেশ টানটান হয়ে থাকে। সম্ভাব্য বিকল্প ছকগুলো তার কণা আছে। সে এখন যন্ত্রমানবের মত নিক্ষেপণ ও নিরাবেগ। বিষ্ণুচরণ চণ্ডা বারান্দার উপর থেকেই তার নড়ন বউকে বিদায় দিলেন — ‘কোনো ভয় নেই, গেটের বাইরে কোচোয়ান গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, তোমাকে সোজা বাড়ি পৌঁছে দেবে। আর রাতও তেমন বেশি হয় নি।’ তিনি আর দাঁড়ান না, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

এত সহজে ব্যাপারটা চুকে যাবে গণেশ ভাবতেও পারেনি। সুরকির পথ বেয়ে মন্ডর গতিতে বউ গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তার সবচেঁচ চাদরে মোড়া। গাছগাছালির আড়ালে গণেশ যেখানে লুকিয়েছিল সেখানটা অতিক্রম করতেই অপূর্ব ক্ষিপ্ততায় তার মুখ চেপে ধরে গণেশ তাকে গভীরতর কোণের মধ্যে টেনে নেয়। বউ শব্দ করার অবসর পায়না, বাধা দেবার সুযোগ পায়না। কিছুক্ষণ বাদে তার নিসাড় সেই বিষ্ণুচরণের থমথমে বাড়ির জংগলে না কি বাগানে পড়ে থাকে।

কোণ থেকে বেরিয়ে গণেশ নিশেদে গেটের মুখে এসে সর্বক দৃষ্টিতে এপাশ ওপাশ নিরীক্ষণ করে। রাস্তার ধারের চালু জমিতে রাখার জন্য কোচোয়ান সম্মত ঘোড়ার গাড়ি আড়ালে পড়ে গেছে। গণেশ সন্তর্পণে গেটের বাইরে আসে। রাস্তার ধার ঘেঁষে অন্ধকারে প্রায় গুঁড়ি ঘেরে সে নির্দিষ্ট কোণের মধ্য থেকে তার সাইকেলটা বার করে এবং উল্লসিত চোখে চলে থাকে।

তার রণকৌশল অনুযায়ী পরপর ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। পুরোনো মনিব মহাদেবের দরজায় গণেশ আছড়ে পড়ে। শেষ মস্তক বিদায় দিয়ে মহাদেব তখন উপরে ওঠার উদ্যোগ করছিলেন। তদবস্থায় গণেশকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। গণেশ তার পদযুগল আঁকড়ে ধরে। হজুরের আশ্রয় তাগণ করে সে বিরাট ভুল করেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। হজুরই একমাত্র পারেন তার জানমান রক্ষা করতে। বিষ্ণুচরণের লোকজন জোর করে তার বউকে ধরে নিয়ে গেছে, পুলিশ নিয়ে গেলে এখনও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। সে নিজের চোখে দেখেছে শহরের বাইরে নদীর ধারে বিষ্ণুচরণের যে বাগানবাড়ি আছে, সেদিকে তার বউকে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই মহাদেব এই সংবাদে যুগপৎ উত্তেজিত এবং উল্লসিত হন। মহাদেশ্য বিষ্ণুচরণ ভাঙ্গা মাছ উল্টে খেতে জানেন না। অতএব দুঁদে উকিল মহাদেব গণেশকে নিয়ে থানায় যান, ডায়েরি করান এবং পুলিশ সমভিযাহারে বিষ্ণুর বাগানবাড়িতে হানা দেন। হতবাক বিষ্ণুচরণের জিজ্ঞাস্য আপত্তি অগ্রাহ্য করে থমথমে বাড়ির সব কটি ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। কিন্তু গণেশের দৃঢ় বিশ্বাস এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই কোথাও তার বউকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। থানার বড়বাবুকে হাত জোড় করে সে বারবার মিনতি জানায় বাড়ির চারপাশের কোণঝাড় বাগান খুঁজে দেখা হোক। মহাদেবও সেই প্রস্তাবে সায় দেন। অতএব বেশ কয়েকটা জোরালো উর্চ ছলে ওঠে, গোটা তিনেক দলে ভাগ হয়ে খোঁজা শুরু হয়। সুরকির রাস্তার পূর্বদিকের ঘন গাছগাছালির আড়ালে টর্চের আলোয় শাড়ির প্রান্তের মত কী যেন একটা দৃষ্টিগোচর হয়। সকলে সে দিকে ছুটে যায়, একটি নারী দেখা নিখর। সনাতনকরণে সত্যাত্ত হয় — গণেশের বউ। দারোগার নির্দেশে দেহ তুলে নেওয়া হয়, লাশকাটা ঘরে পাঠাতে হবে। ভাষার সন্দেহবলে দারোগা বিষ্ণুচরণের দিকে এগিয়ে যায় — আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছে, থানায় চলুন। বিহুল বিষ্ণুচরণের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না, বিফারিত দৃষ্টি গণেশের মুখে ফেলে তিনি পুলিশকে অনুসরণ করেন। গণেশের চোখমুখ ভাবলেনশহীদ।

নিশীড়িত অত্যাচারিত গণেশ আবার সকল ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দুতে। পুরো এলাকার জনসাধারণ সহানুভূতি এবং মর্মবেদনায় উদ্বেল, প্রতিবাদে মুগ্ধ এবং আদোলনে অশাণ্ড। মহাদেব গণেশকে একেবারে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এখন থেকে সে তাঁর আশ্রয়েই থাকবে। এবার তার ব্যবহারে আশ্চর্যকতা করে পড়ে, গণেশের প্রয়োজন স্থখ সাক্ষ্যদায়ক দিকে সর্বদা নজর। তুণ্ড মনে গণেশ পুরো ব্যবস্থা মেনে নেয়, যেন এটাই তার পাওনা।

শেষপর্যন্ত শহরের রাজনীতি হালহাকিত কেন্দ্রভাবে বাকি নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিংবা বাক্তিগতভাবে বিষ্ণুচরণের মামলায় চূড়ান্ত ফলাফল কী হয়েছিল — সেসব বিবরণ এই কাহিনীর পক্ষে অবাস্তব। প্রাসংগিক তথ্য আপাতত এই যে গণেশ বহাল ভবিষ্যতে মহাদেবের আশ্রয়ে কালটিপাত করছে, তার উল্লস আত্মা এখনও কোনো আবারণের অভাব নেই এবং সেই কারণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবারও সম্ভাবনা নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বজাগতিক প্রক্রিয়া তার অগোচরে যদিও কোনো সময় আত্মা ঐশ্ব্যের প্রলেপ পড়ে, সম্পদের ঐকমিক টুকরো জমা হয় — আতংকে কঁকড়ে যাবার কোনো কারণ নেই, কেননা আত্মরক্ষার মূল কৌশলটি তার জানা হয়ে গেছে।



## ল্যাপিস ল্যাজুলি এখা দে

গল্প

জম্বী রোড দিয়ে পিতাজীর সঙ্গে সাইকেলে যাচ্ছে বীরজু। কতই বা বয়স, বছর পনেরো। সবে গোর্ফের রেখা উঠছে। বসতে শুরু করেছে জম্বী বাজারে তাদের সাবেকি দোকান। সন্দল দলটা বাজো বাজো। লোকজন, গাড়িবেড়ার ভীড়। সামনে যাচ্ছে মহারাজার বিলাল মোটির, জয়পুরে সবাই চেনে, দুপাশে অন্য সব গাড়ি আপনি থেকেই রাস্তা করে দিচ্ছে। হঠাৎ মোড়ের মাথায় ডানদিকের এক গলি থেকে তেঁশ করে এসে পড়ল এক বেয়াদব লরি। ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল মোটার। আশেপাশে সব যানবাহন। আচমকা খামতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে বীরজু তার পিতাজীর সঙ্গে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে গেছে মোটরটা। জানলার কাচ রানামো। বীরজু দেখে একটি ছবি নীলে নীল। গৌরী শরীর ঢেকে পাতলা নীল শাড়ি। বাদিকের গালে ফর্সা একখানি হাত। অনামিকায় মস্ত নীল পাথর, সোনালি জরিপাড় নীলারখির মুখখানা ঘিরে আলগোছে পড়ে আছে বাহাত। আঁচলের ফাঁকে নিটোল রাজহংসী কঠ ঘিরে ঘন নীল মটরদানা। গোলাপী গাল দুটো যেন শঙ্খ কানের লতিতে ঘননীল আধখানা ডিম। চোখের তারাও কি নীল? মস্তমুগ্ধ বীরজু নিজের রেজাভেই এগিয়ে যায়। পিতাজীর ধমকে ঘোর ভেঙে থমকে গেল।

‘এই, কী হচ্ছে কী। বেআদব! মহারানীজীর মুখের দিকে তাকাতো আছে? চড়িয়ে মুখ ভেঙে দেব।’

অপ্রস্তুত বীরজু ভাড়াটাড়ি পিছিয়ে আসে। মহারানীজীর গাড়ি স্টার্ট নেয়। সব যানবাহন চলতে শুরু করে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। যেন সব দিন, সব কালের মধ্যে স্বতন্ত্র। বিনিকের কঠিন অবরোধে একটি নিটোল মুহূর্ত।

পিতাজী এদিকে সমানে বকে যাচ্ছেন। মহারাজের জমানায় রাজবাড়ির সব মোটরে কাঠের পাটা লাগানো থাকত। যত পরমই হোক না কেন আঁঠেপুটে বন্ধ অবস্থায় ছিল আরোহীদের যাতায়াত। মহারানীজী তো দূরের কথা, রাজা অশু-পুরের কোন মামুলি জেনানার মুখের দিকেও জয়পুরের কোন প্রজা কখনো তাকিয়েছে। এখন বিনকলা পাশ্টে গেছে। মহারানীজী নিজেই পর্দা থেকে বেরিয়েছেন, ভাঙেও দাঁড়িয়েছেন। তাহলে কি, জয়পুর ঘরানার মানইজ্ঞত তো রাখতে হবে। এখানকার সকলের মত বীরজু, তার বাপ, চাচা, দাদা, নানা কত পুরুষ ধরে জয়পুরের প্রজা সে কথা ভুললে চলবে কেন? এই তো তিনি নিজে রাজা যাতায়াতের পথে গলা লগা করে দেখতে চেষ্টা করেন সিটি প্যালেসের মাথায় জয়পুর রাজ্যের পতাকা উড়ছে কিনা। অর্থাৎ মহারাজকুমার প্রাসাদে অবস্থান করছেন না বাইরে গেছেন। পতাকা দেখলে এখানে মাথা ঝুকিয়ে মনে মনে প্রণাম জানানো ভুল হয় না। আর বীরজু কিনা—বন্ধুতার স্নেহ বন্ধ করতে বীরজু প্রম করে, ‘আচ্ছা পিতাজী, এ যে নীল পাথরগুলো গলায়, কানে, আঙুলে মহারানীজী পরেছিলেন ওগুলো কী?’ সাত পুরুষের জম্বী, একবার মণিমাণিক্যের দিকে মনটা ঘুরিয়ে দিতে পারলে অন্য কিছুই আর খোঁজ থাকবে না। ‘ওগুলো

হচ্ছে ল্যাপিস। ল্যাপিস ল্যাজুলি। সেবসিনি বুঝি কখনো? নীলার মত দামি পাথর নয়। হয়তো শখ করে পরেছেন মহারানীজী। রাজমহারাজার খোয়ালখুশির কি কোন মাথামুস্তু আছে। সব একটা চালু পাথর নয়। তবে মোগলআরো ল্যাপিসের খুব কাজ হ’ত। গয়নায় তত নয়, পুর দেওয়ালের গায়ে। একবার তাজমহল যাস, হ্যাঁ, সেখানে দেখবি কাজের মত কাজ ল্যাপিসের। আজকাল আর ওসব কাজ হয় না। রাজা বাধাশ নেই, সমঝদার কোথায়?’

বীরজু বুঝল রাজাবাদশা ছাড়া, সমঝদার ছাড়া ল্যাপিসের কদর কেউ জানে না। বছরের পর বছর দোকানে বসে কত পাথর চিনিল। হীরে, পাশা চুনী তো বাতের, এছাড়া সাদানিষে পলা শোখরাজ গোমেদ, চিনল বিলাহিতি আলেকজেন্ডাইন, কনলিয়ান, পেরিওট। নাড়া ঘাটা করল কত পাথর। একদিন হাতে এল নিবুট এক সেট ল্যাপিস, সেই ল্যাপিস ল্যাজুলি। ছোট থেকে—বড় দানার বেশ প্রমণ সাইজের মালা ও তিনটি ভিলাকুতি পাথর। দুটি প্রায় এক ওজনের, আকারে একটি উশনি বিশ আছে। তা ভাল কারিগরের হাতে সেট করালে দিবি কানের টাব হুব, বাদবাঁকটিতে আংটি। নেভি ব্লু ডেলভেটের খলিতে যন্ত্র করে তুলে রাখে বীরজু। মাঝে মাঝে বের করে। ঠিক এমন একটি সেট সোনি মহারানীজীর গায়ে ছিল না? বীরজু আস্তে আস্তে হাত বেলায় এক একটি পাথরে। উজ্জ্বল ঘন নীলের মধ্যে কোথাওবা অভি সুস্ব সূতোর মত সোনালি শিরার রেখা, নীলকে আরো উজ্জ্বল, আরো বার্ণা করেছে। চোখ বুজে বীরজু দেখে নীলবসনা পরমা মূর্তিটি, হাঁ হাতখানা গালে রাখা, চম্পাকলি অনামিকায় নীল, পেলব গোলাপী গালের পাশে নীল, মর্মর কঠদেশে ঘিরে নীলের সারি। সে নীলেও কি ছিল এমন সোনালি আভাস?

বীরজু তার প্রমের কদর জবাব পায়নি, পাথরগুলো কখনো বেচেওনি। অবশ্য এমনিতে বাজারে ল্যাপিসের কোন চাহিল নেই। যত আচ্ছা কোয়ালিটির হোক না কেন। পিতাজী ঠিকই বলেছিলেন, সমঝদারি আর কই। সেটা ছাড়া বীরজুর আরো কতগুলো খুচরো ল্যাপিস আছে, একটু ছিছাইই বই মেশানো সস্তার বীজ। ফিরিস্টি টুরিস্ট মাঝেমাঝে ল্যাপিস চায় তো, তখন বের করে দেয়। বীজটি হয় দুটো একটি মালা। তাঁর সেটিং-এ কানের দুল টার। এরা যেনেছে ল্যাপিসের মান। নীলে আজকাল আর বেওসায় কীই বা আছে। যদিও এ গলিতে অর্থাৎ গোপাল জীউ কি রাষ্ট্রায় অন্যান্য পুরোনো জম্বীদের মত বীরজুর দোকানও ক পুরুষের। এই বাজারে কোটি কোটি টাকাব লেনদেন। পিতাজীর কাছে বীরজু কত শুনেছে জয়পুরের জম্বীদের ধনদৌলত দেখে কখনো কখনো। তাকের মানডাব কত, মেরম নীনার কারুকাছে, তেমেঁনি জডোয়ায়। তাছাড়া তামাম হিন্দুস্থানের মণিমাণিকা কাটাঘসা তো এখানে। এই তো মহারাজার একমাত্র মেয়ের বিয়ে হ’ল। না, বীরজু দেখেনি। সে তখন খুব ছোট। তবে পিতাজীর কাছে তার এত কহনী শুনেছে যে তার চোখের সামনে যেন সব ঘটে গেছে। কতকাল পরে জয়পুরে এক রাজকুমারীর বিয়ে। কী ধুমধাম, সাজসজ্জা, আলোর সমারোহ, কী জৌলুস। পুরো জয়পুর যেন রাপকথার শহর। দেশবিদেশের রাজামহারাজার ভীড়, কী তাঁদের পোশাকআশাকের ঘটা, হীরে জহরৎ রোকেড কিংখাবের চমক। মহারানীজী সেবার কেনাকাটার জন্য বোধাই বা বাইরে কোথাও গেলেন না। জয়পুরেই বানানো রাজকুমারীর গয়না। তাঁর দেখোদেখি আর সবাই। কত জম্বীর ডাক পড়ল প্যালেসে। জয়পুরের অভিজাত বাড়িগুলোতেও মেয়েদের

গয়না গড়াবার ধুম পড়ে গেল। জহরী বাজার রমরমা।

কোথায় গেল সে জমানা! আত্রে আত্রে ইন্ডিয়া হজম করে ফেলল জয়পুরকে। বীরজুর কাছে 'রাজস্থান, ভারত' কতগুলো শব্দ, নাম। কোন মানে নেই। যেমন ছিলনা তার পিতাজীর কাছে। সর্বদা বলে এসেছেন, 'ইন্ডিয়ায় আজাদি মানে জয়পুরের বরবাদি।' যেদিন শবরের কাগজে বেরল পাবলিকের জন্য রাজার সব পায়েস খুলে দেওয়া হবে, পিতাজী দু, রাত ঘুমোতে পারেননি, খেতে পারেননি দু, দিন। মরবার আগে অঙ্গি বীরজুকে বলে গেছেন, 'দেখ বেটা, জয়পুরের দো দুশমন, কাংগ্রেস আর গুজর।'

সত্যি, বীরজুও তাই দেখছে নিজের জীবনে। এই যে গুজর জাত, এরা চাষবাস জানে না, হাতের কাজ পারে না। মহারাজার জমানায় ছোটোমোটা কামকাজ করাও, মাথা নিচু করে থাকত বীরজুদের পায়ের তলায়। আর এখন সব মাথায় চড়ে বসেছে। গুজরদের কথা ভাবলে বীরজুদের মত ঠাণ্ডা লোকেরও মাথায় খুন চড়ে যায়। আগে এরা গাই উঁইস চরাত, বদলে দুটো খেতে পরতে পেত। হ্যাঁ মাঝেসাঝে ফুটকামেলা পাকাত, তবে ঠ্যাঙনি দিলেই চুপ। এখন কাংগ্রেস সবাইকে ভোট করে দিয়েছে। মহারাজার একটা ভোট, একজন ফালতু গুজরেরও একটা ভোট। আর ঠ্যাঙনির ভয় নেই। কামকাজ লাটে উঠেছে। এখন গুজর মাঝেই একটা চিন্তা, কেমন করে বীরজুদের লোকসন করবে। খেতিবাড়ি লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে। বীরজু একলা ক'দিক সামলাবে। লেডুকা ছোট, বড় ভিন লেডুকী। দুটোর সাদি দিতে প্রায় ফতুর। কাংগ্রেস কত নয়া নয়া চাঁজ দিয়ে বাজার ভিত করছে। যে দিকে তাকাও দোকান আর দোকান। হররোজ একটা নতুন কিছু বেরচ্ছে। আজ মিল্লার কাল ভ্যাকুয়ামাইজার, এছাড়া টেপ, টিভি স্ক্রটার মেটরের তো কথাই নেই। অথচ পুরানো শহরটার হাল দেখ। হাওয়ামহল তো বাজার আর বাজার। শহরে ঢোকার মুখে দুদিকের পাহাড় ঘেসে লাইন দিয়ে তৈরী মহারাজার আলের মেটে গোলাপী রঙের দেওয়াল, ইমারৎ। কী তার কামকাজ, কেমন সৌন্দর্য। আজ তার রঙ গেছে জ্বলে। ভাদ্রাচোরা পোড়ো বাড়ি সারির মত দাঁড়িয়ে। জয়পুরের ভেতরেই বা কী অবস্থা। বাগবাগিচায় ফুল নেই, ঘাস উঠে গেছে, ফোয়ারাগুলো সব শুকনো। কোন কোন রানীমহলের দেওয়াল-জোড়া ছবি মুছেছে একাকার। শুধু বনছে হোটেল আর হোটেল। জয়পুরের মাটি কেটে মার্বেল তুলছে চিকেনদারের দল। কাংগ্রেস জমানায় টুরিস্টে ভর্তি হয়ে গেছে। সরকার আছে খালি পরস্যা খিচবার তালে। আগে ছিল রাজার জমানা। এখন হয়েছে বানিয়ার।

কিন্তু ভাল লাগেনা বীরজুর। ল্যাপিসের সেটটা বের করে। কাউন্টারে কাচের ওপর একটা একটা রেখে হাত বুলায়। কী ঠাণ্ডা হাঁওয়া। কেমন মসৃণ। নীলে নীল, স্বকব্বক করছে পাখরগুলো। তেমনি সুন্দর আছে। বরাবর সুন্দর থাকবে। বীরজু ভুলে যায় কাংগ্রেস, গুজর, লেডুকীর সাদি, তার রোজকার দুনিয়া। প্রতিদিনই প্রায় এভাবে কাটে বীরজুর। খন্দের আর ক'টাই বা আসে। এ গলিতে এমন অবস্থা শুধু তার দোকানেরই। সান্নিবার্ডটা সেই কবেকার। রোদে-জলে-ধুলোয় অস্পষ্ট। জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে রঙ। ইংরিজিতে লেখা অক্ষরগুলো কোকাক্রমে পড়া যায় — 'প্রিন্স জুয়েলার্স'। ডিলার নামই প্রেসন স্টোনস অ্যান্ড গুমসো। এস্টাব্লিশড ১৮৮০। ডলার অ্যান্ড পাউন্ড অ্যাকসেস্টেড। প্রতিদিন সকালে দোকানের ঝাঁপ

খালার সময় বীরজু ভাবে এবারে একটি রঙটুট করবে। দশ বিশ সাল একই রকম রয়েছে। শোকেসে খুলছে দু চারটে গারনেট আর ক্রিস্টালের সস্তা গলার মালা। চাচেরা ভাইদের দোকানদুটোর কথা মনে করলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বীরজুর। তার নলিবই খারাপ। নইলে তাদের বংশের আদি দোকানটার এমন হাল হয়। পিতাজী বেঁচে থাকতে থাকতেই প্রিন্স জুয়েলার্স পড়তির দিকে। তবু তখন বছরে দু চারটে জেম কোয়ালিটির হীরে পান্না বিক্রি হত। বীরজুর তো একমাত্র ভরসা গ্রহরত্ন। পলা গোমেদ মুনস্টোন কাটেন্সআই আর আনকটি পান্না চুনী পোখরাজ। আজকাল আদমির লোভ যত, তত কষ্ট। তবে এখানে ল্যাপিসের কোন চাহিদা নেই। শনি মদল রাথ কাউকে তুষ্ট করা যায়না ল্যাপিস ধারণ করে। ভগোয়ানের কী বিচির লীলা। স্বচ্ছ হচ্ছে যে পাথর হ'ত বহুল্মা নীলা, নীলকান্ত মণি। নিরুটে বলে তাই হ'ল সেমিপ্রেশাস স্টোন — ল্যাপিস। তার মূল্য শুধু রাপে। মহারানীর অঙ্গশোভা বর্ধনে। তাই ভাল, শুধু রাপের জন্য বেঁচে থাক ল্যাপিস, বীরজুর চিরসাথী। নয়া জমানার সাথে যুঝবার রক্ষাকবচ। বেশি দামটাম উঠলে হয়তো বা লোভে পড়ে হাতছাড়া করে ফেলত। ল্যাপিস সেটটা তুলে রাখতে রাখতে ভারি বখ্তি অনুভব করে বীরজু।

তার বয়স যখন বছর বাইশ, নয়া নয়া সাদি হয়েছে, তখন এক রাতে তার ষোল বছরের বৌ কামিনীর ঘোমটা ঢাকা ছেঁটে মুখের সামনে সবকোচে ল্যাপিসের মালাটা দুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পছন্দ?' কোন উত্তর পায়নি।

গলায় পরিয়ে দিতে গেলে ঘোমটা পরা মুখ আরও নিচু করে দুদিকে সজোরে মাথা নেড়ে অদ্ভুত ধরে সুস্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল।

'সবাই কী বলবে। শরম লাগে।'

যখন কামিনী তিন বাচ্চার মা, পুরোদস্তুর বলিয়েকইয়ে ঘরওয়ালা, তখন বীরজু আরেকবার মালাটা তার মুখের সামনে ধরে বলেছিল, 'পছন্দ?'

একহাতে ঘোমটা তুলে ধরে ঠোঁট উন্টে কামিনী জবাব দিয়েছিল, 'দূর! সোনা নয়, মোতি নয়, একটা পুথির মালা, তারওপর নীল রং। ছিঃ! এসব পরার কি আমার বয়স আছে!'

আর কখনো কাউকে ল্যাপিস ল্যাঞ্জলি পরাবার চেষ্টা করেনি বীরজু। তবে এখন তার ল্যাপিস প্রীতির গল্প পরিবারে সকলের জানা। ভাইপো ভাইব্বিরা ঠাট্টা করে বলে 'তাজবীর গুণ্ডন' বা 'রানীপসন্দ'। আরো কত কি। আর ঘরওয়ালা রাগ হলে খরচাপত্রে টান পড়লে কথা শোনায়।

'কাজকারবার করতে পারে না, কেমন মরদ কে জানে। বছরের পর বছর কতগুলো পাখর নিয়ে বসে আছে। বেচেরুচে দুইপাশা বালবাচ্চার জন্য ঘরে আনবে তা নয়। বেতসা করছে না কি গুদাম বসিয়েছে?' হুঁ দাদি।

বীরজু কারো ঠাট্টা তামাসা বিধূণ ভিন্নস্বাদের জবাব দেয়না। আসলে কথাবার্তা বলাটাই তার কোন কালে আসেনা। তার এই স্বভাবে বড় আফসোস ছিল পিতাজীর। দোকানীর মুখে বই না ফুটলে খন্দের মন ভিজবে কী করে। যত আচ্ছা কোয়ালিটির মাল থাক না কেন শুধু দেখিয়ে তো বেচা যায়না। আর একটা বড় দোষ বীরজুর, তার চেহারা যেমন ছোটখাটো



সাদামাঠা, পোশাক আশাকেও তেমনি। সেই আগেকার ধৃতি কুর্ভা, তাও সবসময় খোপদুরন্ত থাকেন। এদিকে তার চাচেরা ভাইদের দেখ। সব কত ফিটফিট, চোস্ত পাজমা, উঁচু গলা লম্বা কুর্ভা, জহর কোট। তাদের লেডুকারাও আরেজি ইঙ্কুলে পড়েছে, কিটমিট আরেজি বলে বিলাহিতি টুরিস্টদের সঙ্গে। এইতো তার চাচার ছেলে গিরিজা, তার চেয়ে পাক্সা দশ বছরের ছোট, অথচ তার দোকান কী করেছে। গোপালজী কী রাস্তা দিয়ে আর একটু গেলে ডান দিকে দোতলা। তলায় সাবেকি চালো ফরাস পাতা গদিতো বসছে মুনিমজী। ওপরে ইম্পেশাল শোরুম, পুরো কাঁচ ঘেরা। সোফা, কৌচ, ঠাণ্ডা মেশিন চলছে। ওখানে গিরিজা নিজে বসে। চড়া দামে সাহেব মেমদের ইন্ডিয়ান জুয়েলারি বেচে। শোকেসে ঝুলছে থরে থরে মালা — সাতনরি লাল চুনী, উঁচুতে রঙের ফিরোজ। পানির সবুজ জেও, তিন নরি হালকা বেগুনি আমোখিস্ট্র। এক নরি হলুদ বাঘের চোখ টোপাণ, মেটো লাল কনলিয়ান... আরো কয়েক। রঙের মেলা বসে গেছে। খুব জমিয়ে কারবার করছে গিরিজা, দেশ বিদেশ থেকে আনাচ্ছে রকমারি পাথর। এখানে কাচঘাসা করে বেচে। এ তো চুনীওলা আমদানি করেছে কেনিয়া থেকে। পাথর তো নয়, বেদানার দানা। একেরেরে লাল হয়ে গেছে বেটা। মোর কিনেছে আবার। তবে হ্যাঁ। গিরিজার শোকেসেও বীরজুর দোকানের মত ল্যাপিসের স্টো নেই। ল্যাপিসই বীরজুর মান রেখেছে।

আজ সকাল থেকে এই দুপুর পর্যন্ত দিনটো খন্দের এসেছে। সেই হরবকত যা বেচে তারই খোঁজে — পলা গোমেদ কাটসনাই। এমন দরদার করল প্রত্যেকটা খন্দের যেন না জানি কত বহুমূল্য হীরে জহরও সওদা করতে এসেছে। এদের মঙ্গল রাহ কেতু খারাপ হবে নাতো কি। স্বভাব-ই তো গ্রহ। বীরজুর জানু কল্যা। শেষে নামমাত্র লাভে প্রায় পাথরওলা ছেড়ে দিতে হ'ল। উপায় কী, রোজগার তো চাই। খন্দেরকে খুশি না করে বাঁচবে কী করে। বাকি লেডুকটার সাদির কথা চলছে। নাহ্ একা একা বীরজুর আর এত দায়দায়িত্ব সামলাতে পারেনো। লেডুকা বীরজুর সতেরো সাল হ'ল, ইঙ্কুল ফাইনাল দিয়েছে। কতবার বীরজু তাকে সেমেছে একটু দোকান বসুক, মাঝেমাঝে গিয়ে গিয়ে সেবি বাড়ি গুঁড়ি উইস দেখাদেখি করুক। গুজর তো আধা ফসল, দুধ, ঘি সব মেরে দিচ্ছে। লোকসানটাতে শেষমেষ তারই। বাক আর কত দিন। বলে বলে হয়রান। আজ সকালে আবার কথাটা তুলতে ছেলের পড়বে। একেবারে আশুণ। না, লেডুকা এখন দোকানে বসবে না, খেতখামারে যাবে না, সে কালেজ পড়বে। কালেজ না গেলে পড়াশিলা কী? বীরজু দেখতে পায়না আকাল চারিদিকে সবার লেডুকা কত পড়াশিলা করছে, কেউ কেউ দিল্লি যাচ্ছে পড়তে, এমন কি বিলাত আমেরিকাও হচ্ছে। নিজের চাচেরা ভাইয়ের লেডুকাদের দেখুক না। তাই তো তারা এমন গড় গড় হিন্দি আরেজি বলতে পারে; খন্দেরদের সঙ্গে কত বাতর্জিত করে, তাইতো এত মাল বেবেছে। আর বীরজুকে দেখ, হিন্দিটা পর্যন্ত ঠিকভাবে বলতে পারেনো। মুখে কথাই ফোটে না। তাই তো দোকানের এই হালত। লেডুকাকে কিছুতেই সে বাপের মতো হতে দেবে না। উত্তরে বীরজু আর্ধেক খোয়ে উঠে পড়েছে। নাস্তার ডিপকটাও সঙ্গে আনেনি।

‘এই যে তাওজী। কী হ'ল? নিজের মনে কী বিভ্রিভ করছেন? দিমাক ঠিক আছে তো?’ গিরিজার ছেলে সরজুর সহাস্য প্রশ্ন। গলির মোড় পর্যন্ত তার হেঁটেই যায়তাত। মোটর

থাকে বড় রাস্তায়। আসাযাওয়ার পথে খবরাখবর করে।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব ঠিক আছে।’ জোর করে মুখে হাসির ভাব ফেটাতে চেষ্টা করে বীরজু। একে তো আর ঘরের কথা বলা যায় না।

‘বেলা ভো অনেক হ'ল। নাস্তাপানি কিছু করছেন? না? কেন? কিছু আনেননি আজ? দোকানেও বসার কেউ নেই? সে কি কথা। আমি না হয় বসছি, আপনি যান, একটু চা-টা খেয়ে আসুন। মুখুখি তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। দুহাতে দানি প্যান্টা উঁচু করে তুলে বাঁধানো খোলা ড্রেনটার ওপর উঁচু উঁচু সিঁড়ির গাপ বেয়ে উঠে আসে সরজু। না, আরেজি ইঙ্কুল কালেজ পড়লে কী হবে, ছোকরা এখনো বড়দের মান্য করে।

ক'টা কচোরি আর এক কাপ চা খেতে খেতে চন্দ্রকান্ত-র সঙ্গে দেখা। ওরও পৈত্রিক দোকান, পাশের গলিতে দুটো সুখদুখের কথা বলতে বলতে কখন সময় কেটে যায়। হঠাৎ খোয়াল হ'ল, প্রায় আশ্বখটা পয়তাল্লিশ মিনিট হতে চলল। অপ্রতিভ বীরজু দ্রুত পা চালিয়ে ফেরে দোকানে। কাউন্টারের পেছনে তেমনি হাসিহাসি মুখে বাড়িয়ে সরজু। যেন প্রতিদিনের অভ্যাস।

‘তাওজী আপনার কাজ হাসিল।’

‘কী কাজ?’

‘ওই আপনার ল্যাপিস। খুব ভাল দামে খন্দের ঠিক করেছে। এই ঘুরে আসছি বলে গেল। না, না, ঠিক আসবে। আপনি নেই তাই দিহনি। ওই তো মোড়ের মাথায় টিবিওয়ালের দোকানে গেছে মীনা রুবি আর কুন্দন জুয়েলারি দেখতে। ওসব কেনার মত পার্টি নয়, তবু দেখুক। খন্দের যত মাল দেখবে তত আমারের লাভ। আজ না হোক কাল তো কিনতে পারে। বীরজু এসব ফলতু বকবকে ভোলার পাত্র নয়। তাঁর চোখ সরজুর হাতে ল্যাপিসের খলিতে।

‘ল্যাপিসের খন্দের ঠিক করেছিল মানে? হুই তো জানিস ও ল্যাপিস বেচার নয়।’

‘আহা, তাওজী, আপনি এমন বেকার জিদ ধরে বসে আছেন কেন বলুন তো? ওগুলো রেখে করবেনটা কী? আমরা ব্যাপারী জাত, জিনিস সেননেই তো আমাদের রুজিরোজগার। বছরের পর বছর মাল আটকে রেখে তো লোকসান।’ নেভি ব্লু ডেলভেটের খলিটা দেলাতে থাকে সরজু।

‘আমার লাভ আমি বুঝব। ও ল্যাপিস বেচার নয়।’

‘দেখুন তাওজী আপনি একটু বুকেসুখে বাত বলুন। ল্যাপিস কি শুধু জয়পুরের মহারানীই পরেন ভাবছেন? অন্য কত রানী আছেন। এই তো, এই যে খন্দের আপনার ঠিক করেছে সে তো বাংগালের রাজকুমারী।’

বীরজু আরেজি ইঙ্কুলে না পড়লেও অতটা বোকা নয়।

বাংগালের আবার রাজকুমারী কী? ও মূলুকে তো কখনো রাজারানীরই পাট ছিল না।

‘যা, যা। ইয়ার্কি করিস না। ল্যাপিসটা যেতের ঢোকা।’

‘কী যে পাগলামি করেন তাওজী। আপনার এত বয়স হ'ল কিন্তু এখনো আক্কেল হ'ল না। তিন লেডুকীর বাপ আপনি, এখনো একটার সাদি বাকি। পার্শ্ববর্তী তো ঘিরের কথা চলছে, চলছে না? এখন পড়ে থাকা মাল সব বেচেটেছে যা হাতে পারেন তুলে নিন। কাজে

লাগবে'

আরো বিরক্ত লাগে বীরজুর। ভাইপো বলে কথা। জ্যাঠাকে এমনভাবে উপদেশ দিচ্ছে যেন সেই পরিবারের কর্তা। আবার টিভি ফিলিমের মত কথায় কথায় 'তাওজী'। হাত বাড়িয়ে ল্যাপিসের থলিটা নিয়ে নিতে গিয়ে থেমে যায়। সতি, টাকার দরকার।

'দেখুনই না, কেমন দাঁও মেরেছি। বাজারে যা দাম ল্যাপিসের তার চেয়ে বেশি দামেই রফা হয়েছে। কত করে রতি দিচ্ছে জানেন? নিন, বিল বানান। নয়তো দিন, আমিই বানাচ্ছি।

বীরজু আবার 'না' বলতে গিয়ে থেমে যায়। পার্বতীর মা যদি জানতে পারে — এবং সরজুর কৃপায় নির্ধাৎ পারবে — তখন তার কথার বাঁজে ঘরে ঢেকা যাবেনা।

'ঐ দেখুন এসে গেছে। বাংগাল কি শাহজাদী।

বীরজু দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে এক দম্পতি। বিলকুল মামুলি। অল্পবয়সী দুটি লেডকালেক্টরী যেন ইস্টডেস্টে। নিশ্চয় নয়। সাদি। হানিমুন মানাতে এসেছে রাজহুন টুরিজম-এর দৌলতে। অতি সাধারণ একহারা চেহারার মেয়ে, পরনে গোলপি কাজের নীল সূতি শাড়ি, ছেলোটোর গায়ে স্পোর্টস সার্ট, জিন্স। যেমন চেহারা তেমনি পোশাকের ছিরি। কোন জৌলুস নেই।

বীরজুর মেজাজটা আরো খার্টা হয়ে যায়।

'এই যে বহিনজী, আসুন। আপনার জিনিস একদম রেডি।'

সরজু বিগলিত হাসো অভ্যর্থনা করে নেভি ব্লু ভেলভেটের থলিটা এগিয়ে দেয়। বোটা একদম্বরের চালু। পাথর, তাও ল্যাপিস, এ আর রেডি করার কী আছে। এরা মুখ চালিয়েই করে বাচ্ছে।

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে বলে,

'একটু খুলুন তো, আরেকবার দেখি। দামটা বড্ড বেশি বলছেন।'

বাপরে, বিয়ে হতেই পাকা গিঁমি হওয়ার চেষ্টা। সরজুর মুখে হাসি কিন্তু এতটুকু ঢলকায় না।

নিশ্চয়ই দেখবেন। একবার কেন পাঁচবার দেখুন দশবার দেখুন। এতো আপনারই দোকান। আর দামের কথা বলছেন? তা বহিনজী জিনিস যেমন লা-জবাব, দামতো তেমন হবেই। এর আপনি ছুড়ি পাবেন না জম্বরী বাজারে। আর জম্বরী বাজারে যা পাবেন না তা আর ইন্ডিয়ায় কোথাও নেই। পরুন না, পরুন।'

কুটো মদলসূরটো গলা থেকে খুলে কাউন্টারের ওপর রেখে মেয়েটি ল্যাপিসের মালাটা হাতে নেয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। আস্তে করে গলায় পরে। মাজা চিকন রঙ। টানটান সতেজ ত্বকে স্বকরকে নীল ল্যাপিসের দানাগুলো ভালই লাগছে। বীরজুকে মানতে হয়। কান থেকে কালো পুতির ফুল দুটো খুলে রেখে মেয়েটি এবার ডিভাকৃতি পাথর দুটো লতিতে ধরে ছেলোটোর দিকে মুখ তোলে।

'সেব তো কেমন লাগছে?'

মুহূর্তের জন্য ছেলোটো চুপ, শুধু তাকিয়ে থাকে। তার চোখের মুঞ্চ চাহনি যেন বীরজুর

কতকালের চেনা। যেন আর কারো বিহুলতার প্রতিচ্ছবি।

'দারুণ। তোমার এই নেভি-পিংক চাকাইটার সঙ্গে যা খুলেছে না, একেবার মডেলের মত লাগছে।'

'কিন্তু বড্ড দাম চাইছে, না?' মেয়েটি ঠোঁট ফেলল।

'নিজে নাও লক্ষ্মীটি, পছন্দের জিনিস। তাছাড়া আমাদের জয়পুর জমগের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে।' ছেলোটর ঠোঁটের কোণে ইংগিতের হাসি যার উত্তরে রক্তিম অভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মেয়েটির সলাজ মুখ।

বীরজুর বুকের কোথায় যেন টনটন করে। সে যা কোনদিন খুঁজে পায়নি এই ছেলোটো তহি পেরেছে, ল্যাপিস ল্যাজুলি পরার মত কেউ। এতকণে তার মুখ ফোটে,

'নিজে যান বহিনজী নিয়ে যান। কত হয়েছে রে সরজু? বিল বানিয়েছিস? দু'হাজার ন'শ পঁচাত্তর? আচ্ছা আপনি না হয় পুরা সন্তরই দিবেন। এই নিন আমার কার্ট, আবার আসবেন।'



## শরৎচন্দ্রের অনাক্রম

কল্যাণী দত্ত

পুরাতনী

শরৎচন্দ্র ছিলেন বেজায় খেয়ালী। অতবড় কুশলী অনেক কথা উষ্টো পাশ্চাৎ বলতেন ইচ্ছে বা অনিচ্ছে যে কোন কারণেই হোক। ভাষা অত্যন্ত সরস, বাঙালী মাত্রেরই বোধগম্য। কিন্তু মেজাজী মানুষ। আমি যা বলছি সবই শোনা কথা যেমন তিনি বলেছেন যাঁট বার গোঁরা বইটা পড়েছেন। যাঁট বার গোঁরা কেউ পড়তে পারে — এতো আমরা কল্পনাও করতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুব ভক্তি করতেন, আবার মধ্যে মধ্যে একমাত্র নিজেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও ভাবতেন। এই শতাব্দীর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার শীকার ১ম পর্ব পর কে যেন তাঁকে উসকে দিয়েছিল তাই নিজেকে নোবেল প্রাইজ পাবার উপযুক্ত ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁকা খরচ করে ইংরাজী করিয়েছিলেন। দেবানন্দপুর গ্রামের ছোট দু'খানা ঘরে বাড়ি আর একফালি জমি ২০০ টাকায় বিক্রি করে প্রথমে হালিশহর তারপর তাঁরা স্বপ্নবাজি ভাগলপুরে চলে যান। মতিলাল বাবুর নির্বুদ্ধিতার ফলে ভাগলপুরে সকলের আদরিণী বিধবা বাড়িদির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তারপর থেকে ওঁরা বেশ একটু দমে যান। রেপুনে চলে যান। নিজের সম্বন্ধে তাঁর বেশ উচ্চ ধারণা ছিল যেমন ছবি আঁকতে পারেন গানের ও স্বরলিপির বৈজ্ঞানিক আলোচনা তাঁর বেশ আসে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি রীতিমত বিরক্তি ছিল, তাঁর ছবিতে মেয়েদের পা পাশ বালিশের মত সরু এমন কথাও বলেছেন। মেয়েদের শ্রদ্ধা করেন দশ বারোটি নারীর মূল্য ইত্যাদি লেখা হির করেন। আমি জ্যাক অব অল ট্রেডস্ তাই সভ্য সব একটু আর্ধট্য বৃদ্ধি। অবনীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে আর্ট পেট্রিং তাঁর চেয়ে শরৎবাবু বোঝেন ভাল। কবি কালিদাস রায়ের 'বৃন্দাবন অঙ্ককার' কবিতাকে ডাঃ অশ্রীল বলেছিলেন 'বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য' তিনি অবশ্যই লেখার শক্তি ধরতেন কিন্তু হয়ে উঠল না তার আবার শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বাসে ভয়? কী সর্বনেশে কথা! 'চরিত্রহীন' যে পরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি করার কথা তা করল না অথচ রবীবাবুর 'চোখের বালিতে' ভদ্রবরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে নষ্ট হইতেছে তাহাতে কেহ কথটি বলে না। লেখক কিনা প্রভাতবাবু? প্রভাতবাবুর রত্নদীপ? ব্রাহ্মণ ধর্মের অহঙ্কার তাঁর খুব ছিল। আমার চরিত্রহীন শুধু নামের অপরাধেই অপরাধী। নানা ব্যক্তিগত গালমন্দে চিঠিগুলো ভরা। (ডঃ গোপাল রায়) নিজের মাতুল উপেন গাঙ্গুলীকে একবার চিনতে চাইলেননা। কমলা-ওয়ালার ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তাই। উপেনকে লিখে 'বিত্ত্বার' জন্য বসিয়ে বললেন 'পথের দাবীর' মত বই তোমাকে দিলে তুমি কত টাকা আমাকে দেবে? দামই বা কত দেবে? রবীন্দ্রনাথকেই বা কত দেবে? শোনা ছিল নোবেল প্রাইজের আশা তার খুব বেশি মাত্রায় ছিল। দিদি অনিলা দেবী তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন অথচ বলতেন সেটা 'শৈব বিবাহ' নিজের নামে অসামাজিক জীবনের কথা নিজে বলে বেড়াতে ভালবাসতেন। তার স্ত্রী লেখাপড়া জানতেন না অথচ সেকথা চিঠিপত্রে অনুচিত ভাবেই বলেছেন।

শরৎচন্দ্র বেপারোয়া একরোখা মানুষ। ভাগলপুরে তার বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী যোগেশ চন্দ্র রায় তার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন সঙ্গীদের ভয় দেখাতে এবং নিজেকে অসাধারণ

দুঃসাহসী প্রতিপন্ন করে নিজে বাহবা নিতে ভালবাসতেন। বালিগঞ্জে যখন এলেন ১৪ অশ্বিনী দশ রোডে টালির বারান্দাওয়াল প্রকান্ত বাড়ি করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বাড়ির রান্না কাপড় কাচা ইত্যাদি পরিশ্রমের সব কাজই করতেন। তাঁকে কোন সম্মান দেননি। মেয়েদের পর্দা পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন — যা লিখেছি প্রত্যেক কথাই সত্যি। কথাটির বিচার হয়নি প্রত্যেক কথা আমার ওজন করা বদল করা যায় না। লেখার সম্বন্ধে যথেষ্ট অহঙ্কার তাঁর মনে ছিল। সামতা বেড়ের বাড়ি গিয়ে প্রভুল চন্দ্রগুপ্ত এবং চারু দাশগুপ্ত। কী পরিমাণ নাকাল হয়েছিলেন তা প্রভুল গুপ্তের 'দিনগলি মোর'-এ পাওয়া যায়। অথচ অন্য অনেকে প্রচুর সম্মানও পেয়েছে।

## হারাধনের বৈঠকখানা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প

বেজুর গাছের তলায় রোদটা জাফরি কটা মনে হয়। কিন্তু ওখানেও নিশ্চিতই বসার উপায় নেই। একটা কাক বাসা বেঁধেছে, গাছটাকে সে নিজের সম্পত্তি মনে করে। হারাধন এসে বসলেই এমন চিল্লোতে গুরু করে যে তিষ্ঠানো যায় না। পাখিদের জগতে এই কাকগুলো একেবারে লক্ষীছাড়া, যেমন ছাঁচোয়ের মতন চেহারা তেমনিই বিকট গলার আওয়াজ।

দুপুরবেলা ঘুম দেওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির মধ্যে থাকাই যায় না। বারো চোদ্দটি ছেলেমেয়ে কলকল করে দুটো ঘর জুড়ে, তারা লাফায়, কাগজ গোলা পাকিয়ে ছোঁড়ে, কেউ বা ভাঁকা করে কঁদে ওঠে। পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে বয়েস, ওরা পড়তে আসে বড় বউমার কাছে। ইস্কুল অবশ্য বেশি দূর নয়, মাইল দু'এক দূরে মহিষখালিতে, কিন্তু মাঝখানে নদী আছে, সে নদীর ওপর আজও ব্রীজ হলো না, তাই এদিককার লোক ছোট ছেলেমেয়েদের ওপারের ইস্কুলে পাঠায় না।

খুদে পড়ুয়ারা আসতে গুরু করলেই হারাধন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বউমা ঘরে বসে রোজগার করছে, কিছু বলার উপায় নেই।

বেশি বয়েস হলে রোদের জ্বালা বেশি লাগে। শীতও বেশি লাগে। বৃষ্টি একেবারে নয় না। এখন জন্মি মাসের ঠা-ঠা রোদ, বর্ষা নামতে দেরি আছে, এ বছর তো কালবোশেখির ঝড়ই হলো না ভালো করে।

একখানা মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে বড় তেঁতুল গাছটার তলায় ছায়া পাওয়া যায়। এ গাছেও নানা রকম পাখির বাসা আছে, কাকও আছে, কিন্তু বসে বসে মানুষজনও দেখা যায়। তক্তার বেঞ্চিখানা ভেঙে গেছে, লাটী মেরে বসতে হয় মাটিতে, হারাধনের ডান পারের হাঁটুতে হারী বাথা, সে পট-টা মুড়তে পারে না, মেলে রাখে সামনের দিকে। একটা বিড়ি ধরালেই মনটা উদাস হয়ে যায়।

বর্ষার সময় থোয়া-নোকো চলে, এখন বন্ধ। মাঝখানে চড়া পড়ে আছে, লোকজন হেঁটেই পার হয়। গরুর গাড়িও যায়, শুধু একটা জায়গায় জল হাঁটু ছাড়িয়ে উর পর্যন্ত ওঠে। সেখানে গরুর গাড়ির চাকা টোলাটলি করছে হয় দু'তিনজন মিলে। ঝাঁ লোকেরা কাপড় ভেজায়। এক সঙ্গে দু'তিনজন লোক কথা বলতে বলতে এসে এমন ভাবে নদীতে নানেন যেন এটাও রাস্তা। জলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। বাস্তব ভদ্রিতে ওপারে চলে যায়।

হারাধনের মনে হয়, যত লোক যাওয়া-আসা করছে, তাদের সকলেরই যেন জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, কোনো জায়গা থেকে আসছে, কোথাও যাবে। কেউ তেঁতুল গাছের নিচে বসে না। দু'একজন হারাধনের দিকে তাকায় এক ঝলক। কী ভাবে তারা? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই বুড়টাকে?

সত্যি সত্যি তাড়িয়ে তো দেয় নি। বড় বউমা বাড়িতে ইস্কুল খুলেছে, সেটা মাঠেই দোয়ের নয়। লেখা পড়া শিখিয়েছিল, সেই বিদ্যেটা কাজে লাগাচ্ছে, সংসারের শাস্ত্র হাচ্ছে কিছুটা।

হারাধন দুপুরে ভাত-ঘুম দিতে পারছে না বলে নাশির জানাবে কার কাছে?

খোয়াঘাটের পাশে একটা চৌকো সাাদা পাথর পোতা আছে। বছর কয়েক আগে খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অনেক সরকারি আমলা এসেছিল, তিন খানা গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন একজন মন্ত্রী, ঠিক ভোটের আগে। গড়খাই নদীর ওপর চওড়া সেতু হবে এদিককার মানুষের কত উপকার হবে বলে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেলেন। সেই পাথরটার ওপর শ্যাওলা জমে গেছে। লেখাগুলোও ভালো করে পড়া যায় না। আহা, ডুলেই গেছে বোধহয়, মন্ত্রীদের কত কাজ, কত দিক সামলাতে হয়, এ সব ছোটখাটো ব্যাপার মনে রাখবে কী করে?

তা এ সেতু হোক বা না হোক, তাতে হারাধনের কী আসে যায়? খোঁড়া পা নিয়ে সে ওপারে কবারই বা যেত! তার কোনো দরকারও নেই। সেতুটা হলেই বরং ক্ষতি হয়ে যেত তাদের সংসারের, বড় বউমার ইস্কুলটা আর চলতো না, তাতে বড় বউমার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যেত!

নদীর ওপারের আকাশে কয়েকটা শকুন উড়ছে। নিশ্চিত কোনো গরু মরেছে, কিংবা কুকুর। শকুনগুলো ঠিক টের পায়। ওরা থাকে কোথায়? এতখানি বয়েস হলো, হারাধন কোনো শকুনের বাসা দেখে নি। এ তল্লাটে নিশ্চিত নেই! ওরা কি আকাশেই সর্বক্ষণ উড়ে বেড়ায়!

একটু ঝিমুনি এসেছিল, হঠাৎ এক সঙ্গে দু'খানা গরুর গাড়ি এসে গেল, তারা সোরগোলা তুলে পার হতে না হতেই দুটো রাখাল ছেলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। এখন তারা বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপি করছে। তিনটি নীচোতাল রমণী ঠিক যেন গান গাইবার সুরে কথা বলতে বলতে ওপার থেকে চলে এলো এপারে।

হারাধনের বাড়ির পেছনে একটা পুকুর আছে। সাত শরিকের পুকুর, সব বাড়ির লোকেরাই সেটা ব্যবহার করে। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত সে পুকুর থেকে মেয়েদের দখলো। শুধু মান কান, দল বেঁধে আঁচাতে এসেও কতক্ষণ যে গল্প করে। সেইজন্য পুকুর ধারে দুপুর বেলা কোনো পুরুষ মানুষের বসে থাকটা ভালো দেখায় না। হারাধনের মতন বুড়ো মানুষের পক্ষেও না। বুড়ো হলেও যে বস মরে যায় না, তা তো হারাধন এই বয়েসে পৌঁছে নিজেই বুঝেছে।

পাশের বাড়ির শান্তি যখন আসে বড় বউমার সঙ্গে গল্প করতে, সে বসে থাকলে তেমন কিছু মনে হয় না। শান্তির মুখে কোনো চটক নেই, কিন্তু সে যখন হাঁটে, তার পেছনের তম্বুরা দুটি দোলে, সেই দিকে হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকতে থাকতে হারাধন এক সময় নিজেই সচেতন হয়। ছি ছি ছি, শান্তি তাকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকে, তার দিকে কি অমন দৃষ্টি দিতে আছে? আর কোনোদিন কোনো ঝীলোকেই আলিঙ্গন পাওয়া তার ভাগ্যে নেই। অথচ বাসনা রয়ে গেছে!

নদীর ধারে বসে থাকায় অবশ্য কোনো দোষ নেই। এজমালি জায়গা, যতক্ষণ ইচ্ছে থাকে, কেউ কিছু বলবে না। শুধু যদি একটা হাওয়া থাকতো! হাওয়া নেই। আকাশ খমখমে, সারা গায়ে দরদরিয়ে থাম ঝরে।

হারাধনের অবশ্য চমৎকার একটা বৈঠকখানা আছে। খুব নিরিবিলা, কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝট নেই, সঙ্গী-সাবীনের নিয়ে বসে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। কিন্তু দুপুরবেলা সেখানে



যাবার উপায় নেই। সেই ইম্পাতের ঘর গরমে ভেতে একেবারে আঙনের মতন হয়ে থাকে। তা ছাড়া দুপুরলেটায় সঙ্গী সাথীরাও তো কেউ আসে না, বরং ছেলে-ছোকরাদের উৎপাত থাকে, সন্ধ্যার পরই সেটা হারানধনের নিজস্ব।

নদী পেরিয়ে এই রাস্তাটা অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে বর্ধমান পর্যন্ত পৌঁছেছে। বর্ধমান শহর অনেকবার দেখা আছে হারানধনের। এমনকি সে আসানসোল বাকারেও গেছে, কিন্তু বাংলার বহিরে কখনো যায় নি। যাওয়ার দরকার হয় নি। বয়েসকালে তার জামা-কাপড়ের ব্যবসা ছিল, পাইকারি মাল সব বর্ধমানেই পাওয়া যেত। এখন তার শুধু একবার কানপুর যেতে ইচ্ছে করে। কানপুর শহর যে কতদূরে, সে সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা নেই। ট্রেনে করে যেতে নাকি দেড়-দু দিন লেগে যায়। বড় ইচ্ছে করে, কানপুরে গেলে তার অনারকম খাতির যত্ন হবে।

কিন্তু কে তাকে দেখে ভাড়ার টাকা? হারানধনের নিজস্ব সম্বল কিছুই নেই। দিবাকরের কাছে চাইবারও মুখ নেই।

বড় ছেলে দিবাকর এখানে একটা কাপড়ের দোকান চাকরি করে। সকাল নটায়ে বেরিয়ে যায়। ফেরে সেই রাত নটা-দশটা বাজিয়ে। বাড়িতে যে-টুকু সময় থাকে, তখনও সে বাবার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। হারানধনও যেতে কথা বলতে যায় না। নিজেরই ছেলে, এক সময় কোলে নিয়ে কত আদর করেছে। এখন সেই ছেলেকেই সে বেশ ভয় পায়। হারানধনের মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করে।

তা বলে দিবাকর যে বাবাকে খেতে পরতে দিচ্ছে না, সে অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। না দিলেও পারতো, দূর করে দিতে পারতো, হারানধন যে বাপের যোগ্য কাজ করে নি।

হারানধন দু'বেলাই যেতে পায়, বছরে দু'খানা খুতি, দু'খানা কুতুয়া পায়। জুতো অবশ্য দেয় না, দিবাকরের পুরোনো চটি পায় দিতে হয়। জুতোর দরকারটাই বা কী, হারানধনের অভাববুয়ানি নেই। তবে যদি কখনো কানপুরে যেতে হয়, তা হলে বোধহয় ছেঁড়া চটি পায় দিয়ে ট্রেনে ওঠা চলবে না।

বাবার হাতে কোনো টাকা পয়সা দেয় না দিবাকর। নিয়মিত ভাত-কাপড় জোগান দিলে পয়সা কেন লাগবে? কিন্তু হারানধন বিভিন্ন খরচ পাবে কোথায়? বিভিন্ন নেশা বড় নেশা। ঘটা খানেকের মধ্যে একটা অন্তত বিড়ি না চানলে যেন অসুখাওয়া শুকিয়ে কাঁট হয়ে যায়। মদ-পাঞ্জা খায় না, দুধও খায় না কতদিন, জীবনে আর আছে কী, এই বিড়ি ছাড়া?

ছেলের কাছে চাইবার মুখ নেই, চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে সে বড় বউমার কাছে হাত পেতেছিল। বড় বউমা উপদেশ দিয়েছিল বিড়ি খাওয়া মোটেই ভালো নয়, ঐ জন্যই তো আপনার ঘঙার ঘঙার কাশি সারে না.....। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন নি, দশটা টাকা হাত খরচ দেয়।

বিকেল পড়ে এলেই হারানধনের মনটা নেচে ওঠে। বিকেলের দিকে একটা দমকা হাওয়া আসে। মাঠের মধ্য দিয়ে হারানধন একটা পা টেনে টেনে হাঁটে। ইচ্ছে থাকলেও জোরে যেতে পারে না। আকাশে দাল রঙের ছড়াছড়ি। জলার ধার থেকে এক সঙ্গে উড়াল দেয় বালকের ঝাঁক, ধানের খেত নদীর মতন দোলে।

হাঁটতে হয় অনেকটা, সেই রেললাইন পর্যন্ত, তবু হারানধনের কষ্ট হয় না।

এ লাইন দিয়ে ট্রেন যায় খুব কম। সারা দিনে দু'খানা যাত্রী গাড়ি, আর মাঝে মাঝে মাল গাড়ি। অনেককাল আগে, এখানে দুটো ট্রেন গুতো গুতি করেছিল, কেমন করে যেন এসে পড়েছিল মুশোমুখি। জখম হয়েছিল দুটো ইঞ্জিনই, আর চারটে বগি ছিটকে গিয়েছিল লাইন থেকে। রেলের লোকেরা এসে ইঞ্জিন দুটো টেনে নিয়ে গেছে। ভাঙা বগিগুলোর টুকরো টাকরো যতদূর সম্ভব তুলেছে, কিন্তু পড়ে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার একটা বগি কী করে যেন ছিটকে লাইন থেকে অনেকটা দূরে এসে মাঠের মধ্যে দাঁবৎ কাং হয়ে রয়েছে। সেটা একেবারে অক্ষত। মাঠের মাটিতে বসে গেছে চাকা, সেটা সরানো সহজ কথা নয়।

তবু একবার একটা মস্তবড় ইঞ্জিন এনে ঐ বগিটা রেল কোম্পানি টেনে নিয়ে যাবে, এরকম মাঝে মাঝে শোনা যায়। শোনাই হয়, সে ইঞ্জিন আসে না।

ঐ বগিটিই হারানধনের বৈঠকখানা।

যাত্রীদের বসার বেঞ্চি গুলো আটুট আছে। পাখা নেই, সে সব কারা খুলে নিয়ে গেছে কবে, আলোও ছলে না। তাতে কোনো অসুবিধে নেই। আভাধারীরা কেউ কেউ টর্চ নিয়ে আসে, রাখারমণ হাতে দুলিয়ে আনে ইঞ্জিনে।

একে একে আসে শশী, ব্রজ, তিনকড়ি, কাশেম আলি, জটিলেশ্বর — যার ডাকনাম জটা, মাতব্বর মোহা..... সকলেরই চুল পেকে গেছে। এই রেলের কামরায় ওদের ক্লাব, এখানে সুখ দুঃখের কথা হয়। হাসি-ঠাট্টাও চলে খুব।

তবে ঐ কামরারটার দখল নিরুপগ্রহে পাওয়া যায় নি। দিনের বেলা মাঠের চাষা ও রাখালরা এসে চুক পড়ে। সন্ধ্যার দিকেও জোয়ান-মদ পুরুষরা এখানে মদের আসর বসাতে শুরু করেছিল। হারানধনরা এসে বসার পরও ওরা চুক পড়তো। বুড়াদের গ্রাহাই করতো না। যেন রেলের কামরায় সবাইই অধিকার আছে। সবাই ছাড়া এখানে বিনা টিকিটের। মদ খেতে যেতে তারা এমনই হেঙ্গা শুরু করতো যে হারানধনের চূপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। ওদের ক্লাব উঠে যাবার উপক্রম। ছোকরারা ক্রমে এমনই বাজাঝড়ি শুরু করলো যে মেয়ে মানুষ এনে বেগেল্লাও বাস গেল না। ছোকরাদের নাটের গুরু ছিল জাভেদ আর রতন। এই দু'জনের মধ্যে জাভেদ হাসানাই, তার পৌ ধরা ঐ রতন। জাভেদের যেমন গুণা মতন চেহারা, রতনের মেয়েমুখ-খারাপ।

মাতব্বর মোহা তখনো হারানধনের ক্লাবের সদস্য হয় নি। সে তখন পঞ্চায়েত প্রধান। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়েস, কিন্তু দশাসই চেহারা, তেজী পুরুষ। হারানধনরা দল বেঁধে একদিন মাতব্বর মোহার কাছে নালিশ জানাতেই সে বললো, চলো তো দেখি গিয়ে ওরা কী করে?

এমনই ভাগ্য, সেইদিনই জাভেদরা একটা অনিচ্ছুক মেয়ে মানুষ ধরে এনেছে। সে যুঁপিয়ে যুঁপিয়ে কঁাদছে, আর বলছে, ছেড়ে দাও, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। কামরারটার কাছে আসতেই এসব শোনা গেল। মাতব্বর মোহা এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে উঠে পড়লো সেই কামরায়, তারপর সমানে লাথি মারতে লাগলো সব কটাকে। ওদের কাছে ছোরা-ছুরি থাকাও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মাতব্বর মোহার গায়ে হাত ছোঁয়াবে, এখন সাহস কার?

জাভেদের চুলের মুঠি ধরে নিচে নামিয়ে মাতৃকর মোমা বলেছিল, হারামখোর, শয়তান, তোকে আমি পুলিশে দেবো। দশ বছর জেল খাটাবো।

শেষ পর্যন্ত জাভেদকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে চুক্তি হয়েছিল যে সন্ধ্যার পর তারা কেউ আর এই কামরায় আসতে পারবে না। মেয়ে মানুষ আনা একেবারেই নিষিদ্ধ।

দিনের বেলা এই ক্লাবটা চলে না। তার কারণ, বুড়ো হলেও অনেকেই কিছু না কিছু কাজ করে, হারান ছাড়া। শুধু যে তার এক পায়ে বাত হয়েছে বলেই নয়, তার মন ভেঙে গেছে।

ছেলের সংসারে থাকে। নিজের বাড়িটার ওপরেও তার কোনো অধিকার নেই, কারণ বাড়ির সবাইকে সে ঠকিয়েছে। একসময় সে ভূয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

হাঁ, ভূয়াই তো, তা ছাড়া আর কী!

কাপড়ের ব্যবসা ছিল হারাধনের। তখনো তো এরকম বড় বাজার বসে নি, সপ্তাহে দু'বার হাট হতো। তাই নিজস্ব স্থায়ী দোকান ছিল না হারাধনের, প্রতি হাটবারে সে একটা চালা ঘরে সওদা সাজিয়ে বসতো। তাতেই তো সে সংসার চালিয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ছেলেদের লেখা পড়া শেখাবার চেষ্টা করেছে। দিবাকরের লেখাপড়ার মন ছিল না, বেশিদূর পড়ে নি, কিন্তু ছোট ছেলে প্রভাকর ইন্ডল শেষ করছিল। এ প্রভাকর ছিল হারাধনের চমকের মণি। প্রভাকরও বাবা-অন্ত প্রাপ্ত ছিল। বই থেকে কত গল্প শোনাতো বাবাকে।

বেশ চলাছিল, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট হলো। জলেশ্বর ছিল তার খুব বন্ধু। নানা রকম দালালি করা ছিল তার পেশা। একদিন সেই জলেশ্বর চুপিচুপি বললো, হারু, টাকা ডবল করবি? আমি ব্যবসা করে দিতে পারি। তবে দু'টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে হবে না। অন্তত এক দু'হাজার চাই।

হারাধনের মূলধনই হাজার পাঁচেকের বেশি নয়। সে অত টাকা দেবে কী করে। জলেশ্বরের কথা অবিশ্বাসও করতে পারে না। এদিকে আর একটা লোক জামা-কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে, হারাধনের বিক্রিবাটা কমে আসছে। পরীক্ষা করার জন্য সে জলেশ্বরকে একবার এক হাজার টাকা দিল, সাত দিন বাদে জলেশ্বর তাকে নগদ কড়কড়ে দু'হাজার টাকা গুলে দিয়ে গেল।

এই রকম চললো কয়েকবার।

কিন্তু মস্তুর দিয়ে তো আর টাকা ডবল হয় না। আসল ব্যাপারখানা কী তা জানার কৌতূহল হবই হারাধনের। এও এক ধরনের ব্যবসা। ফজল, ননী, রাম সিং নামে কয়েকটা ছোকরার একটা দল আছে। তারা বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে বন্দুক পিস্তল এনে এদিকে বেচে দেয়। নগদ কারবার। লাভ এত বেশি থাকে যে যারা মূল টাকা জোগায়, তাদের ডবল টাকা ফেরৎ দিয়েও প্রত্যেকে কিছু কিছু পায়।

তবে, এ ব্যবসার ঝুঁকি আছে।

কাগজ পত্রে লেখাপড়ার কোনো বালাই নেই, সব মুখে মুখে, বিশ্বাসের ওপর নির্ভর। তবে এ লাইনে সচরাচর কেউ বিশ্বাসের খেলাপ করে না। করলে খুনোখুনি হয়ে যায়। এ লাইনে একবার ঢুকলে বেরুবারও উপায় নেই।

লাভের মতন লোকশানও ভাগ করে নিতে হবে। কোনবার যদি বর্ডারে ধরা পড়ে যায়

মালপত্র, তা হলে সবটাই বরবাদ। সেবারে আর মূলধনও ফেরৎ পাওয়া যাবে না।

সেরকম হয়েছে দু'একবার, তবু মোটামুটি লাভই হিছল হারাধনের। তার বড় সাধ, টিনের চালের বাড়ির বদলে একখানা অন্তত পাকা ঘর তুলবে। ছোট জেলেটাকে কলেজে পড়াবে। কলেজ তো এখানে নেই, সেই বর্ধমান, সেখানে পড়াওনো আর থাকা-খাওয়ার খরচ কী কম! ছেলেটার কলেজে পড়তে যাওয়ার খুব ইচ্ছে, হারাধনেরও ইচ্ছে ছিল, এই তাঁতীবাড়ির একটা ছেলে গভর্নমেন্টের বড় অফিসার হোক! মটোর গাড়ি চেপে বাড়িতে আসবে তার ছেলে, হারাধনকে সবাই বলবে, অফিসারের বাবা! সে আর হাটে বসে জামা-কাপড় বিক্রি করবে না, বাড়িতে আবার তাঁত বসাবে, একটা নয়, কয়েকখানা, লোক রাখবে ....

পরপর দু'বার মার খাবার পর হারাধন ভেবেছিল, খেপেই হয়েছে, আর না। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। পাকা বাড়িতে থাকার সাধ তার আর মিটবে না এ জীবনে। তাঁত চালাবার বদলে তাকে রেডি-মেড ফ্রক আর ইজের আর জামা বেচে যেতে হবে সারা জীবন। তাঁতীর ছেলে আবার কলেজে পড়বে কী, বাবার সঙ্গে গিয়ে হাটে বসুক।

কিন্তু এ যে, একবারও এ লাইনে ঢুকলে আর বেরুনা যায় না।

একদিন ফজল আর জলেশ্বর এসে তাকে ধরলো বুড়ো শিবতলায়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, আর পেছনেই শ্মশান, হারাধনের পর বিশেষ করে পড়ি আসে না। বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দিরে একটা প্রদীপ জ্বলে। হাট থেকে ফেরার পথে এ জায়গাটায় এসে হারাধনের গা ছম ছম করে। তাড়াহাড়া পার হয়ে যায়।

এ বটগাছ তলার খুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন। জলেশ্বর বললো, হারুদা, দাঁড়াও জরুরি কথা আছে।

ফজল বললো, চাচা, এবার তোমাকে বারো হাজার টাকা দিতে হবে!

হারাধন আকাশ থেকে পড়লো। বারো হাজার টাকা সে বাপের জমে দেখেনি। ছোট মেয়েটার বিয়ের সময় শেষ জমিটুকু বিক্রি করে পেয়েছিল সাত হাজার টাকা। আর তার জমিও নেই।

ফজল বললো, চাচা এবার বড় একটা অভাঁর আছে। আসামের পাটি। অন্তত পাঁচ লাখ। মাল হাতে পেলেই নগদ টাকা দিয়ে দেবে। বর্ডারের ওপাশে মালও রেডি আছে। এখন আমাদের ক্যাশ চাই। ওপারে গিয়ে টাকাটা দিয়ে মাল আনবো, এপারে এলেই হাতে হাতে টাকা। মোটে ক্রিশ খন্টার ব্যাপার।

জলেশ্বর বললো, আরো দুটো পাটি রেডি আছে, তারা ক্যাশ দেবে। বারো হাজার টাকা কম পড়েছে। সেই চাপ তোমাকে দিচ্ছি। এবার লাভ অনেক বেশি, বারো দিলে তিরিশ পাবে।

কিন্তু অত অন্তর-শব্তর আনবে, বর্ডারে ধরা পড়ার সম্ভাবনা যে খালি আনা।

না, এবারে বরং কোনো ঝুঁকি নেই। ফজল তাকে আশ্বস্ত করে বললো, বর্ডারের সিকিউরিটি ফোর্সের এক অফিসারের সঙ্গেই পাকা কথা হয়ে আছে, সে সাহায্য করবে, তাকে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার।

জলেশ্বর বললো, হারুদা এই বুড়ো শিবঠাকুরের সামনে আমি কিরে কেটে বলছি এবারে কোনো রিস্ক নেই। আমি নিজেও ওপারে যাবো। এত বড় দাঁও আর তুমি পাবে না।



বটগাছে এই সময় একটা টিকটিক ডেকে উঠলো, ঠিক ঠিক ঠিক।

কথার মাঝখানে টিকটিকি ডাকলে সে কথটা সত্যি হয়। লোভ সামলাতে পারলো না হারাধন। কিন্তু অত টাকা সে পাবে কোথায়? হাতে মাত্র পাঁচটা দিন সময়।

অনেক ভেবে চিন্তে সে বেচারাম সাঁপুইকে তার বসত বাড়িটা বন্ধ দিয়ে দিল চোদ হাজার টাকায়। পরিবারের কার্যকে কিছু জানালো না। জানাবার দরকারই বা কী? বেচারামের সঙ্গে শর্ত হয়েছে, এই চোদ হাজারের ওপর এক হাজার টাকা সুদ পেলেই সে বন্ধক ছেড়ে দেবে। তা হলে তিরিশ থেকে বাদ গেল পনেরো হাজার, আর পনেরো হাজারে পাকা বাড়ি না হোক, সে ছোট ছেলেকে বর্ষমানের কলেজে পাঠাতে পারবে। লেখাপড়া শিখে পাশ টাশ করে যখন বড় চাকরি করবে প্রভাকর, তখন সে-ই নতুন বাড়ি বাবিয়ে দেবে। বাবাকে কি সে তাঁত বসাবার খরচও দেবে না; বাবাকে যে সে বড় ভালোবাসে!

কয়েকটা দিন স্বপ্নে মগ্নগল হয়ে ছিল হারাধন।

শেষ পর্যন্ত কথার খেলাপ করে নি জলেশ্বর তার ফজল। তবে তাদের দুর্ভাগ্য এই, হঠাৎ বদলি হয়ে গেল তাদের চেনা সেই অফিসার। তার বন্ধল যে এলো, তার ব্যয়স কম। মাথায় এখনো কর্তব্যজ্ঞান টনটন করছে। নিজে টহল দিতে গিয়ে সে চোরালানিলয়ের ওপর বেমজা গুলি চালিয়ে দিল। সব মাল তো ধরা পড়েছেই, জলেশ্বর মারা গেছে সেখানেই, ফজল গুলি খেয়ে খোঁড়া অবস্থায় পালতে পারে নি, ধরা পড়ে গেছে। ওদের বাকি দলটা গা-ঢাকা দিয়েছে, তাদের কোনো পাতা নেই।

হারাধন সর্বস্বান্ত তো হলোই, তার জন্য প্রকাশ্যে শোক করারও উপায় নেই। এ মাগলারদের সঙ্গে কার কার যোগ ছিল, কারা কারা টাকা দিত, তাদেরও নাকি পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দারুণ পেট ব্যাথার ভান করে হারাধন ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে রইলো কয়েকদিন।

হারাধনের নাম ফাঁস হলো না বটে, কিন্তু পরের মাসেই বেচারাম সাঁপুইয়ের আর তার সইলো না, সে টাকা চাহিতে এলো।

হারাধনের বউ তখনো বেঁচে, বাড়ি বন্ধক দেওয়া হয়েছে শুনে সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো স্বামীর দিকে। বাপ-ঠাকুরার বসত বাড়ি যে বন্ধক দেয় তার মতন কুলদার আর কেউ আছে পৃথিবীতে? অতি দরিদ্রও তো খেতে না পেলেও তার বন্ধক দেয় না।

কী করেছে হারাধন সেই টাকা দিয়ে? হারাধন উত্তর দিতে পারে না। জুয়া খেলেছে? বর্ষমানে পাইকারি মাল কিনতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে রাত কাটিয়ে ফেলে, সেখানে কোনো ডাকিনী-যোগিনীর পাল্লায় পড়েছে? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে তার? হারাধনের বাকি হরে গেছে, সে শুধু নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে।

ছেলোরা মিলে সেই সময় বাপকে মারধোর করলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। তা করে নি বটে, তবে সবাই মিলে ব্যাকবাণে তাকে ধরাধারী করে ফেললো। সবচেয়ে বিধিয়ে বিধিয়ে কথা বলতে পারে লেখাপড়া জানা বড় বউমা বাসন্তী। হারাধন সত্যিই অসুখে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বাড়ি উদ্ধার করলো এ বাসন্তীই। একটা চোখ টাটা বন্ধে তার ভাল করে বিয়ে হয় নি, কিন্তু বাপের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ নয়। নিজের যে-টুকু গয়নাগাটি ছিল সব

বেচে দিল। কলানবগ্রামে তার এক জ্যাঠাভূতো দাদা ফার্মালিজারের ব্যবসা করে। তার কাছ থেকে বিনা সুদে কিছু টাকা ধার করে এসে বেচারাম সাঁপুইকে মিটিয়ে দিল।

সেদিন থেকেই এটা হয়ে গেল ছেলে-বউ-এর সংসার। মূলধনের অভাবে রেডিমেড পোশাকের ব্যবসাও আর চালাতে পারলো না হারাধন, সে হয়ে গেল পুত্রের অন্নদাস। তার বউকে এ লাঞ্ছনা বেশিদিন সহ্য করতে হয় নি, সে হারাধনকে আরও অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে মেরে গেল টুপ করে। আর যার জন্য এত কিছু করা, সেই প্রভাকরও একদিন চলে গেল বাড়ি ছেড়ে।

দাদার সঙ্গে প্রভাকরের বনতো না। প্রায়ই কথা কাটাকাটি। একদিন দিবাকর তাকে ঢালা কাঠ দিয়ে পিটিয়েছিল। ছোট ছেলেকে বাড়িতে ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল না হারাধনের, সে কিছু জানিয়েও যায় নি। প্রভাকর তেজী ছেলে, ঘুরতে ঘুরতে সে কানপুরে কী করে গেল কে জানে। তবে বাবাকে সে ভোলেনি, কানপুর থেকে সে বাবাকে চিঠি লিখেছিল, শেষ চিঠিটা আসে তিন বছর আগে।

হারাধনের ধারণা, অতদূর দেশে গিয়ে প্রভাকর মানী লোক হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, বড় চাকরি পেয়েছে, নিজস্ব বাড়ি হয়েছে, অভিমান সে আর গ্রামে ফেরে না। হারাধন কলনায় দেখতে পায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মতন বড় বাংলা বাড়িতে থাকে প্রভাকর, সামনে বাগান, সে প্যান্ট কেট পরে ইরিজিকিৎসা কথা বলে বাবাকে পেনে সে মাথায় করে রাখবে। প্রভাকরের অধীনই কর্মচারীরা অফিসায়ের বাবা হিসেবে হারাধনকে দেখলেই সেলাম করবে।

যারা পরের ভাঙ্গো সাহেব হতে পারে না, সেই ধরনের কিছু লোক, এই গ্রামেরই লোক, আড়ালে বলাবলি করে যে প্রভাকর অন্য দেশে গিয়ে নাকি জেল খাটছে। যে হারামজাদারা এই অলঙ্কারে কথা বলে তারা কি নিজের চোখে দেখে এসেছে? ওদের জিতে পোকা পড়ুক! প্রভাকর জেল খাটবে কেন, তার লেখাপড়ায় মাথা ছিল, হারাধন তাকে কলেজে পড়াতে পারে নি, সে নিজের চেষ্টায় বিদ্বান হয়েছে, সে বড় অফিসার হবেই। হারাধন নিজে গিয়ে তাকে দেখে আসবে।

রেল লাইনের ধারে দাঁড়ালেই হারাধনের বৃষ্টি টনটন করে। করে সে কানপুর যাবে? কেউ যদি তাকে দুশোটা টাকাও দিত! প্রভাকর যে দু'খানা চিঠি দিয়েছিল, সে চিঠি সন্ধ্যায় রেখে দিয়েছে হারাধন। সে নিজে পড়তে পারে না, তবু চিঠিতে হাত বুলাবার সময় মনে করে, ছেলের মাথাতেই হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বড় বউমাকে বলে বলেও সে চিঠির উত্তর লেখাতে পারে নি। চিঠিতে নাকি শুধু কানপুর লেখা আছে, আর ঠিকানা নেই। বড় অফিসার হলে তার ঠিকানা লাগে নাকি? কানপুরে সবাই প্রভাকরকে চিনবে, হারাধন একবার সেখানে গেলে ঠিকই বাড়ি খুঁজে পাবে।

রেলের লাইন এখানে একেবারে সোজা। মনে হয় যেন দিশেড় মিশে গেছে। খোঁড়া হারাধন সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, এই লাইন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই নিশ্চিত কানপুর। তার দু'চক্ষু জলে ভরে যায়।

রেলের কামরার বৈঠকখানায় প্রতিদিনই হারাধন সবচেয়ে আগে এসে বসে। একখানা ছোঁড়া গামছা এখানে রাখা আছে, তা দিয়ে বেশিগুলোর খুলো মাড়ে। তারপর একটা বিড়ি

ধরিয়ে বসে থাকে অন্য আত্মজাচারীদের প্রতীক্ষায়।

এরপর আসে তিনকড়ি, কোনো কোনোদিন কাশেম তার সঙ্গেই আসে। কাশেমের তবু দু'একদিন বাদ যায়, কিন্তু তিনকড়ি আসবেই, দূর থেকে তার গুন গুন শোন শোনা যায়। কাশেম আর তিনকড়ি দু'জনই কিছুদিন যাত্রা দলে ছিল। এই ক্লাবে এরা দু'জনই গায়ক, এক একদিন মাতিয়ে দেয় গানে।

তিনকড়ি একটা ঠোঙায় ছোলা সেদ্ধ আর মুড়ি নিয়ে আসে। গরমকালে তার জামা গায়ে দেওয়ার বলাই নেই, খুঁতির কোঁচর খুঁটিই জড়িয়ে নেয় গায়ে। মাথায় চুল নেই-ই বলতে গেলে, গলায় একটা সরু সেনার হার। কামরায় উঠে এসে বলে, নে হাঙ্গ, মুড়ি খা। দুপুরে আজ কী দিয়ে ভাত খেলি?

তিনকড়ি এই প্রশ্নটা করবেই রোজ। তার স্বভাবই মেলিল। যাত্রায় সে ফিমেল পাঁচ করতো। আর কাশেম সাজতো সেনাপতি কিংবা অত্যাচারী জমিদার। দু'জনেই মাঝে মাঝে মুখস্ত পাঠ শোনায়।

প্রতিদিন খাওয়ার তো কোনো বৈচিত্র্য নেই। ভাত, ডাল আর ঝিঙে পোস্ত। মাছ রোজ জোটে না। তাও পোস্তর দাম হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে, এখন হয় কচুর শাক অথবা কলমি শাক। লুচি-পোলাউয়ের গল্প শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, সবাই ধরে ফেলবে। তাই হারাধন সত্যি কথাই বলে, তিনকড়ি ভালো ভালো খাবারের ব্যাপারে আগ্রহীও নয়। সামান্য বৈচিত্র্য হলেই সে কৌতূহল দেখায়। যদি হারাধন বলে, আজ বউমা বেশ নারকোলের বড়া করছেলি, অমনি তিনকড়ি বলে, শোন, নারকোলেটা একটু পচিয়ে নিবি, ভেঙে ফেলে রাখবি দু'দিন। ভেতরটা নীল নীল ভাব হবে, একটু গন্ধ হবে, তখন দেখবি সেই নারকোলের বড়ার সোয়াদ আরও কত ভালো হয়ে যাবে।

এরপর চলবে বড়ার আলোচনা। কত রকমের বড়া হয়। পলতা পাতার বড়া, শিউলি পাতার বড়া, সজনে ফুলের বড়া। আর বকফুল, কুমড়া ফুলের বড়া তো অতি শৌখিন খাদ্য। কাশেম বলে, ওসব ঘাস পাতা কী করে তোরা খাস বুঝি না। আমার একটু পোস্ত না হলে ভাত খুঁচে রোচে না।

শশী এসে বলে, সকল বড়ার শ্রেষ্ঠ বড়া হলো কালা চিংড়ির বড়া। আর, এই বর্ষটা নামলেই কালা চিংড়ি পাওয়া যাবে। কালা চিংড়ির মধ্যে কাঁচা লব্ধা কুটিয়ে ....

কাশেম বলে, কখনো খাই নি। একদিন খাওয়াবে নাকি দোস্ত?

শশী বলে, খাওয়ারো, বর্ষা আসুক। একদিন ভেঙে দিয়ে নিয়ে আসবো। তবে বড়া খাওয়া বন্ধই হয়ে যাচ্ছে। তেলের যা দাম বাড়ছে দিন দিন, শালা আড়াই শো সরষের তেলের দাম নিল এগারো টাকা।

অমনি শুরু হলো তেলের প্রসঙ্গ। রান্নার তেল থেকে কেরোসিন তেল। এখানকার জীবন চক্রের সঙ্গে কেরোসিন বড় বেশি জড়িত। সবকার্যে লোকজন প্রায়ই কেরোসিন থাকে না।

হারাধন ছাড়া আর সকলেরই বউ বেঁচে আছে। বউদের গল্প শুক হলে হারাধন যোগ দিতে পারে না। কিন্তু হী করে শোনে। বৃকটা খা বা শাক। সুশীলা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন তার উপযোগিতা ঠিক বুঝতে পারে নি হারাধন, এখন বোঝে। এই বয়সে, ঝগড়া হোক আর

যাই-ই হোক, কথা বলার জন্যও তো একটা মানুষ দরকার। মনে বড় দাগা পেয়ে গেছে সুশীলা। সে জানতেও পারেনা না, তাকে একটা পাকা বাড়িতে থাকার সুখ দেবার জন্যই হারাধন অতখানি কুঁকি নিয়েছিল।

একমাত্র মোমো সাহেব এলেই ঘর সংসারের কথা ছাড়াও, এ গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের পৃথিবীর কথা ওঠে। সে এক সময় পঞ্চায়েত প্রধান ছিল। গতবারের ভোটে হেরে গেছে, হারাধনের মতন তারও পায়ে বাত ধরছে, লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। তবু রাজনীতির কথা ভুলতে পারে না। শক্তিগড়ে দু'পাটির মারামারি হয়েছে, খুন হ'ল। গেছে একজন, সে খবর মোমো সাহেবই এসে শোনায়। খুনোখুনির গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে। রক্তের গন্ধে বুড়ো হাড়ও চনমন করে ওঠে। একমাত্র তিনকড়িই এতে যোগ দেয় না। সে গান গেয়ে ওঠে :

জলে ভাসে চাঁদ, দ্যাখো সেই জলে

সাঁতার দেয় গো চাঁদবন্দী

অমনি কাশেম হংকার দিয়ে ওঠে, ওরে কে কোথায় আহিস, এ সর্দারটাকে ধরে নিয়ে আয়, ওকে হাতে পায়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আয়। ওকে লাথিতে লাথিতে নিয়ে আয়। আমার পায়ের কাছে এনে ফেল, তারপর আমি দেখি —

হারাধন বাধা দিলে বলে আগে গানটা শেষ করতে দে না।

নটা পঁচিশে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন যায়, সেই আওয়াজ পেলেই সবাই গা মোড়ামুড়ি দেয়। এবার আড্ডা ভাঙতে হবে। বেশি রাত পর্যন্ত বাড়িতে কে ভাত নিয়ে বসে থাকবে? বুউ কিংবা ছেলের বউ মুখ ঝামটা দেবে। সবচেয়ে অবস্থা খারাপ শশীর, তার তিনটে নাতির একেবারে রাফুসে ঘিমে, শশীর সেরি হলেই তারা সব ভাত খেয়ে ফেলে। ট্রেনের শব্দ শোনা মত শশী বাড়ির দিকে দৌড় দেয়।

হারাধনের জন্য কেঁদে জেগে থাকে না, তার ভাত ঢাকা থাকে। সেই জন্য আড্ডা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। এই বৈঠকখানায় বসে যেমন খুশি কথা বলা যায়, কেউ বাধা দেবার নেই, বাড়ির লোক বিরক্তি দেখাবে না, ছেলেপুলেরা এসে খটোপাটি করবে না। তাই সে অন্যদের বলে, আর একটু বসো, আর একটু, তিনকড়ি আর একখানা গান গাক।

কিন্তু অন্যরা একে একে উঠে পড়ে। এমনকি জ্বরদন্ত মোমো সাহেব পর্যন্ত বউকে ভয় পায়।

হারাধনের টর্চ নেই, সাপ খোপের ভয়ে সে একা যায় না, অন্য কারুর সঙ্গে সে মাঠটা পেরোয়। তিনকড়ির গানটা সে গুনগুন করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার গলায় সুর নেই।

একলা হয়ে যাবার পর প্রত্যেকদিনই অন্ধকার বাড়িটার সামনে এসে মন খারাপ হয়ে যায় তার। বেশি কেরোসিন খরচ করবে না বলে তার ছেলে ও বউমা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। হারাধনকে রান্না ঘরে গিয়ে কুপি জ্বালতে হবে। তারপর একা বসে বসে ঠাণ্ডা কনকনে ভাত খাওয়ার সময় যেন তার গলা দিয়ে নামতে চায় না।



২

সারাদিন মেঘলা, দুপুরে তর্জন গর্জন শোনা গেছে আকাশে। আজ বৃষ্টি নামবেই। বিকেল শেষ হবার আগেই চতুর্দিক অন্ধকার।

খুব জোর বৃষ্টি শুরু হলে যেতে অসুবিধে হবে, তাই হারাধন আগে আগে রওনা হয়ে গেল। মাঠের ওপর মত্ত বড় আকাশ, ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে ঝাঁটছে হারাধন। এ যে দেখা যাচ্ছে তাদের বৈঠকখানা, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কামরাটা একদিন সামনা হলে থাকলেও নড়ে চড়ে না। কাছ হয়ে উঠে যাবার ভয় নেই। এ ভাবেই তো রয়েছে অনেকদিন হয়ে গেল।

আজ হাটবার, মুখল ধারে বৃষ্টি নামলে হাট নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য এখন আর হাটের তেমন গুরুত্ব নেই, নিয়মিত বাজার বসে গেছে, বড় বড় দোকান হয়েছে। হারাধন আর হাট-বাজারের দিকে যায় না। পেরেশ নামে একটা ছোকরার হারাধনের সেবাদেশি রেডি মেড পোশাকের ব্যবসা শুরু করেছিল, সে এখন একটা পাকা লোকানের মালিক। হারাধন পারে নি, সে নিজেই নিজের ব্যবসা নষ্ট করেছে। সে জুয়া খেলতে গিয়েছিল। সর্বস্বাভ জুয়ারির দিকে সবাই তাচ্ছিল্যের চোখে তাকায়।

বৈঠকখানার আড্ডাধারীরা কেউ ও প্রসঙ্গ তোলে না। এখানে সবাই সমান।

অন্য দিনের মতন আজও হারাধন প্রথম। কিন্তু পরপর দুটি বিড়ি খরচ হয়ে যাবার পরেও কেউ এলো না; ওরে তোরা আজ শিগগির শিগগির বেরিয়ে পড়বি তো! যেমন জোর বাতাস দিচ্ছে, এর সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলে ছাতাও ফেঁসে যাবে।

চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের বিলিকের সঙ্গে প্রগুণ শব্দে বাজ পড়ার শব্দ হলো। গত বছর বাজ পড়ে দু'জন মারা গেছে। একবার এই লোহার ঘরে পৌঁছে গেলে আর বাজের ভয় নেই। জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে হারাধন। এখন একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। এর মধ্যে এই বৃষ্টি কান্নার টর্চের আলো দেখা যায়। তিনকড়িটা এত দৌঁর করছে কেন?

আজ হারাধনের শরীরাটা ভালো নেই, সারাদিনই কেমন যেন টিশিগিভে ভাব। বুকের কাছে চাপ চাপ। যদি সে বড় অসুখে পড়ে, কে তাকে দেখবে? এই সব দিনে বড় প্রভাকরের কথা মনে পড়ে।

শরীর খারাপ নিয়ে হারাধন আগে আগে এসেছে, অন্যদের তবু আসবার নাম নেই। এরকম বড় বাধনের দিনেই তো আড্ডা ভালো জমে।

ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে হারাধন বেগুণলো পরিবার করে ফেললো। সে আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সারাদিন আজ মনটাও অসাড় হয়ে আছে হাসি-ঠাট্টা-গানের মধ্যে ডুবতে পারলে আবার চান্দা হয়ে উঠতে পারে।

আজ বড় বড় তাকে চা দেয় নি।

দিবাকর কিংবা বাসন্তী তার সঙ্গে খগড়া করে না, রাগরাগিও করে না। তা করলেও মেনে ভালো ছিল। ওদের অবজ্ঞার ভাবটাই হারাধন সহ্য করতে পার না। হারাধনকে ওরা দু'বেলা ভাত দেয় বটে কিন্তু কক্ষনা খেতে থাকে। নিজেরা যখন খেতে বসে, তখন কেউ বলে না, বাবা, তুমি খেতে এসো। হারাধন নিজে থেকে এসো তো ভালো নইলে ভাত ঢেকে

রেখে দেবে। হারাধন যদি কোনো রাতির নে না যায়, পরের দিন কেউ জিজ্ঞেসও করবে না, কেন খেলে না।

হারাধনের বালিশের তলায় দুটো টাকা ছিল, পরন্তু থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। হারাধনের সন্দেহ, তার বড় নাতি সুরেনই সে টাকা নিয়েছে। ছেলোটা দিন দিন বদ হচ্ছে। বাসন্তী ছেলে মেয়েদেরও শিখিয়ে দিয়েছে, যেন দাদুর সঙ্গে কথা না বলে, তাই নাতিরা তার কাছ থেকে নে না। কিন্তু সুরেনকে সে তার থেকে বিড়ি তুরি করতে আগেই দেখেছে। ও দুটো টাকাও সুরেন ছাড়া আর কে নেবে?

ও দুটো টাকা গেলে হারাধনের এ মাসের বিভিন্ন খরচ কুলোবে না। মহা বিপদ! তাই সে মরীয়া হয়ে বাসন্তীকে বলেছিল, বউমা আমার দুটো টাকা পাঠিছ না।

বাসন্তী তখন দাওয়ায় বসে একটা জামা সেলাই করছিল, মুখ তুলে কঠিন ভাবে তাকালো। রাগের সময় তার টারার চোখদুটো আরও ভয়াবহ দেখায়। দিবাকরের যখন বিয়ে হয়, তখন হারাধন এ বাড়ির কর্তা, তার ইচ্ছেতেই সব কিছু চলতো, সেই সময় হারাধন রাজি না হলে কি এ টারার মেয়ে এ বাড়ির বড় হয়ে আসতে পারতো? সে সব কথা মনে রাখেনি বাসন্তী।

সে বললো, তাতে আমি কী করবো?

হারাধন বললো, মনে হয় সুরেনই নিয়েছে ওকে যদি বলো ফেরৎ দিতে।

বাসন্তী সঙ্গে সঙ্গে সুরেন, সুরেন বলে ডেকে শুনুরকে বললো, ও যদি টাকায় হাত দিয়ে থাকে, তা হলে ওর পিঠে আমি ঢালা কাটা ভাঙবে!

সুরেন এসে পঁাড়াতেই বাসন্তী জিজ্ঞেস করলো, তুই ওনার টাকা নিয়েছিস?

অজান বদনে সুরেন সঙ্গে সঙ্গে বললো, না!

বাসন্তী বললো, আমার গা ছুঁয়ে বল।

সুরেন এগিয়ে এসে বাসন্তীর এক হাঁটু ছুঁয়ে বললো, আমি কিছু জানিই না!

বাসন্তী হারাধনের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কি ছেলের কথা বিশ্বাস করবো না আপনায় কথা? এখন এই সব শুরু করেছেন?

সত্যিই তো, হারাধন সব রকম বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। সে কেন গোপনে গোপনে সবাইকে বাড়ি-ছাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল তা পর্যন্ত বলতে পারে নি। মামলা সেখানেই ডিসমিস।

ছেলের নামে নাশিধ করেছিল হারাধন, তাই কি বাসন্তী আজ প্রতিশোধ নিল?

দিবাকর চা খায় না, তার অম্লশির ধাত, বাসন্তী সকাল-সন্ধ্যা দু'বার চা খাবেই। সন্ধ্যাবেলা হারাধন বাড়ি থাকে না, সকালবেলা এক গেলোশ চা খাওয়া তার অনেক দিনের অভ্যাস। সকালে বাসন্তী যখন চা বানায়, হারাধন দূর থেকে গন্ধ পায়। এতদিন তার এক গেলোশ চা বরাদ্দ ছিল। আজ বাসন্তী চা বানিয়ে চুমুক দিতে লাগলো, হারাধনের জন্য গেলোশ নেই। চা-তো আর ঠাণ্ডা খাওয়া যায় না, হারাধন এ সময়টায় রান্নাঘরের কাছে ঘুর ঘুর করে। এক সময় সে বলেই ফেললো, বউমা, আমার চা-টা দিলে না?

বাসন্তী সংক্ষেপে উত্তর দিল, আর চা নেই।

আর নেই মানে কী? যদি চা মনে পড়ে থাকে, এক কাপের মতন হয়, তা হলে ছেলের বউ

নিজে না খেয়ে শ্বশুরকেই দিয়ে দেবে, এতখানি আশা করা যায় না। সে সব দিন কাল চলে গেছে। অন্তত অর্ধেকটাও তো দিতে পারতো শ্বশুরকে!

বাসন্তীর ঠাণ্ডা গলার স্বর শুনাই বোঝা গিয়েছিল, এরপর আর কোনদিনই চা দেবে না হারাদনকে।

যদি ভাত দেওয়াও বন্ধ করে?

করতেই তো পারে, সে এই সংসারের একটা বোঝা মাত্র। কত দিন ছেলে আর বউ তাকে খাওয়াবে-পরাবে? কোনো মানবিক সম্পর্কের টান নেই। এখন সে চোখ বুজলেই ওরা নিশ্চিন্ত হয়। সেদিন কেউ কঁাদবে না। আনন্দে ওদের চোখ ঝলমল করবে বোধহয়। যে-মানুষের মৃত্যুর সময় একজনও কেউ এক ফঁোটাও চোখের জল ফেলে না, তার মতন হতভাগ্য কে আছে?

এই বৈঠকখানার সঙ্গীরা চোখের জল না ফেলেলেও একবার অন্তত আহা বলবে নিশ্চিত। তারা বলবে সর্ব্বার আগে হারুটা এসে বসে থাকতো, সকলের বাড়ির খোঁজ খবর নিত....। যেমন খোঁড়া হাওয়া, তেমন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাজ পতনের কড়-কড়াৎ শব্দে কানে একেবারে তালো লেগে যাবার উপক্রম। আকাশে যেন একটা যুদ্ধ চলছে, কামান দগদগে দু'পক্ষ। বৃষ্টির ছাঁট আসছে কামরার মধ্যে, জানলাগুলো বন্ধ করার উপায় নেই, সব ভাঙা হারাদন সরে সরে যাচ্ছে, তবু ভিজছে!

আজ কি সাধ্যাতরা কেউ আসবে? ওদের কি আক্রেল নেই। আগে বেরুতে পারলো না? সবাই তো জানে, হারাদন ঠিকই এসে পৌঁছেবে। বাড়িতে বসে ওরা কী করছে? তিনকড়ির গান তার বাড়িতে কেউ শুনতে চায় না। তার বউ বলে, কতবার শুনছি, আর কান ঝালাপালা করো না! ক্ষ্যামা দাও!

আজ চা দেয় নি, কাল থেকে যদি ভাত দেওয়াও বন্ধ করে? প্রথমে একবেলা দেবে না তারপর দু'বেলাই। সংসার চালায় বাসন্তী, তার নিজস্ব রোজগার আছে, দিবাকর তার মুখের ওপর একটা কথাও বলবে না। বলতে যাবেই বা কেন?

তখন হারাদন কী করবে? লোককে বলতে যাবে, ওগো, আমার ছেলে আমায় খেতে দেয় না। এর কী কোনো বিচার আছে? হাটের ধারে যতে পাগলা বসে থাকতো, একটা কালি-বুড়ি মাথা চট পরা, মুখখানাও কালি বর্ষ, সে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানতো না.....। আজ সারাদিন সেই যতে পাগলার কথা মনে পড়ছে!

আজ্ঞাধারীরা এসে পড়লে আর এক মনে থাকতো না।

শরীর ছোট মোয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, গতকাল এক পক্ষের দেখতে আসার কথা ছিল, তারা কী বলে গেল আজ শোনা যেত! মোয়েটা বড় ভালো, শধু গয়ের রংটা চাপা বলে ভালো পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এক একটা পাত্রপক্ষ এসে কী রকম আচরণ করে, তা শরী হৃদয়ঙ্গম করে বেশ দেখায়।

বৃষ্টি থামার নাম নেই, আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে। হারাদনের শেষ বিড়িটাও খরচ হয়ে গেল? সন্তি সন্তি আজ কেউ আসবে না? না আসুক, তবু হারাদন ক্লাব বন্ধ হতে দেবে না, সে একাই চালু রাখবে!

সে তিনকড়ির মতন গান গাইবার চেষ্টা করলো:

এসো এসো প্রাণনাথ

বাড়ায় রেখেছি দু'হাত

এবার আর যেও না ফিরে

দুয়ার খুলে রেখেছি হৃদয় মন্দিরে.....

কাশেমের মতন গলা করে বললো: এই পাপিষ্ঠের আমি জিত টেনে ছিড়ে নেবো, মাটিতে পুঁতে ভালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো, ভিটে মাটি চাটি করবো, দেবতার অঙ্গন অপবিত্র করেছে, এরে আমি সরাসরি নরকে পাঠাবো.....

শরীর মতন করে বললো, ওরে বাপরে বাপ, বাড়িতে দুটি রাক্ষুস পুবেছি, তাতো জানো না, সব কিছু খেয়ে শেষ করে, মাঠ থেকে মুলো তুলে খায়, পাতাগুলোও বাদ দেয় না। আমার মুড়ির বাটি থেকে খাবলা খাবলা তুলে নেয়.....

মোল্লা সাহেবের মতন গেরমন ভারি ভঙ্গিতে হা: হা: করে হাসতে হাসতে বলে, আজ অবধি আমার সামনে কেউ চোখ রাঙিয়ে পার পায় নি, আল্লাই তাকে শাস্তি দেন। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি এসে কঁদে পড়ে, সেবার যেমন সুলেমান জেলে যাবার পর তার বউটা এসে কঁদে পড়লো, সুলেমানটা যতই হারামজাদা হোক, আমার সঙ্গে যত শত্রুতাই করুক, তার বউকে আমি বললাম, যতদিন আমি বৈঠে আছি, তোমার বাল-বাচ্ছা না খেয়ে থাকবে না.....

কামরার মধ্যে ঘুরে ঘুরে হারাদন একই ক্লাব চালু রাখছে। বাইরে চলছে ঝড়-তুফান, সেই শব্দ ছাপিয়ে যাচ্ছে হারাদনের গলা।

একবার যেন তার মাথাটা দুলে উঠলো। কী যেন হচ্ছে বৃকের মধ্যে, সে মেঝেতে পড়ে যাবে নাকি? কামরার দেওয়াল ধরে সামলানো।

তারপর হারাদন বুঝতে পারলো, না, তার মাথা ঘোরেনি তো, কামরাটিই দুলছে। হ্যাঁ, বেশ জোরে জোরে দুলছে। এই ঝে, ঝড়ের ধাক্কায় উন্টে যাবে নাকি?

না তো, উন্টে গেল না, কামরাটা চলতে শুরু করেছে। এতদিন পরে এলো সেই বড় ইঞ্জিন? ইঞ্জিনটা টানছে, ক্রমশ গতি বাড়ছে, লাইনের ওপর দিয়ে চলছে, হারাদন টের পাচ্ছে একটা বিশাল ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে গেছে তাদের বৈঠকখানা, ঝঝঝ শব্দ করে ছুটছে। হারাদনের নেচে উঠতে ইচ্ছে করলো।

এতদিন তার ভাগ্য খুলে গেল, এ ট্রেন যাচ্ছে অনেক দূরে, সোজা কানপুরে গিয়ে থামবে! কানপুর, কানপুর, সেখানে আছে প্রভাকর, সে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, বাবা, তুমি এতদিন আসোনি কেন?

ট্রেনটা ছুটছে, ছুটছে, প্রলয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি ভেদ করে, অন্ধকার চিরে ছুটছে।



## মাতামহী

বন্দনা সান্যাল

গল্প

ফ্রাইট নাম্বার ওয়ান ওয়ান ওয়ান। আর্থডক্সি দেরিতে উড়ছে, তার মানে নিউইয়র্ক পৌঁছেতে এখনও ঘণ্টা পাঁচেক বাকি। এই সুদীর্ঘ উড়ানপথে মানুষের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে যায়। টায়ালটে থেকে বেরিয়ে লম্বা 'আইল' ধরে ইচ্ছে করেই সময় নিয়ে ইটিছিলেন ধীরা বোস। হাত পায়ের খিলটা একটু খুলুক, চারপাশের মানুষগুলোকেও একটু দেখা যাক। বাইরে এখন চোখ ধাঁধানো রোদ্দর, তাই জানলা নামিয়ে সকলেই বোধহয় ঘুমোনার চেষ্টা করছে। পারছে বলে মনে হচ্ছে না। ইকনমি ক্লাসের স্বল্প পরিসর আসনে নানা অর্থস্তিরক ভঙ্গিতে টেরা বেকা হয়ে আর যাই হোক ঘুমোনা যায় না। প্লেনের ভেতরের আবহাওয়াতে সারি সারি চোখবোঁজা বিচিত্র ভঙ্গিমার মানুষগুলোকে ধীরার মনে হ'ল যেন একটা লম্বা সুড়ঙ্গ জুড়ে অন্ধিম বিচারের জন্য অপেক্ষমান অনেকগুলি প্রোভায়া। এরকম মনে হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ওরা অনেকেই কেনেও প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হ'বার জন্যে চলেছে, তাই অসহিষ্ণু সময় আর কটছেনা, তাই এই ঘুমের চেষ্টা। এই ঘুমের চেষ্টা, ঘুম না আসা আর তারপরেই নানা বিকৃত চিন্তা অনিমেষের মৃত্যুর পর থেকেই ধীরার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

এরকম হতে দেওয়া উচিত নয়। মনটা যেন এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় ব্যবছিন্ন এক কর্তিত প্রত্যঙ্গ, বাকি অংশটা অবিকৃত অথচ নিপ্রাণ রাগাত ওপারে পড়ে আছে, দুটোইই পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। দুটো মিলে একটা পূর্ণঙ্গ মন আর কিছুতেই গড়ে তোলা যাবেনা। তাই বলে কি অন্য লোকদেরও মন নেই না কি? না কি তাদের হাসি, গান, পেরের শেষে অপেক্ষমান প্রিয়জনদের জন্য ব্যঙ্গ ভরে উপহার নিয়ে যাওয়া, তাদের হাসিমুখটা নিজের বুকে টেনে নেওয়া — এসবের কোনও মানে নেই?

অপর্যায়ী মত ধীরা নিজের জায়গায় আঙু আঙু ফিরে এলেন। "টায়ালটে খুব ভীড় দেখলেন নাকি?" পাশের সীটের ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন। উনি মিসেস রায়চৌধুরী, আটলান্টা যাচ্ছেন নবজাতক নাতিকে দেখতে এবং নিশ্চয়ই ছেলোবো-এর কর্ণব্যাণ্ড জীবনে এই আগন্তুকটির কিছু বেরাটনি সামালপনার সামাল দিতে। "একদম খালি আছে, যাবেন তো এই বেলা সেরে আসুন।"

মিসেস রায়চৌধুরীকে টায়ালটে পাঠিয়ে দিয়ে ধীরা নিজের সীটে গুছিয়ে বসলেন। বড় কথা বলেন মহিলা। প্রথমটা কথা বলতে পেরে ভালট লাগছিল, এখন বিরক্ত লাগছে। সেই একই গল্প, বেশিরভাগই আমেরিকার গুণগাথা, ছে ব্র ডলার, বো-এর মার্টিনেস, বড় নার্নিটির অসাধারণ স্কুল পারফরমেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি। ধীরার নিজের দুটি নাতনি। বলতে গেলে তাদেরই টানে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে বারে বারে যাওয়া। একটা ছয়, অন্যটা চার। এরই মধ্যে স্কুলে যাওয়া, মায়ের সঙ্গে ক্যারি ব্যাগে বাজা 'বয়ে আনা, ভ্যাকুয়াম চালিয়ে কার্পেট পরিষ্কার করা — সব শেষে গেছে বাচ্চা দুটো। অ' — ঠিক জীবনে একেবারে made to order বাচ্চা। ধীরা আমোদিত বিন্যয়ে লক্ষ্য করেছিলেন এবার কলকাতা থেকে ফিরে

যাওয়ার সময় ওরা কেমন সকলের দেওয়া উপহারগুলো গুণে গুছিয়ে প্যাক করে তুলল। "কিছু কিনে নিল" বলে যেসব আত্মীয়স্বজন টাকা দিয়েছিলেন ওদের হাতে, তৎক্ষণাৎ গুণে সমানভাগ করে দু'জনে দুটি ব্যাগে ভরে নিয়েছিল সকলের সামনেই। ছোটটা একটু কম ওস্তাদ বলে দিদি তাকে সাহায্য করেছিল যথেষ্ট। এসব দেখে ওদের মা'র কি লজ্জা!

"দেখ তো মা, মেয়েগুলো কি বেহায়া materialistic হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে, ওদের পাকমি দেখে আমি তো ঠা' হয়ে যাই। খেঁচেন ব্যালু স্কুল থেকে ফেরার সময় মাথারি আনতে যেতে একটু দেরি হয়েছিল, ও মা! নিজেরাই টার্সি ভুলে ঠিকঠাক ভাড়া দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে! আমি তো ভেবে পাইনা আর একটু বড় হলে এদের সামলাব কি করে!"

"তোার আবার একটা বাড়াবাড়ি আছে, নীরা। এতদিন ও দেশে আছিস, চাকরি বাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিস, এখনও তোর সেই খুকিভাবটা কাল না।"

"তুমি জান না মা এই খুকিভাবটাই এখনও ম্যাজিকের মত আমার মনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাকে কি ওখানকার আর সকলের মত মেশিন মনে হচ্ছে তোমার?" নীরা মায়ের কোলের কাছটিতে আরও ঝেঁয়ে এল। মা মেয়ে শেতলপাটি বিছিয়ে পাখা চালিয়ে ঘরের মোকোতে গুয়েছিলেন। ধীরা বললেন, "না, ঠিক তা নয়। তবে তুই ওদের বড় শাসন করিস। তোর বাচ্চা বলে তো নয়, এখন যে যুগের যে নিয়ম। কলকাতার ছেলেমেয়েগুলোই কি কম যায় না কি। Survival-এর প্রশ্ন যখন ওঠে তখন ওদের ভেমনি ভাবেই বিচার করতে হবে তো! আসলে কিছু ওদের মনের ভেতরে সেই শিশুর মেলা সোচ্চই চলেছে। তুই সেদিন শ্বশুরবাড়ি গেলি বেঙ্গলওয়ান, আমি ওদের নিয়ে রাসবেহারীর স্নায়ে রথের মেলায় গেলাম একটু। একটা ঠেপু কিনে দিয়েছিলাম রিয়াকে আর দিয়াকে একটা মাটির বেহালা। ওমা, কি খুশি, কি খুশি! সারাদিন তো সেই বাজনার কনসোর্টে বাড়িতে তিষ্ঠানো দায়। তোর বাবা তো দিবানিরা ভেঙ্গে 'দাও তো দুটোর কান মলে বেশ আচ্ছা করে'। বলে এমন হুঙ্কার দিল যে দুটোকে ছুটে এসে একেবারে আমার কোলের মধ্যে।" এসব বলতে বলতে হেঁ-হেঁ করে হেসে উঠেছিলেন ধীরা বস, হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এ আই ওয়ান ওয়ান-এর যাত্রী ধীরা বসুর এসব কথা মনে পড়ে মনটা নার্নিময় হয়ে উঠল। জীবনে কত ভূমিকাতেরই না অভিনয় করতে হয় — করতে করতে অভিনয়কারী জীবন। জীবনটা অভিনয় মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। কন্যা, সখী, জয়া, অবশেষে মাতামহী। এই শেষের ভূমিকটি তাঁর সবিশেষ পছন্দ। অনিমেষের মৃত্যুর পর তরঙ্গসঙ্গুল জীবন-সমুদ্রে শেষ তৃণটির মত এটি তাঁকে ভেসে থাকতে খুব সাহায্য করছে। তাই তো এত কষ্ট স্বীকার করেও বারে বারে যাওয়া। সামনে ওদের নাকের স্কুলে ফাংশান দেখতেই হবে। ব্যালের সঙ্গে সঙ্গে ওরা কথকও শেষে। বড়টা, দিয়া, কথকের ফ্রেপে নাচবে আর রিয়া ছোট বলে ওকে একটা অলাদা নাচ দিয়েছে — "সোহাগ চন্দবন্দনী।" এবার কলকাতায় সেটা যে কতবার দিম্বাকে দেখান হয়েছে তা বলার নয়। ফুটফুটে মিষ্টি মেয়েটাকে ঘুরে ঘুরে নাচতে দেখে ধীরার বুকা গর্বে ভরে উঠত। আর দিয়া যখন চলে আসার আগে কাতর হয়ে বলেছিল, 'দিম্বা, মাকে বলনা tucketটা বাড়িয়ে নে। আমার কিছু হোমওয়ার্ক প্লাস না — and you know Miss is so cruel — let me at least finish my homework, please, দিম্বা! মাকে বলনা!' তখন

ওর ছুতোর অভিনবত্ব দেখে ধীরা তো হেসে বাঁচেন না। যে হাসি হাসার জন্যে বুড়োবুড়ীরা দল বেঁধে লেকের লাফিং ক্লাবে জড় হয়, সে হাসি কত সহজে শু শু শিশু সান্নিধ্যে উৎসাহিত হয় তা ধীরা দেখেছেন। সকালে মনিওগাক করতে করতে লাফিং ক্লাবে ভিনিও দু'একদিন ঢুকেছেন। মনে হয়েছে সেই হাহারবে হাসি আসলে এক ধরনের হাহাকার তার সঙ্গে কি তুলনা হয় শিশু সান্নিধ্যে এই অনিবার্য আনন্দের মতো।

সেই হাসির চানই বারোবাগা। সেই অতুলনীয় দিম্মা ভাকের আকর্ষণে। এর উষ্টো পিঠে অবস্থা রয়েছে আলো ও গিঠে ছায়ার মত কিছু নির্মল বাস্তবতা। নীরার বিয়ের পর যখন প্রথম গিয়েছিলেন বস্টনে ওদের বাড়িতে তখনও ছোট্টা হয়নি, বড়টা দু'বছরের। ওদের ছবির মত সাজান সংসার দেখে মন ভরে গিয়েছিল। ওরা লম্বা সব ডাইভে নিয়ে যেত সপ্তাহান্তের ছুটিতে। গাড়ির পেছনের সীটে ধীরা আর অনিমে, কোলের কাছে ফুটফুটে বাজটা ঘুমিয়ে কাধা। যেন একটা সুখ স্বপ্ন যার কোনও ভোর নেই। অথচ ভোর হ'ল, বেলা বাড়ল। অনিমেস হঠাৎ হ্যাঁ ফেল করে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর মাস ছয়ক বাসে আবার বস্টন। নীরা তাঁদের এক মাত্র সন্তান। বাবার মৃত্যুর সময় ঘনিষ্ঠভাবে যেতে পারেনি। এখন মাকে ভীষণভাবে কাছে চায়। গিয়ে দেখলেন কলকাতার রাছ যেন বস্টনেও তার অন্তত ছায়া ফেলে এগিয়ে এসেছে। জামাই সঙ্গীপকে অনেকে বুঝতে যোগাড় করেছিলেন অনিমেস। বক্তৃতা করে ছেলে, কমপিউটার ইনজিনিয়ার, বাবা-মার একমাত্র সন্তান। নীরার সঙ্গে একবারে হেরপার্বতী যোগ হয়েছিল যেন। সেই ছেলে ক'বছরে কেমন বদলে গেল। এখন একশ' শতাংশ আলোকোহলিক। সঙ্গীপকে দেখলে মানুষ তা না, একটা জানোয়ার বলে সন্দেহ হয়। একা নীরা সংসার সামলে, চাকরি সামলে, দুটো ছোড়া সন্তানকে যত্ন করে চলছে। তাই বারোবাকে ছুটে যেতে হয়। ষাট পেরোন শরীর ধকল নিতে চায়না। কলকাতায় প্রতাপদিত্য রোডে নিজের বাড়িঘর, পুরোন লোকজন সব মিলিয়ে একরকম। অনিমেস চলে গেলেও তাঁর স্মৃতিই এখন ধীরার কাছে একমাত্র বাস্তব। তাই আসতে হচ্ছে করুনা, এলেও দু'মাসের বেশি থাকতে মন চায়না। বাস মানুষকে কিছুটা স্বাধীন করে তোলে। তাড়াহাড়া এতে সন্তি এখন নিজেকে দেখার জন্য নিজে ছাড়া আর কেই বা আছে। কিছু হ'লে নীরা এই সাতসমুদ্রের ওপারে বসে কি করতে পারবে? পারল কিছু করতে যখন 'বাবা খুব অসুস্থ, হারপাতালে, তাড়াহাড়া চলে এস' এমন খবর পেয়েও শু শু চিৎকিৎ পেল না বলে আসতে পারল না? মনটা এক এক সময় ঝিঁড়ড়ে যায়। কিসের আকর্ষণে তোরা, জেলের মত অসুখ ও হাজারটা ছেলেকে বিদেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকিস? মানবিক সম্পর্কগুলো সব কি অর্থহীন হয়ে গেল, টাকাটাই সব? এই সব চিন্তা ভালগোল পাকিয়ে সর্বদাই মনের মধ্যে ঘুরছে, এখনও ব্যতিক্রম নেই।

ইতিমধ্যে টিভির পর্দায় ছবির স্ক্রেনটিকে আটলান্টিকের ওপরে আর একটু এগিয়ে যেতে দেখা গেল। টয়লেটে অনেকক্ষণ কটিয়ে মিসেস রায়চৌধুরী পুত্র দেহকেনে পাশের সীটে এসে বসলেন। প্রসাধন পেটি থেকে কমপ্যাক্ট বার করে নাকে ঘষলেন, মুখের বলিরেখায়, গলার কুঁচকোন চামড়ায় বোলালেন। সুগন্ধি পারফিউম বার করে বগলে, ঘাড়ের স্প্রে করলেন। তারপর হাসিমুখে ঘুরে থাকিয়ে বললেন, "ওদের দেশের আরও অনেক জিনিষের মত এই কসমেটিকেরও তুলনা হয় না, কি বদুন? বয়সটাকে লুকিয়ে মেয়েল, মনটাও তাই ইয়াং থেকে

যায়। আমি তো ওদের বলি দেশে আসার সময় আর কিছু না আনিস এই সব নিয়ে আসবি বেশি করে। এখন তো আর ঘরে রাখার জায়গা হচ্ছে না। আমার নাতি নাতনিরা তো বলে, গ্রানি, এবার চল তোমাকে আমাদের ভাল পার্টিতে নিয়ে যাব — ডেটও করতে পারবে, You look so young!"

মিসেস রায়চৌধুরীর চিমসে মুখে যুবতীসুলভ হাসি দেখে ধীরাও হাসলেন, সমর্থনে না অসমর্থনে বোঝা গেল না। আজকাল নাতি নাতনিরা কি তাহ'লে এই রকম দিদিমা ঠাকুমাকে পলন্দ করে? এই মিসেস রায়চৌধুরীর মত আয়তসর্পি বা তাঁর নিজের মত স্বার্থসংকলন? তাঁর হঠাৎ নিজের ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল। সেই জলপাইওড়ির বাড়ি, বিজয়া দশমীর রাত। ভেতর বাড়ির নিরামিষি ঘরের দাওয়ায় বসে ঠাকুমা সকলকে মিষ্টি বিলাচ্ছেন। পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন সব ভানসান শেষে আসতে শুরু করেছে ঠাকুমাকে প্রণাম করতে। এদিককার মধ্যে ঠাকুমাই এখন তিনিয়ারমেস। বয়স পঁচাত্তর। ঠাকুমাঁ মারা যাবার পর থেকে পরনে ধবধবে মলমলের থান। অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। জীবনে কোনও কসমেটিক ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়না। অথচ চামড়া কি সুন্দর। ধীরা ঠাকুমার কোলটি বেঁসে বসে থাকতেন এই সময়। ঠাকুমার গায়ে কেমন নারকলে তেল নারকলে তেল গন্ধ, খুব মিষ্টি লাগত। চিমটি কেটে কেটে তুলে ধরতেন ঠাকুমার ফর্সা হাতের তেলতেলে চামড়া। আর ঠাকুমা একটু এদিক ওদিক তাকালেই সামনে পেতলের পরাতে রাখা রাশীকৃত নাড়ু তক্তা আর গজার থেকে এক খালা সরিয়ে ফেলতেন। 'আইঠা করস কান?' মাঝে মাঝে বুড়ী ধমকে উঠতেন, এদিক ওদিক যেতে আসতে ঘোমটার আড়াল থেকে মাও চোখ রাঙাতেন। কিন্তু ধীরা জানতেন এ বাড়িতে তিনি ফেডারি — ওঁ চোখ রাঙানই সাং। কান সাবা দিনরাত ধরে মা জেঠিমা কাকিমারা মিলে ঐ মিষ্টির স্থান তৈরী করেছেন, ঠাকুমাও এই বয়সেও হাত লাগিয়েছেন, সে ঐ খালা মেয়ে খাবার জন্যেই তো। ধীরা বড় বড় দু'চোখ মেলে দেখতেন সেই দ্রুত অপসৃত মিসির কাঁড়ি। দেখতেন কত রং বেরং-এর লোক, কত চট্যাং-এর সোধনা। ভ্রুত উঠানে সপ্তিদের লেখের মেলা বসত যেন। রাত ভাঙা অবিধি চলত তাদের আনাগোনা। ঠাকুমাও ঠায় বসে কারোও চিবুক ছুঁয়ে, কারোও মাথায় হাত রেখে আদর করতেন, আশীর্বাদ করতেন। একটুও ক্লান্ত দেখাত না তাঁকে। মানুষের সান্নিধ্যই কি তাহ'লে 'এলিয়ারের' কাজ করে? মানুষের অভাবই কি তাহলে মিসেস রায়চৌধুরী বা ধীরা বসুর মত আধুনিক দিদিমা ঠাকুমার গুণ্ডু নিজের মধ্যে নিজেকে হাতড়ে খুঁজি বেড়ান? ওঁ প্রসাধনের পেটিতে থয়স কাননের গুণ্ডু খোঁজেন, কেউ লাফিং ক্লাবে যোগ দিয়ে হাহাকার করে হাসেন। জীবন কি তাঁদের বেলায় কুপন আর ঠাকুমার বেলায় অকুপন? কি সেদিন জীবন তাঁকে যা ঠাকুমাকে দিয়েছিল? সে কি সন্তানসন্ততি নাতি নাতনিতে ভরা এক সংসারের গরিমাময় কব্বীর অধিকার? বয়স থাকে কাবু করবে পারেনা, তেল চিকুকে পড়ে পঁচাত্তরের কুণ্ডলনায় চামড়ায়, কসমেটিক লাগেনা? বৈধব্যের শূন্যতাকে পরিজনের সেবাময় সান্নিধ্য ক্রমশঃ ভরিয়ে দেয়?

এবার যোগা হ'লঃ 'আমরা এসে পড়েছি জে এফ কে বিমানবন্দর থেকে আমরা আর আর মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে। বাইরে তাশমাদা এত এত, লোকপাড়া চাইম এফ। ফাইটি



নাহার ওয়ান ওয়ান-এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

তাড়াতাড়ি করে মাথার ওপরের লকার থেকে ব্যাগটা নামাতে গিয়ে টাল খেয়ে গেলেন থীরা বসু। বিমান সেবিকার ধমক খেলেন 'সীটে বসুন যতক্ষণ না সীটবেল্ট খোলার নির্দেশ দেবে'। লজ্জিত হয়ে আবার জায়গায় বসলেন। সত্যিই তো কিসের এত তাড়া? কচি মুখের পিছমা ডাকের? কিন্তু আর কতদিন এই ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে? বয়স ক্রমাশ: কলকাতার গৃহগত জীবনে লক্ষ্যেরেখা টেনে দেবে। সাত সমুদ্র পারের দিয়া রিয়া বদলাতে বদলাতে বড় হবে, বড় হতে হতে বদলাবে। তাদের পাত্রস্থ করতে না পেয়ে নীরার মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে। দেশের লোক দেখলেই বলবে 'একটা ভাল ছেলে দিন না, মেয়েটার বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেল।' মেয়েরা নাক সিটকে বলবে, 'দেশের ছেলে বিয়ে করতে বোল না যেন, adjust করতে পারব না।' সন্ধীপ তার মদের গেলাস নিয়ে বুদ্ধ হয়ে থাকবে, যেন সংসারের সে কেউ না। একটা মোটে মেয়ের একটা মোটে মা থীরা বসু প্রতাপাদিত্য রোডের মন্ত বাড়ির এক কোণে সেবিকার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে অনিমেষের ছবির দিকে তাকিয়ে বলবেন 'এবার আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও।'

সকলের পায়ের খসখস শব্দে সচেতন হয়ে থীরা দেখলেন আইল জুড়ে যাত্রীদের লাইন এগোতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ নামিয়ে তিনিও লাইনে দাঁড়ালেন। এরপর ইমিগ্রেশন, ট্রলিতে মাল গুঠান। কাস্টমস সেরে বাইরে রোদুদর। এ তো দিয়া রিয়া নীরা উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে। ছুটে এসে দিয়া ট্রলি নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলে। নীরা খুশি মুখে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরল। রিয়া কোলের মধ্যে মুখ গুঁজ বুলল "পরশু আমাদের শো। সবাই বলছেই আমি সব চেয়ে ভাল নাচব। তুমি এসে গেছ, এখন আমি আরও ভাল নাচব, দেখে নিও। আমার জানো আমসবুত এনেছ তো। হজমি গুলি? আমাদের পেছনের ডকে এখন কত পাখি আসে জান, দিম্মা, আমরা একটা বার্ড ফীডার কিনেছি তো। আর পেছনের জঙ্গলের পাতাগুলো না লাল হতে শুরু করেছে। তুমি তো এবার fall দেখে যাবে, তাই না দিম্মা? সেদিন একটা হরিণছানা দলুট্ট হয়ে পেছনের জঙ্গলে একলা একলা পাতা খাচ্ছিল, একটুও ভয় পায়নি। আমি ওকে পাতা দিলাম, কি সুন্দর কুকুচু করে খেয়ে গিল। ও ওর মাকে পরে নিশ্চয় পেয়ে যাবে, বল দিম্মা?" এমনি করে বন্ধবন্ধ করতে করতে লাফাতে লাফাতে দিদিমার সঙ্গে গাড়ির দিকে এগোল রিয়া। আর একটু একটু করে মনের ভারটা নিউইয়র্কের রাস্তায় নামিয়ে ফেলে একগাল হাসলেন থীরা বসু। ঠিক পূজোর ছুটিতে মা বাবার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে এসে ঠাকুমা যেমন করে হাসতেন।

## হেমন্তের সি. আর মৃত্যুঞ্জয় সেন

গল্প

দুমুখে ডটপেনটা ডান হাতের মুঠোয় ভরে বাঁ হাত নিয়ে বিজ্ঞান দপ্তর তাঁর চেয়ারের দরজাটা প্রায় ধাক্কা মেরে ঢুকে গেলেন। ঢোকার সমার দরজাটার ওপরে গত শনিবার লাগানো প্লেটটা এক মুহূর্ত থেমে দেখে নিলেন। হিন্দি আর ইংরাজিতে লেখা। ইংরাজিতে তাঁর নামের নিচে লেখা মামোজার আর হিন্দিতে লেখা প্রবন্ধক। আগের প্লেটটা তুলে এটাকে নতুন করে লাগানো হয়েছিল। ওপর মহলের নির্দেশে সব নেমপ্লেট ইংরাজির সঙ্গে হিন্দিতে লিপ্যন্তে হয়েছিল।

অল্প কয়েকদিন হল বিজ্ঞান এই শাখা অফিসে বদলি হয়ে এসেছেন। নতুন অফিসের পুরো অবস্থা এখনো বুঝে উঠতে পারেননি। কাগজপত্র দেখছেন। গতবারের ইনসপেকশন রিপোর্ট দেখে বুঝছেন, তাঁকে শক্ত হাতে লাগান টেনে ধরতে হবে। তিনি রিপোর্টে দেখেছেন, বহু ইরিগুলারিটিস। বহুলাল অনেক একাউন্টসের রিকনসিলিয়েশন হয়নি। বহু ঋণ অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে। সেসব বকেয়া টাকা তুলে আনার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অনেক ডকুমেন্টস টাইমবার হয়ে গেছে। অফিসের নিজস্ব নিয়মকানুন তমনি মানা হয় না। বিজ্ঞান ভাবেন, নিজের মত করে গুছিয়ে নিতে তাঁর একটু সময় লাগবে।

চেয়ারে ঢুকে চেয়ারে বসতেই বিজ্ঞান বিরক্তিতে আক্রান্ত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বদলি হয়ে যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই এক গাদা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন। সব নোংরা কি তাঁকেই সাফ করতে হবে!

টেবিলে রাখা খাতাপত্রের দিকে বিজ্ঞান তাকালেন। ভাবতে লাগলেন, কোন কাজটা প্রথমে শুরু করবেন। এরিয়ার পড়ে যাওয়া কাজের লিস্টটা খুঁজতে শুরু করলেন বিজ্ঞান।

'আসবো স্যার?'— দরজাটা একটু ফাঁক। দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে।

আসুন। বিজ্ঞান বললেন।

ছেলে দুটি ভিতরে ঢোকার পর তাঁদের দিকে তাকিয়ে সামনের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলেন বিজ্ঞান।

দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলে দুটি বসল। একজন বলল, আমাদেরটা কিছু করলেন?

বিজ্ঞান তাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে পুনরায় লিস্টটা খুঁজতে শুরু করলেন। নিজেই নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করলেন, কোথায় রাখলাম কাগজটা। তারপর একটা ফাইল দূর থেকে টেনে নিয়ে তার ফাঁসটা খুঁজতে খুঁজতে বললেন, কী আর করতে পারি বোলা? সবটাই তো বুঝিয়ে বলেছি।

কিন্তু, আমরা তো বেকার। একটা ছেলে বলল।

বিজ্ঞান কোন জবাব না দিয়ে ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে ফাইলের ভিতর থেকে একটা সার্কুলার বের করলেন। আঙুরলাইন করা জায়গাগুলো মনে মনে পড়তে লাগলেন। তারপর কলিং বেলটা টিপে দিলেন।

সার্কুলারটা ছেলে দুটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে কি কি

শর্তে এই লোন পাওয়া যাবে। আর একবার কলিং বেল টিপে বললেন, আরে ভাই, একটা কথা বলি, শোন। সকলেই প্রথম প্রথম বেকার-ই থাকে। বেকার থেকে সাকার করার জন্যেই এই লোন স্কিম। কিন্তু সেই স্কিমে যা যা নিয়ম থাকবে তা তো মানতেই হবে। তোমরা কিন্তু সেটা কিছুতেই বুঝতে চাইছো না।

যে ছেলেটি এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, সে বলল, আপনাদের এই সার্কুলার-টার্কুলার দেখিয়ে কী হবে? আপনি ইচ্ছা করলে সহই পারেন।

নারে ভাই, তা পারি না। বিজনের উত্তর।

এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল একজন বয়োরা। হাতে গর্তদিনে জমাগড়া চিঠি আর রিসিভিং রেজিস্টার। চিঠিগুলো নিয়ে রেজিস্টারে সই করে সেটা ফেরত দিলেন বয়োরাকে। সে চলে যাবার জন্যে দরজার কাছে যেতেই 'অরুণ' বলে ডাকলেন বিজন। বয়োরটি দাঁড়িয়ে যায়। তাকে দেখে বিজন বললেন, ক্যাশ পজিশনটা এখনও পাইনি। ক্যাশের অফিসারকে বাল। তারপর ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের কিছু নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। নিয়মের বাইরে কাজ করা মানেই আমাদের কাজের গাফিলতি। তাতে আমাদের চাকরিও চলে যেতে পারে। আমাদের প্রবলমুখা একবার ভাবো।

কথা বলতে বলতে বিজন চিঠিগুলো দেখতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে একটা চিঠি ভিতর থেকে বের করে টেবিলের ওপরে আলাদাভাবে রেখে পেপারওয়াটে চাপা দিতে দিতে বললেন, এরপরও যদি তোমরা গীড়াগীড়ি করো তবে বলতে হবে তোমরা আমাদের জোর করছো।

ছেলে দুটি এরপর এর ওর মুখের দিকে চাওয়াচাউয়ি করে উঠে পড়ল। একজন বলল, আমাদের কথা ভাবলেন না। কিন্তু আপনাকে দিতে হবে। আচ্ছা চলি।

ওরা চলে যেতেই বিজন মনে মনে বললেন, জোর যার, মুখুড় তার। লোন দিতেই হবে। এ যেন বার্থ রাইটি। তারপর আলাদাভাবে রাখা চিঠিটা তুলে নিলেন। সেটা এবার ভাঁজ করতে করতে ভাবলেন, এই এক কামেলা হয়েছে। ফর্ম বিলির সময় কামেলা, পুলিশ ডাকে। এটা ওটা করো।

এই সময় ফোন বেজে ওঠে। ও প্রান্ত থেকে কেউ সম্ভবত বিজনদের অফিসে ধর্মঘট বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করছেন। বিজন বললেন, এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত আছে, এমপ্লয়ীরা স্ট্রাইক করছে। ম্যানেজমেন্ট বিরোধীতা করছে। তবে স্ট্রাইক হলে ওরা তো আমাদের ঢুকতে দেবে না। সেদিন কাজকর্ম হবে কিনা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিউজ পেপারে বা টিভির নিউজে নিশ্চয় জানতে পারবো স্ট্রাইক হচ্ছে কিনা।

ফোন রেখে বিজন জানালার দিকে তাকালেন। তাঁদের অফিসের সামনে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। জানালার গায়ে এসে লেগেছে সেই গাছের কিছু শাখাপ্রশাখা। তার ঝুটিতে একগুচ্ছ লাল ফুল। ভালো লাগে বিজনের। তিনি মুহূর্তের জন্যে বাতাসে মাথানোড়া সেই ফুলের ঝুটি দেখে নিয়ে পাশের রাস্তাকে রাখা একটা খাতার দিকে নজর রাখলেন। সেটা ফর্ম বিলির হিসাব রাখার খাতা। আসলে শহরের গরীবদের জন্যে সরকারের নির্দেশে ঋণ দিতে গিয়ে বিজন হিমশিম খাচ্ছেন। যারা ঋণ পাবার উপযুক্ত তাঁদের কাউকে কাউকে তিনি বোঝা

করছেন, তাই আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে। এটাই নিয়ম। আবেদনকারী বলে, লাইসেন্স করার পয়সা কোথায়? বেকার, কোথায় পাবো পয়সা? আগে লোন দিন।

একই কথা বার বার শুনে শুনে বিজন একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। প্রত্যহ একই দৃশ্য।

বিজনের তেস্তা পায়। তিনি কলিং বেল টিপলেন। কলিং বেল টিপে তিনি পুনরায় চিঠিটা খুলে মনে মনে বলেন, হুঁ, হেমন্ত এবার তোমার ব্যবস্থা করছি। তোমার অহঙ্কার আমার হাতের মুঠোয়। তিনি বিস্মিত হন এই ভেবে যে সেই অফিস ছেড়ে চলে আসার পর ছেলেটা তাঁর সঙ্গে একবারও দেখা করতে আসেনি। হেমন্তকে বড় অকৃতজ্ঞ বলে মনে হয় বিজনের।

বিজন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। চিঠিটা তাঁর আগের শাখা অফিস থেকে ঘুরে এখানে এসেছে। সেখানকার এক স্টাফ এই হেমন্ত। তার কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সেই রিপোর্টে নির্ভর করছে সেই ছেলেটির চাকরির স্থায়িত্ব।

কলিং বেল টোপার পরেও কেউ এলো না দেখে বিজন আবার কলিং বেল টিপলেন। মনে মনে ভাবলেন, এখানকার থেকে আগের শাখা অফিসটা ভাল ছিল। আগের শাখা অফিস অর্থাৎ সুন্দরপুর পার্ক শাখার কথা ভাবলেন বিজন। আহা তিনি কী সুন্দর করে সেই শাখা অফিসটা গড়ে তুলেছিলেন।

বিজনের সামনে কিছু পুরনো দৃশ্য, ঘটনা উঠে আসে। তাঁর মনে পড়ছে তখন সুন্দরপুর পার্ক শাখা খোলা হবে। বিজন সেই শাখার শাখাপ্রধান। তিনি তার কিছুদিন আগে স্কেল প্রমোশন পেয়েছেন। প্রমোশন পেয়েই শাখাপ্রধান। তাছাড়া সুন্দরপুর পার্ক শাখার কাজ তাঁর নেতৃত্বে শুরু হবে — এসব বিজন তাঁর দর্পদর্শী সৌভাগ্য বলে ভেবেছিলেন। সেই সময় হেমন্ত, হেমন্ত ভট্টাচার্য এসে ধরে চাকরির জন্যে। নাহ, সরাসরি হেমন্তকে এসে তাকে ধরেনি অবশ্য। হেমন্তের এক দূর সম্পর্কের কবীর। তিনি বিজনের হেড অফিসের ভিজিটেশন শাখার এক অফিসার। তাঁর আকুল মনিত, তাঁর আত্মীয়টির জন্যে একটা ব্যবস্থা যেন বিজন করে দেন। খুব গরীবের ছেলে। গ্রামে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। জমিজমাও কিছু নেই। লেখাপড়াও কিছু শেখেনি। ব্রাহ্মণের ছেলে। যজমানি করার ক্ষমতাও নেই। তিনি বলেছিলেন, মাঝে মাঝে আমি কিছু আর্থিক সাহায্য করি। তাতে তো একটা সমস্যা সংসার চলে না। তাছাড়া আমারও তো ক্ষমতার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। চিরদিনের জন্যে তো কিছু করতে পারব না। তাই আপনাকে...। আর ওতো এ অফিসে কোন কাজের উপযুক্ত নয়। ওকে সুইপারের কাজটা দিন। বাথরুম টাক্সের পরিষ্কার করবে, ঝাঁট দেবে। সেটা পারবে।

বিজনকে ঐ ছেলেটির জন্যে আবার স্বতন্ত্রভাবে বলেছিলেন তাঁদের রিজিওনাল অফিসের আর এক ভবনলোক। তাঁদের দেশের বাড়ির কাছেই নাকি হেমন্তদের বাড়ি। সেই ভবনলোকে মতে, ছেলেটি যেমন সব তেমন কর্মপটু। পরিশ্রম করতে পারে সাংঘাতিক। এছাড়া বিজনের এই শাখা অফিসের কয়েকজন, পরিচিত কেউ কেউ তাদের চেনাশোনা আত্মীয়স্বজনের কাউকে কাউকে নেবার জন্যে বিজনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

অফিসের কোন পদেই লোক নেয়া বিজনের কাজ নয়, তবে পাটটাইমের সুইপার ও পরওয়ালাকে বলে করে নেবার সুযোগ ছিল।



তার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি হেমন্তকে দেখা করতে বলেছিলেন। হেমন্ত বর্মানের এক অজপাড়াগায়ের ছেলে। তিনি বুকেছিলেন, ছেলটি বেশ নম্র। শহরে এসে ঘাবড়িয়ে গেছে, অবাক হয়ে গেছে — এমন একটা ভাব ওর চোখেমেখে। যেন বিষয়মুগ্ধ হয়ে আছে সে। পেটা চেহারা দারিদ্র্যতার ছাপ থাকলেও কৌলীন্য ভাব আছে তার মধ্যে। কিছুদিন হল গম্ফ গ্রীনের এক ভদ্রলোক দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন তাকে। কেবল রাতটুকু থাকার ব্যবস্থা। বাবাকি কাজ অর্থাৎ তার খাওয়াদাওয়া নিজেকে আলাদাভাবে করতে হয়। আর রাতের আশ্রয় পাবার বিনিময়ে কিছু শ্রম দিতে হয় হেমন্তকে। রাত্তে শোবার আগে তাকে একটু দূরে রাস্তার পাশের ডিপ টিউবওয়েল থেকে কয়েক বালতি খাবার জল তুলে আনতে হয়।

হেমন্তকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল বিজনের।

হেমন্তের ব্যাপারটা যেন বাংলা ছায়াছবির একাংশ। সেসব গল্পের ছকের মত হেমন্তের বাবা মারা যাবার পর সংসার গেল ভেঙে। বিধবা মা আর কয়েক ভাইবোন নিয়ে ভেসে বেড়ানো। অথচ একসময়ে তাদের পরিবারটি ছিল বেশ বর্ধিষ্ণু এবং বদনী। কিন্তু তার ঠাকুরদার অমল থেকে সেসব শেষ হয়ে যায়। আর তার বাবার অকালপ্রয়াণে সংসারটা নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যায়। পিণ্ডন ভাবেন, ব্রাহ্মণের ছেলে সুইপারের কাজ করতে চায় — তার অর্থ অভাবটা প্রচণ্ড। কিন্তু হেমন্তকে ঐ চাকরি দেবার প্রাক্কালে বিজন বেশ দোমনা করছিলেন। তিনি জানেন, কালো মাথার লোককে সাহায্য করলে বদনাম হবেই। আবার এও ভেবেছিলেন, সাহায্য করবেই দেখি না। যদি একটা পরিবারে একটু হাসি ফোটাতে পারি। তা সেই থেকে হেমন্তের চাকরি শুরু।

নতুন শাখা অফিস। বিজনের মতে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি। প্রাত্যহিক কাজটুকু শেষ করে অন্যান্য কর্মীরা চলে যান। কর্মী সংখ্যা অল্প প্রয়োজনের তুলনায় কম। নতুন অফিসে এ ধরনের সমস্যা থাকার কথা। বিজন তা বোঝেন। কিন্তু দৈনন্দিক কাজ ছাড়া বহু জরুরি কাজ থাকে। সেসব করার লোকজন নেই। সুতরাং করতে হয় বিজনকে। কারণ সেসব হিসেবপত্র, তথ্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পাঠালে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে। বসে বসে তাই বিজনকে বহু স্টেটমেন্ট করতে হয়। শেষ করতে হয় অনেক বকেয়া কাজ। এর জন্যে সময় যায় বহু। একা একা ভাললাগে না। সে সময় তাঁর পাশে বসে থাকে হেমন্ত।

হেমন্তের কাজ শুরু হয় অফিস ছুটির পর। সে তখন সারা অফিসে নাড়ু দেবে। জানালা দরজা বন্ধ করবে। মেন গেটও অর্থাৎ চাবিতলা লাগানো কাজ বিজনের। তাঁর হয়ে সেটা করে দেয় হেমন্ত। আর এসব বন্ধ হলে তবেই সেই চাবি নিয়ে বিরতেন বিজন। তাই নিজের একঘেরোমি ক্যান্টিনের জন্যে বিজন নিজের খোলস ফেলে বেরিয়ে আসতেন এই সময়। তিনি হেমন্তের কাছে কাছে চলে যেতেন। কথাবার্তা ছাড়া জানতে চাইতেন হেমন্তের খবর। তার বাড়ির খবর। তার গ্রামের খবর। যেমন তিনি খোঁজ নিতেন — হেমন্তের আদায়ীরা কে কি কাজ করে। তারা তাদের দেখে না কেন, তার বাবা কী করতেন। এইসব।

এইসব কথা মধ্যে তিনি কোন কোন সময় হেমন্তের সঙ্গে তামাশা-রসিকতা করতেন। 'আরে হেমন্ত, এখন তো চাকরি হল। এবার তো একটা বাকরি করতে হয়।' কথাটা বলে 'বিজন একটু মুচকি হেসে আবার তাঁর কাজের মধ্যে ডুবে যাবার ভান করতেন।

এসব সময়ে হেমন্ত চুপচাপ থাকত। মনোমোহর ঠিক থাকলে বিজন হেমন্তকে আদর করে হেমন্তকুমার বলে ডাকতেন। কিছুক্ষণ কাজ করে আবার মাথা তুলে প্রশ্ন করতেন বিজন, কী হল, হেমন্তকুমার, জবাব দাও। আচ্ছা, 'বাকরি' মানে কি বলতো? কী হল, বলতে পারলে না তো? আরে, বাকরি মানে বিয়ে, বিয়ে। একটা বিয়ে করে ফেল এবার। স্টেটমেন্টের প্যাড থেকে কার্বন যেন পরে করতে হবে বিজন হাসতে হাসতে কথাগুলো বলতেন।

দূরে বসে একথা শুনে হেমন্ত কেমন যেন চুপচাপ হয়ে সিটিয়ে যেত।

অফিস বন্ধ করতে করতে যেন কোন দিন রাত সাতটা আটটা হয়ে যেত। হিমছান পাড়াটা তখন ঢুকে যেত আলোর ঘরে। সেসব আলোর ঘরে তখন লোকজন টিভির পর্দায় নিজদের অঙ্গলি দিত। সেসময় বাইরের রাস্তাঘাট ল্যাম্পপোস্টের অল্প আলোয় জড়িষ্ণু রঙীণ মত। এলোমেলো চুলের মত ছড়িয়ে পড়া পাড়ার সেইসব নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বিজনের বেশ ভাললাগতো। সঙ্গে হেমন্তকে নিয়ে হাঁটা। হেমন্তের হয়ত তখন বীর বাড়িতে সে আশ্রিত তাঁর বাড়িতে ফিরে জল টেনে তেলার কথা নিচ থেকে ওপরে। হেমন্ত জানে সে একটু রাত করে বিজনের কথা শুনতে হবে। তর্গে বিজনের সে কিছু বলতে পারে না। চুপ করে বিজনের পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। মাঝে মাঝে বিজন হাঁকে ওঠেন, এই, ভূমি জোরে জোরে হাঁটতে পারো না? আমার পাশে সরে এসো। হেমন্ত তখন আর একটু পা চালিয়ে এসে বিজনের পিছনে টানা ছায়া ঝুঁয়ে ঝুঁয়ে হাঁটতে থাকে। ভাবখানা এই, বিজনের পাশে পাশে হাঁটলে সে যত রাস্তার অন্যান্য কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলবে বা বিজনের সমান সমান হয়ে পথ চলা নিষেধ।

মাঝে মাঝে হেমন্তের সঙ্গে বিজন অসম খেলায় মেতে উঠতেন। হেমন্তকে নিয়ে এভাবে উদ্দেশ্যহীন পথ চলতেন তিনি। এপথ সেপথ ঘুরে ক্লাস্ত হয়ে তারপর হেমন্তকে তার বাড়ি যাবার জন্যে ছেড়ে দিতেন। ছেড়ে দেবার আগে বলতেন, কি হেমন্ত, কিছু পরসাকড়ি নেবে নাকি? বাসভাড়া? তারপর পকেট থেকে দুটাকার একটা নোট হেমন্তের দিকে বাড়িয়ে দিতেন। হেমন্ত বিমুগ্ধবাহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। সে কঁকড়ে যেত। বিজন জোর করে হেমন্তের হাতের মুঠোর মধ্যে টাকটা গুঁজে দিতেন।

কোন কোন দিন অফিস ছুটির পরে বিজন হেমন্তকে নিয়ে যেতেন রেফ্রিগারেটে। সেখানে গিয়ে বলতেন, কী-বাবো, বলো। ভূমি যা বলবে, তাই-ই হবে। হেমন্ত তার ম্যানেজারবাবুর সামনের চেয়ারে বসতে চাইতো না। সে গিয়ে বসতো অন্য টেবিলে। রেফ্রিগারেটে হায়ত সামান্য কিছু খাওয়া হল, কেবলমাত্র চা আর টোস্ট। রাস্তায় বেরিয়ে বিজন হয়ত বলতেন, কি হেমন্ত, পেট ভরলো? রাত্তে কি আর যেতে হবে? হেমন্ত চুপ করে থাকলে বিজন ধমক দিতেন, বোবা নাকি? হেমন্ত আস্তে আস্তে বলত, না, যেতে হবেনি।

ইতিমধ্যে হেমন্ত অফিসের টুকটাকি কাজ শিখে ফেলেছিল। কোন খাতটা কখন লাগে, কেন্দ্র আলমারিতে থাকে তা কিছু কিছু জানা হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে একটু বেশি সময় নিয়ে ছোটখাটো যোগ এভিং মেনিমে করে দিতে পারতো। এসব সূত্রে হেমন্ত বিজনের আর একটু কাছে এসেছিল। আলোব মত 'হেমন্ত' বলে ডাকলে আর জড়সড় হয়ে হেমন্ত বসে বসে তাকিয়ে থাকত না। তখন তাকে তার নাম ধরে ডাকলেই শ্রিত্ব করা পুতুলের মত

লাফিয়ে উঠত। সতর্ক হরিশের চোখ দিয়ে তাকাতে। আর এসব কারণে সে তখন বিজনের কাছে 'তুমি' থেকে 'তুই' হয়ে গিয়েছিল।

একদিন যখন অফিসের অন্য সকলে চলে গেছে তখন বিজন হেমন্তকে ডেকে বলেছিলেন, তুই নাকি সকালে বাথরুম ভাল করে পরিষ্কার করিসনি, কেন? জানিস, চাকরি চলে যাবে।

হেমন্ত দুহাতের আঙুলের মধ্যে আঙুল জড়িয়ে তার বুকের কাছে নিয়ে এসেছিল। বিজন পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন, কী হল, জবাব দে। শুনছি বামুনের ছেলে বলে করিস না। কাজের আবার বামুন-অবামুন কী রে? আর বামুনের ছেলে বলে যদি তোরা যেম্না হয় তবে এসব যারা করে তাদেরকে কিছু পয়সা দিয়ে করিয়ে নে। ফাঁকিবাজদেরকে আমি কিন্তু সহ্য করতে পারি না।

হেমন্ত বলতে পারলো না, সে ঠিক মতই কাজ করেছে। একজন স্টাফ ইন্সপেক্টরভাবে তার সঙ্গে বগড়া করেছিল। সেই-ই বিজনের কাছে এসব অভিযোগ করেছে।

হেমন্ত চুপচাপ। বিজন চিংকার করে বলেছিলেন সেবার, বুঝলি রে হেমন্ত, শহরের জল তোর পেটে পড়েছে। তোর জামাপ্যাট দেখে তা বোঝা যাচ্ছে।

হেমন্ত একদিন অফিস ছুটির পরে তাড়াতাড়ি বেরুবে জানাতে বিজন অবাক হয়ে হেমন্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। হেমন্ত বলেছিল, আমি আমার কাজ শেষ করে তবে যাব। তবে একটি তাড়াতাড়ি।

বিজন বলেছিলেন, হুঁ, পিপড়ের পাখনা গজিয়েছে। তা কোন সিনেমায় যাবি?

হেমন্ত চুপ। সে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিজন জানালার পাশের কুক্ষচূড়া শাখার ফাঁক দিয়ে দূরের নির্জন রেললাইন দেখছিলেন। সন্তুষ্ট ট্রেনের কোন গুণ্ডা। একরাশ লোক রেললাইন দিয়ে হেঁটে চলেছে। সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিজন প্রশ্ন করেছিলেন, চাকরিটা খোঁষাবি? আমি তোর চাকরি রাখতে পারবো না।

হেমন্ত কিছুকণ চুপ থেকে বলেছিল, বাড়ি যাবো, মা-বনের জন্যে কাপড় কিনতে যাবো।

কবে যাবি বাড়ি? বিজনের প্রশ্ন।

পনেরই আগস্টের ছুটি আছে। তারপর শনিবার। অফিস করে যাবো। হেমন্তের উত্তর।

ওপু বাবা, তুই পনেরই আগস্টও বুকে গেছিস। তা বেশ, তা বেশ। এর নাম প্রগতি।

তোর প্রগতি দেখে আনন্দ পাবার কথা। কিন্তু বলতো, কে শোখাচ্ছে এই প্রগতির বুলি? বিজন নিজেই নিজের কথায় মনে মনে হাসেন। একটি থেমে বলেছিলেন, কিন্তু হেমন্ত, ঐ দিন যে আমার বাড়িতে কয়েকজন আসবেন। তুইও যাবি, খাবিটা। আর একটি কাজটাজ করে দিবি। বিজন চান হেমন্তকে যখন তখন যেমন খুশি ব্যবহার করতেন।

আচ্ছা, বলে হেমন্ত চলে গেল।

হেমন্তকে বিজনের কাছে ইদানিং প্রতিদিনই ধমক খেতে হচ্ছিল। বিজনের সাফারি সূটা তার নির্দেশে হেমন্ত একটি ড্রাইং ট্রিনিং থেকে কাটিয়ে এনেছিল। ইন্সটিট মক হয়নি বলে হেমন্তকে কথা শুনতে হল অন্য কর্মচারীদের সামনেই। আসলে অন্য কর্মচারীরাও ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। তাদের ধারণা, তাদের 'স্যার' হেমন্তকে চাকরি দিয়েছে। আর

হেমন্তও 'স্যার' এর ভক্ত। এসব ওদের ব্যাপার।

এসময়ে অফিসের ক্যান্টিন বয় হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, সে তার পাড়ার নিরক্ষরদের পড়ানোর জন্যে একটা পার্টটাইম চাকরি পেয়েছে। তাছাড়া নিজস্বের বাড়িতেই একটা ছোট্ট মুদিখানার দোকান দিয়েছে। সে আর আসতে পারবে না। তাই অফিসের ছেলেরা হেমন্তকে ধরেছিল। ক্যান্টিনে কাজ করলে দুপুরের খাওয়াটাও ফ্রি হয়ে যাবে। সে তাই ইদানিং ক্যান্টিন বয় হিসেবে কাজ করছিল। তাকে আর বিজন যখনতখন বাইরে পাঠাতে পারছিলেন না। ক্যান্টিন চালায় কর্মচারীরা। দিনের শেষে যখন কেউ থাকতো না তখন বিজন হেমন্তকে ভরসনা করতেন। বলতেন, হেমন্ত, শহরে এসে পয়সা তুই ভাল করে চিনিছিস। কিরে, পয়সাটাই সব, এ্যা?

বিজন একদিন হেমন্তকে বলেছিলেন, হ্যাঁরে, শুনছি, তুই নাকি মাস্টারি করিস?

হেমন্ত যথারীতি চুপ।

বল। কথাটা সত্যি? বিজনের প্রশ্ন।

হেমন্ত নিশ্চপে মাথাটা বঁকালো।

তোর কী বিদ্যা আছে যে তুই পড়াস? কোন্ ক্লাশের ছেলে? ছেলে না মেয়ে রে? পুনরায় বিজনের প্রশ্ন।

হেমন্ত মিন মিন করে বলেছিল, ফাইভের।

ওরে বাস! ক্লাস ফাইভের স্টুডেন্ট? তুই কি ছেলেটোর মাথা খাবি? কী বিদ্যা নিয়ে তাকে পড়াবি? ছেলোটা বস্তিতে থাকে নাকি? তা আজকাল বস্তিতেও ভাল ছেলে তৈরি হচ্ছে। তুই তো বাপু তার ক্ষতি করছিস। বিজনের খেদোক্তি।

কোন কোন দিন হেমন্তকে নিয়ে বিজন বাজারে চুকতেন। প্রচুর বাজার করতেন। হেমন্তের হাতে ভারি থলে, বিজনের হাতে মাছের ব্যাগ। ইটতে ইটতে বিজন বলতেন, গ্রামের ছেলে তোরা। শহরে এসে পরিশ্রম ব্যাপারটা ভুলে গেছিস। কিরে, ঠিক কিনা বল?

ঘর্মাক্ত হেমন্ত থলে হাত বদলাতে বদলাতে বিজনের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করতো। তারপর মাথা গুঁজে ইটতো।

টেবিলে চাপা দেয়া চিঠিটা বিজন আর একবার পড়লেন। ঠিক কোন্ কোন্ প্রশ্নের কী কী উত্তর দেবেন উনি, তাই চিন্তা করতে শুরু করলেন। প্রথম প্রশ্ন হল, আসোচ্য কর্মচারীর ব্যবহার — তিনি বিনয়ী কিনা। প্রশ্নটা পড়তেই হেমন্তকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন বিজন।

বিজনের মনে পড়ে গেল আগের শাখা অফিস থেকে বদলির কিছুদিন আগের কথা। বিজনের হার্টে হঠাৎ একটি অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। হাই কোলেস্টেরোল, হাই প্রেসার, হাই সুগার। তখন বন্ধুরা শুনে বলতেন, তোমার সব হাই-ফাই ব্যাপার। ডাক্তার বলেছিলেন, সকাল বিকেল ইটতে। আর বিজনের ইটা মানে সঙ্গী চাই। সঙ্গী সেই হেমন্ত। অফিস ছুটির পর ইটতে ইটতে লেকে। লেকে এক চক্রর মেরে বাড়ির পথে বড় রাস্তায়। লেকের এই জায়গাটা অন্ধকার অন্ধকার। লোকজনও কম। বিজন পিছন ফিরে হেমন্তকে ডাকেন, 'কিরে, পা চালা, পা চালা'।



এমন ডাক হেমন্তের চেনা। একটি পা চালিয়ে বিজনের কাছাকাছি চলে এসেছিল হেমন্ত। বিজন হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে চান। গল্প করার মত ভাল বিষয় বিজন খুঁজে পান না। ডাবনে, হেমন্তের সঙ্গে আর কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়! তবু কিছু কথা না বলে পারা যায় না। হেমন্তকে বকাতে তাঁর ভাললাগে। তিনি ঠিক করলেন সেই সার্কুলারে বিষয়টি নিয়ে হেমন্তের সঙ্গে কথা বলবেন। অফিসে সেদিনই ইস্যু করা সার্কুলারের ব্যাপারে স্টাফদের প্রতিক্রিয়া কী তা হেমন্তের কাছ থেকে জানা যাক। তিনি জানতেন, স্টাফেরা ক্যান্টিন ঘরে এসব নিয়ে আলোচনা করেছিল।

বিজন ফিরে দেখেছিলেন হেমন্ত আবার পিছিয়ে পড়েছে। উদাস উদেশ্যহীনভাবে সে হেঁটে আসছে। বিজন হেঁকে উঠেছিলেন, কী হল যে? তোর হাঁটতেও কষ্ট। কী গুণটি আছে তোর?

হেমন্ত আবার তার গতি বাড়িয়ে বিজনের পিছন পর্যন্ত চলে এসেছিল। বিজন তাকে দেখে বলেছিলেন, আজকের অফিসের খবর কি? বিমিত্র হেমন্ত ভাবেছিল, তার স্যার তো সারাদিনই অফিসে ছিলেন। অফিসের সব খবর তো তাঁর জানার কথা। তবে আবার অফিসের খবর কী জানতে চান! তবে কি ক্যান্টিন ঘরে সমরদাদা, বিমানদাদা যে ম্যানেজারবাবুর ওপরে রাগ দেখাচ্ছিল, তা কি বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু সে তো কোন আলোচনাই শোনেনি। তাই হেমন্ত চুপ করে থেকেছিল।

কোন উত্তর না পেয়ে সন্তুষ্ট বিজন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সে সময়েই উদ্দেশ্যিক থেকে দ্রুত বেগে একটা ট্যাক্সি ওদকের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছিল। বিজন একটু সরে গিয়ে পিছন ফিরে উড়ন্ত ট্যাক্সিটির দিকে তাকিয়ে পুনরায় হাঁটা শুরু করেছিলেন। তাঁর একটু রাগ হয়েছিল ঐ বেআইনে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ওপরে। একটি পরে সহজ হয়ে হেমন্তের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছিলেন। 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' সে তোর বিয়ের ব্যাপারটার কি হল?

হেমন্ত কিছু না বলে বন্ধী কয়েদীর মত বিজনের পিছল আসছিল। তারপর হঠাৎ বিজন দ্রুত পা চালিয়ে বলেছিলো, হ্যাঁ তো সেটা আমার সঙ্গে। গ্রামের লোক, হাঁটতে পারিস কিনা দেখি।

হেমন্ত দেখল, বিজন হনহন করে বেশ অনেকটা দূরে চলে গেলেন। সেখান থেকে বিজন হেঁকে ছিলেন, তুই হাঁটতেও শিখিসনি?

কী বুকেছিল হেমন্ত সে-ই জানে। সে হঠাৎ গতি তুলেছিল এবং মুহূর্তে হেঁটে বিজনকে অতিক্রম করে চলতে শুরু করেছিল। হকচকিয়ে গিয়েছিল বিজন। তিনি কয়েক পা দ্রুত চালিয়ে থেমে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, হেমন্তের স্পর্ধা বেড়ে গেছে।

বিজনের এখনও মনে পড়ে সে দৃশ্য। সেদিন হেমন্ত তখনও একই গতিতে হেঁটে চলেছিল। মুহূর্তের মধ্যে হেমন্ত বিজনের থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুটা সে গিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে বিজন হেঁকেছিলেন, এই থাম, থাম।

হেমন্ত পিছন ফিরে বিজনের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সে থেমে গিয়েছিল। সে দেখল বিজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। হেমন্ত আবার চলতে শুরু করে। সে কান্নার জন্যে আর অপেক্ষা করে না।

বিজনের মনে হয়েছিল, হেমন্তের স্পর্ধা বেড়ে গেছে। এভাবে হন হন করে তাকে অতিক্রম করে চলে যাওয়া হেমন্তের উচিত হয়নি। একটি আদর পেয়েছে, অমনি সে তাঁর মাথা উঠে বসেছে। বিজন বিমিত্র হয়ে ভেবেছিলেন, ছেলেটার এমন স্পর্ধা হল কী করে? ওকে আবার পুনঃ মুখিকভব করা দরকার। কিন্তু তখন বিজনও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হেমন্তের সঙ্গে হাঁটার প্রতিযোগিতায় গিয়ে তিনি হাফিয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া হেমন্ত এভাবে তাকে অতিক্রম করে সেই অসিদ্ধি প্রতিযোগিতায় জিতে যাবার বাসনা নিয়ে হাঁটতে পারে তা বিজন কল্পনাও করতে পারেননি। এ যেন 'আস্তাবুর্কুদের এটো পাতা উঠতে যে চায় দেবালয়ে।' বিজন ফুঙ্ক।

বিজনের মনে পড়ে, বড় রাস্তায় বাস স্টপে সেদিন দু'জনের দেখা হয়েছিল। স্টপে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলেনি। একটা বাস আসতে বিজন টুক করে সেই বাসে উঠে পড়েছিলেন। বিজন মনে মনে হেমন্তকে একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তাই স্টপেজে তাকে একা ফেলে বাসে উঠে পড়েছিলেন।

এখন বিজনের হাতে হেমন্তের সি.আর পাঠানোর জন্যে ফর্মটি ধরা। সেটা পূরণ করে পাঠাতে হবে বিজনের প্রধান কার্যালয়ে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্ভর করছে হেমন্তের চাকরি স্থায়ী হবে কিনা। সেদিনকার ফুঙ্ক বিজনের রাগ এখনও পড়েনি। সেদিন তিনি অপমানিত হয়ে হেমন্তকে কিছু না বলে চলে এসেছিলেন। এখন কাছে পেলে দু'দশটা কথা শোনাতে পারলে আনন্দ পেতেন। তিনি রিপোর্টের ফর্মটিতে দেয়া প্রতিটা প্রশ্ন আবার পড়লেন। তারপর প্রথম প্রশ্নের উত্তর লিখলেন—না, অনপযুক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর লিখলেন—অনপযুক্ত। এভাবে সব প্রশ্নের উত্তর লিখলেন। মন্তব্যে লিখলেন, এখনই স্থায়ীত্বের কথা ভাবা যায় না। তারপর সেই ফর্মের নিচে একটা সই করে বিজন ফর্মটিকে ভাঁজ করতে শুরু করলেন। তিনি মনে মনে হাসেন। সেই দৃশ্য দেখলে মনে হয়, বিজন এখুনি সেই কাগজের মধ্যে তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষাটিকে গোপনে মুড়ে রাখতে চাইছেন। জীবনে তিনি এই প্রথম একটা প্রতিশোধ নিতে পারলেন। তাঁর মুখে বিজয়ের হাসি।

With best Compliments from :

## THE ROSE DRUG HOUSE

(Chemists & Druggists)

289/D, DARGA ROAD  
CALCUTTA - 700 017

Phone : 240-7211

(All Kinds of Life saving & Surgical items)

## পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বয়ন নিগম

[ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো-টেক্সটাইল কর্পোরেশন]

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

অফিস

চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার

৩৩-এ জহুরলাল নেহরু রোড, ১৯তল, রুম নং ১২, কলিকাতা - ৭০০ ০৭১

ফোন : ২২৬-৩৭২২, ২২৬-৩৭২৩, ২৪৬-৮০৯৩

পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম পাট থেকে বিশ্বমানের ক্যাপলন ব্র্যান্ডেট বয়ন ও বিপণন।  
১৯৮৬-তে ক্যাপলন ব্র্যান্ডেটের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ট্রাণ্ড-ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক  
লাভ। উন্নয়ন ও স্থায়িত্বে ক্যাপলন ব্র্যান্ডেট পশম থেকে উৎকৃষ্টতর।

### • অন্যান্য পণ্য •

জুট টেপ, ফোর ম্যাট, নানারঙের ও আকারের নয়নলোভন ব্যাগ, পলি-প্রপিলিন  
ইয়ার্ন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পাটের চম্পল ও পাইন অ্যাপেল ফাইবার। পণ্যের  
জন্য উপরের অফিসে যোগাযোগ করুন।

## স্যালামান্ডার

মানব চক্রবর্তী



## যন্ত্রভাষা

আমার সামনে বসা লোকটা আর মানুষ নয় — যন্ত্র।

কেন্ট, নটিংহাম, ব্রিস্টল, গ্লাসগোর আমদানিকৃত এক-একটা যন্ত্রাংশ জুড়ে যার গোটা অবয়বখানি।

ওর চোখ দুটো ক্রমশ ছটারের লাল বাতির মত জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে আর টেবিলে রাখা দুটো হাত যে অমিত শক্তির পাওয়ার-হামারের ইন্স্পারমেন্ট যন্ত্রাংশ তা হাই কার্বন সিলের নীলচে আভা দেখেই বোঝা যায়, আরও, আরও কী আশ্চর্য — কোমরের নিচে পা দুটো যেন মধ্যরাত্রে ক্র্যাপ-ইয়ার্ডের ইনগট, চারপাশ খোলা ঘুঘু বাতাসের মাঝে নিশ্চল নিষ্পন্দ একাকী যন্ত্রস্তভাতার পিতামহবিশেষ। বুকের মাংস একটু একটু করে খসে পড়ছিল তার, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল বুকের ভেতরটা — হাটের চেহারার বদলে ওপন-হার্ফ ফার্নেসের মুখখোলা। লৌহতরলময় উফালময় শিখার দাপট অস্থির — আর পাজরের হাড়গুলি বার এত বড় মিলের থার্ডফোর মিলিটিয়ার ডায়-এর সদ্য সমাপ্ত প্রোডাক্ট, রেড হুট।

এমন যে দর্শন, যা হয়ত বা আগামী শতকের যন্ত্রস্তভাতার বিস্তারিত দর্শনের প্রিলুড, তাকে তখন পরিপূর্ণতা দিচ্ছিল আমাদের ঘিরে থাকা বিশাল প্যানেলবোর্ডের অসংখ্য ইন্ডিকের — লাল নীল সবুজ, কেউ জ্বলছিল কেউ নিভছিল কেউ স্থির — ফার্নেস মুভমেন্ট, হিট, হুই ব্রাস্ট টেম্পারেচার, প্রেশার, উইন্ড ভলুয়াম, পেরিফেরিয়াল টেম্পারেচার, ডোম-টেম্পারেচার, স্ক্রিপ কার হুয়েস্টিং-এর ঘন ঘন সিগন্যাল ইত্যাদি যা কিনা ভাষার পরিপূরক হয়ে আগামী শতকের জয়গীথা সূচিত করছিল — মেয়েমুখি আমরা, আমি ও মিঃ ইয়াং —

কাঁচ-ঘেরা কেবিনের বাইরে স্ক্র্যাপ চার্জিং-এর গুণগার্জন, ওর চোখ আমার চোখে, আমার চোখ বিশাল প্যানেল বোর্ডে — টেবিলের দুইপাশে দুজনার বাস।

মিঃ ইয়াং-এর যাবতীয় ক্রোধ এতক্ষণে মোস্টেন আয়রনের চল হয়ে নেমে এল। 'ডেন্ট ফরগেট, য্যা আর অ্যা ফার্নেস ফোরম্যান, মাঝরাত্রে বাৎকার ইন্সপেকশন করতে গিয়ে হাই-লাইন অফিসে বসে তুমি কবিতা লিখছিলে? সামন্ত রিপোর্টার্স মিঃ ইয়েসটার ডে —'

কান-মাথা গরম হয়ে গেল। একেই শাইট শিফট, তায় ব্রাস্ট ফার্নেসের মত রাফ এন্ড টাফ কাজ। কিন্তু মিঃ ইয়াং-এর মত মানুষের মুখে মুখে জবাব দেওয়ার সাহস আমার নেই। পৃথিবীতে কেউ কেউ থাকে যারা কারও কথা শুনেও চায়না, কারও জবাবে তুষ্ট হন।

'কী হল জবাব দিচ্ছ না যে —'

'হাঁ।'

'হোয়াই?' সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে হাতের প্রচণ্ড এক থাপ্পড়।

শাপ্ত পরে বলি — 'সাহেব, তোমার মত একজন রিনাউন্ড আয়রন-মেকারের এ্যাসিস্ট্যান্ট আমি আট ঘণ্টার সব কাজ করে যদি মাঝের একটা ঘণ্টা কবিতার জন্য ব্যয় করেই থাকি তাহলে অত রাগ করছ কেন? ওটা আমার একান্ত এ্যাপ্রিটিজার বিশেষ —'

'স্যাট আপ —' ফের টেবিলে চাপড়। ফোন কাঁপল, কাঁপল ওর পীত রঙের হেলমেট।

বিশাল এক যন্ত্রস্তানবের পাদদেশে, যান্ত্রিকতার চূড়ান্তে সম্ভ্রিত কাঁচঘেরা কেবিনে আমি

অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, কাজ-পাগল মিঃ ইয়াং-এর ফের ধীরে ধীরে বদলে যাওয়া, গোটা অবয়বটাই। একসময় মিঃ ইয়াং-এর গলা আর মানুষের নয় ক্র্যাশার-মেশিনে ফায়ার-ব্রিক্স ক্র্যাশ করার পিশুন শব্দ — 'ফার্নেস ফর ফাইটার্স, এ কবিতার জায়গা নয় —'

'ফাইটার্স' কথাটা সামান্য হলেও আমার মনে আন্দোলন তুলল, হ্যাঁ, কবিতা যারা লেখে তারাও ফাইটার্স — নিজের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে, দেখার সঙ্গে না-দেখার মাঝে যে ছায়াঘেরা প্রতিপক্ষ, বোধ ও মননের নিতিদিনের জন্ম ও হারিকিরির মাঝে তার ভেসে থাকাও এক দীর্ঘকালীন ফাইট বিনা অন্য কিছু নয়। নরম স্বরে বললাম — 'সাহেব, পোয়েটিক-ফাইট চোখে দেখে বোঝা যায়না। ট্রেন্কে বসে রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখেও কত কবিতা রচিত হয়েছে তা জান। ওতে কিন্তু লক্ষণ্ডুষ্ট হয়না, বরং নিশানা আরও পার্ফেক্ট —' সেই সঙ্গে মানসিক জোরও বাড় —'

মিঃ ইয়াং যেন অন্য কোনো গ্রন্থের সম্পূর্ণ অটোনা একটা স্বর শুনছিল — তেমনই অবাকত্ব মেগা তার লালচে মুখখানি — 'হাউ ফার্নি'

'ফার্নি' শব্দটাই ক্রমে আমার অভিক্রমের পাথের হয়ে দাঁড়ায়, আমি মানুষকে শ্রদ্ধা যেমন করি, ভয়ও, কিন্তু যন্ত্রকে নয়, খোলা গলায় হেসে উঠি — 'হো চি মিন-এর নাম শুনেছ সাহেব? দ্যা গ্রেট গেরিলা ফাইটার — উনিও কবিতা লিখতেন ধানক্ষেতের পুকুড়ি ডগের আড়ালে ল্যাভ - মাইন পুঁততে পুঁততে —'

মিঃ ইয়াং-এর চোখ মোস্টেন আয়রনের ঢল-নামা মুহূর্ত থেকে দ্রুত পেছিয়ে যেতে থাকে দশকের পর দশক, এভাবে তার পশ্চাদপসরণ যতই ঘটে যাচ্ছিল ততই পরিভূত হয়ে ফুটে উঠছিল চক্ষু নামক সর্দর্দশীর প্রতিটি বিন্যাস — স্ক্রেক্সা, শব্দ ও নীলচে সাদা সামনে এসে স্বচ্ছ, কর্ণিয়া, কোরোয়, রেটিনা, লেন্স, ভাইট্রাস, চোখ এখন চোখেরই মতন — তখনই ফোন বাজল ক্রিং .... ক্রিং.....

হাত বাড়িয়ে ফোনে তুলেই চাপা স্বরে ইয়াংকে বললাম — 'মিঃ চোপড়া —'

আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাংশমণ্ডিত মিঃ ইয়াং-এর অবয়বখানিতে রূপান্তর ঘটতে লাগল দ্রুত — ফ্যাসাল স্লোর 'ইনগটীয়' রোয়া-নীলচে রঙের বদলে ফিরে পেতে লাগল উজ্জ্বল তাম্র বিভা — ইমপাকটরিন ফ্যালেন্স ফিরে পেতে থাকল মানবিক নমনীয়তা — দ্রুত হাতে রিসিভার তুলে নরম করে হালল, ফোন ধরে এত পোলাইটলি কথা বলতে লাগল মিঃ ইয়াং যা ভাবাই যায়না। মাঝে-মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে প্যানেল-বোর্ড হিট প্রেশার মুভমেন্ট দেখে রিলে করে যেতে লাগল যেন কোনো গৃহী-এর অতি-অনুগত নকলনবীশ তোপাঘাটি — সেইসঙ্গে লগ-বুক উন্টে বি-শিফটের রিপোর্ট, মাঝে-মাঝে সহস্রা 'ইয়া.....ইয়া:'

তাঁরপর একসময় ফোনে নামিয়ে মুখ কুঁচকে বিরক্তি ও অবজার মিশেলে আমাকে শোনাল সম্ভবত ক্ষণপূর্বের হামবল সাবমিশন-কে কাটান দিতেই — 'দ্যা ডেভিল, ইং; আমাকে শোনাচ্ছে ফার্নেস চালানো —' যতসব, ডেলইডে সিল-মিনিপ্তিতে যদি দাদা ধরা না থাকত তবে আজ তোমাকে আমার সঙ্গে নাইট-শিফট করতে করতে কাগলাম ছুটে যেত —'

ব্যাস, মুহূর্তে মিঃ ইয়াং এখন আমাদেরই ছবি — আমি, রাওগাণী, প্রকাশ, রামা রাও বা গৌতম যেমন।



হেসে বললম 'মিঃ চোপড়া কী তোমাদের বাচের?'

'নো — হি জু সেভেন্টি-এইট ফাস্ট-ব্যাং ফ্রম বি. এইচ. ইউ, আমি তিনবছরের সিনিয়র, ফ্রম বাঙ্গালোর —'

ইয়াং সাহেবের মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণার নীল রেখা দেখা দিয়েই ফের মিলিয়ে গেল যখন সে গভীর স্বরে 'চোপড়া আমার বস' বলেই একটু দম নিল। তারপর আর রাখাচাক না রেখে বলে উঠল — 'ওর ক্ষমতা অনেক বেশি, সত্যি, ফার্নেসের ব্যাপারে কিস্তি জানেনা, বোগাস্, ফার্নেসকে যেমন আমি গুলে খেয়েছি তার সিকিভাগও যদি জানত — এ পর্যন্ত ছ'বার রিলাইন করছি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে — এ যন্ত্রদানবের পেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাতের পর রাত ফায়ার-ব্রিক্স বসিয়েছি, হার্ভ-ক্লিং প্লেট, বস্-প্লেট, লার্জ-বেল, স্মল-বেল, এভুরিং —'

কথা শেষ করেই মিঃ ইয়াং আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সন্ধি। একটু আগেও সামস্ত'র রিপোর্টে যে মুখখানা রাগে খমখম করছিল, সেখানে এখন প্রশ্রয়ের হাসি। হাত মেলালাম। ফ্যাংলেন্স আর মেটাকারপাল-বোনস্-এর পুরুষ্ট মহিমায়, সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট ও মাসলস্-এর জমজমাট আধার-মন্ডিত এ হাত বার কসি ঝাঁকি দিয়ে শুধু সন্ধি নয়, তারও অধিক কিছু, মানুষ যখন দীর্ঘ সময় বাদে নিজেকে ফিরে পায় তারই উদারী, সহমর্মিতায়, পুরনো প্রসঙ্গ টেনে নরম স্বরে বলল — 'ডায়ার ফ্রেন্ড, কবিতার ভাষা তোমাকে ক্রমশ যন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, অনেক দূরে, যন্ত্রের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করো — ল্যাংগুয়েজ অব মেশিনস্ — হি-ব্রাস্টের নায়গ্রা - গর্জনের মাঝে নদীর কুলকুল ধ্বনি, এইটু টনস্ ক্রেনের ওজনদার চলনের মাঝে তার মেটরের সুইট মার্মার, ইয়েস্ দিইজ আর দ্যা ল্যাংগুয়েজ অব মেশিনস্ — কারখানা জীবন একেবারে অন্যরকম। পোয়েট আর মেশিন, দুজনে দুজনের রাইভাল; কবিতার যোরে মাঝরাতে হাই-লাইন থেকে গড়িয়ে পড়বে একশ ফুট নিচে আয়রন-ওর বাঁকায়ে, সোজা চার্জ হয়ে যাবে ফার্নেসে — বি স্টেডি মাই ফ্রেন্ড —'

ঢালাই-এর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে ফ্যাংলেন্স যথাসম্ভব স্নাগ বার করে নিতে হবে। তাতে ঢালাইটা ভাল হয়, মেটালও বেশি পাওয়া যায়। হাতে দস্তানা, ল্যাপিং-পাইপ, পিছনে গামা যাব। লম্বা ল্যাপিং-পাইপের পেরনটা উঁচু করে তুলে ধরে অক্সিজেনের ভালব খুলছে। আঙনের সংস্পর্শ পেতেই ল্যাপিং-পাইপের মুখ জ্বলে ওঠে, ইয়াং তখন কোমরে হাত রেখে পিছনে দাঁড়িয়ে। যে মুহূর্তে 'রানার' বেয়ে নেমে এল গলিত ধাতুমল, অসহ্য গরমে শরীরে জ্বলুনি, মিঃ ইয়াং তখন ঝুঁকে 'রানার'-এর কাছে, যেন গলিত ধাতুমলের সঙ্গে কথোপকথনে মত্ত। তামাটে মুখটা লাল, ভাবপেশীহীন

'কী হল সাহেব?'

চিন্তিত স্বরে ইয়াং-এর জবাব, 'মেটাল মনে হচ্ছে হাই-সিলিকন আসবে —'

বারোশ টনের বিশাল ফার্নেসটার সামনে কিছু মানুষ। মাথায় পীত বর্ণের হেলমেট। পায়ের ইভাট্রিয়া গুণ। এ যন্ত্রদানবের তুলনায় কত ক্ষুদ্র আমরা। ইয়াং সাহেব হির দৃষ্টিতে যন্ত্রদানবটার দিকে চেয়ে। হি-ব্রাস্টের তীর শব্দে কান পাতা দায়। মানুষের ভাষা যন্ত্রের দাপটে বোঝা যায় না। মাথার ওপর 'জেনসপ'-এর এইটি টনস্ ক্রেন কাস্ট-হাউস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ঢালাই-এর

প্রজন্মিত স্নাগ।

যন্ত্রদানবটার সোজা 'ট্যাপ-হোল'-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বকের ঝোলানো ক্রশচিহ্নে হাত রেখে ইয়াং সাহেব, ঠোট নড়ছে বিভ্রিভি, এমনটা ও রোজই করে; সম্ভবত অধিক মেটালের জন্য প্রভু বীণ্ডর কাছে প্রার্থনা। হঠাৎ মিঃ ইয়াং পাশে পাঁড়ানো আমার কাঁধে হাত রেখে মল্ল স্বরে বলে উঠল 'শি, জাস্ট লাইক অ্যা প্রেগনেন্ট লেডি —'

যে ভঙ্গিমায়, মোহমগ্নতায়, 'প্রেগনেন্ট লেডি' শব্দটা উচ্চারণ করল মিঃ ইয়াং তা যন্ত্রের ভাষা-শিক্ষা সম্পূর্ণ না হলে দ্বন্দ্ব দিয়ে যন্ত্রকে ভাল না বাসলে কণা যায় না। অসম্ভব।

'সাহেব, এই যন্ত্রদানবটাকে ভুঁমি খুব ভালবাসে তাই না?'

হেলমেট খুলে কপালের ঘাম মুছে নিশিতে পাওয়া মানুষের স্বরে তার জবাব — 'ওহ, আমি তা বোঝাতে পারব না, শি ইজ মোর দ্যান্ মাই ওয়াইফ —'

চমকে উঠলাম। সাহেবের যন্ত্র-প্রেমের কথা জানি, কিন্তু তার গভীরতা এত বেশি! নিজের স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভালবাসে! এ আশুও নন্দনীর বিশাল যন্ত্রদানবকে? হি-ব্রাস্টের তীর শব্দ যেখানে মানুষের শ্রাবণশক্তিকে বধির করে দেয়, যে মোটের আয়রনের দিকে একটায় চেয়ে রইলে দৃষ্টি নষ্ট হওয়া প্রায় অনিবার্য, অমন হিটে বছরের পর বছর কাজ করলে মানুষ যেখানে ক্রমশ ইমপোটেন্ট হয়ে যেতে পারে — তাকেই কিনা মিঃ ইয়াং বলছে 'শি ইজ মোর দ্যান্ মাই ওয়াইফ'!

একপা একপা করে দীর্ঘসেহী মানুষটা, একসময়ের রেড-স্ট্রাইপ দলের নিয়মিত রাগবি খেলোয়াড়, এখন নিউমেটিক ড্রিল মেশিনের কাছে। ওয়ার্কাররা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে। এ্যাটেনশান! ছিদ্র হচ্ছে মিঃ ইয়াংয়ের অভিকায় যন্ত্র-প্রেশসী ব্রাস্ট-ফার্নেসের গুণ্ড অঙ্গে। হঠাৎ কমান্ডারসুলভ স্বরে সে হেঁকে উঠল — 'স্টার্ট ল্যাপিং!'

প্রথম পাইপটা অর্ধেক ল্যাপিং করার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে অজ্ঞাত আলোর ফুলকি। আর দেরি নেই। ফৌসাচ্ছে ফার্নেস। যেন রক্তচক্ষু মেলে মানুষের স্পর্শ দেখে রাগে থরথরো কাঁপছিল। ভিতরের গলিত লৌহের প্রবল স্রোত মহাবীরকে বাইরে বেরিয়ে আসার পথ ঝুঁজছে। কেমন যেন ভয় হচ্ছিল আমার। এ গলিত লৌহের, আঠারোশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ক ফৌটা আমাকে সারাজীবনের জন্য পৃথু করে দিতে পারে — যে স্বপ্নের, এ কী চাকরি দিলে আমায়! মিঃ ইয়াং 'ট্যাপ-হোল'-এর কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সব কিছু লক্ষ্য রাখছে। ওর গরম বোধ নেই। পৃড়তে ভয় নেই। সম্ভবত মৃত্যুরও। যে মানুষ যন্ত্রকে এইভাবে ভালবাসতে পারে তাকেও কি ভাল না বসে উপায় আছে। বহুসময় ইয়াং বকাবকি করলেও আমি তাই রাগ করতে পারিনি — শুধু একটা কথাই ভাবি, রক্তমাংসের একটা মানুষ কী করে যন্ত্রকে অমন গভীরভাবে নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিতে পারে!

হঠাৎ তিন-চতুর্থাংশ ল্যাপিং হওয়ায় তীর বেগে বেরিয়ে এল গলিত লৌহের উদ্গার। লক্ষ-কোটি আলোর ফুলকিতে কাস্ট-হাউস আলোকিত, যেন মহাজাগতিক যাবতীয় গ্রহ তারা মহাশূন্য পেরিয়ে তিন নম্বর ফার্নেসের কাস্ট-হাউসে জমা হয়েছে — অন্ধকার দরীভূত। 'ট্যাপ-হোল'-এর মধ্যে দমকে দমকে লৌহহতরল, সোনাবর্ণ তার রঙ, যেন লকগেট খোলা প্রকান্ত বাঁধের জলরাশি, সচেতরোশ থেকে আঠারোশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় হু হু করে



এসে পড়ছে 'রানার'-এ। রামখিলাওন, আদ্যা, মহাবীর প্রসাদ, পণ্ডত প্রত্যেকের কালে পোড়া মুখগুলো এই দ্বিবা আলেয় দিনের মত উজ্জ্বল।

ইয়াং সাহেব হাত মুঠো করে চীংকার করে উঠল — 'মোটাল .... মোটাল ..... হাউ সুইট এন্ড রাইট .... ওহ ....'

পণ্ডত বাউরি, অভিজ্ঞ হোল-কীপার বিড়ি ধরিয়ে সেও উল্লাসে ফাটোয়ারা — 'শালাে সৃংগভ্ভা মা বাটি — তা বিনা রাতনির আগুন উপারিয়ে কেনেদে .... হি হি ....'

রামখিলাওন যাদব, ফার্স্ট-হেলপার, হাতে তালি বাড়িয়ে খুশিালি জানান দিচ্ছিল — 'হেই হো, আন্ধিয়ারা কাঁহা ভাগ গহিলেরে বাবুয়া—'

ঢালিই চলছে। তীর উত্তাপে গালের চামড়া জ্বালা করছিল, এই অত্যাঙ্ক গলিত লৌহের দিকে চেয়ে থাকতে পারছি না — একটা বিয়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চাইছি, অথচ আমারই সহকর্মীরা উল্লাসে চোঁচির। আদি ভাষায় রঙসিকতা চলছে, চলছে একহাতে খৈনী পাঁচহাতে ভাগ-বাটরি। আর মিঃ ইয়াং এই অসহ্য উত্তাপের মাঝে হুই-মেটাল রানার দিবি টপকে একবার ওপারে, কাস্ট-হুইস পজিকন দেখে পরক্ষণেই লাফিয়ে এপারে, কপাল বেয়ে ঘাম, মুখ চোখে ভূপ্তির হাসি। নিজে সিগারেট ধরিয়ে একটা বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। কাঁখে চওড়া হাত রেখে হেসে বলল, 'একটা কুলকুল শব্দ শুনতে পাছ? অ্যা সুইট মার্মার?'  
'না'

'বোগাস্ — কান পাতে, মনকে কনসেনট্রট করে, তবেই শুনতে পাবে। জাস্ট লাইক দ্যা ফ্রো অফ অ্যা রিভার .... হা: হা:, রিভার অফ মোস্টেন অয়রন; শোন ফ্রেন্ড — আগুন কামিকয়লা আর মেশিনস্-এর মধ্যে নিজের যাবতীয় সন্তাকে মিশিয়ে দাও — এই সালফারের তীর কাঁক বুক ভরে ঢানো — দু'হাত ছড়িয়ে এই উত্তাপকে গ্রহণ করো বৃকে, মানুষ, দ্যা মাইটি ক্রিয়েশান অফ গড, দেখবে আগুনের শিখা আর তোমাকে ছোঁবল মারতে পারছেনা, একদম না, বরং সে উইল, কিস্ ঘ্যা জাস্ট লাইক অ্যা লাভার —'

কথা বলছে বটে ইয়াং চোখ কিন্তু ঘুরে চলেছে চরকিসম, সবখানে, পঁচাত্তর টনের প্রথম ল্যাভেলটা প্রায় ভর্তি হয়ে আসতেই হাত তুলে ইশারা করল — সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্ত সৈনিকের মত রামখিলাওন গুড়ি মেরে গালের অনাবৃত অংশে ভেজা গামছা জড়িয়ে এগিয়ে গেল রানারের অতি সন্নিকটে, হাতের চাপে ক্রিমার-প্রেট তুলে দিতেই মোস্টেন অয়রনের স্রোত পড়তে শুরু করল দ্বিতীয় ল্যাভেল-এ।

আমার বিরস যন্ত্রণাদগ্ধ মুখ দেখে ইয়াং হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে বলল 'তোমার বড় কষ্ট হয় এই এ্যাটমসফিয়ারে, তাই না?'

'হ্যাঁ — এতদিন হল তবু আমি এই গরম, আগুন, আর কালি-কয়লা সহ্য করতে পারছিনা, বিশ্বাস করো সাহেব —'

'আমি জানি। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো — এই জীবনটাকে তোমার ভালবাসতেই হবে। এই হিট, সাউন্ড, আগুনের ব্রাইটনেস, সবকিছুকে। তারজন্য তোমাকে ওদের ভাষা জানতে হবে। ইউ মাস্ট নেক ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্যা মেশিনস্ — তবে দেখবে কত মজা — কত, ইউ ক্যান বিলিভ অ্যা মেশিন বাট কাস্ট অ্যা হিউম্যান বিয়িং —'

চমকে ফিরে দেখি ইয়াং সাহেবের চক্ষুদৃষ্টি ছলছলে, সম্ভবত, ফার্নেসের এই আলোকিত

কাস্ট-হাউসে তার সামান্যতম কোনো দুর্বলতা ফুটে বেরিয়েছিল নিজের অজান্তে; পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তরল লৌহের ঢাল-নামা রানারের দিকে চেয়ে চীংকার করে বলে উঠল — 'ব্রাভো, হোয়াইট্ অ্যা ওয়াভারফুল কাস্ট, সেকেন্ড ল্যাভেল ভর্তি হতে চলল এখনও ব্র্যাগ আসেনি, ব্রাভো, যন্ত্রকে ভালবাসতে না পারলে তার কাছ থেকে বেস্ট আউটপুট পাওয়া যায়না — হাই ম্যান, দ্যাখো এখনও মোটালের কী রাশ!'

ঢালিই শেষ। ঘর্মাক্ত শরীর। শ্রান্ত-ক্লান্ত। কেবিনে বসে আছি। পাখা ঘুরছে ফুল-স্পিডে। ইত্যবসরে ক্যান্টিন থেকে চা এসেছে।

ইয়াং সাহেব বলল 'নে', পরক্ষণেই ড্রয়ার খুলে একটা হুইকির পাইট বার করে 'তোমার চলো —' বলেই মূদু হাসল।

'না ...না'

'হাই ইয়াং-ম্যান, ড্রিংক করো না? ফার্নেসে কাজ করবে কী করে? এনিওয়ে, গো টু হেল — তুমি ক্যান্টিনের খোড়ার হয়ে পান করো।'  
একটা চওড়া পেগ অল্প জল মিশিয়ে হালকা সিপু করে সিগারেট ধরিয়ে, আমাকেও একটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'বিয়ে করছ?'

'হ্যাঁ'

'ফাইন — কিন্তু তবু তোমার চলাফেরায় ফুর্তি নেই কেন? লুকিং গ্লুইন্ দ্যা ফার্নেস — ছেলেমেয়ে?'

'এক ছেলে এক মেয়ে'

'ফাইন' বলেই একটা লম্বা চুমুক দিয়ে ফের প্রশ্ন — 'বউ তোমাকে কেমন ভালবাসে?'

'বুঝলাম না, কেমন বলতে —?'

'আমি নি, কেতোটা —'

হেসে জবাব দিলাম — 'ভালবাসার কি আবার কোনো কোয়ান্টিটি আছে নাকি? জানিনা। তবে বাঙ্গালি ঘরের বউরা হাজবেতদের খুবই ভালবাসে, এন্ড ইট্ কান্টি মেজারড্ বাই এনি ব্যারোমিটার —'

মিঃ ইয়াং হাসল না, ওর মুখে একটা যন্ত্রণার ছবি, দ্বিতীয়বার পেগ ঢেলে জল মিশিয়ে অনেকটা খেয়ে নতুন একটা সিগারেট ধরাল, তারপর চোখ ঘোরাল প্যানেল - বোর্ডের জলজ্বলে ইন্ডিকেটরগুলোর দিকে। হিট, ব্রাস্ট-প্রেশার, পেরিফেরিয়াল টেম্পারেচার দেখতে নেমেতে হঠাৎ-ই, প্রায় চীংকারের ভঙ্গিতে বলে উঠল 'বাট আই হেই মাই ওয়াইফ, আই হেই ... হেই ... আমার নাইট-শিফ্ট থাকলে প্রিন্সিলা ম্যাথিউসের বাংলাতে যায়, দ্যাট্ ব্রাডি ... হেই ... আমার নাইট-শিফ্ট থাকলে কোক-ওভেন, একদিন দুটোকেই খুন করব আমি — দুটোকেই — ম্যাথিউস ম্যানেজার অফ কোক-ওভেন। নিশ্চয়ই ফার্নেসে ক্র্যাপ চার্জ হচ্ছে। ছুটে বাইরে এসে সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা গুমগুম শব্দ। নিশ্চয়ই ফার্নেসে ক্র্যাপ চার্জ হচ্ছে। ছুটে বাইরে এসে দেখি হ্যাঁ, স্কিপ-কারে দশইঞ্চি ক্র্যাপ যাচ্ছে, মিনিমাম সাভ টন।

ইয়াং সাহেব কি গোটা পাইটটা কেবিনেই শেষ করে ফেলবে! আবার ঢালল। আবার চুমুক। তারপর, যে মানুষটা এতক্ষণ গোটা ফার্নেসে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, ওয়াকারীরা যার মুখের ওপর সামান্য ট্যা-ফো করতে সাহস পায়না, যন্ত্রের কাছে নিবেদিত-প্রাণ সেই মানুষটা অতি



ক্রান্ত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে টেবিলে মাথা কাত করে বিড়বিড় করে বলে উঠল 'ইউ ক্যান বিলিভ দ্যা মেশিনস্ বাট নট্ দ্যা উয়ামেন'—

মাঝরাতে বাংকার ইন্সপেকশনে বেরিয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে তলতর করে অনেক উঠতে সারি-সারি র-মেটিরিয়ালস্ বাংকারের ওপরে আমি। কোক, আয়রন-ওর, লাইমস্টোন, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ নানা আকরিকে ভর্তি। মাঝরাতে। পায়ের নিচে বাংকারগুলো এক-একটা মুত্য়া-গহ্বর। সরু তিনফুট লোহার প্লেটের ওপর দিয়ে হেঁটে চলার পথ। পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে বাতি। কোক আর আয়রন-ওরের ধূলায় সে বাতির আলো সীমায়িত। সাবধানে চলতে হয়।

বীভৎস গরম থেকে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় আমি। ঘাম শুকিয়ে গেছে। বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছি। বাতাস কি দামোদর উজিয়ে আসছে? গোটা কারখানাটা সেবা যায়। এ তো কোক-ওডেন, এ যে ডুপ্লেস-প্ল্যান্টে লক্ষ আলোর ফ্লুইকি, টার এন্ড ন্যাপথালিন প্ল্যান্টের তীব্র ঝাঁঝ গন্ধ, পিগ-কাস্টিং মেশিন, থ্যাডেল-হাউস, টাইম-অফিস — অজস্ত বাতি জ্বলছে কোকভারের কারখানায়। চারপাশ খোলা মুক্ত হাওয়ায় নিজেকে ফিরে পাচ্ছি।

হাই-লাইন অফিসে বাতি জ্বলছে। এখানে বসেই গত রাতে অনেক ভেবেচিন্তে একটা কবিতা শুরু করেছিলাম — একগাল কামানো হতেই, আয়নায়, সঠিক ফুটে উঠি। দু'গাল কামানো মানেই নিরুত ছদ্মবেশ। সকালে এমন উৎপাত ভাল লাগে? নিজেকে দখল নেয় যদি অন্যলোকে —

কেন যেন আমার নিজেকে এমন মনে হয়, যেন আমি নই, অন্য কেউ দখল নিয়েছে আমার। তা যাই হোক, সুবল সামন্ত, হাই-লাইন ফোরম্যান, সেটাই মিঃ ইয়াং-এর কানে লাগিয়েছে। পায়ের পায়ের পৌঁছে গেছি হাই-লাইন অফিস। জুতো খুলে টেবিলে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে সুবল সামন্ত। রেগে চীৎকার করে ডাকলাম, 'কী হল সামন্তবাবু, ঘুমোচ্ছেন? কোক-বাংকার খালি হতে চলছে সেদিকে হুঁশ নেই নাক ডাকিয়ে ঘুম —'

মাথার কাছে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গুঁড়মুড় করে উঠে বসল পঞ্চাশোর্ধ সুবল সামন্ত। 'ছিঃ, একজন ফোরম্যান হয়ে নাইট শিফটে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছেন' বলা মাত্র সে কাঁচামাছু মুখে 'এঁ! না.. না.. ঘুমোহিনি একটু শুয়েছিলাম এই আর কি' বলেই করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'ইউ লায়ার, ফের মিথ্যা বলছেন।' আমার গলার স্বরে নিজেই চমকে উঠলাম, আমি নই, যেন মিঃ ইয়াং-এর গলা—'খুব খারাপ সামন্তবাবু, রিপোর্ট করলে চেপড়া সাহেব —'

বাঁকটা শেষ করতে না দিয়েই সুবল সামন্ত আমার দু'হাত জড়িয়ে কাতরতায় চোঁচির — 'প্রজ স্যার, মাফ করে দিন, বাড়িতে আজ নাইট যজ্ঞাদিনি, কিছু লোকের নেমন্তন্ন ছিল দুপুরে — একটুও ঘুমোতে পারিনি, তাই অনেক চেষ্টা করেও আর জেগে থাকতে পারিনি স্যার, শত হলেও ফিফটি-টু রাশি, এই বয়সে রাত জাগা — ফার্নেসে কোনো গোলমাল হয়েছে স্যার?'

'না। কোক-বাংকার এম্পটি হতে চলছে'— গম্ভীর স্বরে বলি।

'কেনও চিন্তা নেই স্যার, আমার কাছে অটোটা লোডেড হ'বার আছে এফুনি লোকো ডাকিয়ে আনলোড করে দিচ্ছি, গোটা রাত কেটে যাবে —'

'হুম্, তাই দিন, কুইক, আর রাতে মাঝে মাঝে নজর রাখবেন, যত সব ইন-গ্যাকটিভ —'

এভাবে সাধারণত গুয়ার্কারদের সঙ্গে আমি কথা বলিনা, কিন্তু এই লোকটাই গতকাল আমার নামে ইয়াং-এর কাছে রিপোর্ট করেছিল মনে পড়া মাত্র, আমার সঙ্গে মিঃ ইয়াং-এর গলার স্বরের, মায় এ্যাটিচিউডেরও, যাবতীয় প্রভেদ ঘুচে যাচ্ছিল।

সুবল সামন্ত ক্রত জুতো পরে, হেলমেট গলিয়ে বেরোতে যাবে হঠাৎ কী মনে পড়ায় থমকে দাঁড়াল, অল্প হেসে হাঁদারে খোলানো একটা ব্যাগ বার করে কিছুটা কুণ্ডা জড়ানো স্বরে 'স্যার, দুটো নাড়ু খাবেন —' বলা মাত্র আমি অবাক — 'নাড়ু?'

'অজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, নারকালের নাড়ু খুব টেন্সি, আসার সময় বট চাট্টি ধরে দিল টিফিন কোটোয়া, বলল, "ভোররাতে নাড়ু খেয়ে জল খেয়ে নিও" — হেঁ: নিন, খুব ভাল —'

চোখের সামনে সুবল সামন্ত'র বাড়ানো হাতে কটা নারকালের নাড়ু — বাংকারে কোক শেষ হতে চলছে আর হাই-লাইন ফোরম্যান আমাকে নাড়ু খাওয়াচ্ছে এ দৃশ্য দেখলে মিঃ ইয়াং যে কী করত তা ভাবাই যায়না, হয়ত সুবল সামন্তকে ধাক্কা দিয়ে — কিন্তু আমি তা পারিনা — পারিনা বলেই ইয়াং সাহেবের মত যন্ত্রের ভাষা আমার অজানা থেকে যায়—

এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল চার বছরের ছেলে গৌরবের মুখ, আট বছরের তানিয়াকে — নারকালের নাড়ু ওদেরও খুব প্রিয়; বনানী মাঝে-মধ্যেই বনায় আর বাচ্চারা তার ভাগ নিয়ে নিজেরদের মধ্যে কলহ করে।

এখন ওদের মধ্যরাত। আমার ছেলেমেয়েরা বনানীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। যন্ত্রলানবের গুমগুম কৌসানি, তার সোলিহান শিখা, বাংকারের হাঁ-মুখ, সব কিছুর বদলে কৌশার বুকে কুশির মত জড়িয়ে-জাপটে থাকা আমার ছোট্ট-সংসার ভেসে উঠছে। বালিশে বউয়ের কেয়োকার্পিন-গন্ধ মাথা ছুটির দিনের আকুলতা — ছেলের হিন্সির গন্ধ টপকে দুই শরীরী সৃগন্ধের মহামিলন, দূরের ন্যাপথালিন-প্ল্যান্টের ঝাঁঝ-গন্ধকে অতিক্রম করে ছোট্ট আসছে তিরিশ কিলোমিটার দূরের মহানিখায়ে আচ্ছাদিত আমার বাড়ি থেকে — আর সেই সঙ্গে, সাংসারিক রোজনামাচার এ গন্ধাকুল দিনরাত ক্রমশ যন্ত্রের কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে চলেছে।

মিঃ ইয়াং-এর সম্পর্প, তার বসে নিবেদিত-প্রাণ জীবননামা, আমাকে যতটাই যন্ত্র-ভাষার সমীপবর্তী করে, সুবল সামন্ত'র বাড়ানো হাতের কটা নারকাল নাড়ু ততটাই আমাকে দূরে নিয়ে যায়।

নাড়ু, নয়, নাড়ু, নয় — আমাদের স্নেহপরবশ সংসারের গুঁড়ে আর নারকোল-কোয়ায় মাথামাখি মা-ভাই-বোন-ছেলেমেয়ে-বউ-আত্মীয়স্বজনের ক্ষুধাতিক্ত্র অংশের মহিমায়, অমোঘ টানের, সপিড-উপস্থিতি এ গোলাকৃতি খানকয় সুগন্ধী খাদ্যদ্রব্য।

কটা নাড়ু খেয়ে জল খেলাম। 'বা, বেশ হয়েছে।' সুবল সামন্ত'র চেয়ে খুশির ঝিলিক। সে হেসে বলল, 'মিঃ ইয়াং! কিন্তু বড় বেশি খ্যাচখ্যাচ করেন, সেই তুলনায় আপনি একেবারে অন্যরকম, শত হলেও বাঙ্গালি তো —'

'উৎ — হলনা, ভুল —' হপারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বলি। পেছনে সুবল সামন্ত'র



বিস্তৃত স্বর — কেন স্যার আপনি বাঙ্গালি নন? এই গতকাল দেখছিলাম বাংলায় পদ্য লিখছিলেন—’

‘হঁ, বাঙ্গালি এবং বাঙ্গাল। ঢাকার। তবে কিনা যন্ত্রের ভাষা-শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয়নি তাই অন্যরকম লাগছে, ওটা জেনে গেলেই আর মিঃ ইয়াং-এর সঙ্গে কোনো তফাৎ পাবেন না। এক, একেবারে স্বহৃৎ এক। আর তখন, নাইট-শিফটে ঘুমোতে দেখলে নারকালের নাড়ু, যতই খাওয়ান রেহাই দেবনা—’

ফিরে আসছি। পেছনে সুবল সামন্ত’র গাল — ‘সত্যি কারখানায় ঢুকলেই মানুষগুলো সব কেমন হয়ে যায় — কাউকে চেনা যায়না—’

আমি চলতে-চলতে রসিকতার চঙ্গে বলি — ‘হা: হা:, একগাল কামানো হতেই, আয়নায়, সঠিক ফুটে উঠি — দু’গাল কামানো মানেই নিবুত ছব্ববশে—’

আবার সেই পথেই ফিরে আসছি।

মনে পড়ছে গতরাত্রে লেখা অসমাপ্ত কবিতার লাইনগুলো, নতুন কিছু শব্দ মাথার মধ্যে ঘা দিচ্ছে ক্রমাগত — পিছনে লোভেড শান্তারের রক্তচক্ষু, হপার টেনে আনার ঘর্ষের শব্দ, তিনফুট প্লেটের ওপর আমারই খবুটে ছায়া। বাংকারগুলো যেন গিলে খাবার জন্য হাঁ করে আছে। সামান্য বেথেয়ালে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। ইয়াং-এর কথাই সত্যি হবে। চার্জ হয়ে যাব বারোশ টনের ব্রাস্ট-ফার্নেসে — আর আমার শরীরের দুশো ছটা হাড়, সকল ইন্ট্রিম, স্বখ-আহ্লাদ, কাম-ক্রেম-আশা-আকাংখা সবকিছু মোস্টেন আয়রনের ঢল হয়ে নেমে আসবে — পিগ-আয়রন থেকে পরিণত হচ্ছে আমি স্টিল হব, তারপর কোলিয়ারি-আর্ক হয়ে মাটির তলায় কোন্ অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভার বহন করে যাব কে জানে — হয়ত বা ব্রড-গেজ রেলের লাইন হয়ে বুক পেতে শুয়ে থাকব এই বিশাল ভারতবর্ষের কোনও সুদূর প্রান্তে — হয়ত বা জাহাজের খোল মটারের শেল ট্রাকের স্যাসি — হয়ত ..... হয়ত বহুতলের পিলার সমুদ্রতলের চেয়ার অথবা কে জানে আমার মেয়ে তানিয়ার মাথায় সরু স্টিলের হোয়ার-ব্যান্ড হয়েই বেঁচে থাকব — ও: কী ভয়ংকর —

না থাক, গতরাতের কবিতা অসমাপ্তই থাক — কবিতা, তুমি আমার যন্ত্র-জীবনের সতীন হয়ো না, আমি মরতে বড় ভয় পাই, তার চেয়েও ভয় পড়ছে ভয় বেঁচে থাকতে — এই যন্ত্রমায় বাংকার, ঐ আঙনে-রান্ধস, দেহাই তোমাদের, আমি আসছি, প্রচণ্ড চেষ্টা করছি যন্ত্র-ভাষা শিখে নিতে, প্রচণ্ড, একটু সময় দাও —

মিঃ ইয়াং এর মাথা টেবিলে কাত। দুটো হাত দুদিকে লম্বা করে ছড়ানো, যেন জলে সন্তরণের ভঙ্গি। প্রথমটায় সন্তরণের ভঙ্গিটার কথা মনে হলেও খানিক আগে ওর মুখে শোনা ‘আমার নাইটশিফট থাকলে প্রিন্সিলা ম্যাথিউসের বাংলাতে যাব’ মনে পড়তেই ভঙ্গিটা অন্যরকম মাত্রা পেয়ে গেল — অনেকটা যেন দুটো হাত দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার মরীয়া প্রয়াস। ঘূমের ঘোরে ইয়াং কী আঁকড়ে ধরতে চায়? বড় কষ্ট হচ্ছিল ওকে ঐ ভাবে দু’হাত ছড়িয়ে ঘুমোতে দেখে কারণ আমি জানি এককালের নিয়মিত ‘রেড-স্ট্রাইপ’ দলের রাগবি খেলোয়াড়, ছদ্মপ্রিয়, ‘ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ারশিপ ওয়ার্ল্ড ইজ জয়’—মন্ত্রে বিশ্বাসী, স্ট্রাম শরীরের অধিকারী মিঃ ইয়াং-এর আজ আর যন্ত্র ছাড়া কিছুই নেই আঁকড়ে ধরার।

যর্মাক্ত অ্রিকসের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। দ্বিতীয় ঢালাই-এর প্রকৃত শুরু হয়েছে। কাস্ট-হাউস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ক্রেন। শাণ্ডার লোকের হুইশল জানান দিচ্ছে তাদের ব্যস্ততা। হোলকীপার পশুপত, কালো পেশীহীন চোহারা, ঘাম ও কবলাওড়িতে মুখচোখ সদা যুদ্ধজয়ের উদ্‌মানদায় চকচকে, আমাকে দেখে হেসে বলল ‘দন্তবত আইজা — পেথখন ঢালাইয়ে কত মাল ইইছে?’

‘দুশো নকই টন’

আনন্দে ওর মিশকালে মুখে দাঁতের পাটি দেখা গেল। খুঁদে চক্ষুদুটি জ্বলজ্বলে, যেন কোনও অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ তার জীবন এমনই ভঙ্গিমায় মাথা ঝাঁকিয়ে ‘উরিরি, এমন ঢালাই বর্ধনিন বাসে ইইছে সাহেব, মন খুশিতে টবুটবু’ বলেই হিহি করে হাসতে লাগল।

যে পরিস্থিতিতে আমার শ্রবণশক্তি বধির হয়ে আসতে চায়, যে আগুন আমার কাছে বিভীষিকা, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে পৃথিবীর নিমন্তম জীব বলে মনে করি — সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার চেয়ে অনেক কম মাইনে পাওয়া একজন অতি সাধারণ শ্রমিক, নুন আনতে যার পাশা ফুরোয়, এখনও যে টিপছাপ দিয়ে মাইনে তোলে, সেই পশুপত বাড়িডি দুশো নকই টন মেটাল হওয়ার আনন্দে আটমান হয় কোন্ মন্ত্রে!

পশুপত বাড়িডিকে আপাদমস্তক দেখলাম — কোমরে রশি বাঁধা ঢোলা প্যান্টার আসল রং কী ভগবান জানেন। মোটা খাকি জামটার জায়গায় জায়গায় অসংখ্য ছিদ্র, আঙনের ফুলকি যাক হোতা।

‘আজ্ঞা পশুপত — ফার্নেস প্রোডাকশন বেশি হলে তোমার খুব আনন্দ হয় তাই না?’

‘কী বলেন আইজা আনন্দ হবে না! সিনা টান ইইয়ে যায়, মুই পল্লার হোল-কীপার বাট, আমার সঙ্গে উক্তর এ-শিফটের গঙ্গা আহিরের, দেখি শালো বিহানে কত টন মাল দেয়!’

আমার বুকের তেতরটা কেমন খুবো হয়ে আসতে থাকে, অবাক গলায় বলি — ‘যেদিন গঙ্গার শিফটে বেশি প্রোডাকশন হয়?’

দুঃখ-দুঃখ মুখ করে জবাব দিল পশুপত — ‘আর বলেন কেনে, মনে সিদিন বড্ড গঁসা, ঘর যেইয়ে বউ এর সঙ্গে থিঁচ লাগে — মনে লেয় আমি বাড়িড়ির ব্যাটা চিতি সাপের বিষ খাইয়ে হজম করি, আর হুই শালো গঙ্গা আহির ডাল-কটি খাওয়া খেট্টা আমাকে হারাই দিবে?’

‘কিন্তু তাতে তোমার কী লাভ?’

পশুপত প্রথমটা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর ওর গলা যেন কুলিং-টাওয়ারের ভেজা বাতাস উজিয়ে নিম্নতায় মগ্নতায় ছেঁড়াফটা মেঘমালা — ‘লাভ কি টাকার! মনে। ই আইজা, সুখ গভভার প্যাট চিরি মাল বার করি আর গঙ্গা আহিরের শিফট থিকো আগাই থাকি — মনে হচ্ছ জয়ের আকাংখায় উদ্‌মান এক বীর — অর্থ যার কাছে বড় নয়, হয়ত বা পশুপত-কথিত গঙ্গা আহিরও বড় নয়, বড় শুধু জয়, বড় শুধু এগিয়ে থাকা — সবাব চেয়ে,



আর এভাবেই নিজের বেঁচে থাকাকে প্রাণসঙ্গীতের মূহনায় অতি-জীবন্ত করে রাখা। যত ভাবছি এসব তত ভাল লাগছে মানুষটাকে।

‘আচ্ছা পশুপত, আরো তো অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে কারখানায়, সব ছেড়ে তুমি ব্লাস্ট-ফার্নেসের কঠিন কাজটাকেই বা বেছে নিলে কেন?’

সে আমায় ভুরু কুঁচকে দেখল দশকের তরং, ঠোঁটের ঠোঁটায় একদল বৈদ্যুতিকের পাটতে চালান করে থুতু ফেলল ‘পিরিক’ শব্দে, তারপর কপালের ঘাম ময়লা শার্টের হাতায় মুছে বলল ‘সাহেব কারখানাতে হাজার কাজ, কিন্তু ফার্নেসে ইচ্ছে মরদের কাজ — আশুন খাইয়ে হজম করতে হবেক, তবেই না আশুন পুড়তে আইনো নিজেই পুড়ি ছাই হবেক, হাঃ হাঃ — হুঁ — বেসাফিকে তখন মনে লিবে বউয়ে আমার পিরিত করছে মিঠা স্বরে। আমার বাপ রানব বাড়ি ছিল হিল সাহেবের জমানার ফার্নেসের লেবার-গ্যাং সর্দার, তখন কি এত ইঞ্জিন ছিল? পিঠ দিয়ে গুতা মাইরে ওয়ানগন ইখার-উখার করত, ফার্নেসে ডিরিল-মিশিন ছিল না, হাতের শাবল দিয়ে ‘হোল’ করত — কত লোকে দমকা আশুন পুড়ি মেরেছে হেঁ: — তবু বাপে আমার বলত ‘পশুরে — আশুন আমার মা, আশুন আমার বাপ, মোদের অমদার; আশুন ছোটো মোদের ঘর-দুয়ার জীবন-মরণ ধরম-করম, আশুন মোদের ডিংলা মাচার ফুল, ঘরের ছাদের পুয়াল’ ইসকল ছাড়ি অন্য ডিপার্টে গেলে দুদিনে গুথায় মরব আইজা —’

পশুপতের কথা শুনে শরীরটা কঁপে উঠল — যেন একজন আদিতমত মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝা পাত্তাপ্রবাহ বজ্রবিদ্যুৎ তুচ্ছ করে খোলা আকাশের নিচে আশুনের নবতম সংজ্ঞায় মানবসভ্যতার ভিত-কে আরও পোক্ত করছে। চারপাশের সব বাধাধিপতি অতিক্রম করে, উপেক্ষা করে, মানুষের জন্মের নিশান উচিয়ে যুগ যুগ ধরে হেঁটে চলেছে ক্রান্তিহীন — এমন যার পরকাম আশুন তার কাছে তুচ্ছ, যন্ত্র তার কাছে শিকলবঁধা।

বুঝতে পারছি, ক্রমশ বৃক্কের ভিতর তীর একটা জেদ পাক মেয়ে উঠছে। নিজেকে অতিক্রমের চেষ্টা। বৃক্ক জ্বালা করছিল অস্থলে। দুটো জেনুসিল চিরিয়ে জেল খোলা — এতে অস্থলটা হয়ত সাময়িক কমবে, কিন্তু অপমানের জ্বালা? হ্যাঁ, অপমান — পশুপত, রামখিলাওন, আদ্যা বা মিঃ ইয়াং এরা যন্ত্রের কাছে যত বেশি নিবেদিত-প্রাণ, চোখের সামনে এরা আশুনকে নিয়ে যত বেশি ছেলেখেলা করে, আমি, নিজেকে ততবেশি করে ‘এসকপিসি’ বলে ভাবতে থাকি, আর এই ভাবনাতাই এসকমায় সবাই অলসলস আমায় হাফ ও বিফোফার ঘটনিয়ে দেয়।

মিঃ ইয়াং তখনও ঘুমোচ্ছিল। তিনটে পনরো। ওকে না ডেকেই ‘ফ্র্যাশিং’ গুরু করে দিলাম। স্নাগ-টা রানারের কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে বুঝলাম হুট এন্ড লাইমি। সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে ঢুকে ফোন করে স্ট্রক-হাউস ফোরম্যানকে ফোন করে আয়রন-ওরের পরিমাণ বাড়িয়ে লাইমস্টোন কিছুটা কমিয়ে দিতে বললাম, জগে উঠে মিঃ ইয়াং রাগ করবেন না খুশি হবে তার তোয়াক্কা না করে — বৃক্কের ভিতর তখনও পশুপতের কথাগুলি বাজছিল ‘আশুন আমার মা, আশুন আমার বাপ ..... আশুন মোদের ডিংলা মাচার ফুল, ঘরের ছাদে পুয়াল —’

কিন্তু এতেও ভিতরের যন্ত্রণাটার উপশম হচ্ছে না। একটার পর একটা কাজ করে চলেছি। দ্বিতীয় ঢালাইয়ের জন্য কাষ্ট-হাউস রেডি। হু-মৌলি লাভেলে পজিলনে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে করছেই ইয়াং-কে না জাগিয়ে নিউমেটিক ড্রিলে ‘হোল’ বানিয়ে ফেললাম। প্রত্যেকটা কাজ

হয়ে চলেছে। মসৃণভাবে।

ঢালাই খুলব, দস্তানা নিতে কেবিনে ঢুকতেই ইয়াং জেগে উঠল — ‘ইন্স দেরি হয়ে গেল — ঢালাই খুলতে হবে যে —’

আমি গম্ভীর, গম্ভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম ‘ডোন্ট ওরি, সব রেডি আছে, ইউ টেক রেস্ট হিয়ার — আমি আজ ঢালাই খুলব —’

অবাক চোখে আমায় দেখল ইয়াং, তারপর একটা কথাও না বলে পেছন-পেছন উঠে এল কাষ্ট-হাউসে।

ল্যাপিং করছি। আশুনের ফুলকি এসে পড়ছে জামায়, প্যাস্টে। শরীরের খোলা অংশ জ্বালা করছে। তবু না, আজ আমি আর বিমের আড়ালে যাব না। যাড়ে-গালে-হাতে আশুনের ফুলকির ছোবল খেতে-খেতে হাতের ল্যাপিং-পাইপ বিশাল যন্ত্রদানবের গুপ্ত-অঙ্গ ছিন্ন করে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে। আশুনের বিভাণ আমার মুখ টকটকে লাল, নাকে লাগছে চুলপোড়া কটু গন্ধ — যত উত্তাপ তত জেদ — একসময় গলগল করে বন্য়ার জলের মত বেরিয়ে এল মোস্টেন আয়রন। তীর রাশ। এবারও যে দারুণ প্রোডাকশন হবে তাতে সন্দেহ নেই।

আলোয় আলোকিত কাষ্ট-হাউস, তখন চির চারটে দশ। দস্তানা কেবিনে রেখে কপালের ঘাম মুছতেই দেখি পেছনে ইয়াং সাহেব, হাতে দুটো সিগারেট। একটা নিজে ধরিয়ে অন্যটা আমাকে দিয়ে বলল, ‘ভেরি গুড, যত তাড়াতাড়ি তুমি কাজ পিক্ আপ করতে পারবে, তত আমি নিশ্চিন্ত। একজন আয়রন-মেকার শুধু প্রোডাকশনের জেরেই বেঁচে থাকেনা — আরও একজন আয়রনমেকার সৃষ্টির মধ্যেই তার সফলতা — হাঃ হাঃ টোয়েন্টি ইয়ার ধরে শিফট-ডিউটি করছি ম্যান — তার মধ্যে সিগ্ন এন্ড আ হাফ ইয়ার শুধু রাত জাগা — ভাবতে পার? এখন অস্লেই হাঁপিয়ে যাই। হ্যাঁ, তুমি পারবে, তোমার মধ্যে একটা সফট-কর্নার আছে, আর সেটাই প্রচণ্ড দরকার ফার্নেসের প্রচার নার্সিং-এর জন্য .....’

এই প্রথম, সমস্ত জড়তা কাটিয়ে সাবলীল স্বরে মিঃ ইয়াং-এর কথার উত্তর দিলাম ওরই ভাষায় — ‘ইয়েস্, বিকজ শি ইজ দ্যা প্রেগনেন্ট লেডি —’

হাসির দমকে ইয়াং-এর দীর্ঘ শরীরটা কঁপে উঠল, সে আমার হাত ঝাঁকিয়ে উল্লসিত স্বরে বলে উঠল — ‘রাইট, রাইট চ্যাকোভাটি, দিস ইজ দ্যা প্রচার ল্যাংগুয়েজ অব মেশিনস্ —’

### স্যালামান্ডারের সূচনাপর্ব

একদিন দুদিন করে মাস গেল, বছর গেল, আর আমি ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করলাম যন্ত্রের কাছে।

ইয়াং সাহেবের কাছে কাজ-শেখা আমি এখন শুধু যন্ত্রের ভাষাতেই সন্তুষ্ট নই, যন্ত্র-প্রেমে পাপল। ঘূমে-জাগরণে যন্ত্র আমার চোখের সামনে নোল খায়। প্রথম প্রথম একটা ছুটির দিনের জন্য কি ভীষণ মুখিয়ে থাকতাম। এমন ছুটির দিন ভাল লাগেনা, বড় ভয়ে দিনটা কাটে — কে জানে, অন্য কেউ যদি গয় সপ্তাহের প্রোডাকশন রেকর্ড ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়।

মিঃ ইয়াং নেই, কিন্তু ঠৈরি করে দিতে গেছে আমাকে। ঢালাই খোলার আগে ইয়াং সাহেব যেমন ‘ট্যাপ-হোল’-এর সামনে দাঁড়িয়ে বৃকে বোলানো ক্রশ-চিহ্নে হাত রেখে বিভিড়ি বিভিড়ি করত, আমিও এখন ল্যাপিং-পাইপ হাতে গলার কাছে পৈতে স্পর্শ করে নিমগ্ন স্বরে বলি — ‘আহো



যক্ষরাণিনী মাতঃ, স্বর্ণ-প্রসবিনী, অমি আয়রন-ওর লাইমস্টোন ডলেমাইট ম্যান্সনিজ ডক্ষণকারিণী মাতঃ, ধন নয় মান নয় জীবন নয় যৌবন নয়, শুধু মোটেন আয়রন দাও, গলিত লৌহের বাঁধভাঙ্গা দ্রোত দাও — আর আগামী জন্মে এমন এক মহীয়সী লৌহ-মাতার গর্ভে জন্ম দিও যার ফাটলাইজেশন হবে এক্স-ওয়াই ফ্রোমোজোমে নয়, হাই কার্বন স্টিলের অতিসূক্ষ্ম দুই কণিকায়—

ফলে মানুষটাই আমি দ্রুত বদলে যেতে লাগলাম।

আজ ছুটি। বনানী অনেক কিছু রান্না করেছে। পোস্তর বড়া, কলাই-এর ডাল, মাংস, চটনি। খেতে বসেছি। ডাল দিয়ে ভাত মেখেই খড়িতে চোখ। বারোটো তিরিশ। মনে পড়ল এ সময় এ শিফ্টের দ্বিতীয় ঢালাই-এর রিপোর্ট দিই চোপড়ার বাংলায়। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল মুখ চোখ, হাতের আঙ্গুল ভাতের থালায় কলাই ডালের পিছল বুক-কেটে ঘোরাতে লাগল ফোনের ডায়াল — ‘হ্যালো টু ফোর এইট, মিঃ চোপড়া। মাংস-চটনি-পোস্তর বড়া, কাফ্ট নং ২১৯৩ মেটাল টু হানড্রেড সেকেন্ডি হা: হা: চল চল মেরে সাথী, ও মেরে হাতি—’

‘ফার্নেস ‘রো’ হয়েছে?’

‘ইয়া: হার্ড ‘রো’

বনানী তীক্ষ্ণ চোখে আমায় পরখ করতে করতে বলল, ‘কী হল — কী বিড়বিড় করছ?’

‘উচ্ছৃগু, পক্ষদেবতার এক দেবতাকে — এখনও চারজন বাকী, আত্মজা, গ্যাডগিল, রায়না, গিল —’

‘সত্যি, দিন দিন তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ, আমার খুব ভয় লাগে গো —’

‘কেমন মানে?’

‘লোহা-লোহা মুখ, আগুন-আগুন চাহনি, ভাতের থালায় সেই কতক্ষণ ধরে আঙ্গুল ঘুরিয়ে

বিড় বিড় করছ, হ্যাঁগো, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? বনানীর স্বর কাঁদো কাঁদো।

আমি খাড় সোজা করে বলি ‘শরীর খারাপ? হ্যাঁ, আয়রনমেকারের আবার শরীর খারাপ

হয় নাকি! জান সিগ্গিট এম. এম স্টিল-রড-এর ব্রেকিং স্ট্রেচ কত?’

বনানী আর কথা বাড়ায় না, নিঃশব্দ বেতে খেতে চোখে আঁচল চাপা দেয় আর উদ্বিগ্ন চাহনিতে মাঝে-মাঝে আমাকে দ্যাখে।

দুপুরে দরজা-জানালা বন্ধ করে, ঘর অন্ধকার। শুয়েছি, এসময় আমার ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই ফিসফিস করে কথা বলে, পা টিপে-টিপে হাঁটে, যাতে শব্দ না হয় — বাবার ঘুম না ভাঙ্গে। আসলে ওরাও এই ক’বছরে বেবে জেনে গেছে বাবা তাদের আয়রনমেকার, আকরিক গলিয়ে আগুন ছেঁচে লৌহ উৎপাদন করে আর এই বিশাল ভারতবর্ষ, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পূর্বে আসাম-মিজোরাম থেকে পশ্চিমে গুজরাট অবধি বিরাট বিশাল দেশের ইন্টিগ্রেটিড রফার মহান কারিগর বটে (সমরাস্থ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্টিলের অবদান বুঝতে হবে)।

ষষ্ঠাধ্যায়ের পরে, সত্যি যখন ‘চ্যাপ-হোল’ — গ্যাস রো করছে আর একুশশো কিউবিক মিটার পার মিনিট আগুন-বাতাসের চাপে দীর্ঘ অয়ি-জিহ্বা, কেউটির জিহ্বের মত এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে — এই-ই তো প্রকৃত ‘রো’-এর সংজ্ঞা, ফার্নেসে আর মেটাল নেই তার প্রমাণ।

ঘুমের মধ্যেই আমি প্রচণ্ড শব্দে, আনন্দ-উদ্ভাসের মিলিত ঝাইবনংকারে চীৎকার করে উঠি ‘রো.....রো.....রো’

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি বনানী কান্দছে, গৌরব ও তানিয়া, আমার পুত্র-কন্যা ছলোছলো চোখে বিছানার একেবারে ধার বেঁধে মায়ের পাশে গুটিসুটি — অবাক চোখে বাবাকে, না, অন্য গ্রহের আগন্তুক মনুষ্যরূপী অজানা এক জীবকে দেখছে।

সেই থেকে সারাঘর শুনশান। মানুষ থেকেও নেই।

বিকলে সম্ভবত বনানী সামনের বাড়ির বৃদ্ধ মন্ডলবাবুকে বলে থাকবে ব্রিগ্রাহরিক ঐ অতিপ্রাকৃত ভয়ংকর দর্শনের কথা, মন্ডলবাবু সব শুনে বললেন — ‘বউমা, লক্ষণ তো ভাল নয়? রোজ হয়?’

মন্ডলবাবুর যুবক পুত্র, তেড়িয়া-স্বভাব পশ্টু বলল, ‘বউদি রো মানে তো ঘুঁসি ছোড়াও বোঝায়, তবে কি দাদা ইদানীং বক্সিং-টক্সিং?’

বনানীর পাড়াভূতো লতিকা কাকিমা বয়সে প্রাচীন, তিনি শুনে বললেন — ‘এতো মহা চিন্তার কথা, এত ভাল মানুষটার শেষে এই দশা। না, আমি তো ভাল বুঝছি না, তুমি বরাং লোকে লাগিয়ে বেলগাছটা কেটে ফেল। ইস কী অলক্ষণে কথা গো! ভাতের থালায় কথা কম, ঘুমের ঘোরে এমন কান্দে, লোহা-লোহা মুখ, আগুন-আগুন চাহনি — নাহে, শুনে আমার ভাল মনে হচ্ছে না, একে শনিবার, তায় ঘরের গায়ে বেলগাছ —’

কেউ কেউ আবার ওঝার কথা বলেছিল। তবে ওরা আজকাল প্যাদানির ভয়ে শহরে আসতে চায়না। শেষ অবধি সব্যস্ত হল আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়াই হবে উচিত কাজ।

আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বলি — ‘ওহ এতো আচ্ছা বিপদ, কী হয়েছে আমার?’

বনানী নাহোড়বান্দা — ‘ওগো তুমি জানানো, এ রোগের নিয়মই তাই, যাদের হয় তারা কিছুটা বুঝতে পারেনা, তুমি একটাবার চলে —’

সাতদিন পরে একটা ‘অর্থ’ সেই দিনটা নষ্ট করব ডাক্তারের কাছে গিয়ে? তাও একজন আয়রন-মেকার? ভীষণ রেগে বলি ‘তোমরা দুপুর থেকে কী শুরু করেছ বলতো — জান আমার মাথায় কত চিন্তা — যতসব ডিজগাস্টিং —’

‘চিন্তা তোমার চুলোয় যাক! আগে ডাক্তার তারপর অন্য কথা। অসুস্থ শরীর নিয়ে এখন ক’দিন উড়িটি যেতে হবেনা। তুমি জানান ঘুমের মধ্যে হাত নেড়ে নেড়ে তুমি কত কী বলছিলে —’

‘কী বলছিলাম?’

‘জাননি, সব মনে নেই, তবে যা শুনেছি তা যথেষ্ট ভয়ের, প্রথমে যানিকক্ষণ জড়িয়ে-জড়িয়ে কী সব বলে হাত মুঠো করে ঘুঁসি ছুঁড়ছিলে আর রো রো বলে টেটিয়ে উঠছিলে —’ কথা শেষ করেই বনানী কঁদে উঠল হাউহউ করে।

আমি যত বোঝাই তত সে কাঁদে। শেষে প্রস্রাব ছাড়ল — ‘ডাক্তারের কাছে যদি না যাবে তো রইল পড়ে তোমার সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে এই আমি চললাম বাপের বাড়ি। যে মানুষ বউয়ের একটা কথাও কানে নেয়না তার সঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করা যে কী বিপদের তা



ঠাকুরই জানেন। শেষে তোমার থেকে না জানি আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এসব রোগ ছড়িয়ে যায় —

‘রোগ? কী বলছ যা তা, কি রোগের কথা বলতে চাইছ?’

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝোঁপানো ঘরে সে ‘আমি কি ডাক্তার —’ বলেই আমার হাত দুটো একবার মাত্র চেপে ধরেই সভয়ে পেছিয়ে গেল আর তখনই কাদার দমক বাড়ল — ‘ইস্ কী ঠাণ্ডা, ঠিক যেন লোহা, অমন ঠাণ্ডা কি জীবিত মানুষের হাত হয়? আয়নার মুখটা দ্যাখো গে — লোহার মত শক্ত, চোখের পাতাও পড়ছে না — হ্যাঁগো, লোহা তৈরি করতে-করতে শেষে কী কঠিন লোহা-রোগ বাঁধিয়ে বসলে তুমি — তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে, কোনও কথা শুনিছি না আমি —’

এমন ঘেসিয়ে কান্না আমার ধৈর্যচ্যুতির পক্ষে যথেষ্ট। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করি। বেচারি, দশ বাই দশ ঘরের মধ্যে যার জীবনের সারাংশার সে কী বুঝবে একজন ডেভিক্লেটেড আয়রনমেকারের মনের অবস্থা। আমি অশান্তি চাইনা। সাংসারিক শান্তি বজায় রাখতে মানুষকে কত কী করতে হয় — ধার করে বউকে বেনারসী কিনে দিতে হয়, মাসের শেষে শ্যালক-শ্যালিকা সমেত পুরো ফ্যামিলিকে ম্যাসানজোড বেড়াতে নিয়ে গিয়ে (যেমন করেছি অক্টোবরের সাতাশ তারিখ) পাঁচশো টাকা খরচ করে পেমেন্টের আগের চারদিন লাব্‌রার তরকারি আর ডাল খেয়ে খুশি মনে বলতে হয় ‘আহা অমৃত’। পাড়ায় বউয়ের সম্মান বজায় রাখতে ছেলেমেয়েকে হাত-ছেঁয়া দূরত্বের বাংলা-মিডিয়াম স্কুলে না পড়িয়ে তিনমাইল দূরের কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করতে হয় — গুণতে হয় মাস গেলে তিনশো টাকা। এতও ব্যয়ের সমতা রাখতে কারখানায় ম্যানজারদের সামনে ফিণ্টার-উইলস্‌ খেয়ে বাড়িতে বিড়ি খাওয়া রপ্ত করতে হয়। শ্যালিকার ছেলের অন্নপ্রাশনে আংটি দিলে ফার্নেস ফোরমারের বটকে ছিঁছিকারের আওনে দণ্ড হতে হবে বলে ফোর পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে চার হাজার টাকা কর্তৃক করে সোনার চেন বানিয়ে দিতে হয় — সবই শান্তির জন্য, কেতা বজায় রাখতে ব্যাটা হতে হয় — সবই শান্তির জন্য। আশ্রয় এতো বলে আমার শরীরের কণা ভেবে বনানীর এমত উদ্ভিগ্নতা। ডাক্তার দেখানোর এহেন আকুলি-বিকুলি। বেশ, তবে তাই হোক।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডি. কে. পাত্র। বিরাট ডাক্তার। সাংঘাতিক পসার। বাইরের লম্বা লাইন খরায় দণ্ড গ্রামের সবেধন নীলমণি একটি মাত্র টিউবকলের সামনে হাড়ি-বাগত সমেত অজস্র মানুষকেও লজ্জা দেবে। ছোট্ট একটা শহরেই যদি এত মনোরোগী, তিরানবই কোটির এই দেশে না জানি কত!

বনানীর মুখে কেস-হিস্ট্রি শুনে প্রবীণ পক্ষপেশ ডাক্তার বুকে স্টেথো চেপেই সভয়ে চমকে উঠলেন — ‘এতো দেখি ঝড় চলছে’

‘ঝড় নয় ডাক্তারবাবু, হট-ব্রাস্ট, একুশ শো কিউবিক মিটার পার মিনিট —’

ডাক্তারবাবু মাথা দুলিয়ে ‘হুম’ শব্দ করেই ফের বললেন ‘ইন্টারেস্টিং কেস — আচ্ছা, জিভ দেখান —’

ঐ কী মাত্র ডাক্তারবাবু কঁপে উঠলেন — ‘আগুন ..... আগুন..... ওরে বাবা, লকলক শিখা —’

‘হ্যাঁ স্যার, সতেরোশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড — লোহা গলিয়ে জল করে দেবে —’

ডাক্তারবাবু দ্রুত এক ঢোক জল চেয়ে প্রশ্ন করলেন ‘কালার চিনতে পারেন? লাল নীল সবুজ হলুদ বেগুনি?’

‘নে — ওনলি দ্যা ব্রাইটনেস অফ মোস্টেন আয়রন, ওই রং যারা একবার দেখেছে তাদের চোখে অন্য রং আসে না —’

চিন্তিত ডাক্তার কিছুক্ষণ টেবিলে পেঙ্গল ঠুকে তারপর বি.পি. এ্যাপারেটাস হাতের বাজতে বৈধে ফের গম্ভীর, বিষয় এবারে চতুর্গুণ, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার মত। শেষ অবধি প্রায়-নিরাশ কষ্টে বললেন — ‘বড় জটিল কেস মশাই, রক্ত বয় না। ফুইফট্রি নেই। ডিসক্যাস। ছত্রিশ বছরের ডাক্তারি-জীবনে এমন অভিজ্ঞতা প্রথম। না, আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন। মানুষের ট্রিটমেন্ট করা যায়, কিন্তু যে মানুষের মধ্যে মৌল-ব্যাপারগুলোই অনুপস্থিত তার চিকিৎসা তো মেডিকেল গায়নে নেই, অ্যামান সিরি —’

এরপর পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বউবাচ্চা সহ ঘরে ফিরে আসা। ফেরার পথে বললাম ‘গেল তো পঞ্চাশটা টাকা। ওটা ডাক্তার না ছাই। আরে বাবা, আয়রনমেকারের ব্রাদ-প্রসার ঐ ফুন্টন একটা খেলনা-বস্ত্র আসে? বোগাস্! একুশশো কিউবিক মিটার পার মিনিট উইভ ভল্যুম হলে তার প্রসার কত হয় জান? সেভেনটিন কেজি পার সেকেন্ড, বুকেছ! ঐ, ঐ বি.পি. এ্যাপারেটাস যে ফেটে যায়নি তা ওর ভাগ্য!’

এত কিছু বলেও মনটা শান্ত হয়না। একটা মাত্র ‘অফ’-এর দিন তাও এইভাবে নষ্ট হল। কাল থেকে ফের নাইট-শিফট। আমার কি দম ফেলার অবকাশ আছে! ছুটির দিনেও তাই একা বসে মনে মনে পরবর্তী দিনগুলির প্রোগ্রাম সাজিয়ে রাখি। কীভাবে প্রোডাকশন আরও বাড়ানো যায়। গোপাল সিং-বজেক্ট করলে সিলিকন একটু ড্রপ করতে পারে সেই সঙ্গে মৌলোর কোয়ালিটি বাড়তে পারে ইত্যাদি নানা ভাবনাসিঁটা এই ছুটির দিনেই ছকে রাখতে হয়। আজকের দিনটা শুধু শুধু নষ্ট করে দিল বনানী। বুকের মধ্যে কেমন যেন দৃষ্টিভ্রা জমা হচ্ছিল। বনানীকে মৃদু তিরস্কারে বললাম ‘সতি আমার দায়িত্ব তোমার কিছুই বুঝলেনা, একটা দিন নষ্ট করলে —’

‘ওমা, নষ্ট কেন, আজ তো ছুটি’

‘ওহ গড — ছুটি আমাদের জীবনে হয় না, উই আর আয়রনমেকার। “ছুটি” শব্দটা মৃত মানুষের বিলাসের সংজ্ঞা। এই ছুটির দিনগুলোতে পরবর্তী নাইট-শিফটের জন্য যাবতীয় প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরি রাখতে হয় — তুমি কিছু বোঝেনা, জান আজ যদি কোনও শিফটের ফোরম্যান আমার গড়া পাঁচশো বাট টনের রেকর্ড ব্রেক করে বেরিয়ে যায় তবে আমার কী হবে।’

‘কী হবে গো —’ বনানীর স্বর এখন আশংকায় থরো থরো।

‘কী আবার! পরের প্রমোশনের সময় দেখব আমার আগে আর একজন গ্যাট হয়ে বসে আছে’

‘যদি তাকেও কেউ পার করে চলে যায়?’

‘তবে সেও আমার মতই শেষ মৃৎহুত ট্রেন ফেল করবে। ইস্, শুধু তোমার নিবুজিডার



জানাই আমি দিনদিন কোন্ অন্ধকারে পৌছিয়ে যাচ্ছি তা জান না—

ভয় ও কান্নার মিশেলে বনানী কাঁপা গলায় বলল ‘কী বলছ তুমি — কোন্ অন্ধকারে পৌছিয়ে যাওয়ার কথা বলছ — হ্যাঁগো, কোন্ অন্ধকারে —’

দগ্ধ করে জ্বলে উঠি — ‘কোথায় আবার! যেখান থেকে যন্ত্রের ভাষা আবার নতুন করে শিখতে হয় — ইউ-স্ট্রাস্টের মধ্যে সুইট্‌ মার্শার, মোস্টেন আয়রনের মধ্যে প্রবাহিত নদীর কুলকুল ধ্বনির বর্ণপরিচয় আবার নতুন করে শিখতে হয়। তুমি যে আমার কী ক্ষতি করছ জান না —’

‘এইতো, এইতো, আবার তোমার রোগটা চাড়া দিচ্ছে—’ কান্না দমিয়ে বনানী বলে উঠল আর সেই সঙ্গে দারুণ হতাশায় মাথা ঝাঁকিয়ে চাপা গলায় হয়ত বা নিজের ভাগ্যকে দুয়ে দেওয়ার মত করুণতর ঘ্যান্সিন বাজতে লাগল — ‘আমি কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না, তোমার কথাবার্তা এখনও কেমন ধোঁয়াশার মত — হ্যাঁগো, তুমি সেই আগের মত আর কথা বলনা কেন!’

দেশকে একশত শতকে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর আমি, একদিন আবার এই ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে ডমিনেট করবে — আমি তারই একজন অতি ক্ষুদ্র সহযোগী, বউয়ের প্যানপ্যানানিতে দিশান্ত হলে চলে? ‘হা: হা: আমায় এ্যান আয়রনমেকার, তুমি তার সহধর্মিণী, এত অল্পেই ভয় পেলে চলে!’

কান্না থামিয়ে বনানী এবারে রেগে চীৎকার করে বলল — ‘তাহলে তুমি কেন একটা স্টিলের মেয়েমানুষ বিয়ে করলে না?’

সারা সন্দেশ্টো কোনও কাজ নেই, অবশ্য কাজ বলতে আমি যা বুঝি — ম্যাসিং নেই, ঢালাই নেই, আগুন নেই, শব্দ নেই, আয়রন-ওর আর কোক-এর মিলিত ধোঁয়ার যুগলবন্দী নেই— সূতরাং কাজ কোথায়?

ওহ্, ছুটি এত কষ্টকর! সময় যেন কাটতেই চায় না।

যত এসব ভাবছিলাম, এক ধরনের অস্থিরতা কুরে খাচ্ছিল আমায়। কেন যেন বারবার একটা অশুভ ইঙ্গিত মনের কোণায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল — হয়ত ..... হয়ত আজ রাতেই আমার রেকর্ড ভেঙ্গে দেবে কেউ। রাস্তোগী, রান্না রাও প্রকাশ বা গৌতম। বিশ্বাস নেই কাউকে। ভেতরে ভেতরে সবাই ফুঁসছে। শিফট পঁচাশো ঘাট টনের সিংহাসন দখল করে রাখা খুব কঠিন।

আমি চাই না কেউ তা ভাবুক। কিন্তু যদি ভেঙ্গে যায়?

বউ চা দিয়ে গেছে, সঙ্গে বাজারের ফর্দ। তেল, জিরে, সার্ক, বোরোপ্রাস, ম্যাগি। হায় দীপ্বর ওরা জানেনা কাকে দিয়ে কী কাজ করছে।

বনানী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। আমাকে লক্ষ্য করছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বাজারের ফর্দ হাতে উদাসীন আমি।

একটু পরেই মিনমিন করে ও বলল, ‘গ্যাসের লোকানটা যদি খোলা থাকে একটু ঘুরে এলো—’

আমি নীরব। রাস্তোগীর মুখ ভাসছে। তিন নম্বর ফার্নেসের ঢালাই খুলল কি।

‘কাল একবার মিনু মাসির ঘরে গেলে হয় না? মাত্র একঘণ্টার জন্য। আগরতলা থেকে ফুলুর বর এসেছে সেই কদিন পর —’

অস্ট্রেলিয়ান কোক-এর রেক কি এসে গেছে? ওতে গ্র্যান্ড-কনটেন্ট অনেক কম। ঐ কোক ফার্নেসে চার্জ করলে রাস্তোগী নিশ্চয়ই বেটার আউটপুট পাবে। বেটার — কিন্তু কতোটা? দু’ ঢালাই মিলে পাঁচশো ঘাট টন অতিক্রম করে যাওয়ার মত? ও; মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

‘ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে — মেয়ের জন্মফটের জন্য একটা ফেভিকলের টিউব আনতে হবে — আজই—’ বনানী ভেবে-ভেবে বলছিল।

অমি স্তব্ধ। কোনো কথা কানে যাচ্ছেনা। দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত আমি, সেবাদাস; জিরে সার্ক বোরোপ্রাস ম্যাগি ফেভিকলের অবৈধ চক্রব্যূহে আটকা পড়া চলেনা আমার ‘কী হল — সেই থেকে হাঁ করে কী ভাবছ, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল —’

‘খাচ্ছি’

‘বাজার কখন যাবে?’

‘খাচ্ছি’

শরীরে যেন জোর নেই, হেঁটে যেতে হচ্ছে করছনে। আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী স্কুটারটা বার করলাম। সময় যেন থেমে আছে এক জায়গায়। পৃথিবীর কোনও ঘড়ি চলাছে না। বাইরে বেরিয়ে একদা বন্ধুদের মুখগুলি মনে করতে চেষ্টা করলাম, না পড়ল না — সব যেন বেলপাখাড়ির লাইমস্টোন মাইনস-এর নিচে চাপা পড়ে আছে। যতবার ওদের ছবিটাকে চোখের পরে ভাসাতে চাই ততবারই আমার যন্ত্র-ভাষা শিক্ষার গুরু ইয়াং-এর মুখ ভেসে ওঠে, ওর কথাগুলি এখনও মস্তের মত মনে পড়ে ‘..... ইউ মাস্ট নেক ফেভলিশিপ উইথ দ্যা মেশিনস্, তবে দেখবে কত মজা — কত, ইউ ক্যান বিলিভ অ্যা মেশিন বাট কাণ্ট অ্যা হিউম্যান বিয়িং—’

না, আমার আর অন্য কোথাও বন্ধু নেই, আমি কাউকে চিনি না। বাজার করে দ্রুত ফিরে এলাম — সব এনেছি কেবল সার্ক বাদে, ধূত, এত টেনশন নিয়ে কি ফর্দ মিলিয়ে বাজার করা যায়?

চোয়ার নিয়ে ফের অন্ধকারে মহানিমছায়ে। দূরে কোথায় মিটিং হচ্ছে, ভেসে আসছে— ‘ম্যায়নে কিয়া, ম্যায় করুঙ্গা, মেরা ওয়াদা, মেরা স্বপ্নে হ্যায় ইয়ে অখন্ড ভারত, মেরা ভারত মহান —’ সর্বত্র শুধু ম্যায়, ম্যায়, ম্যায় — হুন্ নেহি, শুধু ম্যায় —

তা হলে তোরা কারা? যারা দুপুরের রোদে পুড়ে গাঁ-গঞ্জ চৈসিয়ে বাচ্চা কোলে ভীড় জমাস? পাছার নিচে খড়কা করে হাঁ পেতে দমে হাততালি দিস? যোত। যোতের নাম মূর্খ-প্রবোধ, গণতান্ত্রিক মতে জনগনেশের কথক — ওয়েড, ইঁ: ঘোড়ার ইয়ে, শুধু পুলিশের ব্যাটন চাব্বির সময় হুন্, তখন আর ম্যায় নয়, ‘হামারা মাস্ রোটি কপড়া আউর মকান’। মকান তো পাবেনা — মকাই আছে অচেল, যথেষ্ট চিচোব আর দাঁত ভাঙ্গো — ভাঙ্গা দাঁতে ‘চিন্নিশা’ গাও — ‘যো তুহে মাসে ও মুহে মাসে’ — মার্ভেলস। রাজারা-ব্রজায় ভেদ নাই কাঁচের থালির জাত নাই। ধন্য সেকুলারিজম —

আর আমি?

মিটিং-এর জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, মিছিল থেকে শতহস্ত দূরে থাকা, কাঁথায় হিসির গন্ধ বাসিশে ক্যোেকার্পিন-সৌরভ ময়ের বাসিমুখে আমি খাওয়ার মেহ-গন্ধের রোজনামচ্যার মাঝে সংসারের দিশ্বে দিশ্বে ভালবাসা অভিমানে ক্রোম কাম কর্তব্য দায়িত্বের মহাভারতে নগনতম এক মানব — দিনে-রাত্রে জেগে-ঘুমিয়ে কেবলই স্বপ্ন দেখি 'এফ.ই.' — ফেরাস্— গলিত লৌহ — ধাতু মল — অন্ধকার ছাদ থেকে পারপেডিকুলার স্বর্গীয় ক্রেন নেমে আসতে দেখে হান কাল পাঠ ভুলে শয়ন রামন মোক্ষন ভুলে দারুণ আনন্দে চীৎকার করে উঠি — 'হাপিস্ — এ জন্মে তুমি আমার হাপিস্ করো আর জন্মে তোমায় আমি 'আডিয়া' করব' — বাস্তবিকই, তখনই আমার এই দুটো হাত জেসপের এইট টেনস্ ক্রেনের আর্ম হয়ে সারারাত দুলে যায় কার্ট-হাউসের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত হয়ে সংসার সীমান্ত অবধি।

আর নিচে?

নিচে তখন দক্ষ-মৃত-অলীসানো মানুষের মত হুটু-গোঁজ করে কেলিয়ে থাকা ব্র্যাগ-পিভকে জিজ্ঞাসাচিহ্নসদৃশ লোহার ছকে ফাঁসিয়ে মারণ-কেলিতে মগ্ন থাকবে আমারই আগুন-কালি-কয়লার নিত্যদিনের সহচরবৃন্দ — পপপত, রামখিলাওন, আদ্যা, নাগিনা বাহাদুররা — টার্বে-ব্রোয়ারের ঘর্ষের শব্দের মাঝে দেশের সেবায় প্রলিপাত ঘাম ও কয়লার গুঁড়িতে আমাদের নিশীথ কালীন মজলিস, বলা ভাল সে এক দিব্য মজলিস — যেখানে মানুষও আকরিক। আর আকরিকের ধর্ম যা, অসংখ্য ইম্পিউরিটিস-এর মধ্যেই লুক্কায়িত যেমন প্রাগ্পন্দন, তেমনই এ দিব্য-মজলিস মানুষের নতুনতর সংজ্ঞায় প্রতিভাত এক আখ্যান।

মহাভারতের কথা যদি অমৃতসমান, লৌহ-শিল্পের কথা তবে স্বর্গীয়-বয়ান—

আমি ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছি এ স্বর্গীয়-বয়ানে, কারণ মহানিমম্বায়ের যোরঘনাটে আঁধারে এখন চোখের সামনে ভীড় করে আছে আমার সহচরবৃন্দ ওরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে থাকে আমি সূত্রধর।

(১) রামখিলাওন দোসাদ : জিলা ছপরা, গাঁও পঞ্চরঙ্গী

'ছেলেমেয়ে ?'

'সাত গো'

'বিরি ?'

'একগো— গাঁয়ে থাকে'

'তা হলে লড়কাবাচ্চা কী করে হয় ?'

'চিঠিঠি—যে— হাঁ সাব, হর-সাল শাওন মাসে ঘর যায়, দূসর সাল ভাঙ্গো মাসে চিঠিঠি আসে — ছুঁয়া লড়কি গোদমে রোয়ে-রোয়ে দমোয়া বেটি গহিলে, তানি জলদি অহিয়ারে হামার মপোয়া —'

(২) আদ্যা ক্যাওট : জিলা বাঁকড়া, গাঁও তালভাংরা

'মেইয়াছেলাট কারেই ভেইগেগে গেছে —'

'কেন ?'

'শালি গতরখাকি, ফার্নেসের পারা খাড্ডা। রাত জাগে আর আগুন ছেচো মুই সাবুড়ে পেছি— রেইতে লিনছি—পাইপ ভুইলস, তা জুইলসে ফতুর ইইয়ে যেইতম, শায় তককা

বউয়ে পলাই গেল পাশের কোয়ার্টারের ভীমা কাহারের ছেল্যা নকলাব সঙ্গে।

'তো আবার বিয়ে কর —'

'কেনে? বগলবালা পড়েশের লেগে? তার থিকো খাবুড়া-ঘরের বিশ টাকার বউ চের ভাল — বুকি নাচাই হাতে, পুকি দুলাই গায়, সরমের ঢং ভালো আগুনছেচো শরীলে বেদম শিরানি দেয় — হা: হা:

(৩) নাগিনা বাহাদুর : জিলা বিরটনগর, গাঁও তসল্লি

'হেঁ মেজার কিসসা সাব, আমি তো হিলাম ট্যান্ডন সাহেবের আউট-হাউসে, বউ আমার খুপছুরত ছিল, সাহাব বলল — নাগিন, তুই এখানেই থাক তোকে কারখানায় চুকিয়ে দেব, আদমী বনে যাবি —'

'তারপর'

'তারপরেই তো ম্যাজিক। ট্যান্ডন সাহাব হয়ে গেল জানবার, আর আমি আদমী—'

'তার মানে ?'

'আরে সাহাব, /সাজা হিসাব—আমার বউ ওর হয়ে গেল, আর আমার হল নৌকরি—'

'তারপর ?'

'পাঁচ সাল বাদ সাব ভিলিই বদলি হয়ে গেল, বলল, আরেরে নাগিন তুই তো চাকরি ছাড়তে পারবি না, আর আমি স্বভাব —'

'আচ্ছা, তারপর কী হল ?'

'কী আবার হবে! যা হবার তাই — ভিলিই তা ওওয়া, নেপাল কা রোটি, নাচে নাগিন খুটা বীন সাদি বরবাদি —'

এই যে নিশীথকালীন দিব্য মজলিস — ক্রেনের ঘর্ষ ও হুটু-ব্রাস্টের তীর শব্দের মাঝে, আয়রন-ওরের ডাস্ট ও ড্রুপ্পেন-প্লাস্টের নীলচে শিখার চকিত সাহাবহানে, তার ছবি আমি বুকে বয়ে বেড়াই সর্বত্র, কিছুতেই সে পিছ ছাড়েনা, এই যে মহানিম তলে বিশ্রামরত আমি সেখানে এদের উপস্থিতি কী ভীষণ! আর এই ভাবেই কি আমি ছুটির দিনগুলিতে জীবন্ত হয়ে থাকতে চাই? যেমন এখন!

অন্ধকারে বসে আমার একটা দীর্ঘ দীর্ঘ অন্তি-দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ইচ্ছা করছিল — যার ভলুম একশো কিলোবিক মিটার পার মিনিট হয়, যার ধাক্কা আমার ঘর হতে কারখানার দুরত্বটুকু, প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথের যাবতীয় গাছপাড়া ল্যাম্পপোস্ট টেলিফোনের তার ছিড়ে উপড়ে যায়।

হ্যাঁ, শুধুমাত্র পাঁচশো ঘট টন নয়, আরও অনেক কিছু দেখাবার আছে আমার সামান্য ভূনিভা না করে বলতে চাই — মানুষেরা, অবশ্যই, যে কোনো জাধো - টার্বে ব্রোয়ারের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে। সারাজীবনের গ্রহীত ও বর্জিত বাতাস এক করে ছেড়ে দিলে তা সমুদ্রোপকূলের যে কোনো বিধ্বংসী ঝড়ের চেয়েও বেশি ভয়ংকর — ক্রোম ও ঘূর্ণার মিলনে যে অগ্নি উৎপাদন করে মানুষ গড়পড়তা ঘট বছরের পরমাণুতে তাতে ফার্নেস তো নাসি যে কোনো গ্রহকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

পুড়তে এবং পোড়াতে মানুষের জুড়ি নেই।



অথচ দ্যাখো, এমন অতলাস্ত দাহনপর্ব শেষেও চোখ কান হাত পা লিঙ্গ মুক্ত কেমন অবিকৃত! সম্ভবত, যন্ত্রের সঙ্গে এই তার প্রবেদ। বছর বছর 'স্যাট-ডাউন' নেই, মডার্নাইজেশনের খেলনলচে বদলানোর খেলা নেই, এবং নেই বছর-বছর ডেপ্রিশিয়োন। বরং অভিজ্ঞতার প্রাভাহিক কার্বোনিজেশনের পুরু-চড়ায় ঢাকা মানুষও একসময় অদাহ্য অক্ষয় অভঙ্গুর 'মালামান্ডার' হয়ে যায় — সালামান্ডার

দরজার কাছে ওঁড়ি মেরে বনানী কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল জানিনা। একসময় উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল 'অন্ধকারে ভুতের সঙ্গে কথা বলছ নাকি?'

'ভূত নয়, ভূত নয়, ভবিষ্যতের সঙ্গে কথা বলছি। এতক্ষণে তিন-নম্বর ফার্মেলে ঢালাই হয়ে গেছে, কত টন মৌল হল কে জানে। দুটো ঢালাইয়ে ফাইভ হানড্রেড সিঙ্ক্রিটি টনস্ সোজা নয়, খুঁঁব করিনি। কিন্তু কত কঠিন? কত? একেবারে অসম্ভব কী! উঃ, রেকর্ডগুলো যে ভাসার জন্যই হয় বলে জানি — মাই গড —'

ভাবতে ভাবতে আমার শরীর হিম হয়ে আসছিল।

'চলো খাবে'

'না, বিদে নেই'

'বিকেলে তো কিছুই টিফিন করলে না। শরীর আবার খারাপ লাগছে না তো?'

'আঃ বিরক্ত কোরনা — স্টমাকে যার গুয়া—মনোহরপুর-চিড়িয়ার আয়রন-ওর, ইনটেস্টাইনে ল্যাম্প-কোক, ইসোফেগাস্ জুড়ে লাইমস্টোন আর ডলোমাইট, আটারিতে মোন্টেন আয়রন, তার বিদেও পায়না তোমাদের মত — শরীর ও খারাপ হয় না যখন-তখন' শিরে করাঘাত করে বনানী ফুঁপিয়ে উঠলে আমি নিজের বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারলাম না — 'ওহ্ গড্, হোয়াট্ অ্যা পিটি আয়রনি অফ্ অ্যা স্টেডি আয়রনমেকার —'

### ওয়াডারের জন্ম:

বি-শিফটের প্রথম দিন। চার্জ হ্যাণ্ডওভার দিয়ে যখন গ্যারেজে এলাম, রাত দশটা পঁচিশ। এর পর তিরিশ কিলোমিটার পথ ছুটবে আমার বাহন — ১৯৮০ সালের 'প্রিয়া, ডব্লিউ.এন.পি. ৬৯২'

সারা শরীরে ওর কয়লাওড়ির আন্তরগ জমে আছে। একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে খুব যত্ন করে সিট, হেড-লাইট, স্পিডোমিটারের ক্যাঁ ইত্যাদি মুছে মনে মনে বললাম 'সত্যি, তোর জবাব নেই। স্বভূ বৃষ্টি দিন রাত্রি কেবলই ছুটে চলিস আমার সঙ্গে — একটুও ক্রান্তি নেই — ঠিক আমার মত —'

কে যেন ফিকফিক করে হাসল।

পেছনে ফিরে দেখি নাইট-শিফটের লোকজন। সনৎ দত্ত তার বাহক চোকাচ্ছে। 'কিহে এত রাতে বাড়ি যাবে? বলিহারি। কেনে ফ্যামিলি নিয়ে এই স্টিল-টাইটনিশপে চলে আসছ না। রাতের জি.টি রোডের যা অবস্থা —'

আমি আমার বাহনের পিঠে হাত বুলিয়ে বলি 'এর ওপর আস্থা আমার মানুষের চেয়ে বেশি —' বলেই মনে হল কথটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না। পরক্ষণেই আমি সম্ভবত

নিজের মনে সেদুল্যমানতাকে কটাতেই দৃঢ় স্বরে ফের বললাম 'যন্ত্র মানুষকে জেবায় না, মানুষই মানুষকে—'

সনৎ দত্ত মুচকি হেসে চলে গেল। আর আমার বাহন আমাকে বসিয়ে ছুটতে লাগল। আজ ওর চলন-ই অনারকম। কী মরণ গতি — মানুষ হলে বলতাম দারুণ মুড়ে আছে ব্যাটা।

জি.টি রোডে ছুটছি, রাতের বাদশাহী সড়ক। তার চেহারাই আলাদা। লোডেড ট্রাকগুলোর বাপোস্তর সম্পত্তি হয়ে যায় গোটা রাস্তাটা।

এমনই সময় ঘটল একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

কেক কোম্পানীর লিফার-ফ্যাব্রিক সরে পার হয়েছি, হঠাৎ খুব কাছ থেকে কে যেন পরিকার বলে উঠল 'সাবধান মাস্টার, রেস কমাও সামনে একটা বড় গর্ভ, বাঁ-পাশ কাটিয়ে চল—'

স্পিডে ছিলাম, ব্রেক কবে অনেকটা বাদিকে ঘুরে দেখি সতিহি বড় একটা গর্ভ, জলে ঢাকা, রাতের বেলায় বোঝা যাচ্ছিল না, তার ওপর চলমান ট্রাকগুলোর হেড-লাইটের যা দাপট।

বিপদ থেকে বেঁচেই হুঁপ হল কথটা কে বলল? না, আমার ধারে কাছে মানুষ নেই একটাও। শুধু সামনে-পিছনে অজব সারি সারি আলোর চক্ৰ ছুটেছে আর ছুটেছে। তবে কি মনের ভুল! না, হতেই পারেনা। স্পষ্ট শুনেছি, সে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছিল। স্ক্রটারটা থামিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়ালাম, খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে। তখনও আমার ঘোর কাটেনি। কেন যেন আমার মন বলছে, দীর্ঘদিনের সঙ্গী আমার বাহন, আমার ডব্লিউ এন পি ৬৯২-ই কথা বলেছে, নইলে এই অন্ধকারে কে আমাকে ঐ ভাবে সাবধান করে দেবে?

যত ভাবছি এসব, তত বৃকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। এও কি সম্ভব? যান্ত্রিকতার চূড়ান্তে পৌঁছে যে মানুষ নিজেই একদিন যন্ত্র হয়ে যায়, তার কাছেই কি অবশেষে মুখ খোলে প্রাণহীন যন্ত্রেরা? স্ক্রটারের হ্যাণ্ডেলের ওপর গাল রেখে ওকে আদর করলাম, তারপর হঠাৎ আগেগে ওকে জড়িয়ে ধরে মৌলিক বডিতে কটা চুমু খেয়েই বললাম 'আজ থেকে তুমি ওয়াডার—হ্যাঁ, এটাই তোমার যথার্থ নাম, তুমি জাননা আমার হৃদয়ের কতটা জায়গা জুড়ে আছে তুমি—'

'জানি জানি মাস্টার আর সে জ্ঞানই তো আমি তোমার সঙ্গে কথা কই—'

'ওয়াডার — ওয়াডার — ওয়াডার'

আমার চাঁৎকার আর অন্ধকারে স্ক্রটার-জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিকটবর্তী একটা ধাবা থেকে দুজন রাতপাহারার সেপাই ছুটে এল।

'এখানে কী করছেন একা একা?'

ওদের ধমক গায়ে না মেখে আনন্দে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠি — 'মিরাকল, জানেন এইমাত্র জন্ম হল ওয়াডারের' জাস্ট নাইট, কিন্তু কী ম্যাচিওর্ড ওর কথাবার্তা — 'আনবিলিভেবল' পুলিশ দুটো এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করে কাছে এসে আমাকে দেখল, একজন জিজ্ঞাসা করল 'ড্রিংক করছেন?'

'না.....ড্রিংক আমি করিনা, কিন্তু তার চেয়েও বেশি নেশা-নেশা লাগছে এখন —'

একজন সেপাই সম্ভবত সে অন্যজনের তুলনায় পদমর্যাদায় কিঞ্চিৎ উঁচুতে, মুখের কাছে মুখ এনে গন্ধ শৌকার ভঙ্গি করেই 'কোথেকে আসছেন এত রাতে' — বলা মাত্র শ্বাসার্থ



হরে জবাব দিলাম, 'সিঁল প্রাণ্ট'—

সিপাইটা এমনই বেরসিক যে বুঝল না সিঁল-প্রাণ্টের মাথায়া, উন্টে তিরছি হেসে বলল 'ও..... ভেবেছিলাম সদ্য রাঁচি থেকে আসছেন—' যাক, গোপালপুরের কাছেই একটা ম্যাচিং—এর ঘটনা ঘটেছে একটু আগে, সাবধানে যাবেন—

সেপাই দুটো চলে গেল বটে, আমাচা ছিটা ছিগুন। এখনও চিবির কিলোমিটার ছুটেতে হবে তার মধ্যে আবার একটা রেড-লাইট এলাকা। স্কুটার স্টার্ট করে ফের চলতে শুরু করেছি, সম্ভবত ওয়াভার আমার মনের কথা বুকে থাকবে, সে অভয়দানের ভঙ্গিতে বলে উঠল 'ডেন্ট ওয়র মাস্টার—' যু ক্যান বিলিভ মি—

সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ভয়ভীতি কেটে গেল। এই মুহূর্তে ওয়াভার শুধু আমার যন্ত্র-বন্ধ নয়, প্রাণের দোসর, নইলে কেউ এভাবে ভরসা দিতে পারে? এই দীর্ঘ পথ জুড়ে কত কত যে গোপন বিপদের 'বুবি-ট্যাপ' তা আমি জানি, আর জানি বলেই ওয়াভারের বলা 'যু ক্যান বিলিভ মি' আমার কাছে 'ব্ল্যাক ক্যাট' নিরাপত্তার চেয়েও অধিক মনে হয়।

লছিপুরের 'রেড-লাইট' এরিয়ার কাছাকাছি যখন, রাত তখন এগারোটো দশ— দেখি জলা-চারেক মেয়ে গোটা রাস্তাটা জুড়ে মানব-শৃংখল রচনা করছেন। অনাবৃত উর্ধাদ। ঘাগরা বা সায়ী জাতীয় কিছু পরনে। আর তাদের অনতিদূরে, রাস্তার পাশে অন্ধকারে কিছু মন্ডা চেহারা লোক ঘাপটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিরশিরে শোত বয়ে গেল, বেশ বুঝতে পারছি কী ঘটতে চলেছে, হঠাৎ টপ থেকে সেকেন্ড গিয়ারে স্ফোরকের জন্য ধমকাল ওয়াভার, তারপর ফিসফিসিয়ে বলল— 'মাস্টার, লেট্‌ সিম কান ব্রোজ, কাছে এলেই আচমকা টপ গিয়ার করে এক্সপ্লোসিভে মোচড় দাও, একেবারে সিম্বলিটি—' একটোকে শুইয়ে আমি ঠিক বেরিয়ে যাব, ডেন্ট ওয়র—

সত্যি, ওয়াভারের জবাব নেই, তার তুলনা সে নিজে। স্টাটিং-ব্লক থেকে স্টেরয়েড নেওয়া বেন জনসন যেভাবে ছিটকে বেরিয়েছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ জোরে আমার ওয়াভার এ বারবধু-শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁজলের ওঁড়োয় একটা পিচ রাস্তায় পড়ে তখনও কৌকিচ্ছিল— 'প্যাট ফুটা হয়ে গেলরে লচুচু....'

লচুচু অর্থাৎ এ বারবধুর রাখওয়ালে চাঁৎকার করছিল 'শালা তোর মা-কে—'

ওয়াভার আজ ঝড়ের গতিতে ছুটছে, আমাদের দুটি প্রাণ একাধ্য হয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে, সত্যি, এতসুখ জীবনে পাইনি। ওর প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আমি বুঝতে পারছি। আমাকে সওয়ার করে ওয়াভারও যেন আজ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিচক্রযান।

নিয়ামতপুর আর চলবলপুরের মাঝে টানেলটার নিচে হঠাৎ একটা গাভয়া পড়ে ওয়াভারের সাইকেলদার-পাইপ বুলে আচমকা ছিটকে পড়ল সেই সঙ্গে তীর ভড় ভড় ভড়— দিশার্ভবিদারি শব্দ— হে দিম্বর, আজই কি তুমি যাবতীয় পরীক্ষার খেলায় মেতেছে? একজন লোহা-গলানো মায়েদের সহনশীলতার ট্রেনিং-স্ট্রেস পরখ করতে চাইছে? নাকি যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের বন্ধন অঙ্গীকৃতই সম্প্রদায় একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে?

টানেলের নিচে পিচ-অন্ধকারে আমি যখন দিশেহারা, তখনই যন্ত্রণাকাতর স্বরে ওয়াভার বলে উঠল 'ওহু এত দৃষ্টিস্তার কী আছে—' নিউট্রাল করে রেস বাড়াও, হেড লাইট জোরে

ফোকাস করো, এয়ে..... এয়ে আমার অর্গন, পিক ইউ আপ, তারপর দেখছি—'

ওর কথা মতো জোরে ফোকাস করে দেখি গাভয়া পড়ে আছে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ওয়াভারের অর্গন, রুমাল দিয়ে চেপে ওর বান্ধেতে রেখেই ফের ছুট— নিজের যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে ওয়াভার যেভাবে ছুটছে তা ভাবাই যায় না, অমন ইন্জুরি সত্ত্বেও সে বলেছিল 'কী বলেছিলাম মাস্টার, যু ক্যান বিলিভ মি—'

'ওহু ওয়াভার—' শুধু বিশ্বাস করি বললে ভুল হবে, ইউ আর মাই সোল, দ্যা রিদম অফ মাই লিভিং—'

ওয়াভার হাসছিল প্রসন্নতায়, আমি জানি, শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্গনকে ইম্পুট করেও একজন যখন এ ভাবে হাসতে পারে— প্রসন্নতার হাসি, নির্ভরতার হাসি, আর আমাকে সঠিক টিকানায় পৌঁছে দিতে পারে সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে, সে তখন শুধুমাত্র বন্ধ নয়— তার চেয়ে অন-ক বেশি— হ্যাঁ, 'রিদম অফ লিভিং' কথাটিই বর্ণে বর্ণে সত্যি।

বাকী পথটা, তীর শব্দে অন্ধকারে পর্দাফরি করে ওয়াভার যখন আমার ঘরের দরজায়, রাত্রি বারোটা পনেরো। সত্যি, এত দেরি আগে কখনো হয়নি। দেখি ঘরের সামনে জটলা। ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বনানী ফৌপাচ্ছিল অত্যধিক দৃষ্টিস্তায়। তাকে সাব্বনা দিচ্ছিল পাড়াপড়শী মহিলাদের কেউ কেউ।

'আহা, কান্নার কী হল?'

'কিরতে এত রাত—' চিন্তায় আমার যে—' বলেই গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল চোখের জল 'ওহু—' যা যা একেটা ঘটনা ঘটল আসার সময়— কত বিপদ, কত দুর্ঘটনা সব এড়িয়ে শেষে—'

এবারে চোখের জল মুছে বনানী কঁপে উঠে সেই কথাটিই বলল, যা এর আগে বহবার বলেছে— 'কী দরকার বি-শিফট এত রাত্রে বাড়ি আসার, ওখানেই তো মেসে থাকতে পার—' একদিন একটা এমন বিপদ হবে যে—'

ওয়াভারকে ঠেলে ঘরে তুলছি, সিটের প্লিং-এ ক্যাচক্যাচ শব্দ, অর্থাৎ ওর ফিফেল হাসি। তখন আমি ঢাকাইয়া কুড়ি— 'আপ্তে কও বউ, বোভায়া হাসতাহে—'

ইউঃ চঃ! একদিন তোমার এই ঘোড়াকে আমি কী খোঁড়া করে দেব, তখন বুঝবে।

বনানী মুখে যাই বলুক, আমার ওয়াভারকে খোঁড়া করবে এমন সাধা কারও নেই। আমার টেকির পাশে ও শোয়। ঠিক ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে। মাথাটা একপাশে কাত করা।

রাত্রিরে বাওয়া-দাওয়া শেষে গুয়েছি। ঘুম আসছে না। বি-শিফটের দুটো টালিই খুব সাধারণ মালের হয়েছে। হাড্বেড সেডেলি প্রাস হানড্বেড এইট্রি ফাইভ, মোট তিনশো পঞ্চাশ টন। নট ব্যাড, কিন্তু আমার ক্যারিসমা অনুযায়ী তাকে ব্যাড-ই বলতে হয়। ডোনেভান বেইলি যদি ভেড-ই-লেভেন সেকেন্ডস-এ হানড্বেড মিটার প্লিন্ট শেষ করে তবে তা যথেষ্ট খারাপ পারফরমেন্স। আসলে রেকর্ড-হোল্ডারদের একটা বোঝা থেকেই যায়। একটা অলিম্পিক চাপ।

এর থেকে বোধ হয় কোনও কালেই মানুষের মুক্তি নেই। নাইট-শিফটের ফেরামানের মুখটাকে মনে করার চেষ্টা করলাম, দৃষ্টিস্তা বাড়তে লাগল। ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। ঘুম আসে না।

ওপাশ ফিরতেই চোখ পড়ল ঘাড় কাত করে আমারই দিকে ঠায় চেয়ে থাকা ওয়াভারের



দিকে।

তবে কি ওয়াভার আমার বউ-এর কথায় রাগ করেছে? সেই যে, একটু আগেই বনানীর বলা 'একদিন তোমার এই ঘোড়াকে আমি ঠিক খোঁড়া করে দেব' কথাটিয়।

স্টিট-লাইটের চিলতে আলো জানালার ফাঁক গলে ওয়াভারের মুখে। চকচকে চোখ। আমি নিম্ন হয়ে বললাম — 'ডেন্ট মাইন্ড ওয়াভার — বউ-এর কথায় রাগ কোরনা, ছেলেমেয়েরা ছোট তাই বনানীর এত ভয়, ডেন্ট মাইন্ড।'

ওয়াভার জবাব দিলনা দেখে একটু চিন্তা হল। জানালাবাহিত চিলতে আলোয় ওর ছলছলে চোখের দিকে চেয়ে বললাম 'কী হল কাদছ?'

'ওহ নো, হাসছি'

'সত্যি, দুটোর ফারাক বোকা যায় না তোমাকে দেখলে —'

'এখানেই তো মানুষের চেয়ে যন্ত্র অনেক এগিয়ে — ঘুমোও মাস্টার, রাত জাগলে সকালে উঠতে দেরি হবে — ওড-নাইট'

'ওড-নাইট'

আমাদের নিম্ন কথোপকথনের মধ্যেই কখন যে বনানী এসে মাঝের দরোজার সামনে, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ লাইট জ্বলে সে তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে কিছুক্ষণ দেখে বলল 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'কই না তো'

'আমি যে স্পষ্ট শুনলাম, ওড নাইট বলে এপাশ ফিরলে —'

'ওহ শান্তিতে একটু ঘুমোতেও দেবে না? আজকাল আমার ওপর এত নজরদারি করছ কেন? তুমি? শোবার আগে একটু ঈশ্বরের নাম নিচ্ছলাম, সব শেষে ভদ্রতা মেনে শুভরাত্রি জানালাম ব্যাস এইটুকুই —'

চোখ বড় বড় করে বনানী এগিয়ে এসে কপালে হাত রাখল, তারপর ভয়তরাসের স্বরে ক্যানফাসে, হেঁড়ফাটা গলায় বলল — 'ঈশ্বরকে শুভনাইট?'

'হ্যাঁ, অফ-কোর্স' আমি তখন অতিরিক্ত স্মার্ট, পরক্ষণেই ফের বললাম, 'যার কাছে যা ঈশ্বর —'

বনানী বিড়বিড় করে কথাটা আউড়ে কী বুঝল কে জানে বুকে মাথা রেখে হাউ হাউ করে পেলে উঠল — 'ইস্, কী মানুষটা তুমি কী হয়ে গেলে — কী যে অসুখ তোমার কিছুই বুঝতে পারিনা, সারাদিন উল্টোপাল্টা কথা বলা, উদ্ভট আচরণ — কী ভয়ে যে আমার দিন কাটছে —'

রাগ হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলি 'সত্যি, তোমরা মেয়ে মানুষরা সত্যিই ভীষণ বোকা। খাওয়া-পরায় কোনও ফাঁক তো রাখিনি। ছেলেমেয়ের যত্নপ্রাপ্তিতে কোনো ক্রটি তো রাখিনি। দিবা তো আছ। আমিও তেমনি মনের আনন্দে আছি, হ্যাঁ, আশুন কালি কয়লা আর যন্ত্রের সঙ্গে কাজ করে করে হয়ত কিছুটা রক্ষ হয়ে গেছি তাই বলে তোমার এত শুণ্ড শুণ্ড দৃষ্টিস্তা করার কি আছে শুনি? এসো, কাছেই যখন এসেছ একটু আদর করি —'

'ধাক মাঝরাত্তে আর পিঁঠাত দেখাতে হবে না' বলেই বনানী যখন পিছলে যাবার মুখে,

ওর হাত চেপে ধরলাম, আর তত্কনি ও তাঁর যন্ত্রণাকাতর স্বরে চৈতন্যে উঠল 'উহ আ: হাতটা যেন ওড়িয়ে থাকে — হাড়া ..... ছাড়া ..... ও:'

ভয় পেয়ে দ্রুত উঠে বসে দেখি আমার চেপে ধরা জায়গাটায় নীলচে দাগ বসে গেছে। সত্যিই কি আমি এত জোরে চেপে ধরেছিলাম ওর হাত? আমার এ রক্তমাংসের হাত এত শক্তি পেল কোথেকে। আলোর সামনে নিজের দু'হাত মেলেই চমকে উঠলাম — একী, কারপাল থেকে ফ্যালেংক্স অবধি শুণ্ড ফরটি এম.এম রড, হুঁচলো, সদ্য রোলিং মিলস থেকে বেরনো। একটাও রেখা নেই, মসৃণ সারফেস — মাই গড।

বনানীকে আর হুঁতে সাহস পেলাম না। ভাসা দণ্ড স্বরে শুধুমাত্র বললাম 'সরি — তুমি শোওগে, আগুন-পোড়া মানুষ তো তাই হয়ত একটু বেশি জোরেই — যাও, শোও গে —' নীরব দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অতি ধীরে ভেতরের ঘরে চলে গেল সে। আর আমি দ্রুত লাইট নিভিয়ে জোরে গালেই দুটো হাত চেপে ধরে অনুভব করতে লাগলাম অদ্ভুত শীতলতা।

মিনিট কয়েকের মধ্যে ফের ভেতরের ঘর থেকে ভেসে এল বউ-এর গলা — 'এই শনিবারে আমি বড়ঠাকুরের পূজো দেব, তুমি কিন্তু ছুটি নিও —'

'ছুটি' শব্দটা আমার কাছে এ্যালার্জী বিশেষ, তবু গৃহগত শাস্তিটুকু বজায় রাখতে, বিশেষত এই মাঝরাতিরে, বললাম 'সে দেখা যাবে — বড়ঠাকুর ছোটোঠাকুর — ঠাকুরের তো অভাব নেই তোমাদের —'

'কেন, তুমি ঠাকুর মাননা? বেপ্পতিবারের লক্ষীপূজার নকুলদানা তো যাও, কপালেও হাত ছোঁয়াও —'

'হ্যাঁ, সবই ঠিক, কিন্তু পূজো শব্দটা আমার কাছে অন্যরকম, "ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপ ওয়ার্ক ইজ জয়" — নাও, এবারে ঘুমোও দেখি —'

আধঘন্টা চুপচাপ শুয়ে থাকার পর বনানীর ঘুমিয়ে-পড়া সম্পর্কে যখন নিসন্দেহ হলাম, চুপিচুপি উঠে এলাম, ওয়াভারের কাছে। গায়ে হাত দিতেই ও জেগে উঠে বলল 'হোয়াট হ্যাপেনেড?'

'না, কিছু হয়নি, আচ্ছা ওয়াভার, বউ সবসময় আমার সঙ্গে অমন করে কেন বলত? একটা সন্দেহজনক দৃষ্টি, মাঝেমাঝেই বিচিটিমিটি, তবে কি আমাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে?'

ওয়াভার বিজ্ঞের মত হেসে বলল, 'মাস্টার — এ কিছুই নয়, ডেভিকটেড মানুষদের জীবনে এগুলো অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, তুমি কি জানো দ্যা গ্রেটেস্ট ফিলসফার অব দ্যা ওয়ার্ল্ড সফ্রেটিসের কথা? তাঁর বউ কী ব্যবহার করত ওনার সঙ্গে? মার্কস, আইনস্টাইন এরা কেউই যথায়ো গুল্য পায়নি তাদের বউদের কাছ থেকে — এটাই নিয়ম, এ নিয়ে চিন্তা করতে নেই — "ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপ ওয়ার্ক ইজ জয়" কথাটা যাদের শরীরের রক্তে-মজ্জায় নিশে যায়, তাদের বৈটার-হাফ এমনই করে — এবারে ঘুমোও তুমি —'

আ: শান্তি। সত্যি, ওয়াভার কত জানে। কি নিবৃত্ত ওর বিশ্রাম। একটা যন্ত্র হয়েও সে কেনন মানব জীবনের গুঢ় তত্ত্বগুলি জেনে ফেলেছে। ও যথার্থই বলেছে। ডেভিকটেড মানুষদের জীবনে এগুলো অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

অতক্ষণে আমার বউ চোখ বুঁজে আসছে ঘুমে।



## টুপির ট্রাডিশনাল ইতিবৃত্ত : শিল্প সংস্থা

প্রমোশনের সময় যত কাছে আসতে থাকে, তত আমার খিদে কমে যায়, ঘুমও। এখন যেমন। তার ওপর নাইট-শিফটে হজমের গন্ডগোল। দুইয়ে মিলে ইদানীং ভোর-রাতে মাঝে-মাঝেই, আচমকা পেট ভারি লাগে, টয়লেটে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যাইও। শ্রমিকদের জন্য যে ক'টা টয়লেট আছে ফার্নেসের অনতিদূরে, সারি-সারি, ধাওড়া সদৃশ, সে জায়গাটা নরকেরও তিনকাঠি নিচে। যদি বা তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হত তবুও কি ওখানে দূরত্ব পারতাম? না, অসম্ভব; স্ট্যান্ডার বলে কথা। এক হিসেবে, আমরা যারা কাজ করে খাই সবাই শ্রমিক। কিন্তু এও সত্যি — ‘শ্রমিক’ শব্দটা দারুণ কুশাসাময় বাতাবরণে তৈরী। ‘শ্রমিক’ শব্দের বৃহত্তর আঙ্গিনায় বহু বিভাগ — কেউ অদক্ষ শ্রমিক, কেউ দক্ষ শ্রমিক। তার ওপর এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার জন্য আরও একদল শ্রমিক। তাদের কাজের হিসেব নেওয়ার জন্য আমার একদল। এইভাবে দলভিত্তিক বা ডেজিগনেশন-ভিত্তিক শ্রমিক-বিন্যাসের মধ্যে দিয়েই একটি শিল্পসংস্থা তার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখে — যার সংহতিতে অটুট রাখতে এ্যাডহিসিভ রূপে ব্যবহৃত হয় নানা গাল-ভরা স্লোগান, যেমন রাষ্ট্র-ফার্নেস কনট্রোলরুমের সামনে বিশাল উচ্চ হোডিং-এ ভারি সুন্দর করে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা — ‘ফার্নেস একটি একাদমবর্তী পরিবার’ বা ‘হাতে-হাত রেখে ভাই, লক্ষ্যমাত্রা পূরণ চাই’ ইত্যাদি।

অথচ এই হাতে-হাত বেঁধে রাখা পরিবারের, একাদমবর্তী পরিবারের সদস্যদের বেঁচেবর্তে থাকার অন্যান্য বিন্যাসগুলির মাঝে কত ফারাক। অনেকটা ধাওড়া গোয়েঁদের কে.এস. টাইপ কোয়ার্টার বা দু’কামরার ঘরগুলির সঙ্গে ‘দ্যা রিজ’ — এর ঝলমলে ফ্র্যাট অথবা রিভার-সিডের বাংলাগুলির কী দারুণ বৈষম্য। স্বর্ণ-নরকের তফাৎ। চলাফেরা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সবচেঁতেই এই তীব্র বৈষম্য। আর এই-ই হল আমাদের শিল্পসংস্থার বেঁচে থাকার আংশিক ছবি। সেমিনার বা অন্যান্য এ-জাতীয় অন্তঃনৈ আমরাই গলা ফাটিয়ে হাততালি কুড়িয়ে — ‘এই কারখানা আমাদের, বুকের রক্ত দিয়ে আমরা একে বাঁচিয়ে রাখব, ভাইসব — হাতে-হাত রেখে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিজেকে নিয়োজিত কর — উই আর ইন্স দ্যা সেম বোট ব্রাদার —’

সেমিনার শেষে কেউ মার্কটি-থাউজেন্ট চেপে ভূশ করে যায়, কেউ যায় পিছনী প্রিমিয়ারে, কেউ যায় ডান্সা সাইকেলে উব্ব হয়ে ক্যাচরক্যাচর প্যাডেলের শব্দ তুলে।

তবু আমরা এক ও অভিন্ন, আর এই জাতের বস্তাপটা, অন্তঃসারুণ্য, তথাকথিত এক ও অভিন্নতার কারণেই শ্রমিকদের টয়লেটে-কে ঘৃণায় নাক কূচকে এড়িয়ে চলি।

আমাদের টয়লেট কনট্রোল-রুমের একেবারে পোশে, প্রায় এ্যাট্যাচড। যেতে গেলে কনট্রোল-রুম হয়ে যেতে হয়। ইউরোপীয়ান স্টাইল ও ইন্ডিয়ান স্টাইল, দুটোই। সেখানে এগজস্টারের পাখা ঘোরে। নিয়মিত ব্রিচিং ছড়ায়। এ-শিফটে সুপিরার নিয়মিত ধুয়ে-মুছে স্বকবাকে তকতকে করে রাখে। সাধারণ শ্রমিকরা কনট্রোল-রুমকে এমনিতেই দারুণ ভয় ও ভয়তির চোখে দ্যাখে — ও পথ মাড়ায় না। আমরাও এ-শিফট চলাকালীন এ টয়লেটে ভেঙে কিধা বোধ করি কারণ কনট্রোল-রুমে সর্গর্বে বিরাজ করেন চোপরা-আহুজা-গিল-পদ্মনাভন-নটরাজন-ভেঙ্কটচলপতি। তবে ঠা, নাইট-শিফটে প্রয়োজন হলে যেতে বাধ্য সেই। যাইও।

টয়লেটে যাচ্ছি। তিন-নম্বর ফার্নেসের ডাস্ট-ক্যাচারের পাশ দিয়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমেই রেলের লাইন পার হয়ে ডানপাশে বিরাট টার্বে-ব্রোয়ার হাউস আর বাঁ-পাশে পরপর দু’নম্বর ও একনম্বর ফার্নেস। ও দুটো ছোটো ফার্নেস। ক্যাপাসিটি ছশো টন একেকটার। সেই হিসেবে আমি কুলীন, দৈনিক ব্যারোশ টন ক্যাপাসিটির ফার্নেস চালাই।

রেল-লাইন ধরে হেঁটে চলেছি। দু’নম্বর ফার্নেসে ‘ফ্র্যাশিং’ চলছিল, রানারের পাশে কোমরে হাত রেখে প্রকাশ দাঁড়িয়ে। গলিত ধাতুমলের অত্যাঙ্কুল আলোয় ওকে স্পষ্ট দেখা যায়। সে হাত তুলে ইশারা দাঁড়িয়ে আমিও ইশারায় জবাব দিলাম কারণ টার্বে-ব্রোয়ার হাউসের তীব্র শব্দে এখানে কারও কথা শোনা সম্ভব নয়। এক নম্বর ফার্নেসে ক্লিনিং চলছিল, তার মানে চালাই কিছু আগে সমাপ্ত হয়েছে, রামা রাত্তি ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছিল।

টুকলাম কনট্রোল-রুমে।

বিরাট একটি শুভল-টেবিল ঘিরে খানদশেক গিমোডা চেয়ার। বড় সাহেবরা আসেন সকাল আটটায়। এখানে বসে মিটিং হয়। কি করে প্রোডাকশন বাড়ানো যায়, কেন্দ্র ফার্নেসের পারফরমেন্স ভাল নয় এবং কেন্দ্র, কী কারণ, কোনটা কখন মেনেটেনেন্স হবে, কাকে ঠেলে ওপরে তোলা হবে, কাকে বংশদত্ত দেওয়া হবে — ইত্যাদি ওজনদার ব্যাপারের সিদ্ধান্ত এখানে থেকেই মোটামুটি হিরীকৃত হয়ে যায়।

পীত হেলমেটধারী সাহেবরা দিনের বেলায় ইত্যাকার মিটিং করেন, সুদৃশ্য ট্রে করে দামি কাপে চা আসে — সেই সঙ্গে ফোন তুলে ক্যালকুলা - ডেলুজী, ইন্ট-লাইন মেসেজ, কখনও আরও ওজনদার ওপরতলার মুখে গালিগালাজ নির্বিয়ে হজম করে পরে তা আমাদের ওপর ঝেড়ে কিছুটা যন্ত্রণামূলক হন, কখনও ঘন ঘন চুকট টেনে পাল্স-রেট স্বাভাবিক করেন — আর এইভাবে, অসংখ্য কাজ সেয়ে ঠিক পাঁচটা বাজতে না বাজতেই কনট্রোল-রুমের সামনে দাঁড়ানো ফিফট, মার্কটি বা এ্যামবালাডারে চেপে ওনারা ফিরে যান বাংলাতে।

থাকি আমরা। থাকে পশুপত আদ্যা রামঝিলাওনরা। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কৃতিত্বের জন্য সূর্য-পদকের ডাক আসে চোপরা পদ্মনাভনদের। আর আমাদের দৃষ্টিগঞ্জি দিন দিন ক্ষীণ হয়, হিয়ারিং-অর্গান বিকল হতে থাকে, চট্রিশ লেক পূর্বে ধবধবে কাশফুল, পিতৃপ্রদত্ত কাঁচালুদ রং শুকনো আমসির মত কালচে মেরে যায়।

ওনারা যান বটে, তবে সম্পূর্ণ যান না। দেহ চলে যায় বাংলায়। মাথাগুলো থাকে। লোহার হ্যান্ডারে পীতহেলমেটে নাম-লেখা মাথাগুলো ঝোলে। কী বিক্রম তাদের! হেলমেটের কপালে কালো অক্ষরে চোপরা গিল আহুজা পিনাভন এন’রাজন সর্গর্বে উপস্থিতিতে জানান দেয়, আমরা আছি — শরীরটা বাংলার দুক্ষফেননিত শয্যায় তিনপোশ হুইক্সি মেরে গুয়ে পড়লেও আমরা আছি —

আর আমরা এঁ নাম লেখা টুপির অতল্যস্ত প্রভাবে কৌপে সারা। কনট্রোল-রুমে সবে পা রেখেছি অমনি দুলে উঠল মেঃ চোপারার পীতবর্ণ হেলমেট। রাত চারটে। বললাম — ‘গুড মর্নিং’

টুপি চিবুনো এ্যাকসেটে জবাব দেয় ‘মর্নিং’ তারপরই হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত স্বরে ফের বলে উঠল ‘ফার্নেস ছেড়ে এই অসময়ে এখানে কেন? জান, মিসিং ফ্রম ডিউটি কী প্রচণ্ড



দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। আর শুধুমাত্র এই কারণেই তোমার সি. সি. আর আমি বরবাদ করে দিতে পারি?

হাতদুটো দ্রুত উঠে এল বৃকের ওপর। করজোড়ে — ‘স্যার একটু কাজ ছিল’ বলেই ভাবলাম: ছিঃ একী বলছি। ফার্নেস ফোরমান, যার দায়িত্বে এই মহামূল্যবান মেশিনারি, যা কিনা একটা স্টিল প্ল্যাটের হাট, অত শ্রমিকের জান-মনের দায়িত্ব, সে কিনা এই ভোররাত্রে টয়লেট যাচ্ছে ফার্নেস-প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে — এটাও আবার চীফ বস্-কে বলতে হবে! না, নিজের কবর নিজের হাতে খুঁড়তে চাইনা।

সূতরাং ঘাবড়ালে চলবে না। আমিও লোহা গলিয়ে খানেকওয়ালা। চট করে হেসে বললাম — ‘স্যার একটা প্রবলেম আছে।’

‘হোয়াটস ইয়োর প্রবলেম?’

‘মানে, হেঁ হেঁ আপনার কাছ থেকে আয়রন-মেকিং-এর কিছু ওয়া ব্যাপার শিখতে চাই, আফটার অল — আপনি একজন অগ্রগণ্য আয়রন-মেকার, অন্তত আমাদের দেশের স্টিল-ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে।’

পীত-হেলমেটের চক্ষুদুটি হাসির আভাষ ভরে গেল, বলল — ‘দ্যাটস রাইট — বল কী জানতে চাও?’

‘ট্যাপ-হোলে এত আন-বান্টি কোক আসছে কেন?’

‘কারণ কোক কোয়ালিটি খুব খারাপ —’

‘আমাদের চাষালালার কয়লা তো খারাপ নয় স্যার —’

‘কিন্তু আমাদের কোক-ওভেনগুলো তত ভাল নয়’

আমি মাথা চুলকে বলি — ‘তাহলে ঢালাইয়ের সময় ঐ আদনের মধ্যে হুক মেরে আর কতদিন চালাব?’

‘বোগাস — হুক মারা কোনো সাম্যৈকিফিক ব্যাপার নয় মোটালার্জিতে, ওটা একটা বস্তাপচা অশিক্ষিত ধারণা — ইয়াং-এর মত আজোবাজে আয়রন-মেকাররা ওসব শিখিয়েছে তোমাদের। আমি সবসময়-ই হুক মারার বিপক্ষে, কারণ ওতে হোল-এর সেপ নষ্ট হয়ে যায় —’

আমি গলায় উৎসাহ খেলিয়ে বলি — ‘সেটাই তো মুশকিল, আর এইসব ক্ষেত্রে কী করা যায় সেটা জানতেই তো আপনাকে একটু ডিটার্চ করলাম —’

চোপারার টুপি খুঁশি তো হুকই না বরং রাগে গরগর স্বরে বলল, ‘ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্ট আমাকে তিনবার রাশিয়া আর দু’বার জাপান পাঠিয়েছে তোমার মত একজন মেয়ার ফার্নেস-ফোরম্যানকে এই তথ্য ফাঁস করে দিতে নয়, আভারস্ট্যান্ড। আমার কনসার্ন এম.ভি-র সঙ্গে। সেইল-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে। স্টিল-মিনিষ্ট্রির সঙ্গে। এন্ড দে ডোট বদার ফর দিইজ মিনিংগেস হুকিং পোকেিং এন্ড ব্রাডি ফকিং — হুঁ, হুক মেরে যারা ফার্নেস চালায় তারা সব পাঁচা —’

ঐ টুপির সামনে আমি শিক্ষানবীশ। প্রচণ্ড অসহায়। রাগালে চলবে না। ‘পাঁচা’ শুনেও দাঁত কেলিয়ে হাসি কী উদ্‌দরের শিল্প তা আমি জানি। হে ক্রোধ, তুমি দ্রুত ভূগর্ভে আশ্রয় নাও। তলপেটে পাক মারছে, একী যন্ত্রণা! তবু চোপারার ক্রোধ প্রশমনই আমার লক্ষ্য এখন।

‘স্যার, জাপান — রাশিয়াতে শুনেছি ব্রাস্ট-ফার্নেসের কাজ হোয়াইট শার্ট জব —’

‘ইয়াং, পাক্‌স্টলি। কম্পুটারাইজড, কমিনিউয়াস-কাস্টিং, বেল-লেস চার্জিং, সামান্য ব্রাস্ট-লিক্‌জ নেই, এমন মজবুত ব্রিকস লাইনিং যে একটুও গরম লাগবেনা, রানার-এর ওপর কভার, গোটা ফার্নেস-এরিয়া কাম এন্ড কোয়াইট — ত্রোমরা ভাবতেও পারবেনা। আমাদের এই বরোয়া টন ক্যাপাসিটির ফার্নেস-কে জাপানিরা বলে ‘টয়’, রাশিয়ানরা বলে ‘কিউরিয়ো’ — ছিঃ, লজ্জায় মরে যাই। ওখানে মিনিমাম পাঁচ হাজার টন ক্যাপাসিটির ফার্নেস। এতসব দেখে আসা, বুঝে আসা আমাকে আন-বান্টি কোক, হুকিং পোকেিং এসব জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করল না? আমি কি হুকিং শিখতে বারবার মনোনিীত হয়ে বিদেশ যাই, যে মানুষটা স্টিল-ইন্ডাস্ট্রির অভাবনীয় উন্নতির জন্য পদ্মভূষণ পেতে চলেছে তাকে তুমি মাঝরাতে হুকিং-প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করছ?’

আর উপায় নেই। সামনে-পিছনে নজর বুলিয়ে ফ্রোরের ওপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত — ‘ক্ষমা প্রভু ..... ক্ষমা, ভেরি সরি — ভেরি সরি — ভেরি সরি —’

চোপারার হেলমেট একক্ষণ স্থির।

কিছু বিপদ কালল না, কারণ ঠিক বিপরীত দেয়ালে ঝোলানো পদ্মনাভনের টুপি আমার নিশর্ভ সমর্পণের দৃশ্যাটি দেখে ফেলেছে। পদ্মনাভনের হেলমেট দুলে উঠল দক্ষিণী-ক্রুতায়। বাস্ট-ফার্নেসে দুটো গ্রুপ সদা বিদ্যমান — একটা নর্থ-ইন্ডিয়ান অনটো সাউথ-ইন্ডিয়ান। পদ্মনাভন, নটরাজন, ভেন্টচলপতি-রা একদিকে; এদেরও মোটামুটি সবারই একবার-দু’বার বিশেষ সফর হয়ে গেছে ইম্পাত-মন্ত্রকের টাকায়। কিন্তু ফার্নেসের ডমিনেটিং গ্রুপ যেহেতু নর্থ-ইন্ডিয়ানরা তাই পদ্মনাভনের দল একটু মনমরা। যে মাসে টার্গেট-প্রোডাকশন লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়, এরা সব মুখ গৌঁজ করে বসে থাকে। অন্যদিকে চোপরা আহুজা গিল-এর বাড়ি থেকে তখন এস্তার চানা বাটোরা, তন্দুরি-চিকেন আসে — বড় টেবিলে ভাগাভাগি করে খেতে-খেতে নতুন পরিকল্পনার জন্ম হয়।

যে মাসে আবার প্রোডাকশন টার্গেটের চেয়ে কম হয়, দিল্লির ধমক খেয়ে চোপারার মূখ কালো — সে মাসে কনট্রোল-ক্রমে বড় বড় স্টিলের বাটি ভর্তি ইডুলি ধোসা উপুয়া পোসল সম্বর-রসম-সাদম্ সহযোগে রীতিমত উল্লাসে মহাভোজ ‘নাভন’, ‘রাজন’, ‘রাও’, রেভিডের। একালম্বর্তী পরিবারের শ্রোগান-সম্বলিত হোড়িঙটা এত কাছে যে সব দ্যাখে। দেবতে-দেবতে বছর গড়ায়। নতুন বছর আসে। আর ঐ কালোর বুকে সাদা অক্ষরমালা রোসে জলঝড়ে ক্ষয়ে যায়। তখন আবার বৌথ ও সুখী পরিবারের নতুন শ্রোগান মাথা খাটিয়ে বার করা হয়।

পদ্মনাভনের হেলমেট দুলে-দুলে দক্ষিণী সুরে বলে উঠল — ‘দেখে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি — ছিঃ সাষ্টাঙ্গে প্রশম। কল্যাণিতম্ —’

আমি তখন ল্যাঙ্গেগোবরে, টোক গিলে কোনমতে বলি — ‘সুপ্রভাতম্ — আপনি চীফ হলে আপনাকেও করব — সি.সি.আর-এ লাল দাগ পড়ে গেলে আর প্রমোশন হবে না। চোপারার টুপিকে বড় ডরাই —’

‘আমাকে ডরাও না? হাউ ডোয়ার!’

‘হ্যাঁ স্যার, একশাবার ডরাই, তবে কিনা নর্থ-ইন্ডিয়ানরা চরম নন-ভেজ, ভীষণ মাথা



গরম — সে তুলনায় আপনাদের স্বপ্ন-রসম-সাদম অনেক ঠান্ডা, মাথাও —

‘ও, আচ্ছা, আমাদের শীতলম্ মাথার “ক্ল” তুমি দেখনি মনে হচ্ছে — দিল্লির আসন তো হাতছাড়া হয়েছে মাত্রই কয়েক মাস, ওটা আবার দখলে আসবে, স্টিল-মিনিষ্টি তো নশা — পাণ্ডয়ারে এলে তোমার সি.সি. আর কে বাঁচার দেখব — মূৰ্খম ইতরম্ —’

না, বাঁচার রাস্তা দেখছি কোথাও নেই। আবার সামনে-পিছনে নজর বুলিয়েই সান্ত্বনাসে গ্রহণিপাত। ‘হল? এবারে বুধি তো সাহেব, কনুই ছড়ে গেল প্রণামের ঠেলায়। আমি আসলে তোমাদেরই লোক, ক্যামোফ্লেজ করে আছি এই আর কী —’

পদ্মনাভনের টুপি বুধি গলায় বলল, ‘প্রসন্নম্’

এতক্ষণে, যখন ঢুকলাম টয়লেটে, বেগ উধাও।

বেশ অনেকটা সময় নিয়ে কিছুটা হালকা হয়েছি সবে তখনই শুনি জুতোর খচমচ শব্দ। টয়লেটের দরজার চিলতে ফাঁক দিয়ে দেখি, একী, চার নম্বর ফার্নেসের গৌতম চোপারার টুপির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, তাহলে গৌতমও আসে আর এইভাবে ভোররাত্রে টুপি প্রণাম সেরে যায়। ওদিকে ব্যাটারি মুখে কী লম্বা চওড়া বুলি — ‘আমি কাউকে তেল দিইনা, কাজ করি পরসা পাই — আমি কাউকে কেয়ার করিনা —’

বা: এই তার নমুনা। সাবাস গৌতম।

গলা বীকারি দিয়ে টয়লেট থেকে বেরুতেই ওর দুলো হাত সট করে নেমে গেল। এ্যাকবাবরে এ্যাটেনশন। আমার মুখে স্বর্গীয় হসি, না, আমার দুখ পাওয়ার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

গৌতম কেঠো হেসে বলল ‘হ্যালো’

‘হাই — তা এখানে?’

‘তুমি যে কারো, আমিও তাই’

‘তার মানে টয়লেট?’

‘হ্যাঁ, বাট আমম টু.উ.কে টু-ডে’

গৌতমের দুঃখ কাটান দিতে বলি ‘বৌটার লেট দ্যান নেভার’ ওর দাঁত ঘষটনি শুনলাম। মনে হল যেন বিপ্তি করল, মুখে অবশ্য মধু মথিয়ে বলল — ‘সত্যি, রোজ এত ভাল প্রোডাকশন দিচ্ছ তুমি যে —’

বুকের ভেতরটা ফুড়িয়ে যাচ্ছে। আঃ, কী সুখ কী শান্তি। রাইভাল্যারা যখন কারও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেয় তার তুল্য সুখী এই ইহজগতে আর কে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ফর্মে ফিরে পেলাম। ঝাঁক ‘অর রাগু মেরেই বললাম, ‘ডেন্ট ফরগেট গৌতম, মিঃ ইয়াং-এর কাছে কাজ শিখেছি আমি — কারখানায় হাজার-হাজার লোক কাজ করে কিন্তু ল্যাণ্ডওয়েজ অফ মেশিনস্ করজন জানে? নিজেকে যন্ত্রের সঙ্গে একাক্ষর করে দিলে তবেই বেস্ট আউটপুট পাওয়া যায় — বাই —’

গৌতম আমসি মুখে ঢুকে পড়ল টয়লেটে, ইন্ডিয়ান স্টাইল। কিন্তু বাইরে আমার জন্য আরও বিশ্বয় অপেক্ষা করছিল।

কনট্রোল-রুম থেকে বেরিয়েই দেখি প্রকাশ, রামারাও, চট্টরাজ — একের পর এক — একী কান্ড।

ভাগিয়া আমি সবার আগে এসেছিলাম, তাই আমার টুপি প্রণাম এরা কেউ দেখেনি।

দ্রুত এগিয়ে চলেছি ফার্নেসের দিকে। ঢালাই খুলতে হবে। আগুন-কালিকয়লা আর প্রচন্ড শব্দের সঙ্গে ভোরের বাতাসের সংস্পর্শে যে অপরাপ সুরমুচ্ছনা শুরু হবে আমি তার জ্বিন মটো। বিভোর থাকব। সতেরোশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট বুকে নিয়ে দেশ এগোনোর মহান ব্রত পালন করে যাব ভোর ছটা অবধি। ঢালাই বন্ধ করে রোজকার মত ফের শিফট শেষের রিপোর্ট। প্রোডাকশন ভাল হলে ফোন করব উদাত্ত গলায়। কম হলে মিনমিন স্বরে, এবং সেইসঙ্গে চোপারার ধমকের হাত থেকে বাঁচতে কিছু চাতুরির আশ্রয় নেব। রাশিয়া-জাপান ঘুরে আসা চোপারা গ্রাম বাংলার এই আমি-র সঙ্গে চাতুর্যে পারবে না — কেবিনের দরজাটা খুলে রাখব হাটু করে — ইট-ব্লাস্টের তীব্র শব্দ আছড়াবে আর চোপারা ‘এঁা? হোয়াট? ক্যামা? জোরে বল শুনতে পারছি না’ করতে থাকবে। আমি এবারে জানালাটাও দড়াম করে খুলে দেব, আর কম প্রোডাকশনের টেনেজ টার্বো-ব্রোয়ার হাউসের দশ-সমুদ্র-গর্জনের মায়ে ভেসে যাবে — এই-ই চলতে থাকবে যতক্ষণ না এ-শিফটের ফোরম্যান চার্জ হ্যান্ডওভার নেয়।

ততক্ষণে ছটা পনেরো।

মণিৎ শিফটের ফোরম্যান বলবে ‘ইস্ কী শব্দ, দরজা-জানালা খোলা কেন?’

আমি বলব ‘ভোরের বাতাস’

### টাইম মেশিন : টাইম কিপার

ওয়াভার উড়ছে। আমার মুখে কথা নেই। আমাদের এই কথাবিহীন পথ চলা একটা আশ্চর্য ব্যাপারই বটে, কারণ এমনটা বিশেষ ঘটনা। হঠাৎ মাঝরাত্তায় এসে দু’একটা ঝাঁক তুলে ওয়াভার দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার — এমন তো কখনও হয়নি। নাইট-শিফট শেষে বাড়ি ফিরছি, রাত জাগা দেখা, এই যাত্রা-বিস্রাট মেজাজ আমার তুঙ্গে চড়িয়ে দিতেই ঝেঁয়ে উঠলাম — ‘কী হল ওয়াভার, এনি ট্রাবল? তবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে যে!’

ওয়াভার মৃদু হেসে বলল — ‘না ট্রাবল মাস্টার, ভাবছি তুমি এক গম্ভীর কেন! এতক্ষণ একটা কথাও বলনি —’

‘ও: তাই, তবে চালু হও, যেতে-যেতে বলছি একটা ঘটনা — সাউথ-ইন্ডিয়ান লবি আর নর্থ ইন্ডিয়ান লবি-র মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে যাচ্ছি —’

কিন্তু করতেই ফের ওয়াভার চালু হল, আর আমি বলে গেলাম ভোররাতের কনট্রোল-রুমের ঘটনাটা।

সব শুনে ওয়াভার একটুও না চমকে, অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলল — ‘মাস্টার — এ হলো সেই ইম্পিরিয়ালিস্টিক কলোনিজম্-এর বাই-প্রোডাক্ট, টুপির তারতম্যে স্যালুট-এর বহুর বদলে যাওয়া আসলে সাগরপারের দান। ডেন্ট মাইন্ড, ওসব নিয়ে একজন আয়রন-সুপারের চিন্তা করতে নেই। তুমি ভয় পাও চোপারার টুপিকে, আবার চোপারার ভয় ‘সেইল’-এর চোয়ারমানের টুপিকে। আবার নিচের দিকে তাকাও, দেখবে তোমার টুপিকেও কেমন ভয় পায় রামখিলাওন, নাগিনা বায়দুর —



ওয়াভারের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি — মাইলোমিটারে দেখাচ্ছে গতি ঘাট ছুই ছুই, এ স্পীডেও যার কথাই এত যুক্তি থাকে সে সাধারণ নয়।

একটু বাদেই ওয়াভার ফের বলল 'আর লবি-র কথা বলছিলে না? ওটা এখন শ্রোবালিঙ্কড — ওটা নিয়ে চিন্তা করাটাই বোকামি — দুটো লবি-র মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে বেঁচে থাকতেই তো জীবনের স্বাদ — লবি আর ল্যাডার এর মাঝে তফাৎ কিছু নেই, আর ল্যাডার ছাড়া মানুষ উঠতে উঠবে কী করে?'

যাক, খিচা কেটে গেল। ভোরের বাতাসে দারুণ লাগছে পথ চলতে।

রূপনারায়ণপুরের কাছে আসতেই দেখি সেই দুটো বুড়ো। ঠিক মাঝামাঝি। আশ্চর্য মানুষ ওরা। সকালে ফেরার সময় রোজ দেখি ওদের। এই উঁচু ভূতল-পোয়াতি ব্রিজটার সঙ্গে এই দুটো বুড়োর যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কোনোদিন দেখি দুই বুড়ো ব্রিজের মাথায় একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে পায়চারি করছে, যেন অভিন্ন পাহারাদার; আবার কখনও দেখি রেলিং ধরে দূরের ভিসিট্যান্ট সিগন্যালের দিকে চেয়ে আছে অপলক।

রোজই দেখা হয়, কথাও হয় মাঝে-মাঝে; একদিন নিজেই যেচে আলাপ করেছিলাম সাতাশির মার্চে রিটার্ডার্ড চন্দ্র মজুমদার আর এপ্রিলে রিটার্ডার্ড সূর্যকান্ত গুহ'র সঙ্গে। একজন ফর্সা, একজন কালো। একজন লম্বা অন্যজন বেঁটো, কিন্তু খুব বন্ধু ওরা। মানুষ দুটোও অদ্ভুত। আজও স্পষ্ট মনে আছে প্রথম আলাপের কথা। এইরকম-ই এক নাইট-শিফট করে ফেরার পথে ফুটার খামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম — 'কিছু মনে করবেন না, সকালে ফেরার পথে আপনাদের দুজনকে ঠিক এই জায়গাটতে রোজ দেখি — একমিনিটও এদার-ওদার হয় না—'

সূর্যকান্ত হেসেছিলেন। জবাব দিয়েছিলেন চন্দ্র মজুমদার — 'ঠিক বলেছেন, আমাদের সময়ের হেরফের নেই, আমরা টাইম-মেশিন — পল, অনুপল, বিপল, কিছুই আমাদের কান্না দেয় না।'

রাত্রি-জাগরণের পর মানুষের ভাল কথাও অসহ্য লাগে, ক্রান্ত শরীরটা তখন কেবলই বিশ্রাম চায়। মানুষটার মুখে ঐ অদ্ভুত কাণ্ড শুনলে আমার কিন্তু তখন সত্যিই আগ্রহ জমেছিল।

এতদিন যন্ত্রের সঙ্গে ঘর করছি। সময়ের হদিশ নেওয়া কত অত্যাধুনিক মেশিন দেখেছি। প্রিস্টলি, ওসাকা, বার্মিংহাম কত দেশের কত মেশিনের সঙ্গে রাব্রিদিন ওতপ্রোতভাবে মোলামেশো করছি কিন্তু এহেন মানুষ টাইম-মেশিন জীবনে দেখিনি।

অবাক হয়ে বলেছিলাম — 'টাইম-মেশিন? মানে?'

'মানে খুব সোজা। অস্তহীন সময় নিয়েই আমাদের কারবার। সময়ের মাপজোক, মাঝে-মাঝে দূসর-পিছনে উড়ান দেওয়া — এসবই আমাদের কাজ। নিজের হাতে সময় না থাকলে এ কর্মের কাণ্ডারী হওয়া যায় না, হেঁ হেঁ রিটার্ডার্ড মানুষ তো, আমাদের হাতে এখন অঢেল সময়।'

'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু এমন যদি ধরে...'

'ওঃ মশাই — টাইম-মেশিন রিপিটেশন পছন্দ করেন না। বললাম না, আমরা রিটার্ডার্ড, আর যা কিছু রিটার্ডার্ড — সবই সময় সচেতন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, মর্নিং-ওয়াক, রাতে

খাওয়া-দাওয়ার পর মুক্ত বাতাসে পায়চারি করা থেকে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শীতের পনসিটিয়া, গরমের শিরিষ ফুল ফোটা, সবই আমরা সময়ের চুলচেরা হিসেবে মেনে লক্ষ্য করি। বলুন, এ-শিফটে ভোর-বেলা জাস্ট পাঁচটা দশে এই জায়গায় আপনি পার হন না? বি-শিফট থাকলে দুপুরে একটা পাঁচ, আর নাইট-শিফটে রাত নটা। এ হল ডায়নের হিসাব। ওহে সূর্য, এবারে তুমি আপ-এর টাইম টেলিভাল বলে দাও তো হে—'

আশ্চর্য, যন্ত্রের মত গাড়ু গড়ছে, ডাবলেশহীন মুখে বলে চললেন সূর্যকান্ত গুহ — 'সকালে সাতটা পনেরো, দুপুরে তিনটে পাঁচ, রাতে এগারোটা বিশ — অন্ধকার বলে সম্ভবত দশ মিনিট লেট —'

আমার তিন শিফটের যাতায়াতকালীন এই ব্রিজ পেরোনোর নির্ভুল সময়সূচী ওদের মুখে। অবাক দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বসেছিলাম — 'তা সেই ভোর পাঁচটা থেকে সোয়া-সাতটা অবধি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? আপনাদের ঘর-দোর নেই?'

'হ্যাঁ, তা আছে। ঘরদোর, দারা-পুত্র-পরিবার, ফুল কুমুমিত আমরা। কিন্তু ঘরে যাই কী করে। ছটা পাঁচে মোকামা প্যাসেঞ্জার পাস করারাম, এই তো পেরোয়া মিনিট আগে হিমগিরি এক্সপ্রেস, এবারে পটলিপুত্রের সময়, হেঁ; ওটা ফর্টি মিনিট লেটে চলছে —'

'তাহলে দেখছি আপনারা টাইম-কিপারও বটে। কারখানায় কিন্তু আমি অনেক টাইম কিপার দেখেছি।

চন্দ্র মজুমদার হাতে মাছি তাড়ানো ভঙ্গি করে বলেন — 'ওরা শুধু শ্রমিকদের 'ইন-আউট' নিয়েই থাকে, আমরা মহাজাগতিক প্রতিটি ইন্সিডেন্ট-এর সময় ধরে রাখি — হ্যাঁ, সেই হিসাবে আমরা টাইম-কিপারও, তবে কিনা কাটাগিরিতে দুস্তর ব্যবধান, পার্থিব এবং অপার্থিব, দুটোকেই ধরে রাখতে হয়।'

অত্যন্ত সাধারণ চেহারার দুটো মানুষের এহেন অ-সাধারণ কথাবার্তায় প্রথম দিনই দারুণ মজা পেয়েছিলাম। উঁচু ব্রিজের মুক্ত বাতাসে বড় করে শ্বাস নিয়ে মনে হচ্ছিল ফুসফুসের ভেতরটা আবার টকটক হয়ে যাচ্ছে। আমি ফের জিজ্ঞাসা করেছিলাম — 'আপনারা দুজন খুব বন্ধু, কী মজা, তাই না?'

সূর্যকান্ত, বেঁটো লোকটা হেসে জবাব দিয়েছিল 'বন্ধু কী মশাই, হরিহর-আত্মা। সারাজীবন চাকরি করলাম এক কারখানায়। একই ডিপার্টমেন্টে। আমরা ছিল ওয়াটকিং-এর ডব্ল মেশিন, ওর কেউ-এর মিলিং মেশিন। রিটার্ডারমেন্টও প্রায় একই সময়ে। অবসরের পর বাড়িও করেছে এক জায়গায়, পাশাপাশি। তবে কি জানেন, আমি বাঙ্গাল ও ঘাটা। চন্দ্র জীবনভর কংগ্রেস করে এসেছে, আমি আজীবন কমুনিষ্ট। ও মোহনবাগানের অন্ধ ভক্ত, আমি ইস্টবেঙ্গল-অস্ত্র প্রাণ। এই নিয়ে দুজনে কত গুগড়া, কত খাটখাটি, কত ভর্তুকি, কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে উঠে এ ওর মুখ না দেখলে চলেনা। এ বড় কঠিন বন্ধুত্ব।'

'তা আপনারা এত জায়গা থাকতে সকাল-বিকেল এই ব্রিজটাকেই বা বেছে নেন কেন?'

'ব্রিজ-টা কত উঁচু দেখেছেন। আর উঁচু মানেই তো সেখান থেকে পিছনের অনেকটা দেখা যায় — আমরা তো শুধু সামনের নয়, ফেলে আসা দিনেরও টাইম-মেশিন'

এরপর থেকেই ব্রিজের মাথায় চন্দ্র-সূর্যকে দেখলে হয়ত দু'একটা কথা হয়, কখনও বা



বাস্তবতার জন্য কথা হয়না বটে তবে হাত নেড়ে উইশ করে বেরিয়ে যাই। এ ভাবেই চলছে। ওদের দেখি আর ভাবি, ওদের মত সুখী আর কে আছে!

আজও দেখি ওরা দাঁড়িয়ে।

কন্ট্রোল-রুমে ভোররাত্রে টুপি-প্রণামের একটা মনোমত ব্যাখ্যা ওয়াভারের কাছ থেকে পাওয়ায় হীনমন্যতা কেটে গিয়েছিল, ফলে চন্দ্র-সূর্যকে দেখে স্কুটার থামালো। ওনারা যৌথস্বরে হেসে সম্ভাষণ জানালেন — ‘ওড মর্নিং স্যার —’

‘ওড মর্নিং টাইম-কিপার ..... আজও?’

‘টাইম-কিপারের ছুটি নেই হেঁ, কী বল হে সূর্য?’

‘যা বলেছ চন্দ্র পৃথিবীর যাবতীয় ঘড়ি বিকল হবে, ঝড়বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে আসবে আকাশ, সূর্যগ্রহণে দিনেই নেমে আসবে ঘোর-অন্ধকার, হয়ত .... হয়ত আরও কত কী হবে — কিন্তু আমাদের কাজ চলবেই —’

যেন দুই মহাকালরূপী বুড়ো আমার সামনে। এঁদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে চলেছে শীত-গ্রীষ্মসহ যাবতীয় ঋতু, দিনরাত্রি, রাত্রির যাওয়া-আসা, গ্রহচার্য নক্ষত্রের নির্ভুল অবস্থান। আগেও লক্ষ্য করেছি — মন যতই খারাপ থাক, এঁদের সঙ্গে কথা বলার পরেই ভিতরের গুমোট ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করে। বৃকের মধ্যে কেমন যেন একটা সতেজ বাতাস ঝাপট দিয়ে যায়।

ভোরের আলোয় রাসা চন্দ্র-সূর্য এগিয়ে এলেন। প্রায় একই স্বরে বললেন — ‘আমরা দুজন আপনাকে নিয়ে একটা বাজি ধরেছি’

‘বাজি!’

‘হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে’

‘এরা তো আজব মানুষ! এই বৃদ্ধ বয়সেও বাজি ধরার সখ! তাও আমাকে নিয়ে।’

‘কিসের বাজি?’

সূর্যকান্ত হেসে বললেন — ‘তেনম কিছু নয়। মানে আপনাকে এতদিন ধরে যেতে-আসতে দেখছি, কয়েকবার কথাও হয়েছে, কিন্তু আপনি কোথায় চাকরি করেন সেটাই জানা হয়নি। বাজির বিষয়বস্তু সেটাই। আমি বলেছি এঁ হলেন জীবনের মাথায় যখন কয়লার গুঁড়ো তখন আপনি নিশ্চয়ই কোলিগারিতে —’

চন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন — ‘নো ... নো সূর্য, দেখছ না ভব্রলোক সবসময় কেমন চার্জড, উগবগ করে ফুটছেন। এঁ কয়লাগুঁড়ো অবশ্যই থার্মাল-পাওয়ার স্টেশনের। উনি নিশ্চয়ই কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে —’

‘আপনারা দুজনেই হেরে গেলেন —’ আমি একধা বলা মাত্র ওঁরা আঁতকে উঠে একযোগে বললেন — ‘হেরে গেলাম!’

‘হ্যাঁ, টাইম-মেশিন মহোদয়গণ, আপনারা দুজনেই হেরে গেছেন, কারণ আমি স্টিল-প্ল্যাটে চাকরি করি। আয়াম এ্যান আয়রন-মেকার। লৌহ উৎপাদন করি — এফ.ই, যার চাকার মানব-সভ্যতার এ্যামবিলিকাল কর্তৃ বর্ধা —’

চন্দ্র মজুমদার ও সূর্যকান্ত গুহ অবাক চোখে কিছুক্ষণ দেখলেন, যেন সমুখের কোনও অজানা

গ্রহের জীব। তারপর সূর্যকান্ত কনুইয়ের আলতো চেলা মেরে চন্দ্র মজুমদারকে অশ্বফুটে বললেন ‘দ্যাখো হে চন্দ্র, দ্যাখো, প্রাণভরে দ্যাখো, জীবন সার্থক হল আজ — এতকাল মেশিনিস্ট দেখেছ, ফিটার-রিগার-ব্রটার-কার্পেন্টার কত কী দেখেছ, আয়রন-মেকার দেখেছ?’

‘আসলে আমরা কিছুই দেখিনি হে’ বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্র মজুমদার, তারপর ফের বললেন ‘বুঝলে সূর্য, কিস্যু নয়, ইস্ — আয়রন-মেকার মানে ভাবতে পারছ তুমি? এঁই যে মাইলের পর মাইল রেললাইন, এঁই ব্রিজ, এঁ যে সিগন্যাল, এমনকি তোমার-আমার দু কায়ার ওপর ছেঁটি বাড়ি .... কোথায় নেই ওনার হাত! এত সুবিস্তৃত শক্তিশালী হাত আধুনিক ইন্টারনেট ব্যবস্থাতেও নেই। না: হে, আমাদের জীবনে কিছুই হলনা। আপনি মশাই কী বিরাট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছেন ভাবাই যায়না। দেশ এগোনোর মহান ব্রত বহন করা কি চাট্টিখানি ব্যাপার। আচ্ছা মিঃ আয়রন-মেকার, আড়াই হাজার সাল নাগাদ আপনারা নিশ্চয়ই কাটোয়ার উটার বদলে স্টিলের উটা, ফুলকপির বদলে পিগ্-মোন্ডের ফুলকপি, মাচার উচ্ছের বদলে ব্ল্যাগের উচ্ছে বানিয়ে ফেলবেন। তাই না! ওহু, কী আনন্দ —’

আমার অবাকত্ব বাঁধ মানে না — ‘কী সব বলছেন আপনি?’

‘আমি সারসভা বলছি মশাই, সরি, আয়রন-মেকার, দেশে এখন মাটির বড় অভাব — তিরানকবই কোটির দেশে, মাটি শব্দটা ক্রমশ প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার হয়ে উঠছে — ওহু: ভাবতেই কী আনন্দ — আমাদের ছেলেমেয়েরা সত্যি ভাগ্যবান, কী হে সূর্য বড় আপশোষ হচ্ছে তাই না? আমাদের দাঁতগুলো বড় ভাড়াভাড়া পড়ে গেল। নইলে বেশ মজা হত কিন্তু। একদিন পেটভরে খেলে আর বছরভর ক্ষিধে পেত না। আচ্ছা মিঃ আয়রন-মেকার, আয়রন-ওরের ফুডভ্যালু কত?’

লোকদুটো কি পাগল নাকি। যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এর আগে একক্ষণ ধরে কখনো কথা বলিনি। ওদের প্রতিটি ব্যাপার, প্রতিটি কথাই, অন্যরকম।

চন্দ্র মজুমদার থামতেই সূর্যকান্ত ধরলেন — ‘আহা গো, বৃকের মধ্যে আমার খুশির বান ডাকছে হে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আড়াই হাজার সাল নাগাদ মুসুর ডালের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবুর বদলে হাই-কার্বনস্টিলের লেবু চটকাতে চটকাতে ছড়ে যাচ্ছে যাবৎ মানুষের হাতের তেলো — আহা হা .... তবু অক্ষয় এঁ খাতব লেবু, অসীম পরমায়ু, কৌটোয় রাখা একটা মাত্র লেবুতেই কেটে যাচ্ছে জীবনের পর জীবন — যত ভাবছি এসব তেলই পূলাকে আমার —’

এবারে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, ধমকে উঠি — ‘থামবেন আপনারা! আমি সারারাত্ত জাগে আঙনে পুড়ে বাড়ি ফিরছি আর আপনারা যতসব উষ্টোপাশ্টা কথা —’

অর্ডানাদের স্বরে বলে উঠলেন চন্দ্র মজুমদার — ‘উষ্টোপাশ্টা নয় মিঃ আয়রন-মেকার, উষ্টোপাশ্টা নয়। এটাই সত্যি। পৃথিবী এখন এঁ দিকেই ছুটছেন। দু’মাস জল ঢেলে আর ছাই গ্যামাকসিন পাউডার ছিটিয়ে চন্দ্রমুখী বেগুন ফলানো বৃদ্ধ কষ্টের। তার চেয়ে মাল ফর্মায় পড়বে আর হাজার-হাজার স্টেনলেসস্টিলের চকচকে বেগুন বেরিয়ে আসবে ..... আহা হা, বেগুন তখন আর হাই-সোসিটিতে রাত্তা আঁঠিমে থাকবে না —’

দারুণ বিরত হয়েছি, শুনুন — টাইম-মেশিন চড়ে আপনারা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন — দু হাজার বালি মশাই বা পেছনে, যা খুশি তাই ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি নই,



আমাকে বাস্তব মেনে চলতে হয়। আজ চলি — ওসব বাজে কথা শোনার অবসর নেই, বাই—'

ফুটার ব্রিজ পেরিয়ে ঢালে নামছে। কিছুটা এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি চন্দ্র-সূর্য, দুই আশ্চর্য মানুষ, টাইম মেশিন, একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে পশ্চিমের সমান্তরাল রেল-লাইনের দিকে। ওরা বলছিলেন, দুটো দিকই দেখতে পান, সামনে এবং পেছনে, কিন্তু কতটা? সত্যিই কি ওরা আড়ই হাজার সালের ছবিটা এখনই দেখতে পান? সত্যি? নাকি ওটা হৈয়ালি।

### আউটপুট ..... আউটপুট .....

ছেলেমেয়ের ইস্কুল ছুটি আজ। পড়াশুনা করছিল। বালতি ভরে জল নিয়ে চানে বসেছি। ভিতরের খোলা উঠানে। নাইট-শিফট শেষে ঘরে ফিরেই চান করা আমার অভ্যাস।

মাথায় সাবান ঘষছিলাম।

তানিয়া হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে প্রথম লক্ষ্য করল নালাবাহিত সাবানের ফেনা, রং যার কালো-কালচে।

'দ্যাখ্ দ্যাখ্, বাপির মাথায় কী কালি' — তানিয়া ভাইকে একথা বলামাত্র গৌরব, আমার ছেলে, চেঁচিয়ে তার মাকে বলল 'ইস্ বাপির মাথায় কী কালি দেখে যাও মা। তুমি কি মাথায় কালি মেখেছ বাপি?'

বাচ্চা ছেলে এমন প্রশ্ন করতেই পারে, তাদের সন্দেহ নিরসন করা উচিত। বললাম — 'কালি নয় কোক ডান্ট'

'কোক কি বাপি?'

'কয়লা পুড়িয়ে কোক হয়'

'দ্যাখ্ কয়লা পুড়লে তো ছাই হয়'

রেগে বললাম 'এখানে দাঁড়িয়ে পড়া হচ্ছে? ঘরে যাও —'

তখনই কালো রঙের শেষে লাল রঙের ফেনা বইতে গুরু করল। মেয়ে আবার পড়া থামিয়ে বলল 'দ্যাখ্ ভাই ফেনার রং এবার লাল'

'তাই তো! ও বাপি, মাথায় কি লাল রং মেখেছ? ছেলের প্রশ্ন।

'ওহ একটু যে শাস্তিতে চান করব তার উপায় নেই! ছেলের আদার এবারে জোরালো — 'বল না বাপি লাল কেন?'

'ম্যাগনেটাইট ডান্ট থেকে লাল'

'ম্যাগনেটাইট! সেটা কী! ম্যাগির মত? হি হি কী মজা!'

'তোমার মাথা, পড়তে যাও —' কড়া ধমক দিতেই ছেলে ভেতরে চলে গেল। জল ঢালছি মগের পর মগ। আঃ কী শাস্তি! শুনি চাপাঘরে দিকিবে বলছে ভাই 'দেখিস দিদি এবারে ঠিক সবুজ রং আসবে!'

ওরা বই বন্ধ করে তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করছে নালাবাহিত জলের রং —

আঃ শরীরাটা এতক্ষণে যুঁত লাগছে। ঠাণ্ডা জল যত ঢালি তত আরাম।

আয়নার সামনে দুল ঝাড়াচ্ছি, এত সাবান ঘষার পরেও মুন্দের কালচে ভাব দেখে ব্যথিত

হচ্ছি। নিত্যদিন ঐ আঙুনের সামনে কাজ করে মুখের রং পুড়ে গেছে। কস্টিক সোপাও ধুলেও আর ফিরবেনা। তখনই গলার নিচের অংশ, যা জামায় সর্বদা ঢাকা থাকে, নজরে পড়ল। ফর্সা বুক, পেট। বুকের মধ্যে হায় হায় করে উঠল। মনে হল, মাথা আর এই দুটো হাত বৃষি কোনো আদিবাসী মূর্খ-র শরীর থেকে ধার করে বসানো।

অর্ধেক চুল পেকে গেছে। চোখের নাবালে ক্রমাগত রাত্রি জাগরণের চিরস্থায়ী চিহ্ন। চোখের ভিমনে সাদাটে অংশ ঈষৎ মোলাটে। কর্ণক হাতের আঙ্গুল। ল্যাপিং পাইপ বহন করতে করতে মশগতা উধাও। শিরাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে প্রকট। আবার কনইয়ের ওপারের যাবতীয় পেলবতা।

একই দেহে এমত দুই ভিন্ন-ধর্মী ছবি আমাকে আয়নার সামনে বহুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে। বউ ভাবে, আমি বুধি সাজতে ভালবাসি। ওকে কি করে বোঝাই — সাজ নয়, সাজ নয়, আমি হারিয়ে যাওয়া অতীত খুঁজি — যা আয়নার সামনে দাঁড়ালে একটু একটু করে ফুটে ওঠে। আমি সো পোড়ার ক্রিম সেন্ট লাগাই না, শুধু ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত এক বুড়ে দুই রঙের ফুল দেখি।

হাঁ করলাম। নীতের কোনাম কোনাম নিকেটিন। জিভ মেললাম। লালের ওপর সাদাটে আন্তর, তায় দানাদারের মিহি বুটি। মনে পড়ল, এই জিভ দেখেই সেই ব্যাটা ডাক্তার চমকে বলেছিল 'ওরে বাবা, আঙুনের শিখা —'

মনে মনে বললাম — 'এই দেখেই চমকাচ্ছেন ডাক্তারবাবু? তিরিশ বছর চাকরি করার পর তাহলে কী দেখবেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বিস্ময়রূপ দর্শন।'

হবেও বা। আজকের বিস্ময় রূপ তো এফ.ই-র সুতোয় ঝাঁপ। মায়াময় এই জগৎ সংসার 'ফেরাস' ময়। 'নন-ফেরাস'-এর মার্কেট ভালু বেশি, এ্যালুমিনিয়াম-নিকেল-দস্তা-সিলভার-গোল্ড এসবের মূল্য সোই অর্থে বেশি, যে অর্থে শক্তপোক্ত লোহার খাঁচার ওপর রং রং করে গোজাইক-টাইলস-বোর্ডিং-এশিয়াম পেণ্টস্-কার্পেট সব মিলে ট্যাম্ একদান মডার্ন আর্কিটেক্সচার সম্বলিত বাড়ি দামি হয়। কিন্তু তার ঠিকার? হেঁ: হেঁ:, সেখানে ফেরাস-এর জয়জয়কার। বিম-এসেল-জয়েস্ট আর ভিত্ত-এর রড সবই ফেরাস-এর আয়ত্তা — আসল মূল্যের মূলমন্ত্রটুকুই তো সেখানে।

মায়াময় এই জগৎখানিমে বেঁচে রেখেছে ফার্নেসের গলিত লৌহেরই বিভিন্ন রূপ। এল.ডি প্রসেস-এর অক্সিডাইজড আয়রন, 'ওপন-হার্ভ' ফার্নেসের পরিণত 'ইনগট' ই তার মূলধার। বার এন্ড রড মিলের সূত্রসম গলিত লৌহ তার ইড়া ও পিশলা। লোহা বিনে গতি নাই — জমি? চষবে কিসে? খানের ডগ, কাটবে কিসে? সীমান্তে দাঁড়িয়ে গরম গরম বুলি কপুচাবে, তার পেছনে কে? শরীরকে পুষ্ট দেবে, সেও লোহা। একটি নিষ্পাপ গোলাপের জন্ম দেবে, 'গ্যালিভার্ড' বা 'ট্রাই সেটিনারি' — মাটি খুঁড়বে কিসে? জল দেবে যে ঝাঝরিতে তা কিসে তৈরী?

কিছুই ভালো না লাগলে কোপনি পরে হিমালয়ের গুহায় ধ্যানে বসবে? হোঃ, সেখানেও লোহা। হিমালয় পর্বতমালায় নিচে যে পরিমাণ আকরিক লৌহ আছে তা ভারবীরও অতীত। সূতরাং হে জীবন, হে মাহাজীবন, হে ক্রিষ্টজীবন — সবই লৌহ। লৌহময়, জামসেদজী টাটা



থেকে আমহাস্ট্রিটের 'ফাটা', জ্যোতি বাসুজী থেকে লাল্লু ইয়াদবজী, টাইট নাই শেষন থেকে আমাদের বানতলার বাস্তাধারী দুশাসন, আভা-সেলে ডাভা খাওয়া সম্ভব তবু থেকে রশিদের বোমা বিস্ফোরণ, তখন মিছে কেন জীবনের এত ক্রান্তিসিকেশন?

সহজ সরল সত্য যা — সবজীবনই লৌহ জীবন। শুধু মানুষ তার অন্তর্নিহিত মূলমন্ত্র, ফেহাস-এর ওপর নন-ফেহাসের চকমকি লাগায়।

‘ও: তোমার আর চুল আঁচড়ানো শেষ হয়না দেখছি’ পিছনে বনানীর স্বর বেজে উঠতেই আমি লৌহ জীবনের ময়ূরগত হতে ছিটকে পড়লাম।

শ্রোষের ফেলডনে ওর স্বর তির্যক শোনাল। — ‘তবু যদি চুলগুলো কাঁচা থাকত।’

যক্ষণায় কুঁড়ে উঠলাম। পেটের গলগালে চুল পাকে, বংশগত কারণে চুল পাকে, সে সবার তবু সাহুনা আছে। কিন্তু লৌহজীবনের একনিষ্ঠ কারিগর হয়ে চুল পেকে গেছে তার সাহুনা দেবে আমার বউ ও বুঝবে আর কী! এতো আর সোজা-উষ্টো উষ্টো-সোজার উলকাটার বুননি নয়, বড় কঠিন কর্ম। মাটি র তলার আকরিক তুলে এনে তাকে গলিয়ে নির্ধাস্টুক বার করে নেওয়া। ওকে কিছু বলা যুথ।

‘লুচি দিচ্ছি, খাবে এসো’

‘আসছি’ বলেই নিজের হাতের তালুদুটো চোখের সামনে তুলে ধরলাম। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাশ্রমে ঈষদীয় মাউন্ট, খালের ঝাঁড়ি ভাগ্যরেখা, গভীর।

চাকরি পাবার আগে একবার এক খ্যাত আফ্রোলজারের কাছে গিয়েছিলাম। উনি হাত দেখেই বলেছিলেন — ‘এ যে দেখি যশের পাহাড়, কী হাত মশাই। মানুষের নয়, ভগবানের হাত। ঠেকালেই সোনা। কাউকে দেখাবেন না, চাউনিতে ইয়েজু করে দেবে।’

শালা ভুল! ঠেকালেই সোনা — হুঁ; এ হাত যেখানে ঠেকে সেখানে শুধু বাংকার ভর্তি কোক আয়রন-ওর ম্যাননিজ ডলোমাইট। না, আর কখনও হাত দেখানি কাউকে, শুধু নিজে দেখি — ভোররাত্রে উটের পিঠের মত বৃধ-বৃহস্পতির মাউন্টে হাত বুলিয়ে বলি ‘দেই দেবী গলিতং লৌহম্ দেহি, চোপরা সাহেবের কুপা দেই —’

এ হাত একজন আশুন ছোঁচা রাতজাগা হাইলি পেইড সারভেটের হাত। এখানে নিজস্বতার কোনো রং নেই। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে সব বাঁধা, গীয়ারের দাঁতে পা দিয়ে যে রাষ্ট্রসভাতা গ্যালপ করে, ব্রুমিং-মিলস-এর অত্যাঙ্কল নীলগায়ে যে রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখে ‘রে খ্যান’, যে রাষ্ট্রের চারপ্রদান যুবকদের শিরদাঁড়ায় ম্যাননিজ সিলের ফ্রেম, রাষ্ট্রদিনি আমি তারই উপপাদনে ব্যস্ত।

নিজস্বতার রং যেখানে বিমুদ্রা নেই, সেখানে কি আমি স্নেহ ও আমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাকেই দিতে হয় — ‘নো’ প্রতিবাদ জানাই।

‘তুমি কি ইদানীং রাজনীতি করছ? স্নেহ-স্নেহ আবার, ওসব তো এম.সি.সি, পিপলস ওয়ার, এরা বলে। মনে রেখো “স্নেহ” শব্দটা একটা মানসিক বিকার। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে এক হিসাবে সকলেই স্নেহ। বিশেষ-ভ্রমণ শেষে মান্দারতে এয়ার পোর্টে পি.এম-এর স্নেন ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে হোম-মিনিস্টারকে তার বক্ষল্যা ঠিক করে সারিয়ে পড়িমিছু ছুটতে হয় স্নেহ-কাপোর্ট রিসেপশান জানাতে। অনারেরবল মিনিস্টারের কোনো ‘রে খ্যান’ মিসেসকে স্নেন ধরতে মান্দারাত অবধি জেগে থাকতে হয় আই.এ.এস-আমলাকে। স্টিল-মিনিস্টারের জরুরী চিঠি পেয়ে তড়িৎদ্রি দিচ্ছি পৌছে কারখানার এম.ডি-কে ঘটনার পর ঘটনা অপেক্ষা করতে হয়

ওয়েটিং রুমে আর নাকের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে চেঁষারে চুকে যায় যাকে চিনি কেলিংকারির নায়ক, শেয়ার কেলিংকারির প্রধিম এ্যাক্টিভ বা মাঝ-আকাশে বিমান সেবিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ করা পানোমস্ত জনপ্রতিনিধি — তাহলে, সেই হিসেবে স্নেহ কে নয়।’

সবাই স্নেহ আর সবাই স্নেহ-মেকার। কারখানায় চার্জমানের কাছে বকুনি খাওয়া সীতরা বাবু বাড়ি এসে যাচ্ছেতাই বলেন তার বউকে, তিনি আবার সেই বালা মোটোতে উষ্টোপাস্টা যা-ত বলেন কাজের লোক নষ্টের মা-কে, আর সবশেষে নষ্টের মা তার অকাজের স্বামীকে, তুলোদোনা করে প্রাকৃত ভাষায় — ‘তুমি বিশ্ব খাতি পারনা।’ একজন স্নেহ পরমুহুইই আবার স্নেহ-মেকার হয়ে যায়। গোটা ভারতবর্ষটিই এই নিয়মে বাঁধা।

‘ধূত, ভারতবর্ষের কথা ভাবতে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু হবে। আমি বরং আমার পরিবারের কথা ভাবি। ছেলে মেয়ে বউ ঘাম কাঁখা ভালবাসার কথা ভাবি। ছেলের “মাসিপিঙ্গি” হলে মেথির জল খাওয়ানো হল কিনা ভাবি। ভাবি কাটোয়াবাণী মায়ের চোখের ছানি কেনা ফ্রী-ক্যাম্পে অপারেশন করানো যায়। তিনবার প্র্যান করেও ব্যতিক হওয়া শিমুলতলা টারের কথা ভাবি। ভাবি এ-শিফটের ভোররাত্রে ঘড়ির এলার্ম ঠিক সময়ে বাজবে কিনা। কেনে আমাকে মধ্যরাতে আরও একটা ঘুমাম শরীরকে জাগিয়ে পঁচা-গলা-বিকৃত হাসিতে বুকিয়ে দিতে হয় “ওগো আমি এখনও সক্ষম” — আমি এইসবই ভাবতে চাই। এর কোনটার বাইরে এই দেশ? ভারতবর্ষ?’

আয়নাযি বিবিত্ত আমারই প্রতিচ্ছবি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ‘চরম স্বার্থবাদী মেটালিটি। গণপঞ্জের ইজিচেটরে ডিফেক্টিভ নাট এন্ড বোষ্ট। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের একটা ড্রাগ-এফেক্ট আছে, একবার ধরলে আর নিস্তার নেই। বরং নৈব্যক্তিক হও। আকাশ ও সমুদ্র দেখ। ঢেউয়ের সাউন্ড এফেক্টের মধ্যে নিজেকে লীন করে হৃদয়ে মার্মার তোলো —’

আমি হেসে ফেললাম — ‘বা; তা আজ হঠাৎ তুমি দার্শনিকের মত কথা বলছ যে —’  
‘তো আমায় ন্যাত্য করার ভঙ্গিতে জবাব দিল’ ধূস, বোগাসু। ফিলজফির কর্মশিয়াল মার্কেট কোথায়! এই আয়রন এজ-এ ফিলজফারের ন্যাকা-ন্যাকা বুলি পৌছোতে কে? দেশ চকছে লৌহমায়ার, ‘ইনগট’-এর ডিক্টি-স্ট্যান্ড যার যত মজবুত, তার তত অগ্রগতি, ভুলে যেওনা তুমি একজন আয়রন-মেকার —’

যেযের শব্দটিই আমাকে ফের চাগিয়ে তুলল। রক্তে মোচড় মারে এই আয়রন-মেকার শব্দটা। মুহূর্তে নিজের সংশয় দ্বিধা সব কেটে গেল, আর সেইসঙ্গে আমার মুখ চোখে দৃঢ় ও আগ্রাসী একটা চাহনি যা ফার্নেসে ঢালাই চলাকালীন ফুটে ওঠে তা ছেয়ে গেল — আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠল আঠারোটা টুইয়ার — এ বাঁধা বিশাল সেই যন্ত্রদানব, পেটের মধ্যে যার রাষ্ট্রদিনি জলন্ত আগুন আর গলন্ত লৌহের সিন্ধনি, যে আমাকে দাঘ ও সহের মতো যোগে শিক্ষা দিয়ে আজ এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমি হাততালি দিয়ে আয়নাকে বলি — ‘ব্রাতো: — এই তো উজ্জীবনের মন্ত্র, আমার আর কোনো ক্রান্তি নেই, কোনো পিছুটান নেই —’

লুচির থালা নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বনানী আর্ডনাসের স্বরে বলে উঠল — ‘এ্যা, কার সঙ্গে কথা কইছ তুমি? এসব কী বলছ?’



‘নিজের সঙ্গে’

‘ও মা গো, একী অলক্ষণে কথা — নিজের সঙ্গে কেউ কথা বলে?’

‘বলে — আলবাহ বলে। সবাই বলে। প্রত্যেকের মধ্যেই দুটো সত্তা থাকে —’

ভীত চাহনিতে আমাকে আপাদমস্তক দেখে সে কশ্ণিত স্বরে ‘তোমার কোনো পিছুটান নেই বলতে পারলে’ বলেই যুঁপিয়ে ওঠামাত্র আমার আবার পঞ্চাশ টাকা গছা-র ভয় জেঁকে বসল। আজ না জানি আবার আমাকে ডাক্তারের কাছে ধরে নিয়ে যায়।

সূত্রাং সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দে হেসে আয়নার দিকে পিঠ রেখে, এক হাতে বনানীর থুতনি নেড়ে বললাম — ‘আহা, লুচি আর বেগুন-কালিয়া! আনন্দে মরিয়া যাই। দাঁও, পেট চোঁ চোঁ করছে —’

তাতেও ওর মুখের কালো মেঘ কাটেনা দেখে ফের বলি — ‘থুত পিছুটান বলতে কী বোঝ তুমি? ছেলে মেয়ে বউ কি পিছনে থাকার জিনিস। ওরা থাকে সামনে, চোখের সামনে, মাথার উপরে। আমি আঙুন-আলো’র কারবারি, মেষ্টেন আয়নের রাইটনেসের কান্সল, পিছুটান বলতে আমি অঙ্কার বুঝি, পিচ ডাক; নৈশক আর নিথর।’

এতক্ষণে ওর মুখে চিলতে হাসি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভেতরের ঘরে শুয়ে পড়েছি। কী একটা বাংলা সিনেমা দেখাবে টি.ভি-তে, বউ মেয়ে দেখবে বলে বসে আছে। আজ এ সপ্তাহের শেষ নাইট-শিফট। কাল অফ।

সবে চোখ লেগে এসেছে, লো-ভল্যুমে টি.ভি চলছিল, হঠাৎ ঘরের সামনে বিক্ষার প্যাক-প্যাক। পরমুহূর্তেই বনানীর সোপান কণ্ঠস্বর বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে এল — ‘কুমু... উ... কুমু... ই... ই... এতদিনে তাদের মনে পড়ল আমাদের কথা!’

সেইসঙ্গে ছেলে-মেয়ের আনন্দ কলকল ‘মাসি মাসি’ চীৎকারের মাঝে অঙ্কার চোখ মেলে আমি আমার ভাগ্যকে দুয়ো দিছি — ‘যা: বাজল ঘূমের বারোটা!’

কুমুদিনী আমার শ্যালিকা। সুন্দরী। পরন্তু চাকরি করে সে। হাসপাতালের স্টাফ নার্স। খোলা-মনের মেয়ে, অনুভূতি প্রবণ, ইথার স্যান্ডল ছুরি কাঁচি গজ ব্যান্ডেজের সঙ্গে রাব্রিদিন নেকট বজায় রেখেও তার রসিকতা বোধটুকু মরে যায়নি — চিঠিতে আমায় জামাইবাবু না লিখে ‘লৌহ-মানব’ লিখে সোধান করে, উত্তরে আমিও কুমু না লিখে ‘সেবিকা-সুন্দরী’ লিখি।

একসময় আমি ওকে নিজের লেখা কত কবিতা শুনিয়েছি, কোনটা সে তারিফ করেছে, কোনটা খারিজ। তখনও অবশ্য আমি নিজেকে আয়রন-মেকার বলে ভাবতে শিখিনি, স্টিল-প্লাস্টে সদ্য-জন্মের করা চাকুরে মাত্র। পরের দিকে মিঃ ইয়াং-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, দারিদ্র্যবোধ, প্রশ্রয়নের নেশা এবং যন্ত্র-ভাষার শিক্ষালাভ সমাপ্ত হওয়ার পর দূরত্বটা বেড়ে গেছে।

বিয়ে হয়েছে কুমু-র খুব ভাল ছেলের সঙ্গে। ব্যাক্সের অফিসার। টিকালো নাক, লম্বা, ফর্সা, সুকৃষ্ম অর্ধপ্রভ ওর স্বামী।

সেই কুমু বিয়ের চারবছর পর স্বামীর দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে — আমার কি শুয়ে থাকা ঠিক? না, ঠিক নয়, একেবারেই বেঠিক। আজ রাতে প্র্যাটে গিয়ে যে কী অবস্থা

হবে তা জানা সত্ত্বেও —

ওদের আনন্দমুখের কলহাস্য ভেসে আসছিল। আমি উঠে বসেছি বিছানায়। দারুণ ঘুমে চোখ টানলে ভেতরের দিকে। তবু উপায় নেই। ভেতরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই অর্ক জড়িয়ে ধরল। কুমুদিনী উচ্ছল স্বরে বলল ‘ওমা, দুপুরে ঘুম? ছি: ঘুমের রোগ আপনার আজও গেলনা —’

ভেতরটা ভেতো হয়ে গেলেও মিঠে হেসে বলি ‘তা চিঠি দিলেনা কেন? স্টেশনে রিসিভ করতে যেতাম।’

‘স্টাট দেব বলে’

‘বা: খুব ভাল, দারুণ আনন্দে কাটবে ক’টা দিন —’ কথাগুলো আমার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলছিল। সংসারের এটাই ধর্ম। যেমন আগুনে পুড়ে রাতজাগা আমার মাথা ঝিমঝিম করলেও নকল হো হো শব্দে হাসব বলে সুযোগ খুঁজছি, পাচ্ছি না।

‘আপনি কিন্তু এই ক’ বছরে বেশ রোগা হয়ে গেছেন —’ অর্কের কথা শেষ হওয়া মাত্র সুযোগ পেয়ে গেলাম, হো হো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললাম, ‘রোগা নয় অর্ক, দুধ মরে ক্ষীর — হা: হা: তা বল তোমাদের খবর-টবর, সত্যি, আজ বড় আনন্দের দিন।’ বনানীর দিকে চেয়ে দেখি ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। আসলে, আমার যা পরিশ্রমের কাজ তাতে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক রাখিনি। বিশেষত নাইট-শিফটে বাড়িতে লোক এলে মেজাজ বিগড়ে যায়। বনানী তা জানে। সূত্রাং কুমুর আগমনে ঘুম ভেঙ্গে উঠে এমন দরজা গলার হাসি ওকে দারুণ বিম্বিত এবং খুশি করেছে বুঝতে পারছি।

‘জামাইবাবুর হাসিটা কিন্তু আগের মতই আছে তাই না রে দিদি!’

একই থমকে গেলাম। বুদ্ধিমতী কুমুর কথাটা ধরতে চেষ্টা করছি। অসুস্থকে সুস্থ করে তোলা যার কাজ তার কথার পিঠে অন্য মানে থাকা স্বাভাবিক। কুমুদিনী স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। আমি আরও জোরে হেসে উঠে জবাব দিলাম — ‘হা: হা: মানুষের জীবনে হাসির চেয়ে বড় অ্যাপিটিজার আর কী আছে বল। প্রাণ খুলে হাসতে পারা কি সহজ কথা!’

এই অবেলায় ওরা ভাত খাবেন। সূত্রাং দুপুর-বেলাে বাজার গেলাম। চোখ কটকট করছিল। উপায় নেই। মানুষ কি মানুষের বাড়ি আসবে না?

ভাল ভাল মিস্ট্রি নিয়ে বাজার থেকে ফিরলাম। তিনটে বাজে। বনানী ডিমের অমলেট ভেজেছে। চা। টিভি-তে সিনেমা। মাঝে-মাঝে হাসি। টুকরো কথা। ধূমপান। অর্কের নতুন মার্কিত কেনার গল্প। গত পূজায় পেরিয়াম, কোদাইকানাল এমশের অভিজ্ঞতা। না, ঘূমের সামান্য সুযোগ নেই। ওদের সম্মিলিত হাসিতে যোগ দিয়ে আমি কী খুশি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছি। উপায় নেই। কুমু এসেছে — সেই কুমু, যাকে ও.টি-তে সিন্জার কী করে হয় জানতে চাওয়ায়, শায়িত মহিলার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে রেস্টের তলা থেকে এ্যাবডোমেন ডায়াগনাইস পেরিয়ে মিড-খাই অবধি নিখুঁত শেভ করার বর্ণনা দিয়ে তারপর চাপাধরে বলত — ‘খুব মজা লাগছে, তাই না?’ হাসি গড়ে বিকেলের রোদ পড়ে আসে। গোপনে হাই তুলি। অঙ্গলের চোঁয়া টেকুর সামলে অর্কের দু’বছরের মেয়ে, যাকে নিজের মায়ের কাছে রেখে বেড়াতে এসেছে তার খবর নিই। শুধু কি খবর নেওয়া! এর মধ্যে অকৃত্রিম স্বরে বলে ফেলেছি ‘ইস বাচ্চাটাকে নিয়ে এলে কী মজাটাই না হত, আমার গৌরব-তানিয়া খেলার দোঙ্গার পেত —’

গুধু লোহা গলানোর প্যাচ-পয়জার নয়, অভিনয়ও ভালই জানি।

স্কুটার বার করে ঝাড় পৌছ করছিলাম। বারাদার চেয়ারে কুমু ও অর্ক। গৌরব-তানিয়া মাঠে খেলছিল।

হঠাৎ কুমু বলে উঠল ‘এবার এটাকে বিদেয় করুন, অনেকদিন তো হল, নতুন একটা ভেস্‌পা-সিলেন্ট কিনুন, কী সুন্দর মডেল —’

চমকে উঠেই আমার ওয়াভারের হ্যান্ডেল হাত চেপে বললাম, ‘না,না, তুমি জাননা কুমু, এটা আমার খুব পয়মন্ত, এত বছর চালাচ্ছি কোনো গোলমাল নেই, বি-শিফট রাত দশটার পর জি টি রোডে যা ছোটো —’

অর্ক বলল ‘নিশ্চয়ই গুরুগুরু করে তেল খায়?’

‘হ্যাঁ, তেল একটু বেশিই খায়, তিরিশের বেশি আজকাল দেয় না’

‘তিরিশ! মাই গড, তাহলে তো রোজ দু’লিটার পেটল লাগে!’

‘হ্যাঁ তা লাগে। উপায় নেই, এটাই আমার বড় খরচ।’

কুমুদিনী আধুরে গলায় তখনই অর্ককে জিজ্ঞাসা করল — ‘আমাদের মারুতি লিটারে কত কিমি যায় গো?’

‘এই কুড়ি তো হবেই —’

‘তাহলে তো মারুতি চড়াই ভাল। একটা কিনুন না জামাইবাবু —’

সারারাত জাগার পর গোট্টা দিন নির্যুম আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঘাড়ের শিরা দপদপ করছিল। অনেকগুলো জবাব ঠোঁটের ডগে উঠে এলেও কীভাবে যে সামাল দিলাম সে আমিই জানি। হঠাৎ আচমকা উঠে এসে আমার ওয়াভারের ধোয়ামোছা চক্চকে হেড-লাইটে সশসে কটা চুমু খেলাম, সম্ভবত এটাই আমার যথোপযুক্ত উত্তর ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুমু প্রায় আঁকড়ে ওঠার ভঙ্গিতে বলে উঠল — ‘ম্যাগো — এত পথ পেরিয়ে আসা ধুলোবালি লাগা ঐ স্কুটারটাকে চুমু খেলেন? জানেন ওর শরীরে কত জার্ম লেগে আছে!’

‘জানি কুমু, জানি। মানুষের চেয়ে কম।’

সম্ভবত ওরা একটু মন:স্ক্রম হল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে অর্ক বলল, ‘কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না —’

হেসে, প্রসঙ্গটাকে হালকা করতে চেয়ে বলি — ‘খুব সহজ। স্টিলের বডি। জার্ম পেনিটেট করতে পারে না। আর তাছাড়া ভাইরাস বলে ব্যাকটেরিয়া বোলা, সবেরই খাদ্য চাই নইলে বংশ বিস্তার করবে কী করে! স্টিল শিট-এ কী সেলস আছে? টিস্যু, ব্লাড, বোন-ম্যারো?’

কুমুর মুখে এতক্ষণে খিলখিল হাসি, তার দেখাদেখি অর্কও। মোছামুছির পাল্লা শেষে হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখি কুমুর পাশের চেয়ারটা খালি। ম্লান আলোয় পাখিদের ঘরে ফেরার কাকলি।

পড়ন্ত আলোর রেশ কুমুর গালের একপাশে। বাচ্চা হওয়ার পর দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে সে।

‘অর্ক কোথায় গেল?’

‘হাঁটাচাটি করতে — বসুন’ হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে সে নরম স্বরে বলল, ‘আপনার

শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে এই ক’বছরে। মুখচোখে কালো ছোপ। ডাইজেশনের গোলমালে ভুগছেন নাকি?’

হালকা চালে বলি ‘না...না পটে আমার সবসময় আঙুন কলকল করে, লোহা পাথর সব হজম করে দেয় —’

‘ওমা, চুলও দেখছি অনেক পেকে গেছে — ছিঃ, পাকা চুলের লোক আমার একটুও ভাল লাগে না —’ কুমুর মুখচোখে ভাল না-লাগার ভঙ্গি।

‘কী আর করি বলো — চাকরিটা এমনি, অত্যধিক হিটে চুল পেকে যায়।’

‘হুঁ, আর যেন কেউ স্টিল-প্ল্যাটে কাজ করে না। এই তো অর্কর বন্ধু সেলস্-এর ম্যানেজার। ক্যালকাটা অফিসে পোস্টিং। কী হ্যান্ডসাম এখনও, পর্যভ্রমিণেও একটা চুল পাকেনি।’

‘আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি ‘হতে পারে। কিন্তু স্টিল-প্ল্যাটের সেলস্-এ কাজ করা আর ডাইরেস্ট প্রোডাকশানে কাজ করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক কুমু — ও তুমি বুঝবে না —’

সন্ধ্যার মসলিন প্রচ্ছদ আমাদের ওপর। একসময় হঠাৎ কুমুদিনী গভীর স্বরে বলল ‘আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন জামাইবাবু’

‘কেমন?’

‘এই যেমন — কথাবার্তা লোহাটে-লোহাটে, মুখচোখ পোড়াটে, সবসময়.....’

‘বলো, আরও বলো কুমু, ভাল লাগছে —’

কুমুদিনী হাতে চিমটি কেটে ‘সবসময় কেমন যেন’ বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি শূন্যস্থান পূরণ করার মতই বলে উঠলাম — ‘ভাড়াটে - ভাড়াটো ভাব, তাই না?’

‘এ্যাগজ্যাস্টিল! কী করে আমার মনের কথাটা বুঝলেন?’

‘হা: হা:..... আমি খুঁ-বিভার নই, বাট এ্যানু আরয়ন-মেকার। লোহার মনের কথা পড়তে পারি মানুষ তো সামান্য। লোহাটে, পোড়াটে তারপর তো ভাড়াটে-ই এ্যাপ্রিপ্রিয়ে, তাই না?’ হাসি খামিয়ে অর্ক চুপ করে থেকে তারপর উদাস স্বরে ফের বললাম ‘হ্যাঁ কুমু, ঠিক বলেছ, আমি ভাড়াটে সৈনিক — যে প্রত্যেকদিনের যুদ্ধের জন্য মাইনে পায়। কিন্তু মজাটা কী জান, দীর্ঘদিন ঐ একই যুদ্ধ করতে করতে আমার প্রতিপক্ষকে বড় ভালবেসে ফেলেছি। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার বদলে দারুণ একটা সহানুভূতি জন্মে গেছে যন্ত্রের ওপর — বিশ্বাস করো, ওরাই আজকাল আমাকে বেশ আনন্দ দেয়।’

‘একী বলছেন আপনি?’ চাকরি করে আনন্দ! মেশিনস্ কে সিমপ্যাথি। না বাবা, ও জিনিস আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার তো আর একটা দিনও চাকরি করতে ভাল লাগে না। ভাবছি, খুব তাড়াতাড়ি বেঙ্কামুলক অবসর নিয়ে বসে যাব। দিন দিন কর্মক্ষেত্রের যা এ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে! তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে কুমু বলল, ‘জামাইবাবু, এখন আর কবিতা লেখেন না?’

চমকে উঠলাম — ‘কবিতা?’

‘ইস্ — কী চঃ। আগে কবিতা লিখে আমাকে কত শোনাতেন, ভুলে গেছেন। সেই যে একবার অজয় নদীর ধারে বালির ওপর বসে —’

কুমুর মুখে কবিতার কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল, অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে বললাম ‘না,



আর লিখিনা —'

সে ভক্তি করল আপশোষের। 'ইস' কবিতা আমার খুব ভাল লাগে — অবশ্য আপনার ঐ ফার্নেস নিয়ে 'আঠারোটা টুইয়ারের জ্বলন্ত বিষ নিশ্বাস বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি—' ধর্মের কবিতাগুলো কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগত না। খালি আগুন-কালি আর কয়লা, কবিতার সেই পেলব ব্যাপারটাই নেই —'

'কিন্তু তবু ঐ লাইনটা এতদিনেও ভুলে যাওনি —'

কুমু হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, শুধু মশাই, মানুষ খুব ভালটাকে যেমনি মনে রাখে তেমনি খুব খারাপটাকেও। কত ভাল কবিতা লিখছে আজকের দিনের তরুণ ছেলেরা তা জানেন। আমি তো সময় পেলেই পড়ি —'

আমি অন্ধকারে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকি। হয়ত কুমুই ঠিক। আমি তো আর কোনো কিছুই খবর রাখিনা। যন্ত্রের কাছে মনপ্রাণ সব সঁপে দিয়ে বসে আছি।

একটু বাদেই ফিরে এল অর্ক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা বেগুনি নিয়ে হাজির বনানী। গরম বেগুনি কামড়ে অর্ক বলল 'কী কুমু, কাল তাহলে সবাই মিলে মাইথন বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ অবশ্যই। দিদি তো রাজি, আর জামাইবাবুরও কাল অফ।

আমি আঁতকে উঠলাম। 'না.....না, প্রিজ, আমাকে তোমারা ছেড়ে দাও। বরং বনানী আর বাচ্চাট্টো নিয়ে ঘুরে এসো, খুব ভাল কাটবে দিনটা।'

কুমুদিনী ছদ্মকোপে ঝাঁকিয়ে উঠল — 'খামুন তো, রেস্ট-ডে তে আপনার কী এমন রাজকাজ শুনি!'

'মাছে, অনেক কাজ আছে'

ফের ধমক। 'জানি, খুব জানি — বন্ধুদের সঙ্গে তাস, নইলে আড্ডা, এই তো?'

'না কুমু, বিশ্বাস করো কাল সারাদিন আমি ঘুমোব —' কথাটা অনেকটা আমার আর্ডনানের মত শোনাল, আর ওরা সমঝরে হো হো করে হাসতে লাগল। হাসি আর থামেই না। আমি অবাক। 'এত হাসির কী হল!'

কুমুদিনী চায়ের কাপ সাবধানে নামিয়ে রেখে হাসতে-হাসতে বলল, 'ঘুম আবার ইম্পট্যান্ট কাজ করে থেকে হল। ঘুম মানেই সময় নষ্ট। জানেন, চল্লিশ বছরের একটা মানুষ শুধু ঘুমিয়ে ক'বছর কাটায়!'

আমি তখন হাঁহি তুলছি। চোখ জ্বালা করছে। আরও একটা রাত। আরও আটটা ঘন্টা। আঠারোটা টুইয়ারের বন্ধনে ঐ অনর্গল ফৌশানিরত যন্ত্রদানবের কাছে জালা-পোড়া যন্ত্রণা-ভয়-ভালবাসা সব কিছুর শেষে আবার প্রতীক্ষা — আউটপট.....আউটপট.....

### দৃষ্টি মৃত্যুর মাঝে

বহুদিন পর আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল ফার্নেসে। আমারই শিফটে। দুর্লভ প্রতিহার, আমার কেবিন খালিশী, যার কাজ শিফটে চারবার চা বানিয়ে ফোরম্যানদের খাওয়ানো আর ঢালাইয়ের স্যাম্পেল তীতে করে ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে দিয়ে আসা — সেই ছেলেরা, কোয়ারা, আজ মারা গেল। বা বলা ভাল, সামান্য একটা ভুলের জন্য ওর মৃত্যু হল। কারণ ফার্নেস

কোনো ভুল-কে ক্ষমা করেন।

এই যে বিশাল যন্ত্রদানব, ব্রাস্ট-ফার্নেস, তার বুক নিয়ত যে তীব্র আগুন-বাতাস ঢুকছে তা উৎপন্ন হয় কোথা থেকে?

টার্বে প্রায়ার হাউস বাতাস উৎপন্ন করে, এবং তা বড় পাইপ বাহিত হয়ে আসে স্টোভ-এ। একশ মিটার উঁচু প্যাঁটা স্টোভ আছে তিন নম্বর ব্রাস্ট ফার্নেসে যার ভিতরটা সবসময় আগুনে লাল।

টার্বে প্রায়ার হাউস প্রেরিত বাতাস ঐ গরম স্টোভের মধ্যে দিয়ে বইয়ে তবেই বাসল-পাইপের মাধ্যমে ব্রাস্ট-ফার্নেসে যেকোনো হয়, ঐ আগুনের বাতাসের উষ্ণতা তখন সাধারণত সাতশ থেকে আটশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে। কিন্তু ঐ অতিকায় সুউচ্চ স্টোভগুলিকে গরম করা হয় কিসে? ব্রাস্ট-ফার্নেসের অভ্যন্তরে যে মেটালার্জিক্যাল রি-গ্র্যাকশন ঘটে চলেছে প্রতিমুহূর্তে তারই ফলে সৃষ্ট 'বি.এফ.গ্যাস' দিয়েই স্টোভগুলিকে গরম রাখা হয় — যার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড থাকে। এই কার্বন মনোক্সাইড তীব্র সংহারক গ্যাস। মানুষের নাকে গেলে তা মৃত্যুর কারণ হয়।

দুর্লভ প্রতিহারও মারা গেল ঐ মৃত্যুময় তীব্র গ্যাসের প্রভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল — সে কেন মাঝরাতে স্টোভ-প্রাটিকর্মের ঘুমোতে গিয়েছিল? বড় বড় সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'ডেনজার', 'এখানে ঘুমোনা নির্দেশ'। তা সত্ত্বেও বেচারা ঘুমের জন্য বেছে নিয়েছিল ঐ স্টোভ প্রাটিকর্ম, যেখানে নিশ্চয়ই কোনো স্টোভ থেকে কার্বন-মনোক্সাইড লিক্ করছিল।

আর এভাবেই একটা মৃত্যু, শিল্প-সম্পৃক্ত মানুষদের কাছে চরম নিবৃত্তি আখ্যা পেয়ে গেল — সেই অনুপাতে সহানুভূতি নয়।

ভোরের শীতল বাতাসে ছুঁছিল ওয়াডার। কুয়াশা ভেজা পিচরাস্তায় টায়ারের দাগ। মন খারাপের সওয়ারী আমি।

একসময় আর থাকতে না পেরে ওয়াডার শুধালো — 'কী হল আজ বড় চুপচাপ যে —'

'মেন ভাল নেই'

'সেকী, এত ভাল প্রোভাকশান দিলে, ফার্নেসে কোনো গোলমাল নেই, মন তো খারাপ হওয়া উচিত নয়।'

'আ.....সে অন্য ব্যাপার — একটা ভাল ছেলে আজ মরে গেল। ওর পরিবারটার কী হবে তাই ভাবছি —'

'স্ট্রেঞ্জ! যু আর এ্যান্ অয়রন-মেকার, একটা মানুষের মৃত্যুর জন্য তোমার তো মন খারাপ করা সাজে না।'

মনে খটকা লাগল। ঐ কী কথা! কিন্তু ওয়াডার যে বাজে কথা বলেনো। বড্ড প্রাক্টিক্যাল। অনেকটা চোপরা সাহেবের মত। তবে কিনা আমারই তাঁবে-খাকা চোপরা। বিধামিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞাসা করি — 'কেন, একটা ছেলে অসহায়ভাবে মরে গেল ঘুমের মধ্যে, আমারই আঙুরে কাজ করত, আমার মনখারাপ হবে না?'

'নিশ্চয়ই না — অয়রন মেকারের মন অত পলকা হত নেই। হ্যাঁ, যদি একটা ব্রো-পাইপ

ডামেজ হয়, হাথ-বুলিং প্লেট থেকে জল ঢুকে যায় ফার্নেসে, চার্জিং বন্ধ থাকে কোনো কারণে, স্ক্রিপ-কার ছিড়ে পড়ে ফার্নেস টপ থেকে, অস্ট্রেলিয়ান লো-গ্রাশ-এর কোক না পাওয়ায় প্রোডাকশন মার খায়, তবে তোমার মন খারাপের মুক্তি আছে। য়া আর আ ফাইটার। ট্রেকের গুলিবিদ্ধ পাশের সৈন্যকে দেখে মনখারাপ করে বসে থাকবে নাকি ম্যাগাজিন লোড করে নতুন উদ্যমে ট্রিগারে আঙ্গুল টিপবে? না মাস্টার, মন খারাপের কিছু নেই, মানুষ মরার জন্যই জন্মায় —

‘আমি অমতানি স্বরে বলি ‘আমিও তো মরব একদিন। তবে কি আমার জন্যও কারও দুঃখ সহনভূতি হবে না?’

‘অফকোর্স, তুমিও মরবে একদিন, আর তোমার জন্য আদার্স আয়রন-মেকাররা কেউ দুঃখ পাবে না, বরং একটা পোস্ট ড্যাকট হলে বলবে তারা খুশি-ই হবে। গোপনে সেলিব্রেট করবে।

হ্যাঁ, দুঃখ তারা পাবে, তোমার মাইনের টাকটা না হলে যাদের দিন চলবে না। যাদের গালে আদর করে চুমো খাওয়ার লোকটা আর ফিরবে না। তবে হ্যাঁ, সে দুঃখও বেশিদিনের জন্য নয়। যদি কারখানায় মরো, তবে কমপ্যান্সেন্টারি গ্রাউন্ডে তোমার বউ চাকরি তো পাবেই

সেইসঙ্গে মোটা টাকা — তা ছাড়া লাইফ ইনসিওরেন্স প্লাস পি.এফ. গ্র্যাটুইটি, সব মিলে লাখ সাতেক তো বটেই, এছাড়া কে.ভি.পি, ইন্দিরা বিকাশ, ইউ.টি.আই, এন.এস.সি, ব্যাক্সের টি.ডি — সব মিলে — (হোঃ এরপরেও কি সত্যি মৃত্যু মানুষটার জন্য দুঃখ-টুঃখ থাকে কারও?)

দুর্লভ প্রতিহারের মৃত্যু থেকে সরে এসে ওয়াভারের কথাগুলো ভাবছি, না, ও ভুল বলেনি। প্রতিটি কথা বাস্তবসম্মত। আমি মরলে সত্যি ওর কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই, ওকে আমি নিঃশ্বাস করে যাব না।

ওয়াভারকে যেন আজ কথায় পেয়েছে, নিয়ামতপুর পার হয়ে লিংক রোডে পড়তেই সে বলল ‘জানো হে মাস্টার — একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু আর একজন আয়রন-মেকারের মৃত্যুর মধ্যে কিন্তু আবার অনেক তফাৎ।’

‘স্টো কীরকম?’

‘এই যেমন একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু আর স্ট্রের বর্ষিদিগ মুছে ফেলার মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই — কিন্তু মরার পরেও একজন আয়রন-মেকার যুগ-যুগ বেঁচে থাকে।’

‘তা কেমন করে সম্ভব?’

ওয়াভার গতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বলল, ‘কেন নয় শুনি? এ-জীবনে তুমি কত লক্ষ টন ইনগুট প্রোডাকশন করেছ তার হিসেব জান? তোমার যাম পরিশ্রম মেধা চিন্তাশক্তি বিদ্যাসাগর সেতুর শরীরে বা মেট্রো রেলের লাইনে, শতাব্দী এক্সপ্রেস বা পৃথিবী বা পৃথিবী তা হলপ করে বলতে পারো? বহু হুই থেকে ইনস্যাট-২, এমনকি প্রাইম মিনিস্টারের ডিনার-সেট কোথায় না থাকতে পার। এবং তা প্রায়রাস, প্রেস্টিজিয়াস —

‘সাবাশ ওয়াভার ..... সাবাশ, আমি বৃকতে পারছি মরেও মরে না আয়রন-মেকার, পুড়েও পোড়ে না, মেসিং-পয়েন্টেও সে গেলে না, অক্ষয় অমর সে — স্যারামানডার —

দুপাশে ধানক্ষেত। ঝকঝকে আকাশ। গ্রামের মানুষ হাল-বলদ নিয়ে মাঠে চলেছে। কোলিয়ারি শ্রমিকেরা সাইকেল চেপে কর্মস্থলে। টিউবওয়েল ঘিরে জলের জন্য ভীড়। লোহার সুউচ্চ

ছাঁচলো খাঁচার মাথায় বিদ্যুতের হাই-টেনশন লাইন। পথের পাশে একটা ক্র্যাশার-মেশিন ঘিরে সকালের কর্মতৎপরতা — আহাহা, কী সুখ, আমি আছি, কোথাও না কোথাও আছিই আছি, কী দারুণভাবে বেঁচে আছি —

রূপনারায়ণপুর ব্রিজের মাথায় টাইম-মেশিন। চন্দ্র-সূর্য।

চন্দ্র মজুমদারের হাতে খুরপি।

সূর্যকান্ত গুহর বগলে এক আঁটি কলমী শাক।

‘এই যে আয়রন-মেকার, আমরা আপনার জন্য দাঁড়িয়ে, গুড-মর্নিং —’

‘গুড মর্নিং, হাতে খুরপি কেন সাতসকালে মিঃ টাইম-মেশিন?’

‘হেঁঃ হেঁঃ, কেঁচো — কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়েছি, ঘন্টাখানেক পরে বউ রুটি আলুভাজা করে দেবে, খেয়ে মাছ ধরতে বেরোব। ধরিব মৎস, মহাস্থেখ আছি বৎস — তার মধ্যে অবশ্য ফিফটি-ডাউন অমৃতসর এক্সপ্রেস আর ডাউন বাবা-আসানসোল পাস করিয়ে দেব—হাঃ হাঃ

চন্দ্র মজুমদারের মাছ ধরার নেশা আগে শুনি নি তাই অবাক স্বরে বলি, ‘মাছ! কেঁচো দিয়ে মাছ?’

‘হ্যাঁ — কেঁচো থাকে মাটির নিচে, আর মাছ থাকে জলের নিচে, অথচ এই কেঁচোই আবার মাছকে টেনে আনে —’

‘তা সারাদিনে কত মাছ হয়?’

‘খুব বেশি নয়, তবে কিনা সময়টা বেশ কাটে। জলের বুকে মেঘের ছায়া ভাসে। তার বুকে আমার ভাবনা — মেঘের ছায়া একটা চাকরি করা পাত্রের সন্ধান পেরেছি তবে কিনা বড্ড ডিমাম্ভ, নগদ চল্লিশ হাজার। গিগিরি চোখে ছানি — অপারেশন করাতে হবে। আসল কথা

কি জানেন মিঃ আয়রন-মেকার, এসব ভাবনায় যত দুঃখ তত সুখ। আর এই দুঃখ বা সুখ জলের বুকে রোদধর আর মেঘের মত খেলা করে। মাছ হল অভিলাষ। কেউ ধরা পড়ে নেউ পড়ে না।’ কথা শেষ হতেই ভোরের বাতাসে বড় করে শ্বাস টানলেন চন্দ্র মজুমদার।

সূর্যকান্ত গুহ’র হাতে ধরা টাটকা কলমী শাকের গায়ে তখনও ভোরের শিশির — মুখে রাজ্য জয়ের হাসি।

আশ্চর্য্য মানুষ এরা, এত অল্পে খুশি হওয়া মানুষ আমার পছন্দ নয়। এদের দেখলে মনে হয় কেবলমাত্র পৃথিবীর ভার বাড়ানোর জন্যই এদের বেঁচে থাকা, অতান্ত নিশ্চজ বেঁচে থাকা।

জীবনে কোনো কালোপেছ নেই। যে সময় এত দ্রুত ধাবমান তারই হিসেব-রক্ষক হয়ে কিনা সৃষ্টির আদিতে জন্ম যে মাছ, জলের গোপনে তারই খেয়ালখুশিতে এদের বেঁচেবর্তে থাকা? ইচ্ছে করেই সূর্যকান্তকে খোঁচা মেয়ে বলি, ‘ঐ ঘাসপাতা বুকে জড়িয়ে রেখেছেন এই সাতসকালে? সত্যি ঝোপজঙ্গল কিছুই আর কী রাখবেন না মনে হচ্ছে।’

সূর্যকান্ত রাগলেন না। ভোরের শিশির মাথা কলমী শাকের রাগি বাব বড় করে নিয়ে বললেন — ‘কলমী শাক আর কুমড়োফালি দিয়ে গুটিকি মাছের ঝাল যা হয় না। আশা অমৃত। চারদিন

জুড়ে ভুগে গিগিরি মুখে মোটে স্বাদ নেই। গুটিকি-কলমী দিয়ে আজ দুটি ভাত খাবে বউ, তাই তিরিশ পয়সা করে দু’আঁটি কিনে নিলাম — কলমী-গুটিকির গন্ধে একখালা ভাত মেথতে-মেথতে উড়ে যায় —’



‘বোগাস্’

‘এ্যা কিছু বললেন?’

‘না ..... বলছি আপনাদের গন্ধের বলিহারি’

এতেও রাগলেন না সূর্যকান্ত ওহ, বরং সকালের সজীব বোধের মত খোলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন ‘তা যা বলেছেন মিঃ আয়রন মেকার। আরে মশাই গন্ধই তো সব। গন্ধই তো জীবন। এই যেমন কলমীশাক আর শুটকি মাছের গন্ধ, ফ্যান-ভাতের গন্ধ, আলু চোখা-বেগুন পোড়া, কুমড়োর ছেঁচকি, পটলের খোসা বাটা — আহা যা গন্ধ টু দ্যা পাওয়ার ইনফিনিটি। আচ্ছা, বলুন তো মিঃ আয়রন-মেকার, তাৎকালিক নীতির হিসরি গন্ধ, চুলের কাঁটাগ জবাফুস তেলের গন্ধ, লোডশেডিং-এ ঘরের কোণে জবুথবু বুড়োবড়ির শরীরের গন্ধ বা হাজা-আঙ্গুরের কঁাকে রাসা জবা আলতা-র গন্ধ এসবের কোনও বিকল্প হয়?’

ওয়াভারের হেড-লাইটে সূর্যের আলো। চকচকে। ও আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে। আমি একটা কড়া জবাব দেব এটাই ও আশা করে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম ‘হয়, অফ কোর্স হয়। বিকল্প না থাকলে পৃথিবী অচল। সায়েন্স তা হলে কীসের জন্য? প্রতিটি বিকল্পের মধ্যে দিয়ে তার জয়যাত্রা অব্যাহত। আপনাদের মত পিউরিটান লোকেরা এসব বুঝবে না। আর তাছাড়া এতক্ষণ যে সব গন্ধের কথা বললেন ইদানীং তা আমি পাচ্ছি না। প্রত্যেকটি গন্ধের মধ্যেই একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ছাপ। সমষ্টিগত ভাবনার বিন্দুমাত্র লেশ নেই। যে গন্ধ সমাজকে এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে না, বরং তিনধাপ পেছিয়ে দেয়, তার জন্য আমার কোনো আকাংখা নেই — অল রাবিশ্ —’

সূর্যকান্ত এতেও রাগলেন না বরং আমি থামা মাত্র সোমাসে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন — ‘বা: চমৎকার, শোন চন্দ্র, কান খুলে শোন, ততকাল তো শুধু নিজের ছেলেমেয়ে ঝুঁ আর নিজের পেমেন্ট, ইনক্রিমেন্ট, এরিয়ার এসব নিয়েই ভেবে এসেছ — দ্যাখো, এর বাইরেও কত মানুষ সমাজের জন্য, সমষ্টির জন্য, কত চিন্তা করে যাচ্ছে রাতদিন। আচ্ছা মিঃ আয়রন-মেকার, তাহলে আপনার দেশ-এগোনার গন্ধের কথাই না হয় বলুন। লোহার গন্ধ কেমন? গম্ভীর স্বরে বললাম ‘লোহার গন্ধ নেই, কারণ সে লোহা। এহুই।’

‘আপুনের গন্ধ কেমন?’

‘আপুনের গন্ধ নেই কারণ সে শক্তি। পাওয়ার।’

‘জলের গন্ধ কেমন?’

‘ধূত মশাই, জলও শক্তি। হাইড্রো-পাওয়ার। জলের আবার কিসের গন্ধ!’

‘তাহলে .... তাহলে ....’

‘ধামুন। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না কিছু। আপনাদের কথা আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।’

চন্দ্র-সূর্য অবাধ চোখে আমায় দেখে তখনই সমন্বরে হেসে বললেন — ‘দেখুন, তাহলে পাওয়ার, শক্তির আধার হয়েও তার গন্ধ থাকে না — হা: হা: —’

ওদের শেষের কথাগুলো বুকে শেলের মত বিধল।

বিশাল উঁচু ব্রিজের মাথায় আমরা মুখোমুখি। ভোরের আলোয় ওরা কত রাসা। আর রাত্রি

জাগরণের ক্রান্তিতে আমি অন্ধকার। ওরা কলমী শাক বুকে চেপে কেমন সহজে হাসতে পারে, আর আমি লক্ষ টন ইনগট-এর জন্মদাতা ইদানীং হাসতে ভুলে গেছি। পেনসনের সামান্য টাকায় ওদের চোখের তারায় ঘাসফুলের ঝিকি, আর পেমেন্টের মোটা-খাম-বুকে আমার চোখে ঘোলা-ঘূর্ণি — দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া স্বখাত ধাতুবিদ একটা অদ্ভুত টপির একটুকরো অন্ধকারে এই প্রভাতেও কেমন বিষয়। অথচ আমি দেশের অগ্রগতির একনিষ্ঠ কারিগর, ওরা তার পেছ টেনে ধরা বোকা।

এমন অসম দুই পুরুষে কতদিন ভাব থাকতে পারে?

না, আর নয়। এদের সংশ্রব পরোক্ষে আমার আমার ক্ষতি করছে। ওদের কথাবার্তা সাংঘাতিক ছোঁয়ছে।

ওয়াভার চালু হতেই শুনলাম ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে শরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা চন্দ্র মজুমদারকে বলছেন সূর্যকান্ত ওহ, ‘একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে হে, কান পাতে, হ্যাঁ — মনে হচ্ছে সিগ্ন ডাউন — অমৃতসর মেল, ইন্স তিনঘণ্টা লেট চলছে হে —’

অনেকটা এগিয়ে আসার পর ওয়াভার কথা বলল। ‘মাস্টার, এই লোকদুটোকে একদম পাঠা দিওনা।’

‘হ্যাঁ, একটু আগে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আচ্ছা ওদের সম্পর্কে তোমার ধারণাটা একটু খুলে বলো তো শুনি’

‘নটোরিয়াস ফেলো। লৌহব্রহ্ম এই যুগে ওরা ভয়ংকর ভাইরাসবাহী চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে দুই শতাব্দী। ওদের যন্ত্রের পড়লে তোমার বুকের ভিতর জমে ওঠা স্যালামান্ডার ঘেরে ধীরে গলে যাবে। তুমি কত যাবে তুমি পিছিয়ে যাবে তা জান। আটশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হাই-ব্রাস্টের সামনে দাঁড়িয়ে যে তুমি হা হা করে হাসতে পার — সেই লোক তখন ছত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গরমে গলগল করে ঘামবে, পিঠময় ঘামটি চুলকোতে চুলকোতে এ জীবন অসহ্য মনে হবে। খাবার হজম হবে না। রাতে ঘুম হবে না। ম্যা উইল বিকাম অ্যা নার্টিং-নার্টিংনেস-এর যন্ত্রণা জান। যম-যন্ত্রণা।’

ঘরে পৌঁছেই দেখি সারায়র শুনশান। মানুষগুলো যেন বোবা। কারও মুখে কথা নেই। আমাকে দেখেই বনানী চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠল — ‘সত্যি গো, ভগবানের বিচার নেই। ইন্স, চোখে দেখা যায়না হেমন্তাব্যবুর কারা। কাল রাতে ওনার স্ত্রী হাসপাতালে মারা গেছেন। একটু আগে ডেড-বডি ঘরে নিয়ে এসেছে — আহা, দুটো ছোট ছোট বাচ্চা রেখে এমন সুন্দর বউটা অকালে চলে গেল। আমি এই একটু আগেই দেখে এলাম। তুমি একবার যাও। পার তো সবার সঙ্গে শশানেও শেষ কাজে ঘুরে এসো। একপাড়ায়, এত কাছে, এতদিনকার চেমাজানা —’

হেমন্ত সান্যালের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র মনে পড়ে গেল আরও একটা মুখ। দুর্ভাগ্য প্রতিহার। স্টেড-প্ল্যাটফর্মের চিরঘুম শায়িত। ঘটনটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। একটা মুখ দেখে বাড়ি ফিরে আসার একটা মুহূর্ত। মনটা ছটফট করে উঠতেই মনে পড়ল আসার সময় ওয়াভারের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলাম দৃঢ়তা। সত্যি তো, মানুষের জীবনে মৃত্যু অনিবার্য। কেউ অল্পবয়সে মরে, কেউ বেশি বয়সে। কেউ কিছু করে মরে, কেউ কিছু না করেই। কিন্তু

একজন আয়রন-মেকার কেন চারপাশের ঘটনামুহুর্ত দেখে এত বিচলিত হবে? তার তো অমরতার জীবন। স্যালামান্ডারের জীবন। মোটেন আয়রনের ঢল-মাঝে উৎফুল্ল হাসির জীবন। ওম-গর্জানি হট-ব্লাস্টের মাঝে আকরিক-প্রমে মাতোয়ারা জীবন। মানুষের মুহুর্তে তার চোখে জল আসা সাধে না। শেষ যাত্রায় গিয়ে লোক দেখানো ভদ্রতা তার পক্ষে বেমানান।

বরং রাত জাগা শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি সাঙ্গ করে নেওয়াই কাজের মত কাজ। লুক ফরোয়ার্ড। পিছনে নয়। শ্মশান, চিতাকাঠ, জল, এসব যত ঘাড়ে চেপে বসবে তত ফেরাস-এর কোয়ালিটি মার খাবে। লৌহ উৎপাদনের লৌহ-দৃঢ় মানসিকতায় সোস্টিমেণ্টের ইমপিওরিটি বাসা বাঁধবে।

‘কী হল — তুমি একটিবার যাও গো — কত লোকে গেছে, না গেলে যে বন্ড খারাপ দেখায় —’

‘আঃ, কত লোকের সঙ্গে আমার তুলনা করছ কেন? আমি গেলেই তো আর হেমন্তবাবুর কী বেঁচে উঠবে না —’

‘ইস্ কী নির্দয় তুমি — একপাড়ায় থাকি —’

‘নিকুচি করেছে তোমার “একপাড়া” — প্রোবলাইজড কমার্শিয়ালাইজেশন-এর আমি নিরস্তর যোদ্ধা একজন ডেভিকটেড আয়রন-মেকার, মৃত্যু নিয়ে ভাবনা, পাড়া নিয়ে চিন্তা — এসব আমার কাছে বিষবৎ।’

বনানী রেগে মুখ বাঁকিয়ে বলল হাঁ: আয়রন-মেকার না ছাই। যেন পৃথিবীতে আর কেউ কারখানায় কাজ করেনা —

আমারও মেজাজ ক্রমশ তুঙ্গী — ‘জানি, জানি। অন্যরা কে কেমন চাকরি করে সব জানি। কারখানায় হাঞ্জিরা দিয়েই বাজারে গুন্টি খোলে, ইঙ্কুলে রোল-কল সেরেই বাড়িতে কাজ আছে বলে শেষ-ব্যাক ট্রাশানি সারতে যায়, ডিউটি গি গিয়ে পরদিন শপ-সুপারিনটেনডেন্ট-এর বাড়ি গিয়ে বাজারের কেনা ল্যাংডা আম কিনে হাতে দিয়ে বলে “স্যার বড় ভাল আম, আমার গাছের, ধরুন”, সব জানি, কে কেনে ডিউটি করে। এ তো, সামনের রাস্তার ফিটার যোষ, অভাবড় ফুলের বাগানটা গরু ঢুকে সাফ করে দিল, দেবনা? ডিউটি পালিয়ে ফুলের বাগান করলে তার এ দশাই হয়। আমাদের চাকরি তা নয় ছনে রেখে —’

বনানীর রাগ তাতেও কমেনা — সে গলার শিরা ফুলিয়ে তখনও সমানে জবাব দিয়ে চলেছে — ‘হুঁ: তোমাদের এটা আবার চাকরি নাকি। মানুষ চাকরি করে একটু সুখে থাকবে বলে। তোমার চাকরি ডেকে অসুখ বাড়াবে বলে। সত্যি, আমার জীবনটা তুমি হেল করে দিলে। না ঘরে শান্তি না বাইরে। লোহা গলিয়ে কত না বিশ্বজয় করছ — তা একটা লোহার ইয়ে বানিয়ে আনতে পার না। দেখতাম তাকে বুকে জড়িয়ে কত তোমার সুখ। পাড়ার একজন হঠাৎ মারা গেল, এতদিনের চেনাজানা, কত দরকারে পাশে দাঁড়াও, তার জন্য সামান্য সহানুভূতি নেই? তুমি মানুষ নও —’

রাগ হলেও আর কথা বাড়ালাম না। শুধু শুধু এনার্জী নষ্ট করার মানে হয় না। সোজা ঢুকে গেলাম বাথরুমে।

গা মুছে, চিপসি নিয়ে ওয়াভারের লুকিং-গ্রাস-এর সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচাড়ছি, হঠাৎ ও

বলে উঠল — ‘সঠিক সিদ্ধান্ত’।

বনানী রান্নাঘর থেকে গরম খুন্টি নিয়ে ছুটে এসে বলল — ‘আজ ওটাকে যদি না শেষ করে ফেলি তো—’

### ওয়াভারের মৃত্যু

ছেলেমেয়েকে কতদিন আদর করিনি। ওরা আমার গম্ভীর মুখোচা দেখে ইদানীং কাছে আসতেই চায়না। এই বয়সেই ওরা বেশ বুঝে গেছে — তাদের বাবা শিল্পসভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে জড়িত। ওরা তাই আমাকে দূর থেকে দ্যাখে।

এর মধ্যে কেটে গেছে আরও দুটি সপ্তাহ। আবার এসেছে নাইট-শিফট। সাইক্লিক অর্ডারের নিয়মমেনে দিনাতিপাত।

সঙ্গে সাতটা অবধি টানা ঘুমিয়ে বাইরের অন্ধকারে চেয়ার পেতে বসে আছি, তখনই কানে এল চৌকাঠের ওপারের আলোয় ভাইবোনের চাপাধরে কথাপকথন।

‘দিদি, বাপির কাছে যাবি?’

‘না’

‘কেন?’

‘বাপি গল্প বলেনা —’ তানিয়ার ঠোঁট ফোলানো জবাব।

‘ধ্যাত্ .... বাপি লোহা গলায় জানিস না! লোহা গলালে কি গল্প মনে থাকে। সব গল্প গলে জল হয়ে যায় —’ গৌরবের সবজন্তু জবাব।

‘সেজন্যই তো বাপিকে আমার ভাল লাগেনা। সবার বাবারা কত গল্প বলে, কত খেলা শেখায়, ফুটবল শেখায়, ফেয়ারি টেলস্ —’

‘হাঁরে দিদি, ঠিক বলেছিস — ভুইং কপিতে কী সুন্দর জোকার ঐকে দেয়, ফড়িং ধরে দেয়, লাটু কিনে দেয়, ঘুড়ি বানিয়ে দেয় তাই নারে। আমার বাপি কিছু দেয়না — খালি লোহা গলায়।’

সামান্য নীরবতা। তারপরই ভাইকে বোনের প্রশ্ন — ‘আচ্ছা বড় হয়ে তুই কী হবি রে। লোহা-গলানো মানুষ হবি?’

‘ধ্যাত্, কখনো না। মা বলেছে, লোহা-গলানো মানুষের বুকের ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তারপর পাগল হয়ে যায়। আমি বড় হয়ে মাটির পুতুল বানাব — লাল নীল সবজ মানুষ। পাখি ফুল হাতি নৌকা, জানিস মাটি দিয়ে কী সুন্দর ঠাকুর তৈরি হয় —’

‘যারা মাটির কাজ করে তাদের কুমোর বলে —’

‘তা হলে আমি কুমোর হব — কী মজা, কুমোর ..... কুমোর .....’

প্রথম দিকের কথাগুলো শুনে হাসি পাচ্ছিল, পরের দিকে গলা শুকিয়ে কাঠ। চমকে উঠলাম। অন্ধকারে আমার দীর্ঘশ্বাস আমি ছাড়া কেউ টের পায় না। আমার সন্তানের মুখে একী কথা। হিঃ একজন আয়রন-মেকারের ছেলে কিনা হবে কুমোর।

অসম্ভব। এ হতে পারেনা। এ বয়সে এমন ধারণা তৈরী হওয়াটাই দৃষ্টান্তার। গম্ভীর স্বরে ডাকলাম — ‘এদিকে এসো তোমারা’



ওরা দুটি দ্বিধাজড়িত পায়ে কাছে এল।

ছেলের চোখে চোখ রেখে যতটা সম্ভব নরম গলায় বললাম — ‘না সোনা, ওসব বলতে নেই। ওসব তো ছোটলোকের কাজ। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। হাই-গ্র্যাম্বিশান রাখতে হবে। বড় হয়ে তুমি বিরাট মৌলার্লিস্ট হবে—আমার চেয়েও অনেক বড় ধাডুবিদ—’

সঙ্গে সঙ্গে এটুকু ছেলে বলে উঠল — ‘কিন্তু, তাহলে যে তোমার চেয়েও বেশি মাথা খারাপ হবে!’

আমি স্তব্ধ। আর একটা কথাও বলতে পারলাম না। ছেলের সরল দুটি চোখ থেকে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। মনে হল এ জীবনটা বৃষ্টি বর্ষ হয়ে গেল। দারুণ যন্ত্রণায় বৃকের ভিতরটা মুচড়ে উঠছে। এত পরিশ্রম কাদের জন্য করছি! এই যে নিতিদিন দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আশুতনু হেঁচে মাসমাইনের মোটা খাম হয়ে আনছি — তা কিসের জন্য? আয়রন-মেকারের ছেলের স্বপ্ন, সে কিনা কুমার হবে। মাটির মানুষ বানাবে। হিঃ.....

কী বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে আমার ও আমারই পরিবারের মধ্যে।

না, এ হতে পারেনা। কোথাও দারুণ একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। যা আমি বুঝতে পারছি না।

ভেতরকার চাপা উত্তেজনা, যন্ত্রণা, সামাল দিয়ে মেহপরিবশ পিতার স্বরে ছেলেমেয়েকে কাছে ডাকলাম — আমার স্বরে বেরিয়ে এল তীর কর্কশ শান্টার লোকের ছুঁশিল —

ওরা দাঁড়ে পলাতে গেল।

আমি উঠে গিয়ে ওদের কাঁধে হাত রাখতেই ওরা সমস্বরে চৈতন্য উঠল ‘আঃ ছাড়া, কী জ্বর — উঃ লাগছে —’

বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইলাম। পারলাম না। হাত দুটো ভাঁজ হয়না। ক্রেনের শক্তপোক্ত মজবুত আর্ম-এর সঙ্গে আমার হাতের কোনোই তফাৎ নেই। নিভাঁজ। শীতল। ওজনদার।

ওরা ফের চৈতন্য উঠল ‘ছাড়া, লাগছে .... উঃ আঃ’

আমি ওদের থুতুনি ধরে একটা আদরের প্রত্যাশী হয়ে মুখটাকে কাছে আনতে গিয়েই দেখি আঙ্গুলগুলো স্টিফ, পিগু-মোস্ত, ষোঁচা লাগলে রক্ত ঝরতে পারে। ভয়ে হাত সরিয়ে নিতেই ওরা যেন দারুণ বিপদ থেকে বেঁচেছে সন্দেহে ছুটে পালান। সোজা মায়ের কোলে।

অন্ধকারে একা বসে আমি কী দারুণ বিপর্যয়, যতবার দীর্ঘশ্বাস ফেলি, তা বাসল-পাইপ বাজিত হট-ব্লাস্টের মত উষ্ণ হয়ে যায়, আর তীব্রতয়া ধ্বংসাব্যয় — খুব চেষ্টা করছিলাম একটা কীদতে, সংগোপনে, না, জলের ছিটফোঁটা নেই। তবে কি চোখের বাঁধি শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে? আমি কোনো ক্যামারহিট মানুষ? অতিরিক্ত প্রচেষ্টায় হঠাৎ চোখ থেকে দু’খন্ড রেড-হট লাম্পি কোক বেরিয়ে এল — হাতের তালুতে রেখে তাদের ‘হোরা একতাল আমার অশ্রুগ্রন্থি-কে আঁকে রেখেছিল — হতছাড়া’ বলছি অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলামাত্র ওরা দুটি পায়ের মত ভানা কাপটে আরও অন্ধকারে উড়ে চলে গেল। সেই মুহূর্তে ঘর আর আমার ঘর রইল না, সব কেমন যেন বদলে যেতে লাগল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুশো সপ্তর ফুট উঁচুতে এক বিরাট বিশাল বাৎকার, ভেমনই সূচীভেদ্য অন্ধকারে আমি ও আমার পরিবার চান্দালা-ঝাঁকরা-ঝরিয়া আগত কোক-এর সমপ্তিমাত্র, পৃথক পৃথক মাইনস্ থেকে এসে যেন একই

আশারে জড়ো হয়েছি, ভীষণ অচেনা হয়েও একই অবি-জঠরে চার্জ হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজস্বের চিহ্নিতকরণের শেষতম পর্বটুকুই খালিয়ে নিচ্ছি—‘পরিবার’ শব্দটিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে, আশুনের দাহ্যতায়, কর্মবাসনে, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, মিথেন, সালফার, সিলিকন, হাইড্রোজেন — কত কত ভিন্ন ভিন্ন মৌল ছড়িয়ে পড়ছি বারোশ টন ব্লাস্ট-ফার্নেসের সুউচ্চ অবস্থিত রিডার-বাহিত হয়ে অনন্ত নীল মহাশূন্যে —

মোয়ারের একশেষে মাথ কাড় — গোড়াছিলাম। বনানী গৌরব তানিয়া ঘিরে দাঁড়িয়ে। ভয়াব্রস্বরে বনানী বলল — ‘তুমি অমন করছ কেন?’ আবার কি শরীর খারাপ লাগছে?’

‘এ্যা! কী হয়েছে! কিছু বললে? কই, কিছু হয়নি তো আমার!’

বনানী এগিয়ে এসে মাথার চুলে বিলি দিতে-দিতে উদ্ভিগতাকে আড়াল দিয়ে বলল — ‘এক কাজ করো, এবারে অনেকদিনের ছুটি নাও — চলো সবাই মিলে শিমুলতলা ঘুরে আসি, তারপর ফিরে এসে না হয় আবার কাজের মধ্যে ডুবে যেও —’

আমি জবাব দিলাম না। এ কথাও জবাব হয়না। তাছাড়া তখনও আমায় একমাত্র চিন্তা করে যাচ্ছিল — আয়রনের বিকল্প বৃজতে যে বালক মাটির কাছে আশ্রয় চায়, মৌলার্লিস্ট-কে ঘোমা করে কুমার হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে বড় হয়ে যে আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তা বলাই বাঞ্চ।

আমি কি এই চেয়েছিলাম? ওরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক।

ডিউটি বেরনোর মুখে ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল আমার মেয়ে।

‘আমাকে এক সেট ওয়াটার কলার কিনে দেবে? কাল ইকুলে লাগবে।’

‘আঃ, সেটা এখন বলছ। সন্দেরেলা বললেই তো কিনে আনতে পারতাম বাজার থেকে।’

সঙ্গে সঙ্গে বনানী ঝেঁঝে উঠল — ‘সন্দেরেলা তুমি যে সমাধিস্থ ছিলে তুলে গেছ? মাঝে মাঝে কী যে হয় তোমার — আমার আর একটুও বাঁচতে হচ্ছে করেনা। ছেলেমেয়েদের ধমক ছাড়া কথা কওনা, আমি কার কাছে এ-দুবের কথা বলি। আমরা যেন তোমার কেউ নই — একদিন ডিউটি থেকে ফিরে দেখবে —’

‘কী..... কী বলতে চাইছ তুমি —’ উত্তেজিত স্বরে কথাগুলি বলে এগিয়ে আসতেই দেখি ওর চোখে জল। সে আঁচলে চোখ মুছে বলল, ‘কিছু না .... যাও’

বৃকের মধ্যে ভরার দুন্দুভি। ও আমাকে কিসের ইঙ্গিত দিতে চাইছে? ডিউটি বেরনোর সময় ওসব অলক্ষ্যে কথা বলছে কেন!

যদি দেখলাম। সাথে আটটা বেজে গেছে — ইন্স..... আমার যে আর একমুহূর্ত দাঁড়ানোর উপায় নেই। ভেবেছিলাম ঘরের পরিবেশটা হালকা করে তবেই ডিউটি বেরোব, এসে দেখি উন্মো হল।

একসময় আর একটা কথাও না বলে দুপাল্প পা ফেলে বেরিয়ে পড়লাম। ছেলেমেয়ে মা-কে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আজ ওরা ‘টা টা’ করলনা। মিনিট বানেক ওমশুন মুখে অপেক্ষা করে স্টার্চ করলাম ওয়াড্ডারকে।

ভেতরের দৃশিস্তা অভিমান রাগ সব আছড়ে পড়ল এ্যাক্সিলিটোরে। ওয়াড্ডার যেন আজ উড়ছে।

রোজকার মত রূপনারায়ণপুরের ব্রিজে, অন্ধকারে, চন্দ্র-সূর্যর সঙ্গে দেখা। হেড লাইটের আলো দেখেই ওরা আজকাল ওয়াডার-এর আগমন বুঝতে পারে। কথা বলব না ভেবে রেবেছিলাম — কিন্তু ওরা তা শুনেবে কেন? অনন্তকালের টাইম-মেশিন যে — চলমান আমাকে হাত নেড়ে সূর্যকান্ত গুহ বলে উঠল ‘রাইন’ ইলেক্ট্রন মিনিটস লেট —’

জবাব না দিয়ে শাঁই শাঁই করে বেরিয়ে গেলাম — হ্যাঁ, এই এগারো মিনিট মেক আপ করতে হবে। হেলমেটের তলা দিয়ে ঘাড়ের লম্বা চুল উড়ছে। আল্লাডি মোড় টার্ন নিতেই ওয়াডার বলে উঠল, ‘আজ তোমার কী হয়েছে বল তো মাস্টার? যে ভাবে টার্ন নিলে এক্ষুণি স্ক্রিড করে পড়ে যেতাম। জি: তোমাকে ধৈর্য হারালে চলে। বি স্টেডি, জি.টি. রোডে কিন্তু সামান্য ভুলের ক্ষমা নেই।’

উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে এগিয়ে চলেছি।

ওয়াডার ফের বলল ‘আজ তোমার কিছু একটা হয়েছে, আমাকে খুলে বলতে পারো —’

কী আর বলব —আমার স্ত্রী বলেছে —একদিন ডিউটি থেকে ফিরে এসে দেখবে —’

‘হা: হা: ওটা বাঙ্গালি রমণীদের কমন ল্যাংগুয়েজ। অর্থহীন কথা। কাজ-পাগল লোকদের ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রীরা ওরকমই বলে থাকে। ডোন্ট ওরি, এইসব হাজার্ড-এর মধ্যে দিয়েই একজন লোককে উন্নতির শিখরে আরোহন করতে হয় —’

কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরাও যে আমাকে ভয় পায় —’

‘সেটা ই তো স্বাভাবিক — ভয় থেকে ভক্তি, তা থেকে ভালবাসা, প্রত্যেকটা ইন্টারলিংকড —’

আমার খটকা লাগল — ‘কিন্তু ভালবাসা থেকে ভক্তি, তা থেকে ভয়, এটাই কি ইউনিফর্মড নয়?’

ওয়াডার বাকি খেল। তারপর ফের চলতে লাগল।

‘কী হল। হঠাৎ জার্ক করল কেন তোমার হৃদপিণ্ড?’

‘আমি দুঃখ পেলে অমন করি’

‘কিসে আবার দুঃখ পেলে ভূমি?’

‘ঐ যে, তুমি এখনই ইউনিফর্মালি সাজালে — ভালবাসা-ভক্তি-ভয়। তুমি জাননা মাস্টার, ওটা খোড়-বড়ি-খাড়ো জীবনের কমন মানুষদের জন্য। আয়রন-মেকারের জীবনে ওটা পুরোপুরি রিভার্স। ভয় দিয়ে শুরু। ভয় জয় করে ভক্তি। ভক্তির প্রাবল্য থেকে ভালবাসা।’

উদভ্রান্ত হয়ে ‘কী জানি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোনটা আগে কোনটা পরে’ বলতেই সে হেসে বলল ‘ও.কে — ওসব ছাড়ো, সামনে জি.টি. রোড — বি কশাস্ —’

আজ সব কিছুই কেমন যেন গোলমালে। প্রথম ঢালাইটা খুব ভোগাল। মোটালের রাশ্ নেই। অথচ ফার্নেস ফুল প্লাস্টে চলছে। দীর্ঘসময় নিয়ে ঢালাই যখন শেষ হল মোটাল মার আড়াই ল্যাডেল। বুকটা হায় হায় করে উঠল। ফার্নেসের পো-হাইপের পেছনে ব্লু-প্লাসে চোখ রেখে সেখি যন্ত্রদানবটার অগিভার্ডের উজ্জ্বল আলোর মাতামাতি যথারীতি। চার্জিংও গেছে ভালই। তবে গোলমালটা কোথায়। মাত্র আড়াই-ল্যাডেল মোটাল। তখনই ফোন এল। হ্যাঁ, যা

ভেবেছিলাম তাই। ওজন-ঘর থেকে দন্তগুপ্তর ফোন — ‘হ্যালো, একশ সাতার্ন টন মোটাল হয়েছে — কী ব্যাপার, তোমার শিফটের ঢালাইয়ের সঙ্গে এটা ভাই বৈমানান —’

দন্তগুপ্ত বরাবরই প্রচণ্ড হিংস্টে। খাটাল থেকে দুধ নিয়ে চোপরা সাহেবের ঘরে পৌঁছে তার দিন শুরু হয়। সে আমাকে খোঁচা দেয়। আমি গম্ভীর স্বরে জবাব দিলাম ‘নো প্রবলেম, পরের ঢালাইয়ে নিশ্চয়ই পুথিয়ে দিতে পারব —’

চা এসেছে কেবিনে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্যানেলবোর্ডের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। ঐ যন্ত্রদানবটার ভিতরে ঘটে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্তকে লক্ষ্য রাখছি। মোটাল চাই, মোটাল, দ্বিতীয় ঢালাইয়ে তিনশত টন মোটাল না হলে একজন প্রথম শ্রেণীর আয়রন-মেকারের মান থাকেনা।

আবার ফোন। এবারে রামা রাও। চারনন্দর ফার্নেস থেকে।

‘কী ব্যাপার। ঢালাই শেষ? কত মোটাল হল?’

‘একশ সাতার্ন’

‘ওন্লি। আমার দুশো কুড়ি — ইডলি খাবে? চলে এসো, মাঝরাত্রে একটু টিফিন করা যাক —’

‘একদিন দুশো কুড়ি করেই ইডলি খাওয়াতে চাইছ, কোনোনদি যদি হঠাৎ তিনশত হয়ে যায় তো? কী খাওয়াবে তখন?’

রামা রাও একটু লজ্জা পেল মনে হয় — ‘আরে ভাই তিনশো আমার লাইফে হবে না— শোনো, যে জন্য ফোন করা, আজ আটটা নাগাদ হরিশংকর পাণ্ডে আর তার বউকে দেখা গেছে ক্লাবে বসে চোপরা সাহেবের সঙ্গে ড্রিংক করতে, বোঝ অবস্থা! কত জুনিয়ার ছেলে, অথচ —’

আমি হেসে বলি ‘নতুন কী। এটাই স্টিল টাউনশিপের কালচার। প্রমোশনের লিস্ট বেরুতে যে দেরি নেই —’

এমন সময়ই হঠাৎ দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকল ঘমজ্ঞ পশুপত। ‘সাহাব, কাজ কী কইরে হবেক?’

‘কেন? রোজ যেমন করে হয়।’

‘কিরেন ডাউন ইইয়ে গেছি। ইট-মোটাল বার্নারে বিরাট জ্যাম, আমি আর রামখিলাওন দম্ লাগিয়ে চেষ্টা কইরলাম, উল্লেখক না, কিরেন বিনা জ্যাম উঠবেক না। ঢালাই যদি মার খায় তখন চমক বইলবেব না আইজা —’

কিছুকি উঠলাম। কেনে ব্রেক-ডাউনের কারণে ঢালাই হবেনা? বলে কি লোকটা?

ক্রমত ফোন করলাম ইলেকট্রনাল ইঞ্জিনীয়ারকে। ওরা লোকজন নিয়ে এল কুড়ি মিনিট পরে। তরতর করে উঠে গেল কেনে। একটু একটু করে সময় পার হচ্ছে আর আমার টেনশন বাড়ছে। আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। ইঞ্জিনীয়ার রমেশ দত্ত বংশ চেষ্টা করেও ফস্ট ধরতে পারছে না। একসময় সে কেনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে বলল ‘আশ্চর্য ব্যাপার, স্লাইই লাইন ঠিক আছে অথচ হয়েস্ট-লিভার কাজ করছে না —’

‘দেখুন, কেন ঠিক না হলে আমি কিন্তু প্ল্যান্ট-কন্ট্রোলকে ফোন করব, দরকার হলে মাঝরাত্রে ঘুম থেকে ভুলে সিনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের বাড়িতে ফোন করব, সামান্য একটা ফস্ট ভাও ধরতে



পারছেন না?’

অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক্যাল ফিটার দলজিত সিং সাহ্ননার স্বরে কাছে এসে বলল, ‘ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আমি তো আছি, ফস্ট জরুর বেরোবো’

রেগে জবাব দিলাম, ‘রাত তিনটের সময় তোমরা ক্রেন ও.কে. দিলে আমি ক্রিনিং করব কখন, আর ঢালাই খুলব কখন?’

ফের কজন ক্রেনে চাপল। টানা ঘটনাক্রমে চেষ্টা করেও যখন চালু করতে পারল না, একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে রেষা দখল বলল — ‘হল না, জেনারেল শিফট ছাড়া হবে না, কাল সকাল আটটার আগে কোনো আশা নেই —’

মাথায় যেন বাজ হানল কেউ। ঢালাই মিস্ হবে ক্রেন ব্রেক-ডাউনের জন্য? এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোকালে।

উত্তেজনার শিখরে আমি, কপালে ফৌটা-ফৌটা ঘাম। শিফট ম্যানেজার কৈলাশ ঘাটনিকে ফোন করে সব কিছু জানানো মাত্র সে তিরিফে স্বরে জবাব দিল — ক্রেন ডাউন তো মানুষালি ক্রিনিং করাও — মনে রেখো ঢালাই মিস্ হলে জবাবটা তোমাকেই দিতে হবে।’

এই একটা জায়গায় ঘাটনি আমার চেয়ে অনেক নিরাপদ। প্রোডাকশন বেশি হলে আমার যেমন, তেমনি ওরও কুতিভ, কারণ শিফটের পুরো দায়িত্ব ওর। কিন্তু কোনো গুরুতর কারণে যদি ঢালাই মিস্ হয় তবে তার দায়িত্ব ওর নয়, ফার্নেস ফোরম্যানের।

চোপরা সাহেবের মুখটা মনে পড়তেই নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। সমূহ পরাজয়ের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। একতাল যে সম্মান নিয়ে, যে দাপট নিয়ে ফার্নেস চালিয়ে এসেছি — একদিনে তা নষ্ট হয়ে যাবে?

কাস্ট হাউসে এসে দেখি পণ্ডপতের কথা মিথ্যে নয়, বিশাল আকৃতির একটা জ্যাম্ লোহা আর ব্র্যাগের পিষ্ট ঠিক ট্যাপ হেলের মুখে। তীব্র গরমে কাছে যাওয়া যায়না। তবু এগিয়ে গিয়ে দেখি কিভাবে ওটাকে তোলা যায়। না, ক্রেন ছাড়া উপায় নেই। ক্রেনের সঙ্গে বড় লোহার হুক দিয়ে জ্যামটাকে সিলিং বেঁধে টানতে হবে।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে ওয়ার্কারদের মানুষালি ক্রিনিং করার কথা বলতেই ওরা ফুঁসে উঠল। চিরদিনের বংশব্দ রামখিলাওন চেঁচিয়ে বলল, ‘হম জানবার নেহি — ক্রেন ছাড়া এ জ্যাম তোলা যায় না —’

পণ্ডপতও সায় দিল ওর কথায়।

ওদের দোষ নেই। অনেক চেষ্টা করে, বড় বড় শাবল দিয়ে, হাতুড়ি দিয়ে এঁ খন্ডটাকে ভেঙ্গে টুকরো করে ওঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, গরমে আর ঘামে ওদের পোশাক ভিজে জবজবে। একমাত্র ভরসা যেটা, অর্থাৎ ক্রেন, তাও ব্রেক ডাউন।

ক্রেন ড্রাইভার সম্মানী লায়েক, ব্র্যাগ-রানারের পাশে গামছা পেতে বালির বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমেচ্ছিল। একসময় অন্য সব শ্রমিকরা যখন বৃষ্টিতে পারল যে আজ রাতে আর ক্রেন ঠিক হবার সম্ভাবনা নেই, তখন ওরাও যে যার চট্টের বস্তা পেতে কাস্ট-হাউসে ছড়িয়ে-ছিড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

জেগে আছি কেবল আমি। অস্থিরভাবে সারা কাস্ট-হাউস দাপিয়ে বেড়াছি। যে যন্ত্র আমার

কাছে মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে এসেছে একতাল, যাকে নিয়ে আমার রাত্রিদিনের গর্ব, স্বপ্ন, সবকিছু — সেই-ই কিনা আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মাথার ওপর এইটি টানস্ ক্যাপাসিটির জেসপের ক্রেনটা অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ওপর থেকে ফুলে আছে তার রোপ-ড্রাম, হির, তার নিচে বিশাল এ্যাংকার-হুক, তারই ছায়া আমাকে দ্বিখন্ডিত করেছে। হায় যন্ত্র!

ফৌসাচ্ছে ফার্নেস। ফ্লিপ-কারের ক্রান্তিহীন ওঠা নামা। রাস্ট-লিকেকের কান-ফাটানো শব্দ। ট্র্যাপ-চার্জিং-এর গুমগুম আওয়াজ। ঘর্মাক্ত শ্রমিকেরা অলস ভঙ্গিতে গুয়ে — যেন রণক্ষেত্রে পরাজিত শিবির। উৎসাহহীন। উত্তেজনাহীন। যেন জেনে গেছে কাল প্রভাতেই আত্মসমর্পণের সাদা নিশান উড়বে।

একটা ঢালাই মিস্ হওয়ার যে কী পরিণাম, তা আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। এত বছরের তিল-তিল পরিশ্রমে, আগুনের সঙ্গে দীর্ঘজীবনের সহবাসে অর্জিত আয়রন-মেসারের শিরোপায় পাকাপাকি ভাবে পড়ে যাবে জিজ্ঞাসাচিহ্ন। অথচ ক্রেন ব্রেকডাউন হলে আমি কি করতে পারি?

রাত জাগা চোখে ব্র্যাগ-সাইডে ফিফথ-স্পাউন্টের পাশে ছোট্ট কাঠের বেষ্টিতে বসে আছি। হতাশ। নিরুপায়।

গোটা রাস্ট ফার্নেসটাকে দেখা যাচ্ছে একশ ফুট দূর থেকে। বিশাল, উচ্চতায় ও প্রহে। ওর তুলনায় কী ক্ষুদ্র আমি। আমরা। অত দহন বৃকে নিয়েও দিনের পর দিন বছরের পর বছর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দশ টন পনেরো টন ট্র্যাপ-চার্জিং-এর ঝাপটা সহ্য করেও অবচল। আঠারোশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উত্তপ্ত গলিত লৌহকে সে ব্রিক-লাইনিং-এর খেরোটপে আটকে রেখেও দৃষ্টিভ্রান্তহীন। অথচ আমি, এ ফার্নেসের নিয়ন্তা, সামান্য একটা ক্রেন ব্রেকডাউনের জন্য কত বিচলিত। শুধু কি তাই? কনভেটর ফুলে লোয়ার ক্লাসে পড়া ছেলেমেয়ের রজপেন্স দিন সীমাহীন টেনশানে মরে যাই। তানিয়ার জন্য একটা ভাল প্রাইভেট টিউটারের অভাব আজও আমাকে দৃষ্টিভ্রান্ত রাখে। বনানীর বহুদিনকার অতি সহের একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতে না পারার যন্ত্রণা অন্যারবি আক্ষেপের কারণ — সবকিছু মিলেমিশে কত সহজেই আমি ঝুঁকড়ে যাই। যন্ত্রের সঙ্গে লড়াই-করা মানুষ, নিজের কাছে কী অবলীলায় হার মেনে যাই।

হে ঈশ্বর, যন্ত্রকে এত ভালবেসে, নিজেকে সমর্পিত করেও যান্ত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারলাম না।

এখনও চোপারার পীতবর্ণ টুপি র লাল চোখ আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। পদ্মনাভনের হাসির আড়ালে শাসানি হিম করে দেয় বৃক।

সাড়ে চারটা। ভোররাতের ঠাণ্ডা বাতাস। একটানা উত্তেজনা, দৃষ্টিভ্রান্ত ও ক্রান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ আমার কত কাজ বাকি। কত কৈফিয়ত। কত দায়।

ক্রান্তিতে নুয়ে পড়া আমি হঠাৎ একটা যান্ত্রিক শব্দে চমকে উঠি। ঘাড় ফেরাতেই দেখি ক্রেনের উদ্ভত ‘বুম’ তার মাথা নামিয়ে এনেছে, মোটরের স্বর্ধর স্বরে বলছে ‘কী হল, ভেঙ্গে পড়ছ কেন? হালো ম্যান!’ বিশ্বাসে কঁপে উঠল গলা — ‘কে? কে তুমি?’

‘আমি জোসেফ’

‘তুমি কোথেকে বলছ?’

‘আমাকে চেনেনা! এতকাল কাষ্ট হাউস দানিয়ে বেড়ালাম। আমি জেশপ’স ক্রেন। জন্ম উনিশশো ষাট। ইংলন্ডে। নটিংহাম ওয়ারউইকশায়ার ঘুরে তবে ইন্ডিয়ায় —’

‘জোসেফ .... জোসেফ .... তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি চালু হও। প্লিজ। আমার কাষ্ট হাউস ক্রিনিং বাকি। জ্যাম্ তোলা যায়নি। ঢালাই বাকি। প্রোভাকশান দিতে পারিনি। আমি ভীষণ অসহায়, আমাকে তুমি বাঁচাও —’

জোসেফ তার ইম্পাতমন্ডিত বিশাল দুটি হাত, আজানুলবিত, দুলিয়ে হেসে উঠল সুকঠিন ঝইঝনংকারে — ‘এত ভয় কেন তোমার? যন্ত্রকে যে মানুষ ভালবেসেছে তার কাছে পরাজয় নেই। যন্ত্রকে ভালবাসতে পারাই তো সবচেয়ে বড় জয় — আর বাকিগুলো সব জয়ের বাইপ্রোডাক্ট। যন্ত্রজয়ের পর সৈনিকরা যেমন বাড়ি বাড়ি চুকে টেনে আনে যুবতী মেয়েদের, ধানের গোলায় আগুন ধরায়, জলে বিষ মেশায় — তেমনি।

‘জোসেফ .....এ.তুমি কী বলছ?’

‘হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই বলছি। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করার স্পৃহাটাই তো বড়, ফল নিয়ে অত উতলা হতে নেই বন্ধু —’

এ কী শুনিছি আমি! এ যে ওয়াডারের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা। অথচ দুজনেই যন্ত্র।

আমার দোদুলমানতার মাঝেই জোসেফ ফের বলল ‘ভোররাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে— চলে যাবে?’

‘কোথায়?’

‘এয়ে — শ্রাণ-ব্যাঙ্ক পেরিয়ে, নাকডার্সটা গ্রাম উজিয়ে যেখানে কলকল স্বরে বয়ে চলেছে দামোদর, যাবে তার বালুতটে? ভোরের সূর্যোদয় দেখতে তোমার ইচ্ছে করে না?’

‘খুঁবই ইচ্ছে করে জোসেফ, খুঁবই, কিন্তু এ যে — একটা টুপি রক্ত চক্ষু —’

জোসেফের নিরেট লোহার শরীরটা ঝঝম ঝঝ শব্দে কঁপে উঠল। স্মলন্ত সিলিং-এর নিচে ওর ধাতব রোপ-ড্রাম হা হা শব্দে হাফে।

‘আমার এই বিপদে তুমি হাসছ?’

‘টুপি রক্তা বললে কিনা, তাই। আরে বন্ধু, চোপারার টুপি শুধুমাত্র একটা মানুষের টুপি নয়, ওটার পেছনে একটা দর্শন আছে। টুপি ব্যাপারটাই ফিউডালিজম-এর প্রতিভূ। ভয় পাওয়ানো তার ধর্ম। আর ফিউডালিজম ব্যাপারটা কোনো কালেই ধূয়ে মুছে যায়না বলেই টুপিগুলোর প্রত্যাপ এত বেশি। কমিউনিজম বলে ক্যাপিটালিজম বলে, আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় ইজম হল এই টুপিইজম — যা কিনা ফিউডালিজম-এরই পরিবর্তিত ও পরিশ্রুত রূপ। চলে এসো, ভয় ভাঙ্গাতে না পারলে সে সব ইজম-এরই দাস। তার স্বেচারি জীবনে কার্টোনা। চলে, ভোর হচ্ছে —’

‘বিশ্বাস করো জোসেফ, আমি তত সাহসী নই। তুমি যা পার, আমি তা পারি। সামগ্রিক এক ভয়ের আধারে আমি কেবলই ঘুরপাক খাই। প্লিজ জোসেফ, তুমি সচল হও। আমি মুক্তি চাই এই ভয় থেকে। তুমি সচল হও। আমাকে বাঁচাও।’

জোসেফ অবাক স্বরে বলল ‘আমি সচল নই কে বলেছে? এ ব্যাটা সম্যাসী লায়েক দ্যাট

বাস্টার্ড ক্রেন অপারেটর, দেশি মদ গিলে ঘুমোবার জন্য মোটরের দুটো তার বুলে রেখেছে। তাছাড়া আমি তো অল রাইট —’

‘তাই নাকি —’ বলেই লাফিয়ে উঠলাম।

চিচিং ফাঁকের মন্ত্র পেয়ে গেছি।

দ্রুত ছুটে এসে সম্যাসী লায়েককে হ্যাঁচকা টান মেরে উঠিয়ে প্রচণ্ড চাঁৎকার করে বললাম — তোমার চাকরি খেয়ে নেব লায়েক, ঢালাকি করছ? যাও যে তার দুটো খুলেছ তা ফিট করে একদুগি ক্রেন চালু করো, কুইক, জ্যাম্ তুলেই আমি ঢালাই খুলব — পরে তোমার ব্যাপারটা কী করা যায় আমি দেখছি —’

ধরা পড়ে যেতে সম্যাসী লায়েক আমার হাটু জড়িয়ে হাউহাউ করে কঁপে ফেলল — ‘বড় অন্যায় করে ফেলিছি স্যার, জেবনে আর হবে না, এবারের মত ক্ষমা করি দ্যান স্যার — সব কাজ করে দিছি —’

ঘর্ঘর শব্দে চালু হল ক্রেন। গোটা কাষ্ট-হাউস জেগে উঠেছে। বীরবিক্রমে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্রেনের এ্যাংকার-হুকের সাহায্যে জ্যাম্ তোলার জন্য।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ঢালাই খুলেই ফোন করলাম ঘটানিকে। ও অবাক স্বরে প্রশ্ন করল — ‘ক্রেন ও.কে দিল কে?’

‘কেন, আমি?’

‘তুমি!’, স্ট্রেঞ্জ, তুমি কি ইলেকট্রিক্যাল কাজও জান?’

‘জানতে হয়। একজন আয়রন-মেকারকে তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি মেশিনকে জানতে হয়। আরও জানতে হয় বিপদে পড়লে কী করে সেখান থেকে বাঁচার পথ বার করতে হয়। শোনা ঘটানি, ঢালাইটা কীভাবে খুলেছি তা জানিয়ে দিও চোপারকে, আর বোলো, এত মাইনে দিয়ে ইলেকট্রিক্যালের অতগুলো লোক পোষার দরকার নেই, বুঝেছ!’

কৌল ঘটানির বিভবভিৎ স্বর ভেসে এল — ‘রিয়েলি ইউ’স অ্যামেইজিং’

ঢালাই চলছে। গলিত লৌহ সমুদ্রের সমুখে আমি। সম্যাসী লায়েক চলে গেছে। ক্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে একেবারে শেষপ্রান্তে। আর আমার চিন্তা নেই, এখনি চলে আসবে এ শিফটের লোকজন। বানার টপকে ঘীরে স্ক্রু ক্রেনটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। ‘মাই ডিয়ার ব্রেন্ড জোসেফ — হ্যালালো, শুনতে পাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ পাচ্ছি — বলা’

‘একটা কথা জানতে চাই’

‘গো অন’

এ জীবনে দুজন যন্ত্রবন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি — এক তুমি, আরেকজন আমার ওয়াডার। কিন্তু দুজনের মানসিকতায় কত তফাৎ! তুমি আমাকে ভোরের সূর্যোদয় দেখাতে চাও, আর সে চায় আয়রন-মেকারের কঠিন বর্মে আমাকে ঢেকে রাখতে। আমার ফ্যামিলিকে দুরে সরিয়ে কেবলই স্বপ্নসীতারের সুরমুখনায় নিজেকে বিলীন করে দিতে। এটা কেন হয়?’

জোসেফের উদ্ভূত বুম্ আবার নেমে এল নিচে। ভারিকি স্বরে বলল, ‘এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, সয়েল। মাটি। হেরিডিটি। বুঝলে। আমার জন্ম সেই দেশে যার রাজত্বে সূর্য অস্ত



যেতনা। কেবলই সূর্যদয়। শিল্পবিপ্লবের মোক্ষলাভ করা গ্রেট ব্রিটেনে। আমরা কাজ করি, কিন্তু আয়সম্পন্ন নয়। আমাদের কর্মযোগ মুক্তির আনন্দ পাওয়ার জন্য। আরও বেশি বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার জন্য নয়। কাজ শেষ হলেই সপ্তাহান্তে আমরা তাই ছুটো যাই কাশ্মি-সাইডের খামার বাড়িতে, গভীর সবুজ দেশে, অথবা বরফঢাকা শৈল শিখরের পাদদেশে, বা কোনো সমুদ্রতটে। উদ্দাম আনন্দে মেতে উঠি। অটচকি পেরিয়ে গেলেই আমরা রঙ্গীন মানুষ। আর পাশাপাশি তোমার ওয়াভারের পেডিগরি দেখ, তার জন্মবৃত্তান্ত দেখ। তার বড় হয়ে ওঠার ইতিহাস জানলেই বুঝতে পারবে দুই যন্ত্রের মাঝে কতোটা তফাৎ। ওয়াভারের জন্ম থার্ড ক্যান্টিনেটে, অন্ধকারের দেশে, যেখানে রাজনীতির মূলমন্ত্র মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে এক্সপ্লয়েট করা, যেখানে সাধুসন্তের পা-খোয়া জল পান করে প্রাইম মিনিস্টারের দিন শুরু, সব ইজমের মূল লক্ষ্য যে দেশে কেবল ভোগবাদ আর পরিবারতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি — সুতরাং তোমার ওয়াভারের সঙ্গে আমার মেন্টালিটির ফারাক তো থাকবেই। যে মুহূর্তে তুমি যন্ত্র, ওয়াভার তোমাকে ডমিনেট করবে, আর যে মুহূর্তে তুমি মানুষ, ওয়াভার-কে ডমিনেট করবে তুমি। তুমি ভাগ্যবান, যে জীবন পেয়েছ তাকে হেলায় নষ্ট কোরনা। এনি ওয়ে — ঘরে যাও, তোমার পরিবার বড় দৃষ্টান্তায় আছে — ওকে — বাই —

সারা রাত্তার ওয়াভারের সঙ্গে একটোও কথা বলিনি। জোসেফ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমার এখন ঘরের কথা মনে পড়ছে খুব। মনে পড়ছে বনানীর মুখ। ছেলেমেয়ের সদাসন্তুষ্ট চাহনি। ক্রুত চালাচ্ছি। রূপনারায়ণপুরের ব্রিজের মাথায় চন্দ্র-সূর্যর সঙ্গে দেখা।

কথা বলার সময় নেই তবু দাঁড়ালাম।  
ওয়াভার তক্ষুনি বলে উঠল 'কী হল মাস্টার! এরা সব বিঘাভ ভাইরাসবাহী মানুষ — এদের সঙ্গে আর একটি কথাও নয় — ঘরে চলে।'

'চুপ করো, শত হলেও এরা মানুষ'

'এসব তুমি কী বলছ মাস্টার!'

চন্দ্র মজুমদার আর সূর্যকান্ত গুহ-কে আজ দেখলাম পরিপূর্ণ চোখে। ভোরের আলোয় রাস্তা দুজন অতীত দিনের মানুষ — বয়ে চলা অনন্ত সময়ের সাক্ষী।

'গুড মর্নিং আয়রন-মেকার' বলে সূর্যকান্ত সন্তোষ জনাতেই বললাম 'আ, আমার কি কোনো নাম নেই? আয়রন-মেকার কি কোনো মানুষের নাম হয়?'

সূর্যকান্ত গোল গোল চোখে আমাকে বিরাগমুগ্ধ দেখেই চন্দ্র মজুমদারকে বললেন 'ওহে চন্দ্র শোনো শোনো এ কী কথা শুনি আজ লৌহমানবের মুখে।' 'হ্যাঁ সূর্য, এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন — সময়ের খাতার কিন্তু নামটাই আসল, ডেজিগনেশনটা শুধু তার গায়ের জমে থাকা দীর্ঘদিনের খুল।'

সূর্যকান্ত বিভ্রবিড় করে বললেন 'তাহলে তো আমাদেরও ওয়ান আপ টু ডাউন না বলে "দিব্লি-কালকা" বলা উচিত, ফাইভ আপ সিঙ্গেল ডাউন না বলে—'

'রাইট, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কি উৎসকে বিচার করা যায়?'

'আমি হাঁ করে চেয়ে দেখছিলাম ওদের। দুই আশ্চর্য মানুষ।'

'কী দেখছেন!'

'আলো — আপনাদের মুখ জুড়ে —'

'কিসের আলো' বলেই চন্দ্র মজুমদার মিটিমিটি হাসলেন।

'সূর্যোদয়ের'

'কী যে বলেন!' শেষ ট্রেনের হুইশল শুনছি, এখন সূর্যোদয়ের আলো!'

'হ্যাঁ চন্দ্রবাবু, প্রত্যেকটা শেষই একটা নতুন শুক্লর আলো যোগায় — আজ চলি, পরদিন অনেক কথা হবে —'

রূপনারায়ণপুর বাজার পার হতে গিয়েই মনে পড়ল আমার মেয়ে ওয়াটার-কালার চেয়েছিল কাল রাতে। কী আঁকবে আমার তানিয়া? আমার ডি.এন.এ - বাহিত আগুনের চেরা জিত? লৌহ-সহবাসের দিনক্ষণ? নাকি বনানীর ডি.এন.এ- বাহিত শান্তশীতল এক ডাহুকডাকা গ্রামের ছবি? নাকি গ্রাম-জীবনের স্নেহশীতল ল্যান্ডস্কেপ ও আঠারোটা টুইয়ারের নাগপাশে বাঁধা এ আগুন রান্ধসের ছবি মিলেমিশে আমাদের যৌথ জীবনের ব্যর্থ দন্দ ছিন্নভিন্ন হাথাকারের ছবি।

ওয়াভারের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৌড়ে ঢুকলাম একটা লোকানে।

'ভাল একটা ওয়াটার কালার দিন তো —'

নন্দ তিরিশ টাকায় কেনা কুড়িটি জল রঙের চৌখুপ। কত রঙ জানি। কত জানিনা। ভিবিজরের বাইরেও কত রঙ। অনেক মোটা মোটা বই পড়া চোখে, তাদের দেখা যায়না। বোঝা যায়না। তানিয়া বাচ্চা মেয়ে — তাই আর রঙের গোনাগুণতি নেই।

'দিলে তো তিরিশটা টাকা ফালত গচ্চা —' ওয়াভার বলল।

'গচ্চা!'

'হ্যাঁ, দু'দিনে নষ্ট করবে'

'নষ্ট করবে? ওহ ..... এত সব ভাল রং। আচ্ছা মেয়েটা কি আঁকতে চায়?'

'কী আবার! সব রং মিলেমিশে যা হয় —'

'সেটা কী, আ: সব সময় হেঁয়ালি কোরোনা, বলো —'

'ব্লাক—ওন্লি ব্লাক'

'না ..... না..... অমন বোলোনা ওয়াভার, তুমি সবসময় আমাকে দিয়ে আমার ছেলেমেয়েদের মাপতে চাও কেন বল তো!'

দিনদিন ওয়াভার বাচাল হয়ে উঠছে। সবসময় নেগেটিভ দিকটাই দেখবে। না, আর কথা নয়। সাড়ে সাতটায় তানিয়ার স্কুলবাস আসবে, তার আগেই রঙ্গের বাস্টা তুলে দিতে হবে মেয়ের হাতে।

মেরুণ স্টার্ট যি-রঙ জামায় আমার তানিয়া, সদ্য ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ, স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষমান।

ওয়াভারকে ঘরে ঢুকিয়ে তানিয়ার হাতে ওয়াটার কালার তুলে দিয়েই বললাম — 'এই নাও'

'কী মজা ..... কী মজা বাপি তুমি খুঁউব ভাল, খুঁউব —' আনন্দে কলকল করে উঠে আমার কালকুণ্ডলি মাথা মুখটা কাছে টেনে আদর করতে করতে হঠাৎ বিস্মিত স্বরে বলে উঠল আমার মেয়ে, 'তোমার টুপিটা কোথায় বাপি?'

‘এ্যা! তাই তো —’ চমকে খালি মাথায় হাত বোলাতেই নিজেকে ভারি অচেনা মনে হল। যেন এটা আমার মাথা নয়, অন্য কারও।

হেলে মেয়ে দুজনেই বাঁধন ছেড়া হাসিতে উজার — ‘এমা — বাপিকে আজ অন্যরকম লাগছে — একেবারে অন্যরকম —’

চন্দ্র-সূর্যর কাছে যখন ব্রিজের মাথায় দাঁড়িয়েছিলাম টুপিটাভো তখনও ছিল। কিন্তু এখন নেই। তার মানে ওটা নিশ্চয়ই রঙের দোকানে হারিয়েছে।

এত বছর ব্যবহার করছি, জলে-ঝড়ে-রোদে-আওনে যে পীতরঙের হেলমেটখানি আমার দীর্ঘজীবনের সহচর তা আজ সকালে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

টুপিখীনতায় ভারমুক্ত যতটা, ততটাই দুঃখিত।

তবু হেলমেটের অবনিলা খুশির আনন্দকে ভাঙ্গতে চাইনা। নরম স্বরে মেয়েকে শুধোলাম ‘ওয়াটার কালারে তুমি কি আঁকবে সোনা?’ প্রশ্নটা করেছে একটু যেন ভয় হল। যুগপত ওয়াভার ও মেয়ের মুখের দিকে চাইলাম। মনে পড়ল একটু আগেই ওয়াভারের বলা কথা কটি।

‘বলো সোনা, বলো, এখনই তোমার স্কুলবাস আসবে — প্লিজ —’

‘একটা আচ্ছা পাহাড় বাপি’

‘আর?’

‘তার পাশে নদী — নীল জল’

‘আ: গো অনু তানিয়া, গো অনু —’

‘শেষ দেখা যায় না একটা ধানক্ষেত —’

‘মার্ভেলস! তারপর?’

‘দুটো সবুজ টিয়া উড়ে যাচ্ছে, ঠোঁট ধানের শীষ — তুমি খু-উ-ব ভালো বাপি — মাই সুইট ড্যাডি —’

স্কুলবাস এল। একবুক খুশি নিয়ে হেলেমেয়ে চলে গেল বিজয়ী ভঙ্গিতে, আমি চাইলাম ওয়াভারের দিকে। ও গুম মেরে ছিল। মুখচোখ ফ্যাকাশে। চাহনিতো চাপা অস্থিরতা।

এতক্ষণ পর বনানী হেসে বলল ‘ডিউটি ফেরার পথে তুমি যে আজ মেয়ের ওয়াটার কালার কিনে আনবে আমি তা ভাবতেই পারিনি। সত্যি, আজ কিন্তু টুপি ছাড়া তোমাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে —’

ভারমুক্ত আমার মনে পড়ল যশ-বন্ধু জোসেফের কথা। এক ভয় থেকে অন্য ভয়ে চারিয়ে যাওয়া টুপির ট্রান্সিশাল ইতিবৃত্ত। ফিউজালিজম-এর নতুন সংজ্ঞা। মনে পড়ল দুই বন্ধুর মুখ — আলো আঁধারের অতিথি, চন্দ্র-সূর্যকে। আমি হাসতে লাগলাম প্রাণ খুলে।

বনানী চা হাতে দিয়ে বহু বর্ষদিন পূর্বকার অকুণ্ঠিত সরলতা মাথানো গলায় বলল — ‘বলো, আজ কী রান্না করব।’

এই তো, আমি যেন আমার প্রাক-লৌহজীবনের ছন্দে ফিরে এসেছি। দারুণ ক্ষিপে পাচ্ছিলাম আমার। স্টমাকে আর অয়রন-ওর নেই, লাইমস্টোন নেই, ডলোমাইট নেই — কত কী খেতে হচ্ছে করছে আমার। সব তো আর একদিনে খাওয়া যাবেনা। আন্তে আন্তে, ধীরে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। চোখ নাড়িয়ে বললাম, ‘পারবে? দারুণ একটা আইটেম!’

‘আহা বলোনা ওনি’

‘তবে আজ জুড় করে কলমীশাক কুমড়ো দিয়ে শুটকি মাছ রান্নাও দেখি।’

‘ইস, কতদিন খাইনি গো। ছোটবেলায় কী সুন্দর করে মা রান্নাতেন এই পদটা। আজ তুমি সত্যিকারের সংসারি মানুষের মত কথা বললে।’

খুব খুশি হয়ে জবাব দিলাম ‘তাই নাকি! আর এতদিন? এতগুলো বছর?’

‘ই’, জানানো বুলি। চং। বিয়ের পর থেকে তো শুধু একটাই কথা শুনে আসছি লোহা লোহা আর লোহা। মাঝে মাঝে মনে হত প্রজাপতি খনি তোমারা জন্য কেন একটা স্টিলের মেয়েমানুষ বানিয়ে দিলেন না। ভাসভো না, মচকাভো না, সাধ-আল্লাদ সব চাপা পড়ে থাকত এ নিরোঁট চকচকে শরীরের নিচে। ইস্ ..... সারাবছর জুড়ে এতকাল শুধু লোহার গন্ধ। মাছে লোহা, মাংসে লোহা, পালংশাকে লোহা — সংসারটা একদম লোহা-লোহা গন্ধে ছেয়ে গিয়েছিল —’

লম্বা চুমুকে চা শেষ করে বললাম ‘খুড় লোহার আবার গন্ধ হয় নাকি!’

‘কেন হবে না’ — বনানী এই প্রথম আজ মৃদু প্রতিবাসে বলল ‘বরফে যেমন, পাথরে যেমন, তেমনি, দারুণ গন্ধহীনতার গন্ধ —’

ওর কথা শেষ হওয়া মাত্র আমার ওয়াভার শব্দে ছিটকে পড়ল মাটিতে। তবে কি স্ট্যান্ডের স্থিতি ঢিলে হয়ে গেছে। ছুটে ওয়াভারের মাথার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলাম। গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম ‘কী হল। হঠাৎ ছিটকে পড়লে কেন? ওঠো, ছি: তোমার মত একজন ডায়নামিক, প্রাকটিক্যাল, আমার এতদিনকার সঙ্গী ..... বি স্টেডি ওয়াভার ..... ওঠো ..... প্লিজ.....’

ওয়াভার তবু কোনও শব্দ করল না। নিখর।

‘আ: অমন করে ওয়ে আছ কেন। ফিলিং আনইজি? ডাক্তার কল দেব? ওয়াভার ....’

ওয়াভার —

স্ট্যান্ডের দুটি উর্ধ্বমুখী রড স্থির। নিশ্চল। যেন কোনও দৌঁদবাজ ঘোড়া অন্তিমকালীন ভঙ্গিতে সামনের দুটি পা শুনে তুলে রেখেছে। শানে আছড়ে পড়ায় হেড লাইটে ক্র্যাঙ্ক। কাঁচের বুকে লম্বা ফটলগুলি সোজা, মনে হল ওয়াভারের চোখে জল।

বনানী পাশ থেকে বলল, ‘তোমার ওয়াভার আর কখনও কথা বলবেনা।’

চমকে শুধোলাম ‘কেন? কী হয়েছে ওর।’

পিঠে হাত রেখে সে শান্তস্বরে, যেন সাব্বান দিচ্ছিল — ‘দেখেও বুঝতে পারছ না? এঙ্কুনি ওর মৃত্যু হয়েছে।’

‘না..... না..... এ হতে পারে না, আমার ওয়াভার, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ওয়াভার, তুমি জান না বনানী ও আমার কাছে কেতোটো —’

‘জানি গো জানি — সব জানি, কিন্তু এও তো মিথ্যা নয় — আজ আর তোমার মাথায় টুপি নেই, শরীরে লোহার গন্ধ নেই, মুখে যন্ত্রের ভাষা নেই, এর পরেও ওয়াভারের বেঁচে থাকটা আশ্চর্যের নয় কী!’



## স্যালামান্ডার গলছে

ওয়াভারের মৃত্যু আমাকে দারুণ নিশ্চ করেছিল সত্যি, কিন্তু বৃকের ওপর চেপে বসে থাকা পাখির হঠাৎ সতেরে যাওয়ার আনন্দটুকুও কি দেয়নি? এই দুই বিপরীত টানা পোড়নের মাঝে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। চোখের দৃষ্টিতে আঙনের ব্রাইটনেসের বদলে ছায়াচ্ছন্ন গাছদের সবুজ ভেতর এমন দোল খেতে লাগলো যে আমি যথা-তথ্যই দোলনা দেখতে লাগলাম — তেমনই একটা, যার একইটী কালপুরুষের কোমরবন্ধে অন্যটা সপ্তমিগুলের মধ্যস্থি — বিরটি, বিশাল, আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা; আর যার গর্ভে আমি ও আমার পরিবারসম্মত প্রচণ্ড দোলানি। এই মুষ্টি পড়ে যাব নিকষ অন্ধকারে আর মাধ্যাকর্ষণের বাহিরে ছিটকে যাব, এই ভয়ে চাঁৎকার করে উঠছি। কিন্তু অশ্চর্য, বনানী গৌরব বা তানিয়া, ওরা কিন্তু এটাকেই উপভোগ করছিল খুব, আর বাপির ভয় দেখে যে উচ্চস্বরে হাসছিল তারই জেরে সম্ভবত আকাশের মধ্যভাগে বিদ্রুত চমকায় — ওদের হাসিমুখ আমাকে আনন্দদান করেনা বরং ভয়ে চাঁৎকার করে উঠি 'উই... আ..... আ..... আ.....'

'কী হল! হঠাৎ চাঁৎকার করে উঠলে যে! কোনো কষ্ট হচ্ছে?' বনানী পাশেই বসেছিল চোয়ালে।

ওর উদ্বিগ্নতাটুকু আজ ভাল লাগল। একটা হাত চেপে ধরে বললাম — 'ভেতরটা শূন্য-শূন্য লাগছে —'

'এটা কোনো খারাপ লক্ষণ নয় — আবার পূর্ণ হবে, তার আগে এমনটা হয়।'

'আচ্ছা, একটু আগে তুমি কি দোলনা চড়িয়েছিলে?'

ওর মুখ চোখ কঁচকে উঠল। সন্দেরের দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল 'তুমি কি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে থাকো? একটা দেখার মধ্যে থেকে আরও কোনো কাল্পনিক দেখার চলে যাও? না, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে, আমায় খুলে বলছ না তুমি —'

'হ্যাঁ, অসুবিধা কিছু একটা হচ্ছে, কিন্তু সেটা যে সঠিক কী, কতটা, তা বোঝাতে পারছি না; নাকি কোনো অসুবিধাই নেই, আচমকা শিকল ছিঁড়ে গেলে বিমুচতার অন্ধকারে খেই হারানো — তাও বুঝতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, একটা কষ্ট হচ্ছে খুব। মনে হচ্ছে বৃকের ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, পারছেন না।'

বনানী আমার বৃকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আর সেই মুহূর্তে ওর হস্তবাহিত ঘরোয়া সন্তোষ ওরফে যা কিছু নৈকট্যের দ্রাবণবাহী, স্মৃতিবাহী, তা নাকে এসে ঝোঁয়ামার গা ওলিয়ে উঠল, ভীষণ বমি পাচ্ছে — কপালে সাবুনার মত ঘাম, বিন্দু বিন্দু —

ওয়াফ ওয়াক শব্দ করতে করতে চোয়ার ছেঁড়ে উঠে গেলাম সামনের বারাদার নিমগাছটার নিচে, আর তক্ষুনি শুরু হল বমি — দমকে দমকে —

প্রথমেই আন-বার্নটি কোক, রেড-হুট। বনানী শিউরে উঠল। চাঁৎকার করে পাড়া মাথায়। ছেলেকমেয়েরা তারস্বরে কাঁদতে লাগল তাদের বাবার দুরবস্থা দেখে। পাড়ার মাতকর দু' একজন ঐ চাঁৎকারে কাছে এসে চমকে উঠল। এটা কোন্ জাতের রোগ হতে পারে তা নিয়েই খুব আলোচনা করছিল।

আমি আন-বার্নটি লাম্পি কোক গুলোকে দেখতে দেখতে যন্ত্রণাক্রান্ত স্বরে বলে উঠি — 'অস্ট্রেলিয়ান সো-এ্যাশ কনস্টেন্ট, আহা, কতদূরের পথ পেরিয়ে আসা, এই জলবায়ুতে হজম

## বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

হবে কেন — শরীর রিফিউজ করছে —'

ঘাড়ে-মাথায় যে জল ঢালবে বনানী তারও উপায় নেই। অত হিটে সামনে যাবে কী করে! লাম্পি কোক-এর পর দলা দলা ব্লাগ — একটু লাইমি, হবেনা? কত বছর ধরে জমে আছে। ভাল করে চেয়ে দেখি দু-একটা স্পার্ক — সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে বাকি রইল না ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে।

আমি দারুণ আনন্দে চাঁৎকার করে উঠলাম 'স্যালামান্ডার গলছে, স্যালামান্ডার গলছে — হা: হা: আঙনে যা গেলনা, মরেনা, পোড়েনা, তাই গলে বেরুচ্ছে — অদাহ, অভঙ্গুর, দীর্ঘকালের চড়া পড়ে যাওয়া স্যালামান্ডার গলছে —'

বমির ফেয়ারা ছুঁতে লাগল আর সেই সঙ্গে আলোকময় স্পার্কিং — উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিমগাছটা। যে পাখিগুলো আশ্রয় নিয়েছিল তারা উড়ে পালাল।

বনানীর তারস্বরে কান্না আর পাড়ার অত্যাশাহী যুবকদলের শিয্যালরি-সুলভ স্বভাবের কারণে দ্রুত ডাক্তার ডাকা হয়েছে — কিন্তু সাধ্য কী তার এই নিমবৃক্ষের পেরিফেরিতে প্রবেশ করে — শুধু হ্যাঁ-করে দেখছিল মুখ দিয়ে আঙন-ব্লাগ আর ফেরাসের স্পার্কিং ও গড়ানো একটা মানুষ।

একটু বাদেই এ্যাম্বুলেন্স এলো, কিন্তু ই হিটে টায়ার গলে যেতে পারে বা ইঞ্জিন জ্বলে যেতে পারে এই ভয়ে দাঁড়ালো গিয়ে কমকরেও একশ হাত দূরে।

উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে দাবি উঠল 'দমকল.... দমকল'...

দীর্ঘদিনের জমে থাকা স্যালামান্ডার-টা একটু একটু করে যত গলে যাচ্ছিল তত আমার নাকে এসে লাগতে থাকল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির গন্ধসকল — কতদিন দুই দেহ এক হয়নি, কতকাল বর্ষা নামেনি, এইমতো আরও যা যা অতীত গোপনীয় অথচ সত্যের মত হির, সুন্দর।

একসময় ব্লাগ ও লৌহের মিশ্রিত দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত চড়াখানি সম্পূর্ণ গলে গেলে আমি আমার লোয়ার ইন্ডেস্টাইনের চওড়া শাশু ব্লাগে পাই — 'আ: এতদিনে একটু নাড়ে চড়ে বসার সুযোগ পেলাম' — প্রত্যন্তরে হার্টের পালমেনারি আর্টারি হেসে জবাব দেয় 'আমিও ফিরে পাচ্ছি ফুইটিটি, ও: কী আরাম! কী আরাম!'

উবু ভঙ্গি থেকে একটু একটু করে সোজা হচ্ছি, আর তখনই দ্রুত বেগে ধেয়ে আসা একটা গাড়ির শব্দ সঙ্গে আঙনই চং চং শুনে বুঝতে বাকি রইল না যে দমকল আসছে। এল, এবং তারা যখন হোস্ পাইপ বার করতে ব্যস্ত, তখনই আমি সম্পূর্ণ সিঁধে, এই মুখ দিয়ে মানুষের গলায় ধমকে উঠলাম — 'তফাৎ যাও —'

ওরা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখতে থাকে আমার দুশাশ ছেলেমেয়ে বউ, আর আমি মাঝখানে, দায়িত্বশীলতা ওদের মাথায় হাত বোঁলাচ্ছি —

ওরা ফিরে গেল। দমকল, এ্যাম্বুলেন্স, এবং মানুষেরা। আমি ঘরের দিকে ফিরে বললাম — 'আজ সবাই একসঙ্গে খেতে বসব আর দারুণ একটা গল্প বলব, আঙনখেকো একটা মানুষের অগ্নিমান্দ্য —'





## নীল নয়, কালো নয়, সাদা নয়,

### লাল দরজা

আমি ছোটবেলায় বিহারে রাঁচীর কাছাকাছি নামকুমে দিন কাটিয়েছি। তখন একটা খেলা খেলতাম — সাইকেলের চাকা ঠেলে ঠেলে ঘুরে বেড়াতাম। আরেকটা বিজ্ঞানের খেলা খেলতাম— একটা কাঁচের বোতলে লাল কাঁচপোকা রাখতাম, আরেকটায় শুয়ো পোকা রেখে দেখতাম কি করে সে প্রজাপতি হয়, আরেকটা বোতলে জোনাকী পোকা রাখতাম। অবাক বিষয়ে দেখতাম সব কিছু। আমার বাবা আমাকে উৎসাহিত করতেন। আমার ন'বছর বয়সেই আমি বাবাকে হারাই। কিন্তু আজও আমি স্বপ্নে বাবার সঙ্গে কথা বলি। 'লাল দরজা' যেদিন দেখলাম, সেদিন রাতে বাবা আমাকে বললেন 'তুই কিছু জানিস না। তোর বন্ধু বুদ্ধদেব জানে। দেখলি না একটা ছড়া বলে লাল দরজা খুলে দিল।' সত্যিই, আমি কোনও ছড়া বা মন্ত্র জানি না। যদি জানতাম, তা হলে এক এক করে আমার এই কঠিন কঠোর জীবনের অনেক লাল, নীল, কালো, সবুজ দরজা খুলে যেতো। বুদ্ধদেব কিছু জানে, সেই জন্য একটা আবোল তাবোল ছড়ায় লাল দরজা খুলে দিতে পেরেছে।। বুদ্ধদেবের কিছু ছবি দেখলে আমার শরীরে নেমে আসে মৃত্যু-শীতলতা — যেমন 'ফেরা', 'তাহাদের কথা' বা 'বাঘ বাহাদুর'। আবার কিছু ছবি দেখলে আমি প্রচণ্ড ব্যাকুল হয়ে উঠি, চোখের জল সামলাতে পারি না যেমন 'চরাচর', 'দুরত্ব', 'নিম্ন অন্নপূর্ণা', এবং সব শেষ অবশ্যই লাল দরজা।।

'লাল দরজার' ছোট্ট ছেলোটি, হাতে একটা লাল কাঁচপোকা নিয়ে ছড়া কেটে দরজা খুলে দেয়। কেন খোলে? কার জন্য খোলে? ও কী ভোঙ্কল, না আমি ভোঙ্কল! বুদ্ধদেব এ কী এক সরলতার খেলা খেললেন? যে সরলতা পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির অন্তরে সাড়া জাগায়! মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশকেই বলা হয় শিক্ষা। 'লাল দরজা' দেখে আমার মনে হয়েছে যে বুদ্ধদেব আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির একটা কোনায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে চেয়েছে। তাই, 'লাল দরজা' অন্তর্মুখী চলচ্চিত্রের একটা নতুন দিগন্ত। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খোঁজার ও।

'লাল দরজায়' বুদ্ধদেব খুঁজতে চেয়েছে মানুষের মানসিক আরোগ্য নিদান। খুঁজছে অজ্ঞান মনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। এ যেন,

‘মুদিত আলোর কমলকলি কাটিরে

রেখেছে সন্ধ্যা আধারপর্ণপুটে।

উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে

ভরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি

চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,

দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে”

লাল দরজায় মানব-মানবীর আন্তরিক বিশ্লেষণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া এবং দ্বন্দ্ব, তার একটা স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এক সহজবোধ্য কাব্যিক ছন্দে ফুটে উঠেছে, যা ভারতীয় চলচ্চিত্রে

বিরল। জীবনের প্রতি এই যে বিশ্বাস, এই যে মহাযজ্ঞ, ভালবাসা, জীবনের সন্ধিক্ষণ — সব কিছুই মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে নীল নয়, কালো নয়, 'লাল দরজায়'।

“মোর কিছু ধন আছে সংসারে

বাকি সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।।

ওগো, কোথা মোর আশার অতীত!

ওগো, কোথা তুমি পরশ চকিত!

কোথা গোস্বপন বিহারী!

তুমি এসো এসো গভীর গোপনে,

এসো গো নিবিড় চরণে

বসনে প্রদীপ নিবারি, এসো গো গোপনে।।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে

বাকি সব আছে স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।।”

স্বপ্নের মত ছবি 'লাল দরজা' ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এক ধাপ উপরে পৌঁছে দিল। এই ছবি আমাদের গর্বের ছবি। চিত্রনির্মাণ প্রক্রিয়ারও নতুন ইঙ্গিত।

— বিপ্লব রায় চৌধুরী

[illegible]

লাল দরজার স্থিতি



ପିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ : ନନ୍ଦାଦେବୀ

লাল দরজার স্থিরচিত্র

, চান্দাভাঙা গিলাই, নান্দাভাঙা গিলাই, চান্দাভাঙা গিলাই, চান্দাভাঙা গিলাই  
 , চান্দাভাঙা গিলাই, চান্দাভাঙা গিলাই, চান্দাভাঙা গিলাই, চান্দাভাঙা গিলাই

250





কাহিনী / চিত্রনাট্য/ পরিচালনা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

চিত্রগ্রহণ — ভেনু

সম্পাদনা — উজ্জ্বল নন্দী

কার্যনিবাহী প্রযোজনা — দুলাল রায়

প্রযোজনা : চন্দ্রানী লাহিড়ী

অভিনয়ে

গুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, চম্পা, আসাদ, ইন্দ্রানী হালদার,

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়,

এবং

শ্রীমান সুদীপ মজুমদার ও অন্যান্য

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

শুরুতে টাইটেল ভেসে ওঠে একের পর এক মিস্ত্র করে।

দৃশ্য/১

ভোর

মেঘ ও কুয়াশার ভোর। দূরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে ছোট বড় পাহাড়ের সারি। মেঘ এসে এক-একবার ঢেকে দিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। এর মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে সাত-আট বছরের একটি ছেলে। শ্যামলা, রোগা ও ভাসা ভাসা চোখের ছেলোটর গায়ে চাদর জড়ানো, তার তলায় লাল রং-এর একটা সোয়েটার ও প্যান্ট। ছেলোটিকে দেখে বোঝা যায় সে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ছেলোটি ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনো ঘুম জড়ানো তার চোখে। মিড-ক্রোজ-এ তার মুখ। ছেলোটি নিচে, মাটির দিকে তাকায়। সে কিছু দেখছে বোঝা যায়। তখনই হয় তার দৃষ্টি। আন্তে আন্তে তার মুখটি ভালো লাগায় ভরে ওঠে।

কাট-টু

সকালবেলার নরম, ভেজা সবুজ ঘাস। তার ওপর নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে লাল, ডেলাভেটের মত তুলতুলে, কানের মার্কিটের মত গোল সুন্দর বেশ কিছু পোকা।

ক্যামেরা একটু টিল্ট-আপ করলে ছেলোটির খালি পা-জোড়া দেখা যায়। ছেলোটি বসে। হাত বাড়িয়ে মুঠি করে তুলে নেয় একটি পোকা। তারপর দৌড়ে চলে যায় ফ্রেম থেকে। লাল সেই পোকাদের ওপর সামান্য সময় থাকে ক্যামেরা।

ছেলোটি দৌড়ে এসে দাঁড়ায় একটা গাছের নিচে। তাকায় মুঠির দিকে। তারপর আন্তে আন্তে বলে :

ছোট মোটি পিঁপড়া বোটি

লাল-দরজা খোল্ দে, খোল্ দে।

এবার আন্তে আন্তে মুঠি খোলে সে।

মুঠির ভেতর দেখা যায় ওপর হয়ে থাকা সেই লাল পিঁপড়োটিকে। তার খুঁদে খুঁদে ছোট হাত-পা মেলে দেয় লাল পিঁপড়োটিকে।

বয়সী বিবাহিতা মহিলার মুখ। তিনি ডাকেন — নবীন, বেলা যে চলে যাচ্ছে, ঘরে আসবি না?

ছেলোটির মুখ। সে ফিরে তাকায়। তারপর এগিয়ে আসতে থাকে ক্যামেরার দিকে। ক্যামেরার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি শেষ হয়।

কাট - টু

দৃশ্য/২

কলকাতা

দিন শুরু হয় ব্যস্ত রাস্তা। ক্যামেরা লো-এঙ্গেলে রেখে ওয়াইড এঙ্গেল লেন্সে নেওয়া চলন্ত

গাড়ি থেকে।

গাড়ির ভেতর পেছনে বসে চুলছে ৪৭/৪৮ বছরের একজন সার্ট পাশ্ট পরা মানুষ। নাম নবীন দত্ত।

গাড়ি চালাচ্ছে অন্য একজন। ৩৭/৩৮ বছর বয়স। বেশবাসে বোবা যায় লোকটি ড্রাইভার। নাম দিনু। দিনু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে পেছনে বসে চুলতে থাকা নবীনকে দেখে। মুচকি হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে।

গাড়ি চলছে চমক গাড়ির জানলা দিয়ে একটা রাইফেলের মুখ বেরিয়ে এসে বাস্তু রাস্তা লক্ষ্য করে ওলি ছোঁড়ে। যে ওলি ছোঁড়ে তাকে দেখা যায়। দ্রুত গাড়ির ভেতর লুকিয়ে পড়ে সে। গাড়ি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বাস্তু রাস্তার ফুটপাথে একটি যুবতী মেয়ের রক্তাক্ত শরীর লুটিয়ে পড়ে আছে। ছোট্ট ছুটি করছে লোকজন। লাফ দিয়ে ভিসিয়ে যাচ্ছে অজস্র পা সেই শরীরটিতে।

ক্যামেরা মৃত মেয়েটির শরীর থেকে ওপরে উঠে যায়। দেখা যায় নবীনের মুখ। মুখে ভয়। নবীন মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

একটি পুলিশ জিপ এসে দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে নেমে কয়েকজন পুলিশ ছুটে আসতে থাকে।

গাড়ি চলছে চমক গাড়ির জানলা দিয়ে একটা রাইফেলের মুখ বেরিয়ে এসে বাস্তু রাস্তা লক্ষ্য করে ওলি ছোঁড়ে। যে ওলি ছোঁড়ে তাকে দেখা যায়। দ্রুত গাড়ির ভেতর লুকিয়ে পড়ে সে। গাড়ি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বাস্তু রাস্তার ফুটপাথে একটি যুবতী মেয়ের রক্তাক্ত শরীর লুটিয়ে পড়ে আছে। ছোট্ট ছুটি করছে লোকজন। লাফ দিয়ে ভিসিয়ে যাচ্ছে অজস্র পা সেই শরীরটিতে।

ক্যামেরা মৃত মেয়েটির শরীর থেকে ওপরে উঠে যায়। দেখা যায় নবীনের মুখ। মুখে ভয়। নবীন মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

একটি পুলিশ জিপ এসে দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে নেমে কয়েকজন পুলিশ ছুটে আসতে থাকে।

গাড়ি চলছে চমক গাড়ির জানলা দিয়ে একটা রাইফেলের মুখ বেরিয়ে এসে বাস্তু রাস্তা লক্ষ্য করে ওলি ছোঁড়ে। যে ওলি ছোঁড়ে তাকে দেখা যায়। দ্রুত গাড়ির ভেতর লুকিয়ে পড়ে সে। গাড়ি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বাস্তু রাস্তার ফুটপাথে একটি যুবতী মেয়ের রক্তাক্ত শরীর লুটিয়ে পড়ে আছে। ছোট্ট ছুটি করছে লোকজন। লাফ দিয়ে ভিসিয়ে যাচ্ছে অজস্র পা সেই শরীরটিতে।

ক্যামেরা মৃত মেয়েটির শরীর থেকে ওপরে উঠে যায়। দেখা যায় নবীনের মুখ। মুখে ভয়। নবীন মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

একটি পুলিশ জিপ এসে দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে নেমে কয়েকজন পুলিশ ছুটে আসতে থাকে।

## বিভিন্ন বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

- বয়স ?

- ফরটি সেভেন।

- হাত-পা সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছে এ রকম কতদিন ধরে মনে হচ্ছে আপনার প্যাম্পন - প্রায় এক বছর ধরে। মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় সমস্ত শরীরটা লোহার - নাড়তে পর্যন্ত কষ্ট হয়।

- একদিন রাত্রে, হোয়াইল....। নবীন থেমে যায়।

ডাক্তার দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা নিয়ে বলে - বলুন ?

নবীন - মানে যখন উই ওয়ার হ্যাভিং স্লিপ আমার স্ত্রী ভয় পেয়ে বলে আমার হাত-পা লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

- ছেলেমেয়ে ?

- একটি ছেলে, দার্জিলিং-এ স্কুলে পড়ে।

- আমার হেঁ সবকিছুই খুব নরমাল লাগলো। সোয়ার ইজ নাথিং অ্যান্ড ইন্স অ্যান্ড আপনার শরীরে কোথাও কোন সমস্যা নেই।

- ও-সব কিছু না। আসলে নিজেই নিজে এক্সেস্ট করে নিজে না পারলে এ ধরনের অনেক কিছু মনে হয়। আমি আপনার মতো কেঁস আরো পেয়েছি। পরে অনেকে আর রিপোর্ট ভিজিট করেনি।

হয় তারা ভালো হয়ে গেছে না হলে...। ডাক্তারের মুখ হাসি হাসি হয়ে ওঠে।

নবীন তাকায়।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে - না হলে ফ্লাইং মেশিনে চড়ে ফর গুড রোবট প্রান্টে চলে গেছে। একটি থেমে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলে - কিছুটা এন্টি-স্ট্রেন্স ক্যাপসুল খেয়ে দেখুন তো - এগুলো অন্য ধরনের, বেশ দামী। কি করেন?

নবীন - ডেন্টাল সার্জেন।

কি - টু

দৃশ্য/৪

ফুটপাথে লুটিয়ে পড়ে থাকা মেয়েটির মৃত শরীর। রক্তে ভেসে জমে আছে চারদিক। ভিজিটী ক্যামেরা নিয়ে টিভি-ইউনিট খবি তুলছে।

দৃশ্য/৫

দিনের শেষের সময়

ফ্রেমে একটি জানলা। তারপর জানলার ওপারে দিন শেষের বাস্তব কলকাতা। ক্যামেরা আরো সরে এলে দেখা যায় ক্যামেরা প্রায় পর্দা ভেঙে ধরে থাকা মুখটি ডেন্টাল সার্জেন নবীন দত্ত।

এরা। নবীনের মুখ থেকে সেরে এসে আস্তে আস্তে ঘুরে যেতে থাকে মাথার পেছন থেকে। সামনে বসে থাকা অন্য মুখটি দেখা যেতে থাকে। এটি মুখটি হাঁ করায় তার এই ভেতর প্রথম মুখটির হাতে বা দাঁত তোলা সাঁরাশিটি ক্যামেরা স্থির হওয়ার পর হাঁ মুখটির গহ্বর



থেকে টান দিয়ে একটি কবের দাঁত তুলে আনে।

ফালে একটি জল ভরা পাত্রে। জলের রং সামান্য লাল হয়ে ওঠে।

নবীনকে দেখা যায় আয়নার সামনে। সদা জল ঝাপটানো মুখ তোয়ালে দিয়ে মোছে নবীন। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়।

কাট - টু

**দৃশ্য/৬**

একটা গাড়ির পেছনের খোলা কাঁচের বাইরে দুটি পা। একটি আর একটির ওপর। পা-এর মালিকের মুখটি ড্রাইভার দিনুর।

ক্যামেরা ট্রলির ওপর। পা থেকে ক্যামেরা সরে এলে অন্য জানলা দিয়ে দেখা যায় নবীনকে। চেয়ারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। এসে গাড়ির দরজায় জোরে টোকা মারে নবীন। দিনুর ঘুম ভাঙে না। নবীনের চোখেমুখে বিরক্তি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেশ জোরে ডাকে - দিনু।

দিনু হড়বড় করে উঠে বসে। চোখ আঁজুল দিয়ে মোছে। নবীন গাড়িতে ওঠে। হাতে ডাক্তারের ব্যাগ।

দিনু ঘুম জড়ানো স্বরে বলে - কোথায় যাবো?

নবীন - বাড়ি। নবীন দরজা বন্ধ করে দেয়।

কাট-টু

**দৃশ্য/৭**

শেষ বিকেল। কলকাতার রাস্তা

গাড়ি চলছে। কিছু দূর গিয়ে নবীনের গাড়ি রাস্তার একপাশে আস্তে আস্তে থেমে যায়।

নবীন বিরক্ত হয়ে বলে - কি হলো?

দিনু - তেল ফুরিয়ে গ্যাছে।

নবীন - তেল ফুরিয়ে গ্যাছে মানে? সেদিন কুড়ি লিটার ভরলে না?

দিনু গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলে - কত চললো সেটা দেখুন।

দিনুর গলা শান্ত।

নবীন রেগে বলে - কি দেখবো? মাইল মিটারটা কবে থেকে খারাপ করে রেখে দিয়েছে।

দিনু গাড়ির পেছনে গিয়ে ডিকি খুলে তেলের টিন বের করে নবীনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বলে - টাকা দিন।

নবীন পেছনের পকেট থেকে টাকা বার করতে করতে বলে -বারবার এই রাস্তার মাঝখানে...।

পাঁচ লিটার।

নবীনের কাছ থেকে টাকা নিতে নিতে দিনু বলে - আসলে তেলটা কম দিচ্ছে স্যার। একবার গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে।

নবীন -ঈ! গ্যারেজে নিলে যেন অনেক আগেই ঠিক হতো!

দিনু আড় চোখে নবীনকে দেখে নেয়। তারপর চলে যায়।

দিনুর তেলের জ্যারিকনে হাতে চলে যাবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিচু স্বরে বলে - চোর কোথাকার!

কাট-টু

**দৃশ্য/৮**

দক্ষিণ কলকাতার পুরোনো একটি গলি দিয়ে নবীনের গাড়ি চুকছে। থামে আরো পুরোনো একটি বাড়ির সামনে। নবীনের বাড়ি। নবীন গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

দিনু পেছন থেকে ডাকে - স্যার, গাড়ি তুলে দেবো?

নবীন বলে - হ্যাঁ।

দিনু - স্যার।

নবীন ঘুরে দাঁড়ায়। বলে - আবার কি?

দিনু - একশো টাকা অ্যাডভান্স স্যার। বৌটার অসুখ। দু-মাসে কেটে নেবেন।

নবীন বলে - কোন বৌ? এক না দুই, কোন নম্বর?

দিনু একটু চুপ করে থেকে বলে - এক স্যার।

নবীন বলে - সতি না বানাচ্ছে?

দিনু - বানাচ্ছি না স্যার। আজ তিনদিন অসুখ।

নবীন পকেট থেকে ব্যাগ বার করে একশো টাকা দেয়। দিনু চলে যেতে গেলে নবীন ডাকে।

-দিনু শোন।

নবীনের গলায় একটু ইতস্তত ভাব। দিনু এলে নবীন বলে - আচ্ছা দিনু, দু দুটো বৌকে

একসঙ্গে কি করে সামলাও বলাতো?

দিনু একটু হেসে বলে - সে আছে স্যার।

নবীন - সে আছে মানে?

একটু থেমে দিনু আবার বলে - একসঙ্গে না স্যার। আর একদিন বোলবো।

নবীনের মুখ। সে মুখে বিষময় ও কৌতুহল দুই-ই মেশানো।

**দৃশ্য/৯**

নবীনের ঘর

নবীনের বৌ বেলা টেলিফোনে কথা বলছে।

বেলা - কুশল, আমি মা বলছি। কেমন আছিস? এতদিন ফোন করিসনি কেন?

টেলিফোনে কুশলের গলা শোনা যায় - এতদিন কোথায়, সাতদিন তো মোটে ফোন করিনি।

বেলা - তোকে না বলছি প্রতিবে সপ্তাহে ফোন করবি? শরীর কেমন আছে?

- ভালো। তুমি কেমন আছো?

বাইরে থেকে দরজায় বেলের শব্দ শোনা যায়। বেলা রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে বলে - মিনু,





দিনু বলে - কে আবার, আমি। দরজা খোল।

দরজা খুলে যায়। একটি বছর কুড়ি/বাইশের বিবাহিত মেয়ের মুখ।

মেয়েটি যে একটু সেজেছে দেখলে বোঝা যায়। দরজা খুলে মেয়েটি বলে - এত দেরি করলে? দিনু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে - দেরি হয়ে গেল। আলো জ্বালাসনি।

বৌটি বলে - এই মাত্র তো মা বাড়ি গেল। জ্বালাচ্ছি। মা কিন্তু তোমার ওপর খুব খেপেছে!

দিনু জামা ছাড়তে ছাড়তে বলে - কেন?

বৌটি বলে - সেই আগের দিন মাকে বললে না এ শনিবার ছ'টার শো-এ সিনেমা দেখাবে? মা সকাল সকাল এসে জামাই-এর জন্যে চিংড়ির বাল রান্না করে শেষে বসে বসে চলে গেল।

দিনু বলে - যা, ভুলেই গিয়েছিলাম। যাকগে, ভালোই হয়েছে। তোর মাটা শালা বড় ভজর ভজর করে মালতিকে একটা রুপোর বালা করে দাও, মালতির জন্যে পোস্টা পিসে টাকা জমা করাও, ঘরের চালটা সারিয়ে দাও, হেন ত্যানো সাতগন্ডা!

মালতি - মা'র নামে ফালতু কতা বলচো কেন? মা নিজের জন্যে কিছু চেয়েছে, না তুমি কখনো কিছু দিয়েছো?

দিনু চুপ করে যায়। তারপর একশো টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে - রাখ। এ মাসটা একটু টাইট আছে। চালিয়ে নিস। আগের দিন মালের বোতলটা কোথায় রেখেছিস রে মালতি? মালতি কোন কথা না বলে দেশি-মদের একটা বোতল আর গ্লাস সামনে রাখে। তারপর টাকটা নেয়। মুখ দেখলে বোঝা যায় সে একটু চটেছে।

দিনু গ্লাসে মদ ঢালে তারপর একটোকে খেয়ে নেয়। হাত দিয়ে মুখ মুছে মালতির দিকে তাকায়। মালতির মুখ তখনো চটে আছে।

দিনু বলে - তোর এই দোষ, মা'র সম্বন্ধে কিছু বললেই হলো! মুখটা সঙ্গে সঙ্গে হাড়ি! বেশ তো সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে তোর মুখে কেউ হেগে...

মালতি - খিঁচি করলে কিন্তু আমি এখনুনি মা'র বাড়ি চলে যাবো।

দিনু - যা-শালা।

দিনু আবার খানিকটা মদ ঢালে। এক চুমুকে সবটা খেয়ে নিয়ে বলে - এই মালতি, একটা জগায় যাবি?

মালতি'র রাগ একটু পড়েছে। বলে - কোথায়?

দিনু - যে জায়গাটায় বিয়ের আগে সেই ইংলিশ ছবিটা দেখে তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম তারপর চক চক করে একশোটা চুমু খেয়েছিলাম শালা সেই হিরোটোর মত করে।

মালতি'র মুখ। সামান্য হাসি ফুটে ওঠে সেই মুখে।

দিনু মদের বোতল আর গ্লাসটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে প্রায় ছোটোর ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে - দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছুটে আয়।

কাট-টু

## দৃশ্য/১৩

রাত্রি।

নদীর ধার। হাতে মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে দিনু ছুটে এসে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়। মালতি ঢোকে, ছুটে চলে যায় সেও।

কাট-টু

## দৃশ্য/১৪

নদীর ধারের কেল্লা। সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওপরে উঠছে দিনু আর মালতি। কেল্লার ওপর। নদীর ওপর জোৎস্না এসে পড়েছে। দিনুকে দেখা যায় আবার গ্লাসে মদ ঢালতে। একটোকে খেয়ে দিনু বলে - আ- ফাস্ত্লাস লাগছে। যেন শালা লাটের বাট!

আর তুই শালা লাটের বিবি!

মালতি ফ্রেমে ঢোকে। তারপর বলে - হ-! আমি তো লাটের ঝি! বিবি থাকে কলকাতায়! তোমাকে একদিন পুলিশ ধরবে ঠিক দেখো।

দিনু - কেন পুলিশ ধরবে কেন?

মালতি - এখানে একটা বৌ, কলকাতায় একটা!

দিনুর মুখে রাগ এসে জমে। দিনু বলে - এবার কিন্তু শালা তুই ফালতু বকছিস। মেজাজটা সবে এসেছে, এখন অন্য রকম করিস না। একটু থেমে দিনু বলে - একটা গান গা।

মালতি - কোন গানটা?

দিনু - এ কি যেন, আগে গাইতিস, এই যে সেই 'এমন জোছনায় তোমার ভাতার আমার বিছনায়'।

মালতি - ধুর, আমি এ সব অসভ্য গান গাইবো না।

দিনু - তবে যা ভালো লাগে গা।

মালতি একটু থেমে গান ধরে - তোমার দয়ায় যিশু ফুটিতেছে ফুল ফল...

দিনু - তুই না মাইরি! ধরলি একটা গ্রেটানি গান এই সময়!

গান থামিয়ে মালতি বলে - আমি তো গ্রেটানি।

দিনু - সে তুই যা আছিস সে আছিস। তা বলে...

মালতি - কাল সকালে কিন্তু আমি গিজায় যাবো।

দিনু - যাস। তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ঘুমাবো।

দিনু সরাসরি বোতল তুলে গলায় মদ ঢালে। গিলে নিয়ে মুখ পুছে বলে - ঘুম পাচ্ছে রে মালতি। তুই এবার মা কালী হ, আমি শিব ঠাকুর হয়ে শুয়ে পড়ি।

মালতি - না। অনেক হয়েছে, এবার ঘরে চলে। কাল খুব ব্যস্ত হয়েছে, তেনারা বেরোতে পারে।





একজন সহকারী এসে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু বলে। নবীন মাথা নাড়তে নাড়তে বলে - ডাকো।

দরজা ঠেলে ভিজিটিং রুমে এসে একজন ডাকে - মি: মুখার্জি?

ধূতি পরা আশির ওপর বয়স রোগা এক ভদ্রলোককে তার পাশে বসা মাঝবয়সী একজন ডাকে - বাবা, তোমাকে ডাকছেন।

ভদ্রলোক কিছুম্বিলেন। চোখ মেলে বলেন - হয়ে গ্যাছে?

হেলে - হলে বুঝতে পারতে না! ভেতরে চলো, তোমাকে দেখবেন। ওঠো।

কাট-টু

দৃশ্য/২২

শেষ বিকেল

নবীনের গাড়ি চলছে। রুলকাতার ওপর সূর্য চলতে শুরু করেছে।

গাড়ি চালাচ্ছে দিনু।

নবীন বলে - তোমার বৌ কেমন আছে?

দিনু - একটু ভালো স্যার।

নবীন - হাঁ।

গাড়ি চলছে। ট্রাফিক-সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ায়। নবীন বলে - আচ্ছা দিনু, আমি তোমাকে কত দি?

দিনু - দেড় হাজার।

নবীন - ওভারটাইম?

দিনু - চার/পাঁচশো।

নবীন - পুজো বোনাস? মেডিকেল? জামাকাপড়?

দিনু - সব দেন। কেন জিজ্ঞেস করছেন স্যার?

নবীন - এতে তোমার দুটো সংসার চলে যায়?

দিনু - ঐ আর কি! এদিক ওদিক থেকে কিছু আসে।

নবীন - এদিক ওদিক মানে? ডেল-টেল তো এদিক ওদিক করো বুঝতে পারি, তা ছাড়া?

দিনু - কেন স্যার, আপনি তো জানেন আমি ভালো মেকানিক। ছুটির দিন প্রাইভেট ভাবে টুকটাক গাড়িটাড়ি সারাই।

একটু থেমে বলে - তাতেও চলে না স্যার। কষ্ট হয়।

নবীন - তা কষ্ট করে দুটো বিয়ে করলে কেন?

দিনু - সে আছে স্যার। আর একদিন বলবো।

ট্রাফিক সিগন্যাল ছেড়ে দেয়। গাড়ি আবার চলতে শুরু করে।

কাট-টু

দৃশ্য/২৩

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

নবীনের গাড়ি এসে থামে নবীনের বাড়ির সামনে। নবীন ব্যাগ নিয়ে নেমে যায়। দিনু বলে - তুলে দেব স্যার?

নবীন হাঁ বলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু বলবে বলে তাকায় দিনুর দিকে। এগিয়ে এসে বলে - আচ্ছা দিনু, তোমার বৌরা সব জানে?

দিনু কোন উত্তর না দিয়ে অঙ্কুত মুখ করে হাসে।

নবীন বলে - অঙ্কুত! একদিন দেখাবে ওদের?

দিনুর মুখে অঙ্কুত সেই হাসি। দিনু বলে - কি যে বলেন স্যার!

দিনু গাড়ি স্টার্ট দেয়।

কাট - টু

দৃশ্য/২৪

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজায় নবীন।

ঘরের ভেতর বেলা বড় একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে বের হবার জন্য সাজগোজের শেষ পর্ব সারছে। বেল শুনে সামান্য বিরক্ত হয়। ভেতরের ঘর থেকে বসার ঘর দিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

দরজা খুলে দেয় বেলা।

নবীন ঘরে ঢোকে।

সজ্জল পরিবারের মোটামুটি সাজানো ঘর। ঘরে ঢোকে নবীন। একটা চেয়ারে বসে নবীন। বেলা আবার ঘরে ঢুকে যায় সাজ শেষ করার জন্য। নবীন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে - একটু চা হবে?

বেলার গলা শোনা যায় - হবে। আর পাঁচ মিনিট পরে হলেই আমাকে পেতে না। আমি একটু বের হচ্ছি। একটু দেরি হতে পারে। চা'এর জলটা বসিয়ে দিলে তৈরী করে নিতে পারবে? বেলা তার কথার শেষ অংশ নবীনের কাছে এসে বলে।

নবীন বলে - পারবো। মিনু কোথায় গেছে?

বেলা - মিনুকে বাজারে পাঠিয়েছি। একটু অপেক্ষা করলে ও এসে চা করে দেবে। চা-এর জল বসিয়ে দেবো?

নবীন - থাক। মিনু এসেই করে দেবে।

বেলা - তুমি কিছুদিন ধরে তাড়াতাড়ি চলে আসছে চেষ্টার থেকে?

নবীন - কেন, তোমার অসুবিধা হচ্ছে?

বেলা আহত দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বলে - সত্যি। যাক।

হোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেলা বলে - আমি যাচ্ছি। নীলামা জোরজোর করলে হয়তো খেয়ে

আসতে পারি।

যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় বেলা। নবীনকে বলে - তোমার মা'র একটা চিঠি এসেছে। ওই টেবিলের ওপরে।

নবীন - কি লিখেছেন?

বেলা - এনভেলপ্‌। খুলিনি।

নবীন - মা'র চিঠি খোলানি?

বেলা - তুমি তো জানো অন্যের চিঠি খুলে পড়ার অভ্যাস আমার নেই।

বেলা নবীনের দিকে তাকায়। নবীনের মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ে মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। নবীন বলে - তুমি যেভাবে বললে তাতে মনে হতে পারে আমার আছে।

বেলা - নেই? আমার চিঠি খুলে পড়ো না তুমি?

নবীন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

বেলা বলে - যাকগে আমি যাচ্ছি।

বেলা চলে যাবার জন্য এগিয়ে গেলে নবীন জকে। ওর গলায় অনুতাপ জড়ানো।

নবীন - বেলা।

বেলা ঘুরে দাঁড়ায়।

নবীন - বেলা, তুমি সত্যি বিশ্বাস করো সেদিন তোমার গায়ে আমি হাত তুলতে গিয়েছিলাম?

বেলার চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে। একটু চুপ করে থেকে বেলা বলে - আমি যাচ্ছি।

নবীনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা যায়।

কাট - টু

**দৃশ্য/২৫**

রাত্রি। নবীনের ঘর

টেবিলের ওপর একটা খামের ওপর নবীনের হাত এসে পড়ে। খাম ভুলে নিয়ে ছিড়ে নবীনের হাত চিঠি বার করে। ক্যামেরা নবীনের মুখের ওপর এসে মুখের আরো কাছে এগিয়ে যায়। মা'র চিঠি পড়ছে নবীন।

কাট - টু

**দৃশ্য/২৫এ**

টেলিভিশন-এ দেখা যায় বাগি গা-এ বিশাল লম্বা দাড়ির একজনকে, মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে আছে তার গৌরব ও দাড়ি। একজন প্রশ্ন করছে তাকে - আপনার বয়স কত?

লোকটি - ৬১ বছর।

প্রশ্নকর্তা - আপনার গৌরবের বয়স কত?

লোকটি - ঐ ৬১।

প্রশ্নকর্তা একটু বিস্ময় নিয়ে বলে - মানে আপনার এক বছর বয়স থেকেই গৌরবদাড়ি গজিয়ে যাচ্ছে?

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

লোকটি একটু হেসে বলে - না, মানে আমি জন্ম থেকে ওসব কাটিনি আর কি!

ক্যামেরা আস্তে আস্তে টেলিভিশন-এর সামনে দিয়ে রাউন্ড টুলিতে ঘুরে যেতে থাকে। সামনে বসে থাকা নবীনকে দেখা যেতে থাকে। শোনা যেতে থাকে দাড়িওয়ালা লোকটি আর প্রশ্নকর্তার কথাবার্তা।

- আপনার গৌরব লম্বায় কতটা?

- ন'ফুট চার ইন্চ করে দু'দিকে, মোট আঠারো ফুট আট ইন্চ।

- এত বড় গৌরব পরিষ্কার রাখেন কি ভাবে?

- নিজে যতটুকু পারি করি। তাছাড়া লোক আছে, সপ্তাহে একদিন পরিষ্কার করে দিয়ে যায়।

-- তার মানে অনেক খরচ বলুন।

- তা একটু আছে। তবে আমার অন্য অনেক খরচ নেই যেসব আপনাদের আছে।

- যেমন?

- যেমন নেশা-ভাঙ্গ করি না। থেরোটর-বায়োস্কোপ দেখি না। মেয়েছেলে-বাড়ি যাই না।

মানে আমার সেক্স-এর পেছনেও কোন খরচ নেই!

- বিয়ে করেন নি?

- না! হয় নি। গৌরবদাড়ি শুদ্ধ বিয়ে করতে কোন মেয়ে রাজি হয়নি।

- গিনিস্ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ নাম পাঠান নি?

- আর দু'ইন্চের জন্য অপেক্ষা করছি।

**দৃশ্য/২৫ (Contd.)**

এ সব কথাবার্তার শেষ অংশ শোনা যায় (ক্যামেরা নবীনের মুখের ওপর)। নবীনের চোখ বেজা। টেলিভিশন-এর শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে এবং তার ওপর ভেসে ওঠে এক বৃষ্কার স্বর।

“সেহেরে নবীন, আজ প্রায় দুই মাস তোমার কোন পত্র পাই নাই। আমার আগের পত্রেরও তুমি কোন উত্তর দাও নাই। তুমি ছাড়া ইহ জগতে আমার চিন্তা করিবার মত আর কিছু নাই। তাই বর্ষদিন তোমার খবর না পাইলে স্বাভাবিক কারণেই দুশ্চিন্তা হয়। তুমি কেমন আছো? বৌমা কেমন আছেন? কুশলদাদু কেমন আছেন? এই বয়সে তাহাকে একা একা বাড়ি-এ রাখাটা আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না। যাই হোক পত্রপাঠ সব খবর জানাইবা। মা ইহাও তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নাই, কেননা কোন প্রয়োজন পড়ে নাই। তুমি অবশ্যই পুত্রের কর্তব্য করিতে চাহিয়াছো। আমাকে কলিকাতা নিয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছো। আমিই তোমার বাবার স্মৃতি ও তাহার এই বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারি নাই। আমার এই বয়সে তোমার খবর পাইলেই মনে করিব তুমি অনেক কর্তব্য করিয়াছো। প্রায় এক বছর তোমাকে দেখি নাই। আসিবার কথা বলিতে পারি না কেননা বৃষ্টি আমার আর



কোন কাজ না থাকিলেও তোমার অনেক কাজ। তোমার মুখখানি বড় মনে পড়ে। মনে হয় কতদিন দেখি না। আমি ভালো আছি। তবে এ বৎসর খুব শীত পড়িয়াছে। তাই বাতের ব্যাথা আবার জানান দিতেছে যে সে আমাকে ছাড়িয়া এই জন্মে আর কোথাও যাইবে না। আমার বুকভরা ভালবাসা ও স্নেহশির্ষাদ জ্বলিও। ইতি তোমার মা।”

মা’র গলা শোনা যাবার সামান্য পর থেকেই নবীনের মুখের ওপর মেঘের মত কুয়াশা এসে ঢেকে দেয় তার মুখ। সেই মেঘ ও কুয়াশা মিশে যায় চেরাপুন্জির দিনের বেলার মেঘের সঙ্গে।

### দৃশ্য/২৬

(চেরাপুঞ্জি। সকাল)

সেখা যায় নবীনের মা’কে। নবীনের মা জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছেন। তার দু’হাতে ধরা উল বোনার কাটা। হঠাৎ উলের বল তার কোল থেকে খসে পড়ে। ক্যামেরা সিঁড়ির দিকে। নবীনের মা মুখ ফিরিয়ে তাকান সিঁড়ির দিকে তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান জানলার কাছে। নবীনের মার মুখ। তাকিয়ে আছেন দূরে। ক্যামেরা ওই মুখের ওপর নিচে মাটির ওপর বসানো। উলের বল গড়িয়ে গড়িয়ে ওপর থেকে নিচে নামছে। নেমে প্রায় লেগের কাছে পৌঁছে গেছে। দৃশ্যটি স্লো-মোশনে দেখা যাবে।

### মিস্ত্র করে

নবীনের মার তিরিশ বছরের মুখ। তাকিয়ে আছে দূরে।

### দৃশ্য/২৭

সেখা যায় কুয়াশা ও মেঘ উঠে আসছে পাহাড়ের ওপর থেকে, এসে ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিচ্ছে চারদিক। ঘাসের ওপর লাল পিঁপড়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোট নবীন তাকিয়ে দেখছে তাদের। দূর থেকে ডাক শোনা যায় - নবী-ই-ই-ন। নবীন মুখ ঘুরিয়ে তাকায় তারপর দৌড়তে শুরু করে। বাড়ির দরজার সামনে এসে ভেজানো দরজাটা খুলতে গিয়ে হাত সরিয়ে নেয়। বলে :

ছোট মোটি পিঁপড়া বোটি  
লাল দরজা খোল দে।

নবীন ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

### দৃশ্য/২৮

একটু এগিয়ে একটা ঘরের ভেতর সেখা যায় নবীনের বাবাকে। নবীনের বাবা ডাক্তার। ঘরের ভেতর কানে স্টেথো লাগিয়ে রুগী দেখছেন তিনি। দরজার সামনে নবীনকে দেখা যায়। ছোট নবীন বলে - বাবা, তুমি দেখলে না। আজো দরজাটা খুলে গেল। বাবা দরজাটা আমার কথা শুনে পায়। দরজার কি প্রাণ আছে বাবা?

নবীনের বাবা মুখ ঘুরিয়ে তাকান নবীনের দিকে। তারপর স্টেথো খুলে নবীনের কাছে এগিয়ে এসে তার মাথার চুল নাড়িয়ে দেন। হেসে বলেন - দরজাটা তোমাকে খুব ভালবাসে তাই খুলে যায়। ঠিক মত বলতে পারলে সবাই ভালোবাসে, সবাই কথা শোনে। যেমন দরজাটা তোমার কথা শুনেছে!

নবীন বলে - সত্যি?

বাবা - সত্যি।

একটু দূরে নবীনের মাকে দেখা যায়। তিনি হাসছেন। নবীন মা’র কাছে এগিয়ে যায়।

নবীন আর নবীনের মা হেঁটে যাচ্ছে। বাড়ির এক একটা থাম সরে যাচ্ছে।

নবীন বলে - মা, সব গাছের প্রাণ আছে?

মা - আছে।

নবীন - আমাদের এখানে যত গাছটাছ আছে সবার মধ্যে আছে?

মা - আছেইতো।

নবীন - তাহলে এই যে দরজা জানলার জন্য গাছদের কাটে তাতে ওদের লাগে না?

মা - লাগে বৈকি।

নবীন - তাহলে ওরা কোন কিছু বলে না?

মা - ওরা আমাদের দরকারের কথা ভেবে সব সহ্য করে। কিছু বলে না। শুধু বলে আমাদের দেখে তোমরা সহ্য করতে শেখো।

নবীনের মুখ। এই মুখের ওপর দূর থেকে ভেসে আসে নবীনের নাক ডাকার শব্দ।

কাট - টু

### দৃশ্য/২৯

ফ্রেমের বাঁ-দিক থেকে ইন্ করে নবীনের চেয়ারে বসে নাক ডাকতে ডাকতে ঘুমিয়ে পড়া মুখ, নবীনের মুখ ডান দিকের ফ্রেম ঘেঁষে থাকে।

ক্যামেরা নবীনের মুখে রাউন্ড-ট্রলির ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আবার টিভির ওপর আসতে থাকে। মার গলা মিলিয়ে যেতে থাকে। ভেসে আসতে থাকে টিভি থেকে আসা সংবাদ-পাঠকের গলা।

### দৃশ্য/২৯এ

‘গতকাল কলকাতার রাস্তায় আততায়ীর গুলিতে নিহত মহিলার পরিচয় আজ পুলিশ জানতে পেরেছে। মহিলাটির নাম নির্মালা রায়। মৃত্যুর বাড়ি দক্ষিণ কলকাতা এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। খুনের কারণ এখনো পুলিশের কাছে অজ্ঞাত। তবে নিহত নির্মালা রায়ের সঙ্গে তার হত্যাকাারী যে পরিচয় ছিল সে বিষয়ে পুলিশ যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। আততায়ীর সন্ধানে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত চালাচ্ছে।’

খবরের মাঝখানে মৃত নির্মালায় ছবি আবার ভেসে ওঠে পদ্যায়।

দৃশ্য/২৯ (Contd.)

ক্যামেরা আবার ফিরে আসে নবীনের মুখে। তারপর না থেমে এগিয়ে যেতে থাকে বেলার শোবার ঘরে। ঘুরে এসে থামে বেলার মুখের কাছে। বেলার মুখের পেছনে খোলা দরজা। মাঝখানে একটা প্যাসেজ। তার ওপারে বেলার দরজার ঠিক উষ্ট্রাদিক বরাবর নবীনের শোবার ঘরের দরজা।

আলো অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে এসে নবীন নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখ ঘুরিয়ে তাকায় বেলার দিকে। তারপর এসে দাঁড়ায় বেলার ঘরের দরজার কাছে।

নবীন এগিয়ে আসে বেলার খাটের কাছে। দাঁড়ায়। তারপর বেলার ঘুমন্ত মুখের ওপর নামিয়ে আনে তার হাত। বেলার চোঁটের ওপর নামিয়ে আনে তার আঙুল। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে বেল। হঠাৎ এভাবে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্তি ফুটে ওঠে তার মুখে।

বেলা বলে ওঠে - না। কিছুটা রাত শোনায় তার গলা।

নবীনের মুখ। স্নান ও অপমানিতের মত দেখায়। গলার স্বরে তা চেপে রেখে নবীন বলে - তোমাকে বলিনি। কয়েকদিন আগে আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। আমার কিছু হয়নি। বেলা বিছানা থেকে উঠে বসে। তারপর বলে - আমার ভালো লাগছে না।

নবীন তাকায় বেলার দিকে তারপর আন্তে আন্তে ফিরে যেতে থাকে। ক্যামেরার সামনে বেলার মুখ, পেছনে নবীন। বেলার মুখ দেখে মনে হয় সে কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করে কিছু বলতে চাইছে। নবীন বেলার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে যায়। তারপর বেলার স্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বেলা বলে - আমার বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে...। বেলা থেমে আবার বলে - নিজের মধ্যে আর কিছু খুঁজে পাই না।

কান্নায় জড়িয়ে আসে বেলার গলার স্বর।

নবীন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

বেলা বলে - তুমি পাও ?

নবীন কোন কথা বলে না।

বেলা আবার বলে - আমি জানি। তারপর মাথাটা অঙ্গ নবীনের দিকে ঘুরিয়ে বলে - তুমিও না।

নবীন এবারও কোন কথা না বলে আন্তে আন্তে নিজের ঘরে চলে যায়।

আলো নিভে যায় নবীনের ঘরে। আধো অন্ধকারে বেলার মুখ। বেলা কাঁদছে নিশ্চয়।

ক্যামেরা আবার ফিরে আসতে থাকে টেলিভিশনের কাছে। বেলার চাপা কান্নার স্বর মিশে যায় টেলিভিশনের শব্দের সঙ্গে। দেখা যায় হিন্দি ছবির একটি মারামারির দৃশ্য।

কাট - টু

দৃশ্য/৩০

দিনের শুরু। নিলীমার বাড়ি

নিলীমা - কি হয়েছে তোর ?

বেলা - মন ভালো নেই। তোর স্কুলে আমার চাকরিটা হচ্ছে কি না বল ?

নিলীমা - হচ্ছে। আপাতত এক বছরের লিভ-ভ্যাকেশনে। কিন্তু কি ব্যাপার বলতো ? তোদের কি হয়েছে ?

বেলা - আমি আর পারছি না ওর সঙ্গে থাকতে। অনেকদিন তো একসঙ্গে থাকলাম, কি লাভ হলো ?

নিলীমা - স্বামী-স্ত্রী তো একসঙ্গেই থাকবে, এতে লাভ লোকসানের কি আছে ?

বেলা - আছে। কোন সম্পর্কই যেখানে এতদিনে গড়ে ওঠেনি সেখানে এভাবে থাকাটা কেমন যেন ঠাকানো বলে মনে হয়।

নিলীমা - এভাবেই তো সবাই বেঁচে থাকে। আমি আছি না।

বেলা - সবার কথা জানি না। আমি থাকতে চাই না। ও সেদিন আমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলতে গিয়েছিল।

নিলীমা - কেন ?

বেলা - আমি অন্য ঘরে শুই আজকাল। তখন কুশল ছিল। সেদিন ও চাইছিল আমি ওর ঘরে শুই, রাজি না হওয়ায়...। খুব খারাপ সমস্ত কথা বলেছিল। কুশলের সামনে। সেই থেকে কুশল ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে চায় না।

নিলীমা - সে কি, কেন ?

বেলা - ওর সঙ্গে শুতে আমার ভয় হয়। কেমন যেন শক্ত, লোহার মত লাগে ওর শরীর। দম বন্ধ হয়ে আসে।

নিলীমা - কি বলছিস কি তুই ?

বেলা একটু থেমে বলে - ও আমাকে আজকাল সন্দেহ করে। চিঠি খুলে পড়ে। কয়েকটা চিঠি খুঁজে পাচ্ছি না। ও ছাড়া কেউ নেয়নি আমি জানি।

নিলীমা - কার চিঠি ?

বেলা কোন উত্তর না দিয়ে বলে - আচ্ছা নিলীমা, ধর নতুন করে কেউ যদি সব জেনে তোকে ভালবাসতে চায় যাকে তুইও একদিন ভালবাসতিস, তাহলে ?

নিলীমা বেলাকে দেখে নেয়। তারপর বলে - আমি ওসব ভাবিচি না। এক ঘরে থাকলে এক বিছানায় শুতে হয়। মাঝে মাঝে একসঙ্গে বেড়াতে যেতে হয়। ভেজা ভেজা গলায় কথা বলতে হয়। ব্যাস! অন্য কিছু ভেবে কি করবো। কিছু করতে তো পারবো না! তারচে...।

তোরো তো ভালবেসে বিয়ে করেছিলি ?

বেলার চোখে জলের আভাস দেখা যায়। বেলা বলে - ওকে ভালবাসি না আর ভালবে খুব কষ্ট হয়। তোর স্কুলের চাকরিটা পেয়ে গেলে নিজের খরচটা অন্তত চালাতে পারবো।

নিলীমা বলে - বললাম তো হয়ে যাবে। অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে কাল-পরশু স্কুলে চলে আস।



আমি এবার হান করতে যাই রে, স্কুলের দেবি হয়ে যাচ্ছে।

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিলীমা বলে - তুই বললি না তো কার চিঠি?

কাট - টু

### দৃশ্য/৩১

একটা গলি দিয়ে হেঁটে এসে একটা বাড়ির বন্ধ দরজার বেল বাজায় বেলা। দরজা খুলে যায়। চল্লিশ বোয়ালিশ বছরের একজন পুরুষ বেরিয়ে আসে। বেলার দিকে তাকিয়ে হাসে। হাসে বেলাও। বেলা ভেতরে ঢোকে। পুরুষটি দরজা বন্ধ করে দেয়।

কাট - টু

ক্যামেরা অর্পণের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বেলা ব্যাক টু ক্যামেরা দরজার সামনে আসে। দরজা নক করে। অর্পণ দরজা খুলে দেয়। বেলা ঘরে ঢোকে। অর্পণ দরজা বন্ধ করে দেয়।

### দৃশ্য/৩২

দিনু গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে বসে নবীন ঢুলছে। দিনু সামনের কাঁচে দেখতে পাচ্ছে নবীনকে। দিনু সামান্য মুখ ঘুরিয়ে বলে - স্যারের শরীর খারাপ নাকি?

নবীন চোখ মেলে তাকায়। সোজা হয়ে বসে। তারপর বলে - না।

দিনু - রাতে ঘুম হয়নি স্যার?

নবীন কথা না বলে গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। জানলার বাইরে দ্রুত সরে যাচ্ছে কলকাতার রাস্তাঘাট। নবীন সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দিনুকে বলে - দিনু একটু থামাও তো।

দিনু গাড়ি থামায়। নবীন তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় দিনুর দিকে। বলে - দিনু, হাতটা ধরে দেখাও তো, শক্ত শক্ত লাগছে?

দিনু অবাক হয়ে তাকায়, তারপর ধরে বলে - না তো। কেন স্যার?

নবীন হাতটা সরিয়ে নেয়। কোন কথা বলে না।

দিনু - যাবো স্যার?

নবীন মাথা নাড়ে।

দিনু গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলে - কয়েক দিন স্যার চেয়ার বন্ধ করে দিন। কোথাও ঘুরে আসুন বৌদিকে নিয়ে। সব সময় পোকা খাওয়া দাঁতের ভেতর তাকিয়ে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে স্যার।

কাট - টু

### দৃশ্য/৩৩

নবীনের চেয়ারের ডাক্তারের অপেক্ষায় বসে থাকা লোকজনদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ একজনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে নবীন। লোকটি অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা, চেহারায় কোথাও একটা গোপন ক্রুরতা আছে - মুখময় বসন্তের গভীর ক্ষতের দাগ - থলথলে শরীর ও ভোতা নাক - লোকটি মধ্যবয়স্ক এবং পরনে লুজি। লোকটিকে আগে দেখা গেছে। লোকটি নবীনকে দেখে কপালে আলগা করে হাত তুলে সেলামের ভঙ্গি করে। নবীন সামান্য দাঁড়ায়। লোকটিকে দেখে কিছু মনে করার চেষ্টা করে। তারপর মুখ সরিয়ে নিয়ে তার চেয়ারে ঢুকে পড়ে।

চেয়ারের ভেতর।

একজনের বড় করে রাখা হাঁ-এর ভেতরের অংশ ক্যামেরায় যতটা সম্ভব ধরা যায় ধরে আছে। সারি সারি অদ্ভুত দর্শন দাঁত, মাঝে দু-একটা নেই। নবীনের আঙুলে ধরা একটা সুরু জিনিস এক একটা দাঁত নেড়ে নেড়ে দেখছে।

নবীনের হাঁ-এর কাছে যুকে পড়া মুখ উঠে দাঁড়ায়। নবীন বলে - প্রায় সবকটা দাঁতই খারাপ। ফেলে দিয়ে নতুন করে বাঁধাতে হবে। হাঁ-করা মুখটি থেকে ক্যামেরা সরে এলে দেখা যায় মুখটি একটু আগের সেই অদ্ভুত দর্শন লোকটির। লোকটি সামনে রাখা গ্লাসের জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিয়ে বলে - সে তো অনেক খুঁট ঝামেলা আর বহু টাকার ব্যাপার ডাগদারবাবু!

নবীন হাত ধুতে ধুতে তার এসিস্টেন্টকে বলে - এর পর কে আছে ডাকো।

লোকটি বলে - ডাগদারবাবু, কত লাগবে তাইলে?

নবীন - আড়াই হাজারের মত। ছ-সাতদিন আসতে হবে। সেট করার পর আরো দু'একদিন। লোকটি অদ্ভুত ভাবে মাথা দু'একবার নেড়ে বলে - অ। এখন কত?

নবীন - একশো।

লোকটি আবার আগের মত মাথা নেড়ে বলে - অ।

নবীন প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলে - কি নাম?

লোকটি - কিশোরী সিং।

নবীন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে - আপনি, মানে তুমি কি করো?

লোকটি অদ্ভুত ভাবে বলে - অনেক কাম-কাজ করি। কেন ডাগদারবাবু?

নবীন তার গলা স্বাভাবিক করে বলে - আগে আমাকে দেখিয়েছো?

লোকটি - নাহি তো। কিউ ডাগদারবাবু?

নবীন - চেনা চেনা লাগছে। কোথায় তোমাকে দেখেছি বলতো?

লোকটি - ক্যামা মালুম সাব।

নবীন তার এসিস্টেন্টকে বলে - এরপর কে আছে?

কাট - টু

**দৃশ্য/৩৪****শেষ বিকেল**

নবীনের চেয়ার। কেউ নেই। নবীন একা। তার ব্যাগের ভেতর থেকে কতগুলো পুরোনো চিঠি বের করছে নবীন। পড়ছে একটার পর একটা। চিঠিগুলো বেলার। একটা চিঠির ওপর ঠিকানা লেখা। ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নেয় নবীন।

কাট্ - টু

**কলকাতার রাস্তা**

দিনু গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনে বসে নবীন।

কাট্ - টু

**দৃশ্য/৩৫**

বেলা ও সেই পুরুষটি। সেই ঘর।

পুরুষটি বেলার মুখ দু'হাত দিয়ে ধরে কাছে নিয়ে আসে। তাকায়। তাকায় বেলাও। আরো কাছে আসতে গেলে বেলা বলে - না। ছাড়াই। পুরুষটি স্নান হেসে হাত নামিয়ে নেয়। তারপর বলে - ভাবছিলাম আজও বোধহয় তুমি এলে না। আর একটু দেরি হলেই অফিসে চলে যাচ্ছিলাম।

বেলা - তুমি আর চিঠি লিখো না। কি হবে এখন আর এসব লিখে।

পুরুষটি - উনিশ বছর আগে তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছিলাম। তারপর থেকে কত কি লেখার জন্য জমে আছে। মাঝে তোমাকে দুদিন ফোন করতে গিয়ে ডং দত্তের গলা পেয়ে আর কথা বলিনি।

বেলা - তুমি বিয়ে করলে না কেন?

পুরুষটি - তোমাকে বিয়ে করতে পারলাম না তাই!

বেলা - মাসীমা, মেসোমশাই মারা যাবার খবর কার কাছে যেন শুনেছিলাম। কতকাল পরে এলাম! এত বড় বাড়ি একা একা খারাপ লাগে না?

পুরুষটি হাসে। তারপর বলে - এত বছর পর হঠাৎ সেদিন তোমাকে দেখে অদ্ভুত লাগছিল।

বেলা স্নান অথচ সুন্দর করে হাসে। তারপর বলে - অনেক পাস্টে গেছি! বুড়িয়ে গেছি, তাই না?

পুরুষটি কিছু না বলে হাসে।

বেলা বলে - রাস্তায় তো কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। কি করে যেন তোমার সঙ্গেই কখনো দেখা হয়নি।

একটু থেমে বেলা আবার বলে - তখন মনে হতো নবীনকে না পেলে কষ্ট পাবো। তার কয়েক বছর পর থেকেই সব কেমন বদলে যেতে লাগলো। তখন তোমার কথা মনে পড়তো মাঝে মাঝে।

বেলা চুপ করে যায়।

পুরুষটি বলে - বেলা, আমরা আবার নতুন করে শুরু করতে পারি না?

বেলা - না। কয়েক মাস আগে তোমার সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন একটা সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে টের পাচ্ছিলাম। এখন মনে হয় এটাও যদি ভেঙে যায়?

একটু থেমে আবার বলে বেলা - আসলে সম্পর্ক ব্যাপারটিই খুব জটিল। আমি আর জড়াতে চাই না। তাছাড়া...

পুরুষটি তাকায় বেলার দিকে। বেলা অন্য দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে - তাছাড়া, এখন আমি একা থাকতে চাই। কুশল আছে...

বেলার কথা শেষ হবার আগেই ওর মুশের ওপর বাইরে রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা যায়। বেলা মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকায়।

**দৃশ্য/৩৬**

রাস্তার সামনে একটা গাড়ি এসে ব্রেক কষে থামে। গাড়ির ভেতর নবীন। দিনু সামনে।

নবীন বলে - এটাই এগারোর বি। থামো।

নবীন গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটির দিকে এগিয়ে যায়। বেল বাজায়। নবীন দাড়িয়ে থাকে।

একটু পরে দরজা খোলে ওই পুরুষটি। জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাকায়। - কাকে চান?

নবীন - অর্ণব রায়?

পুরুষটি - আমিই অর্ণব রায়। কি চান বলুন?

নবীন দখতে থাকে অর্ণবকে। তার মুখ আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে ওঠে। হিংস্র দেখায় তার মুখ।

কাট্ - টু

ঘরের ভেতর বেলার মুখ। সে মুখে ভয় ছাড়া কিছু নেই।

কাট্ - টু

নবীন চলে আসছে। তার মুখ আগের মতই শক্ত ও হিংস্র।

অর্ণবের মুখ। কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছে চলে যাওয়া নবীনের দিকে।

কাট্ - টু

**দৃশ্য/৩৭****সন্ধ্যা হয়ে এসেছে**

কলকাতার রাস্তা। বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছে দিনু। নবীন বাইরে তাকিয়ে আছে। করুণ তার চোখ। কনুই দিয়ে চোখটা মুছে নেবার চেষ্টা করে। দিনুর দিকে তাকিয়ে বলে - এত জোরে চালিও না।

দিনু - মাঝে মাঝে স্যার গাড়ির দমটা দেখে নিই। ঠিক আছে আস্তে চালাচ্ছি।



একটু থেমে দিনু বলে - এবার একটা নতুন গাড়ি কিনে নিন। বাজারে কত নতুন গাড়ি এসে গেছে। দশ বছর একই গাড়ি চড়ছেন স্যার! আমিও স্যার একটু হাত খুলে চালাই।

নবীন কোন কথা বলে না।

দিনু আপন মনেই বলতে থাকে - মাঝে মাঝে বদলালে ভালো লাগে। পুরোনোটা থাকলো। নতুনটা আবার একঘেয়ে লাগলে এটায় চড়ে নেবেন কয়েকদিন। তখন দেখবেন এটা আবার ভালো লাগছে। এটা আবার খারাপ লাগলে অন্যটা চড়বেন। নতুনটা পুরোনো হয়ে গেলে আর একটা কিনে নেবেন। সবওলেই থাকলো। যখন যেটা খুশি চড়বেন।

নবীন দিনুর দিকে তাকায়। বলে - তোমার মত থাকতে পারলে খুব ভালো হতো দিনু।

দিনু নিশ্চয় অদ্ভুত ভাবে হাসে।

নবীন বলে - দিনু, তুমি এতদিন ধরে তো আমার গাড়ি চালাচ্ছে, আমি কোন্ জায়গা থেকে এসেছি এই শহরে, আমার বাড়ি কোথায় ছিল, আমার বাবা কি করতেন, মা কোথায় আছেন, আমরা ক ভাই বোন, জানো?

দিনু - না স্যার।

নবীন - কিছু জানতে হচ্ছে হয় না আমার সম্বন্ধে, আগ্রহ হয় না?

দিনু - না স্যার। আপনি মালিক, আমি ড্রাইভার। আমি কি জানবো স্যার!

দিনু আবার অদ্ভুত ভাবে হাসে।

বাস্তায় কি দেখে উত্তেজিত হয়ে নবীন বলে - গাড়ি থামাও দিনু।

দিনু গাড়ি থামিয়ে বলে - কেন স্যার, কিছু হয়েছে স্যার?

নবীন - কিছু না। তুমি বাড়ি চলে যাও গাড়ি নিয়ে।

নবীন গাড়ি থেকে নেমে যায়।

### দৃশ্য/৩৮

প্রথম দৃশ্যে দেখা একটি মেয়েকে গুলি করে মেরেছিল যে লোকটি, তাকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। পেছনে দেখা যায় নবীন দ্রুত হেঁটে এগিয়ে আসছে। লোকটির সামনে এসে দাঁড়ায় নবীন। লোকটিও দাঁড়ায়। নবীনকে দেখে। তারপর ছুটতে শুরু করে। ছুটতে শুরু করে নবীনও। লোকটি একটি সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়ে। নবীন পেছনে পেছনে আসে। লোকটি হারিয়ে যায় এক সময়। নবীন দাঁড়িয়ে পড়ে।

### দৃশ্য/৩৯

একটি পুরোনো বাড়ির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে নবীন। সিঁড়িটি শুকুর দিকে দেখা গেছে। নবীন উঠছে। মনে হচ্ছে নবীন খুব ক্লান্ত।

কাট - টু

### দৃশ্য/৪০

ডাক্তার - কেমন আছেন?

নবীন - ভালো নেই। আপনি কি আমাকে আর একবার দেখবেন?

ডাক্তার - না। কেমন লাগছে?

নবীন - মাঝে মাঝেই সমস্ত শরীর শক্ত শক্ত লাগে। কোন কিছু ভালো লাগছে না।

ডাক্তার - ভালো লাগার কোন মানুষ নেই?

নবীন কোন উত্তর দেয় না।

ডাক্তার - ভালোবাসার কোন মানুষ নেই?

নবীন এবারও উত্তর দেয় না।

ডাক্তার - স্বপ্ন দেখেন?

নবীন - আগে দেখতাম। আজকাল আর দেখিনা।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলে - এই ট্যাবলেটটা নতুন এসেছে। রোজ দুটো করে একমাস খান। দেখবেন ভালো হয়ে যাচ্ছেন।

নবীন বলে - আজকাল জেগে জেগে অন্য জিনিস দেখতে পাই।

ডাক্তার - কি?

নবীন - বিশাল বড় বড় হাঁ, তার ভেতর থেকে উঠে আসছে অন্ধকার আর শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে।

ডাক্তার হেসে ওঠে। হো হো করে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে থাকে।

কাট - টু

### দৃশ্য/৪১

সিঁড়ি দিয়ে নামছে নবীন। অন্য দিক থেকে উঠে আসছে কিশোরী সিং, তার সঙ্গে উঠে আসে অদ্ভুত দর্শন আরো দুজন। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে, কড়া তর্ক করতে করতে উঠে আসছে তারা। নবীনকে দেখতে পায়নি কিশোরী সিং। হঠাৎ পাশের একজনের কলার চেপে ধরে কিশোরী সিং। তারপর জোরে পেটে ঘুসি মারে। লোকটি পেট চেপে বসে পড়ে। কিশোরী অন্য পাশের লোকটিকে বলে - উসকো কভি হামরা পাস নেহি লেকে আনা। হামকো আঁখ দিখাতা হ্যায়। শালা, মা কি...। কথা শেষ হবার আগেই এসব দেখে ওপরে দাঁড়িয়ে পড়া নবীনের দিকে নজর যায় কিশোরীর। যেম কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বলে - সেলাম ডাগদারসাব। আপনি এখানে আসেন নাকি?

নবীন মাথা নাড়ে।

কিশোরী সিং বলে - তো ফির এখানেই দেখেছেন।

নবীন হাতটা একটু তোলে। তারপর নিচে নেমে আসতে থাকে।

উপরে উঠে আসতে থাকে কিশোরী।

নবীন অনেকটা নেমে এসে ওপরে তাকায়। কিশোরী ওপরে উঠে চলেছে পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে। অন্য লোকটি তখনো পেটে হাত দিয়ে বসে আছে।

কাট - টু

দৃশ্য/৪২

নবীনের গাড়ি একটা জায়গায় পার্ক করা। দিনকে দেখা যায় গাড়ির পেট্রল-ক্যাপ খুলে তার মধ্যে একটা সরু পলিথিনের পাইপ ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে টেনে তেল ঢালছে একটা জ্যারিকেনে। বেশ কিছুটা তেল বেরিয়ে এলে দিনু পাইপটা বের করে এনে পেট্রল-ক্যাপটা আবার লাগিয়ে দেয়। তারপর জ্যারিকেন হাতে হটতে শুরু করে। সামনে একটা সরু গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে রিক্সা নিয়ে বসে আছে ১২/১৩ বছরের একটা মেয়ে। দিনু রিক্সার কাছে এলে মেয়েটি ওপরে সিটে উঠে বসে। রিক্সা গলির ভেতর চলতে শুরু করে। দিনু রিক্সাওয়ালাকে বলে - কিরে নুরুল, আজ কত হলো? নুরুল - খুব, আজ মহিরি বিশ্বাস করবে না সকাল থেকে সবগুলো শালা মোটা মোটা লাশ টানছি। কতদিন বলাছি, গাড়ি চালামোটা এবার শিখিয়ে দাও দিনুদা। সাবিনার আব্বাটা শালা কাল বলে দিয়েছে ড্রাইভার না হলে মেয়েটার নিকা করিয়ে দেবে। দিনু হেসে বলে - তালে তো সতিই তোকে শেখাতে হয়। দিনুর পাশে বসা মেয়েটা বলে - বাবা, কাল স্কুলের মাইনে না দিলে কিন্তু স্কুলে ঢুকতে দেবে না বলেছে। হা। দিনু - দিবি দিবি। মাকে বলিস একটু মাংস নিয়ে আসতে। আমি গাড়ি তুলে দিয়ে আসছি। বাবু শালা কাকে দেখে দৌড়েলাকে কো জানে। এই নুরুল, গ্যারাজ থেকে আমাকে গাড়ির সামনে নামিয়ে বাসন্তিকে পৌঁছে দিবি। গরম গরম আলুর চপ খাবি বাসন্তি? বাসন্তি খুশি হয়ে মাথা নাড়ে।

দৃশ্য/৪৩

একটা ছোট গ্যারেজের সামনে রিক্সা দাঁড়ায়। দিনু জ্যারিকেন হাতে নেমে প্রায় দৌড়ে গ্যারেজের ভেতর ঢুকে পড়ে। দু-তিনজন বাচ্চা-মাঝবয়সী তখনো কয়েকটা গাড়ি সরাচ্ছে। তাদের মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে দিনু মোটা একটি লোকের হাতে জ্যারিকেনটা দেয়। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সেটা বড় একটা ড্রামে ঢালতে ঢালতে বলে - দু-লিটারের কম আছে। দিনু বলে - যা আছে আছে। এখন তাড়াতাড়ি ছাড়া। সেদিনেরটা কিন্তু বাকি আছে। আজ শালার অনেক খরচা আছে। লোকটি খালি ক্যান ও পয়সা গুনতে গুনতে বলে - নে নে, দুদিনেরটাই নে। তোর খরচা মানে তো - হেঁ হেঁ। আবার নাকি তিন নম্বর আর একটা জুটিয়েছিস, এটা কোথাকার রে - বলি না হুগলি? তোর শালা একটা ছবি গ্যারেজে বাঁধিয়ে রাখবে! দিনু - ভ্যানতড়া কোরো না তো। গাড়িটা শালা রাস্তায় পড়ে আছে।

পয়সা নিয়ে দিনু ছুটে বেরিয়ে যায়।

কাট - টু

দৃশ্য/৪৪

নবীনের বাড়ি। রাত্রি

ক্যামেরা রাউন্ড টুলির ওপর ঘুরে যাচ্ছে নবীনের মুখ থেকে টেলিভিসন-এর ওপর। সংবাদ পাঠক বলছে :

দৃশ্য/৪৪এ

‘গত শুক্রবার কলকাতার রাস্তার আততায়ীর গুলিতে নিহত নির্মলা রায়ের হত্যাকারীকে এখনো পর্যন্ত ধরা না গেলেও পুলিশ জানতে পেরেছে যে হত্যার কারণ প্রেমঘটিত। সন্দেহ করা যাচ্ছে যে রামলাল আতিক নামে নিহতের জনৈক পূর্ব প্রেমিক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে খুনের পর থেকেই পলাতক।’  
টেলিভিসন-এর পদ্যর রামলাল আতিকের ফটো ভেসে ওঠে।

‘রামলাল আতিক নামে এই ব্যক্তির কোন সন্ধান জানা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে।’

দৃশ্য/৪৪(Contd.)

দরজার বেল বেজে ওঠে।

মিনু বাথরুমের দরজা অল্প ফাঁক করে মুখটা সামান্য বার করে বলে ওঠে - দাদাবাবু, দরজাটা খুলে দিন, আমি বাথরুমে।

কাট - টু

নবীনের বাড়ির দরজার বেল বাজাচ্ছে দিনু। নবীন দরজা খুলে দেয়।

দিনুকে দেখে বলে - গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

দিনু - কোথায় যাবো স্যার, পেছনের ডান দিকের চাকটা হেঁদোর কাছে পাঁচার হয়ে গেলে। দুটো জায়গায়। সারিয়ে আনতে আনতে এতক্ষণ লেগে গেলে। আমাকে এগারোটা টাকা দেবেন স্যার। আমার থেকে দিয়ে দিইছি।

সিঁড়ি দিয়ে কারো ওপরে উঠে আসার আওয়াজ শোনা যায়। দেখা যায় বেলাকে। বেলা এসে ঘরে ঢেকে। নবীন তাকায়। নবীনের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। দিনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে - ঠিক আছে, কাল নিও।

দরজা জোরে বন্ধ করে নবীন। ফিরে এসে বসে আগের জায়গায়। টেলিভিসন তখনো চলছে। নবীনের মুখে আগের মত রাগ এসে জমেছে। নবীন উঠে এগিয়ে যায় বেলার ঘরের দিকে। বেলা পোশাক বদলাচ্ছিল। ক্যামেরার দিকে তার মুখ। পেছনে দরজার সামনে নবীন এসে দাঁড়ায়। নবীনের উপস্থিতি টের পেয়ে বেলা নিজেকে আবৃত করে নেয়। তার মুখেও ভাবের পরিবর্তন হয়। বেলা তাকায় ক্যামেরার ডান দিকে। সু কুটকে এসেছে কিছুটা।

নবীন বলে - কোথায় গিয়েছিলে?



নবীনের গলায় এমন কিছু ছিল যে বেলা ঘুরে দাঁড়ায়। নবীনকে দেখে নিয়ে বলে - কেন বলোতো?

নবীন - জানতে পারি না?

বেলা - কাজ ছিল?

নবীন - কি কাজ?

বেলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে - কি হবে শুনে।

নবীনের মুখ। আন্তে আন্তে বিষম হয়ে ওঠে সেই মুখ। তারপর আন্তে আন্তে বলে - চাকরি খুঁজছে জানিনাতো।

বেলা - তোমাকে কে বললো?

নবীন - নিলীমা ফোন করেছিল কিছুক্ষণ আগে। তোমাকে কালই অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে দেখা করতে বলেছে। - হঠাৎ চাকরির দরকার কেন হলো?

বেলা - হঠাৎ না। অনেকদিন থেকেই ভাবছি। চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তাছাড়া...

চুপ করে যায় বেলা।

নবীন তাকায় বেলার দিকে।

বেলা বলে - আমার আর ভালো লাগছে না এইভাবে থাকতে। অনেকদিন তো হলো।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বেলা। তারপর আবার বলে - খুব একঘেয়ে লাগছে সবকিছু!

নবীন বলে - তুমি কি আলাদা থাকার কথা ভাবছো?

বেলা - জানিনা। ভাবছি এই ষোলোটা বছর কি অদ্ভুতভাবে তোমার সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম।

একটু চুপ করে থেকে নবীন বলে - তুমি যে এ রকম কিছু একটা বলবে তা জানতাম।

অবাক হয়ে বেলা বলে - মানে?

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। নবীন এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনটা তোলে - হ্যালো।

ও প্রান্ত থেকে কোন শব্দ শোনা যায় না। নবীন আবার বলে - হ্যালো?

কুশলের গলা শোনা যায় এবার। - আমি মা'র সঙ্গে কথা বলবো।

নবীন বলে - আমি বাবা বলছি।

কুশলের গলা শোনা যায় না। নবীন আবার বলে - হ্যালো?

কুশলের গলা - আমি মা'র সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নবীনের মুখ এবার বিষম হয়ে ওঠে। রিসিভারটা বেলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে - কুশল।

বেলা ত্যাগাতাড়ি এসে ফোন ধরে। বলে - কুশল, কেমন আছিস? চিঠি পেয়েছিলি?

কুশলের গলা - কি লিখেছো আবেল-তাবেল? আমার মন খারাপ হয়ে গ্যাছে। আমি এফুনি তোমার কাছে চলে যাবো। তুমি ঝুলে লিখে দাও।

নবীন আন্তে আন্তে নিজের ঘরে চলে আসে। হেরে যাওয়া ও অপমানিতের মত তার মুখ। বেলার গলা শোনা যেতে থাকে - কুশল শোন, পাগলামি করিস না। তুই এখন বড়ো হয়েছিস।

নবীন আন্তে আন্তে জানলার সামনে দাঁড়ায়।

ক্যামেরা নবীনের মুখ থেকে টেলিভিসন-এ আসে।

কাট্ - টু

দৃশ্য/৪৫

চেরাপঞ্জি

ন'বছরের নবীন একটা ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে। দেখা যায় সূর্য ঢলে পড়ার পরের লাল আকাশ। অন্য দিকে ছুটতে শুরু করে নবীন। দাঁড়ায়। রূপোর থালার মত বিশাল বড় চাঁদ উঠতে শুরু করেছে আকাশে। তখনো আলো আছে। নবীন তার পা'এর দিকে তাকায়। একটা লাল পোকা এগিয়ে আসছে তার দিকে। নবীন নিচু হয়ে পোকাটা হাতে তুলে নেয়। ছুটতে শুরু করে সে।

একটা রাস্তা দিয়ে নবীনের বাবা এগিয়ে আসছেন সাইকেল করে। একজন মাঝবয়েসী খাসিয়া তাকে তার ভাষায় বলে - তোমার ছেলে আসছে।

নবীনের বাবা সাইকেল থেকে নেমে পেছনে তাকায়। হাসে। নবীন ছুটে আসছে। খাসিয়াটি দাঁড়িয়ে পড়ে। নবীন তার বাবার কাছে এসে বলে - বাবা, হাত পাতে।

বাবা হেসে হাত পাতে। নবীন পোকাটা বাবার হাতে দেয়। পোকাটা ঘুরতে থাকে হাতের ওপর। খাসিয়াটি মজা পেয়ে হাসতে থাকে।

নবীন তাকে খাসিয়া ভাষায় বলে - তোমার দরজা বন্ধ না খোলা?

খাসিয়াটি হেসে বলে - বন্ধ।

নবীন পোকাটা নিয়ে খাসিয়াটির হাতে দিয়ে বলে - পোকাটাকে হাতে নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে বলবে

‘ছোট মোটি পিপড়া বোটি  
লাল দরজা খোল দে’

বললেই তোমার দরজা খুলে যাবে।

খাসিয়াটি হাসে।

কাট্ - টু

দেখা যায় নবীনকে সাইকেলে পেছনে বসিয়ে নবীনের বাবা এগিয়ে চলেছে। নবীন গান গাইছে। অদ্ভুত সুরের এক খাসিয়া গান।

কাট্ - টু

দৃশ্য/৪৬

কলকাতার রাস্তা

গাড়ি চালাচ্ছে দিনু। পেছনে বসে বসে চলেছে নবীন। দিনু পেছনে ফিরে একটু দেখে নিয়ে অল্প হাসে।

কাট্ - টু

দৃশ্য/৪৭

নবীন সিঁড়ি দিয়ে চেষ্টা করে উঠে যাচ্ছে।

দৃশ্য/৪৮

দাঁত তৈরীর ঘর থেকে দেখা যায় চেষ্টা করে ঢুকছে নবীন। ভেতরে একটি লোক দাঁত তৈরী করছে। ঘরময় অজস্র কৃত্রিম দাঁত।

নবীন একজনের দাঁত তুলছে। লোকটি 'আঁ আঁ' করে শব্দ করে ওঠে।

কাট্ - টু

দৃশ্য/৪৯

একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করছে দিনু।

দিনু - ফোন ছেড়ে দিস না মাইরি। দু টাকা লাগে ফোন করতে। আর একটু কথা বল।

দৃশ্য/৫০

মিনুর মুখ। টেলিফোন ধরে আছে অন্য প্রান্তে। তার মুখ রাগ রাগ।

মিনু বলে - আমি তোমাকে ফোন করতে বলেছি? আগেও বলেছি আমাকে ফোন করবে না। আমার সঙ্গে তোমার কিসের কথা যে বৌদি যখন থাকে না তখন ফোন করো? একা মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না। ছিঃ!

দৃশ্য/৫১

দিনু - মা: বাবা। তাকে আমি খারাপ কথা কিছু বলেছি? শুধু বলেছি তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। এতে এত রাগ করছিস! ভালবালার কথা বললে তো মাথা ছেঁচে দিবি মনে হচ্ছে!

দৃশ্য/৫২

মিনু - বাড়িতে বৌয়ের অভাব হয়েছে? ওসব কথা তাকে গিয়ে বলো। আবার ফোন করলে দাদা-বৌদিকে বলে দেবো সোজা বলে দিলাম।

দৃশ্য/৫৩

দিনু - তুইহতো অদ্ভুত! বৌ থাকলে আর কারো সঙ্গে কথা বলা যাবে না? তাহলে তো পৃথিবীটা রসাতলে যাবে রে।

ওপার থেকে মিনুর ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা যায়। দিনু বলে - ধুর মা...। বলতে গিয়ে দ্যাখে টেলিফোনের লোকটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কথা শেষ না করে দিনু জিজ্ঞাসা করে - কত হলো?

কাট্ - টু

দিনু ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে ঢুকে পড়ে।

কাট্ - টু

সিঁড়ি দিয়ে নবীন নামছে। নবীন গাড়ির সামনে এগিয়ে আসে।

আগের মতই গাড়ির জানলার বাইরে দু পা তুলে শুয়ে আছে দিনু। ক্যামেরা দিনুর মুখের দিকে এগিয়ে যায়। দিনুর মুখ। সূচক নাহক ভাকতে ভাকতে ঘুমোচ্ছে।

নবীন গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে।

শব্দ জেগে যায় দিনু। জানলা থেকে পা দুটো নামায়। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেয়।

নবীন - তোমার এই জানলায় পা তুলে দেওয়া দেখলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায় দিনু।

দিনু - বিশ্বাস করুন স্যার, আমি পা তুলে ঘুমোই না। ঘুমের মধ্যে পা-দুটো উঠে যায়।

নবীন - এত ঘুমোও কি করে বলতো?

দিনু - চোখ বুঝলেই আর স্যার আমার কিছু খোয়াল থাকে না।

নবীন - চোখ বুজো না তাহলে!

দিনু - হেসে বলে - চোখ তো স্যার একদিন না একদিন বুজতেই হবে!

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে যায় ফ্রেমের বাইরে। ফ্রেম জুড়ে রাস্তা।

কাট্ - টু

দৃশ্য/৫৪

রাত্রি

একটা দেয়ালে ঝোলানো সস্তার ছোট আয়নায় ৩০/৩২ বছর বয়সী রমণীর মুখ দেখা যায়। কপালে সিঁদুর দিচ্ছে। চেহারায়া অলগা শ্রী ও চটক দুইই আছে। সিঁদুর পরা হয়ে গেলে সে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। ক্যামেরা ঘুরে ধরে দিনুকে। দিনু চা খাচ্ছে।

চা খেতে খেতে দিনু তাকায় রমণীটির দিকে। এটি তার প্রথম বৌ সুখী। একটু দূরে আগে দেখা তার মেয়ে বাসন্তিকে দেখা যায়।

সুখী দিনুর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসে। তারপর হেসে বলে - কেমন লাগছে? ভালো লাগছে না?

দিনু - মনে হচ্ছে জল দিয়ে গুলে খেয়ে ফেলি! কার জন্য এত সাজসজ্জা রে সুখী? আমার জন্য?

সুখী রহস্য করে বলে - কেন, আমার আর কেউ নেই নাকি! খালি তোমারই আছে?

দিনু - তোমারও আছে, জানিতো।

সুখী - চাইলে দু'তিনটে বিয়ে আমিও করতে পারি। বুঝলে! হাত পেতে বলে দিইছে আছে! বাসন্তি ফিক্ করে হেসে ফ্যালে। সুখী তাকে ধমকায় - এই বাসন্তি, ঝুলের মাইনে মাইনে করে তো মাথার পোকা খেয়ে ফেলেছিল এ'কদিন, এবার লেখাপড়াটা কি আমি করবো? বই নিয়ে বস বলছি। খালি হাঁ করে কথা গেলো!



বাসন্তি - মাইনে দিলেই হয়ে গেল বুঝি? বই কিনে দিয়েছে একটাও?

সুখী - কেন, বই ছাড়া বুঝি পড়া হয় না? স্ট্রেট-পেন্সিলে আঁক কয়তে কি হয়েছে? আর তোমাকেও বলিহারি যাই বাপু - টাকা-পয়সা একটু ব্যাড়াবে না কি বল দেখি? নাকি আমাকে সে ব্যবস্থাও করতে হবে?

দিনু - নিপেন বলছিল একটা কাজ দেবে সামনের মাসে। দিল্লী থেকে বই রোড একটা গাড়ি নিয়ে আসতে হবে কলকাতায় ডেলিভেরির জন্য - সব খরচ বাদে হাজার টাকা দেবে। টাকাটা বাসন্তির জন্য জমিয়ে রাখবো। সাতদিন শালা ডুব মেরে দেবো। বাবু জিগেপাতে এলে বলবি ভেদবমি ছিল্লি বলে হাসপাতালে পাঠাঠে দিয়েছিস। মেয়ে দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে। এখন থেকে না জামলে...

সুখী - আমি ওসব অলুক্ষুণে কতা বলতে পারবো না।

দিনু - বৃকলি সুখী, বাবুর কিছু একটা হয়েছে। কেমন করে যেন আজকাল হাঁটে। সেদিন একজনের পোকা দাঁত ফেলতে গিয়ে শালা ভালো দুটো দাঁত তুলে দিয়েছিল। সেই নিয়ে কি কাশ্মেলা!

সব সময় কি যেন ভাবে। সেদিন মাইরি হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল। আগেও এমন করেছে।

তারপর বাসন্তির দিকে তাকিয়ে বলে - আজ ক্লাবে কি ফিল্ম দেখাচ্ছে রে?

বাসন্তি বলে - মা জানে তো। সেই মিঠুন গরীব ছিল তারপর নাচতে নাচতে খুব বড়লোক হয়ে গেল - সেই আই এম এ ডিস্কো ডেন্সার...

দিনু - এই সুখী যাবি?

সুখী - নাতো কি এমনি এমনি সেজেচি? জানো তিন তিনবার দেখেছি। মিঠুনের জন্য মেয়েটা কি ভাবে প্রাণ দিয়ে দিল। আমাদের ওরকম কামো জানো মরে যেতে হচ্ছে করে, সব দিয়ে দিতে হচ্ছে করে।

কাট - টু

দৃশ্য/৫৫

টেলিভিশন-এ সংবাদ পাঠক খবর পড়ছে। 'আগামী বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ গরিবী মুক্ত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যতে নামিয়ে আনা হবে। মীরাটে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং সন্দেহ করা হচ্ছে এ পর্যন্ত এই রোগে মৃতের সংখ্যা প্রায় একশোর বেশি। আজ কলকাতায় পুলিশ শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন আগে আততায়ীর গুলিতে নিহত নির্মলা রায়কে খুন করার অভিযোগে পলাতক আসামী রামলাল আতিককে বারুইপুরের একটি পতিতালয় থেকে গ্রেপ্তার করেছে।'

টিভি'র পদর্য রামলালকে দেখা যায়। পুলিশ ভ্যান থেকে নামানো হচ্ছে তাকে। চারদিকে

প্রচুর ভীড়। পুলিশ লাঠি দিয়ে তাদের সরানোর চেষ্টা করছে। রামলালের দুহাতে পেছন থেকে হাতকড়া পরা - এগিয়ে আসছে সে।

কাট - টু

নবীনের মুখ। টিভি দেখতে দেখতে এই দৃশ্য সে তাকায় গভীর ভাবে।

কাট - টু

দরজা খোলার একটা শব্দে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় নবীন। দ্যাখে বেলা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে।

নবীন একটু ইতস্তত করে বলে - কিছু বলবে?

বেলা - হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এ ঘরে আসবে?

নবীন টিভি বন্ধ করে।

কাট - টু

বেলার মুখ। বেলা বলে - আমার স্কুলের চাকরিটা হয়ে গ্যাছে। আজ এপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিয়েছেন রানুদি।

নবীন - রানুদি কে?

বেলা - হেডমিসট্রেস।

নবীন - ও। কনগ্রাচুলেশন। কবে জয়েন করছে?

বেলা - নেক্স্ট মাস থেকে। মানে সামনের বুধবার থেকে। আর...

বেলা খেমে যায়।

নবীন চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায় বেলার দিকে। বেলা নবীনকে একবার অঙ্গ দেখে নিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর বলে - সামনের মাস থেকে স্কুলের কাছে একটা ঘর পেয়েছি। আমি কিছুদিন ওখান থেকেই স্কুল করতে চাইছি। অনেকটা দূর, বাসট্রামে অতটা রাস্তা যেতে অনেক সময় লেগে যাবে।

নবীন - আমাকে চেম্বারে পৌঁছে দিয়ে দিনু তোমাকে স্কুলে দিয়ে আসতে পারে। গাড়ি তোমার কাছেই থাকতে পারে। ফেরার সময় তোমাকে বাড়ি পৌঁছে তারপর চেম্বারে চলে আসবে। একটু চূপ করে থেকে বেলা বলে - না। আমি কিছুদিন একা থাকতে চাইছি।

নবীনের মুখ দেখে বোঝা যায় সে কষ্ট করে হঠাৎ শরীর জুড়ে উঠে আসা রাগ চেপে রাখতে চাইছে। একটু চূপ করে থেকে নবীন বলে - একদম একা? সত্যি?

বেলা ভু কুঁচকে বলে - কি বলতে চাইছো ভূমি?

নবীন - কি আবার, আমার সন্দেহটা যে মিথ্যা নয় সেটাই মিন করতে চাইছি।

বেলা - তোমার যা খুশি মনে করতে পারো।

নবীন - আমি জানি তুমি আর ফিরে আসবে না।

বেলা কোন জবাব দেয় না।

নবীন বলে - তুমি ডিভোর্স চাইতে পারো। চাইলে আমি দিয়ে দেবো। কিন্তু তোমাকে আমি কি নিইনি বেলা? কোনটায় কম হয়েছে বলতে পারো?

বেলা - আমি এখন ডিভোর্স চাইছি না। আর দেবার কথা বলছে? দিয়েছে। যেমন নিয়েও নিয়েছে। সব। শরীর, সময় আমার নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগা - সব। কিন্তু এসবের বাইরেও আর একটা জিনিস থাকে, সেটা কখনোই দিতে পারোনি তুমি। আর সেটা কি তুমি বোধ হয় বুঝতেও পারো না।

নবীন একটু চুপ করে থেকে বলে - কি বলতে চাইছে তুমি?

বেলা - কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি বুঝবে না!

নবীন বলে - চলে যেতে চাও, যাও। কিন্তু যা ঠিক নয় তেমন কথা বোলো না। আর কুশলকে কি বলবে ঠিক করে রেখো। তোমার চলে যাবার জন্য ওর কাছে অন্তত আমাকে দায়ী করে যেও না।

বেলা - তোমাকে দায়ী করবো না। সে নিয়ে ভেবো না। ওকে কাল আমি চিঠি লিখে দিয়েছি ওর হস্টেলের ঠিকানায়। চলে আমি অনেক আগেই যেতে পারতাম, শুধু ওর জন্যই যাইনি এতদিন। এখন ও বড় হয়েছে, ও বুঝতে পারবে। আসলে এইভাবে চলে যেতে আমারও খারাপ লাগছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কত মানুষই তো এভাবে থেকে যায়। অনেকে হয়তো বোঝেই না। কিন্তু এ কথা সত্যি যে আমরা কেউই কাউকে ভালবাসি না। তোমার একটা বৌ-এর দরকার ছিল, আমার একজন স্বামী। আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেকদিন তোমাকে ভালবাসার, কিন্তু তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে যা আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বারবার।

একটু চুপ করে থেকে বেলা আবার বলে - একটা কথা বলবে?

নবীন তাকায় বেলার দিকে। বেলা বলে - তুমি কোনদিন কাউকে ভালোবেসেছিলে?

নবীন চুপ করে থাকে।

বেলা বলে - মনে হয় বাসোনি। বাসলে তার ছায়া আমি কখনো না কখনো নিশ্চয়ই তোমার চোখে দেখতে পেতাম।

নবীন - তুমি?

বেলা অদ্ভুত ভাবে হাসে। তারপর বলে - বাসতাম। হয়তো আজো বাসি।

নবীন - লোকটি কে?

বেলা - কোন লোকের কথা বলছে?

নবীন ঘরের ভেতর গিয়ে কয়েকটা ছেঁড়া চিঠি নিয়ে আসে। ছুঁড়ে দেয় বেলার দিকে। বলে - এগুলো কি?

বেলা তাকায় মাটিতে ছুঁড়ে দেওয়া চিঠিগুলোর দিকে। রাগে দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখ। তারপর শান্ত করে নেয় নিজেকে। নবীনের দিকে সব হারানোর দুঃস্থিতে তাকায়।

নবীনের মুখ প্ৰথমতঃ করছে।

বেলা আন্তে আন্তে বলে - চিঠিগুলো যে তুমি নিয়েছো আমি জানতাম। ওগুলো অর্গবের চিঠি। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে থেকেই ওকে আমি চিনতাম। হয়তো

ভালোও বাসতাম। জানিনা। তখন কিছু বোঝার সময় হয় নি। উনিশ/কুড়ি বছর দেখা হয়নি। তারপর হঠাৎ কিছুদিন আগে রাত্তায় দেখা হয়েছিল। এর মধ্যে মাঝে দেখা হয়েছে। ও চিঠি দিয়েছে। কিন্তু আমি আর এগোতে চাই না। কোন মানোও নেই।

নবীন - কেন?

বেলা ম্লান হেসে বলে - যদি ও টুকুও হারিয়ে যায়। বিশ্বাস করো।

আমি তোমাকে মিথ্যে বলছি না।

ক্যামেরা আন্তে আন্তে নবীনের মুখের দিকে এগিয়ে যায়। সেই মুখের ওপর একই সঙ্গে জড়ো হয়েছে রাগ, অপমান ও অবিশ্বাসের ছায়া।

বেলা বলে চলছে - যাক গে, বিশ্বাস করলে করবে, না করলে আমি আর কি করতে পারি!

কাট - টু

**দৃশ্য/৫৬**

দিন

চলন্ত গাড়ির ভেতর থেকে কলকাতার মনুশেট দেখা যায়। ক্যামেরা সরে আসে গাড়ির ভেতর। দিনু গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে নবীন।

দিনু বলে - স্যার, আপনি দিল্লিতে গিয়েছেন?

নবীন - হ্যাঁ।

দিনু - ওখানে আপনি কুতুব মিনার দেখেছেন? ওটা কি আমাদের এই মনুশেটের চেয়ে বড়?

নবীন - হ্যাঁ। কেন?

দিনু - দিল্লীতে স্যার আমার এক খুড়শুওর থাকে। অনেকবার যেতে বলেছে।

নবীন - বলোনি তো আগে?

দিনু হেসে বলে - আপনিও আমার সব জানেন না স্যার!

কাট - টু

**দৃশ্য/৫৭**

নবীনের চেম্বারের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। নবীন নামে। চেম্বারের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে নবীন।

**দৃশ্য/৫৮**

চেম্বারের ওয়েটিং রুমে লোকজন বসে আছে। নবীন এগিয়ে আসছে। একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলে - দাঁতগুলো তুলেই দিন ভাগদারবাবু। টাকা সে আমি জোগাড় করে লেবো। দণ্ডাই খেয়ে কয়েকদিন ঠিক ছিল। আবার কাল থেকে বৃং দর্দ। কাজকাম সব বন্ধ।

লোকটি আগের একটা দৃশ্যে দেখা কিশোরী সিং। নবীন সামান্য দাঁড়ায় ও দ্যাখে তাকে। কি যেন ভেবে নেয় নবীন। তারপর বলে - ঠিক আছে। আগে যাদের সময় দেয়া আছে তাদের



দেখে নিয়ে ডাকবো।

ভেতরের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায় নবীন।

কাট - টু

**দৃশ্য/৫৮**

নবীনের কাছে দাঁত দেখাতে আসা লোকজনদের অপেক্ষা করার ঘরের বাইরে একটা ছাদ। তার পাশে আর একটা ঘর, কাঁচ দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে বসে একজন বয়স্ক লোক দাঁতের মাড়ি ও দাঁত তৈরী করছে। ঘর ভর্তি অজস্র দাঁত ও দাঁতের মাড়ি, হাঁ করা এবং বন্ধ করা। নিবিস্ট মনে দাঁত তৈরীর কাজ করছে লোকটি।

নবীন এসে ঢোক। লোকটিকে বলে - সবাই লানচ-এ গেছে। তুমি যাও।

লোকটি বলে - স্যার আপনার হয়ে থাক তারপর যাবো।

নবীন একটু দৃঢ়ভাবে বলে - না। তুমি যাও।

নবীনের পেছনে কিশোরী সিংকে দূরে বসে থাকতে দেখা যায়। নবীন তাকায় তার দিকে।

কাট - টু

কিশোরী সিং-এর মুখ হাঁ করা। দাঁত দেখতে দেখতে নবীন মুখ তুলে কিশোরী সিং-এর দিকে তাকায়। দ্যাখে ভালো করে। নবীনের মুখ কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে যেতে শুরু করে। কিশোরীর মুখের ভেতর থেকে হাত নিয়ে আসে। কিশোরী সিংও লক্ষ্য করতে থাকে এবং তার মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়। সে বলে - ডাগদারবাবু কিছু বলবেন?

নবীন বলে - এসব দাঁত তুলতে অনেক টাকা লাগবে। ওপর নিচ সবই খারাপ। সব তুলে বর্ধাতে চার পাঁচ হাজার পড়ে যাবে।

কিশোরী - সে কি ডাগদারবাবু, সেদিন তো দু-আড়াইই বাতালেন। এতনা তো দেনা মুশকিল হোগা। তব ছেড়ে দিন। দূসরা কেই আচ্ছা দাওয়াই লিখে দিন।

নবীন - দাওয়াই-এ কিছু হবে না। দাঁত তুলতেই হবে। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে একটা পয়সাও নেবো না যদি তুমি আমাকে একটা খবর দাও।

কিশোরী - ক্যায়া খবর?

নবীন ঘরের পর্দা সরিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নেয়। নবীনের মুখ অন্য রকম লাগছে। তার গলার স্বর কেমন যেন জড়ানো ও ঘরঘরে লাগছে। সে বলে - খর কাউকে যদি সরিয়ে দিতে হয় তাহলে তোমার জানাশোনা কেউ আছে?

কিশোরী তার বৃকের ওপর মেলে দেওয়া টাওয়েলটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসে। বলে - মতলব? খতম?

নবীন মাথা নাড়ে অদ্ভুত ভাবে। তার মুখে ধাম জড়ো হচ্ছে।

কিশোরী - কিসকো?

নবীন ফিসফিসে গলায় বলে - সে আছে।

কিশোরী একটু চুপ করে থেকে বলে - আমি তো এসব খুট-খামেলা কা কাম এখন করি না। সেকিন...

কিশোরী তাকায় নবীনের দিকে। তারপর বলে - এ দাঁত আপু কব বানায়েসে ডাগদারসাব? নবীন - সামনের সপ্তাহে। কাউকে জানো যে করতে পারে?

কিশোরী - হাঁ। পয়চানতা থা।

নবীন - কে?

কিশোরী - ইয়াসিন। আভি ভি এসবু ধান্দা করতা হ্যায়। বহুত দিন দেখা নেহি উসকো। পর উসকো ডেরা মালুম হ্যায়। মগর এক বাত হ্যায় ডাগদারসাব।

নবীন - কি বাত?

কিশোরী - উসকো ডেরামে আপকো হাম লে যায়েসে, জান-পহচান করওয়া দেসে - ইতনা তক্, বাসু। বকি বাত আপকা করনা হোগা আউর ও ভি হামারা চলে আনে কা বাদ। ইতনা হি হাম কর সেকুতে। বাসু। ইসেসে চলেগো সাব?

নবীন মাথা নাড়ে।

কিশোরী বলে - তব কব যানে মাংতা? দিন মে ইসসিনকো মিলনা মুশকিল হ্যায়। রাত মে ঠিক হোগা। কাল চলবেন?

নবীনকে দেখে মনে হয় কেউ ভর করেছে ওর ওপর। আশ্তে আশ্তে মাথা নেড়ে বলে - ঠিক আছে। কাল সাতটার সময় নিচে আমার গাড়ির সামনে দাঁড়াবে। কোথায় যেতে হবে?

কিশোরী - ওয়াটগঞ্জ। এখন কি আমি যাবো নাকি ফির দেকবেন?

নবীন - না। দেখা হয়ে গ্যাছে।

কিশোরী উঠে দাঁড়ায়। চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ায়। নবীন তাকায়। বলে - কিছু বলবে? কিশোরী বলে - হাঁ ডাগদার সাব।

নবীন বলে - কি?

কিশোরী - এসব কাম করনে কা পহলে আচ্ছা সে শোচ-সামাখলেনা চাহিয়ে। একবার খামেলা হয়ে গেলে বহুত মুশকিল। জেল ফাঁসি ওয়াসি সব আছে। আর কুছ হো যানে সে হামকো ফসাইয়েগা মত। নবীন কিছু বলে না। কিশোরী নবীনের দিকে তাকায়। তারপর বলে - সাব, আদমি কে আছে?

নবীন একটু চুপ করে থেকে কঠিন মুখে বলে - আছে একজন। একটা লোক।

কাট - টু

**দৃশ্য/৫৯**

সকাল

নবীনের বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে দিনু নবীনের জন্য। নবীন বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। গাড়িতে ওঠে। দিনু গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

দৃশ্য/৬০

রাস্তা। নবীনের গাড়ি যাচ্ছে। হঠাৎ নবীন বলে - দিনু গাড়ি থামাও।

দিনু বলে - কি হলো স্যার?

নবীন - গাড়ি থামাও আগে তারপর বলছি।

দিনু রাস্তার ধারে গাড়ি থামায়। নবীন গাড়ি থেকে নেমে দিনুর দিকের দরজা খুলে বলে - তুমি নায়ে। দিনু নবীনের হঠাৎ এই ব্যবহারে হতভম্ব। গাড়ি থেকে নামে সে। নবীন দিনুর জায়গায় উঠে বসে। দরজা বন্ধ করে বলে - আজ আমি চালাবো। তোমার ছুটি।

দিনু অবাক হয়ে বলে - কেন স্যার? কি হয়েছে?

নবীন - কিছু না। তুমি যাও।

দিনু - কোথায় যাবো স্যার? আপনি চালান না, আমি পাশে বসে থাকি।

নবীন - না, তোমাকে থাকতে হবে না। কোথাও ঘুরে এসে। তারপর বলে - তোমার এডভান্স চাই দিনু? পনচাশ টাকা?

দিনু - দিন।

নবীন পেছনের পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে পনচাশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে বলে - ঠিক আছে এডভান্স না, এমনি দিলাম। নাও।

দিনু টাকাটা নেয়। নবীন বলে - শোন, আমি যে আজ গাড়ি চালাচ্ছি সেটা কাউকে বলার দরকার নেই। বুঝলে?

দিনু মাথা নাড়ে।

নবীন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়। দিনু ঘটনার এই আকস্মিকতায় বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে নবীনের গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার দিকে।

কাট - টু

দৃশ্য/৬১

দিনু তার বাড়ির গলি দিয়ে আসছে।

দৃশ্য/৬২

তাকে বাড়িতে ফিরে আসতে দেখে সুখী অবাক হয়ে বলে - সেকি, তুমি না কাজে বেরুলে? ফিরে এলে যে বাড়ি?

দিনু - তোকে কালকে বললাম না? আজ আবার মাথা খারাপ হয়েছে। শালা বলে আমি গাড়ি চালাবো। আজ ছুটি! কিন্তু হঠাৎ পনচাশটা টাকা দিল কেন সেটা শালা বুঝলাম না। কি কেস কে জানে!

দিনু টাকাটা সুখীর হাতে দিয়ে বলে - নে রাখ। পচিশ টাকা আমাকে ফেরৎ দে। যাই একটু ডায়মন্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি। তাড়াতাড়ি রান্না কর। খেয়ে যাবো।

সুখী - এখনো উনুনই ধরাইনি মোটে। কি করে জানবো তোমার বাবু আজ গাড়ি চালাবে!

আমার দেরি হবে। সকালে যে রুটি আলু ভাজা দিয়েছিলাম সেটা খেয়ে যাও না। নাহলে মালতির ওখানে খেয়ে নিও।

দিনু - কেন, একটু ভাত ফুট দিয়ে নিতে পারবি না?

সুখী - সে পারবো না কেন, আরো কিছু পারবো। তবে একটু দেরি হবে। তোমার ডায়মন্ডহারবারের শৌচতে বেকেল হয়ে যাবে। তারপর একটু খেমে বলে - কে ভালো রান্না করে গো, আমি না মালতি?

দিনু বলে - তুই।

সুখী হেসে বলে - মালতিকেও একই কথা বলো, তাই না?

দিনু হাসে।

কাট - টু

দৃশ্য/৬৩

বিকেলের শুরু।

একটা ট্রেন লাইন দিয়ে ছুটে আসছে দিনু। ট্রেন এসে দাঁড়ায়। দিনু উঠে পড়ে।

ট্রেন যাচ্ছে। দিনুর মুখ। লোকজন। তাদের কথাবার্তা। ট্রেনের হকার। বোতলের গ্যাস ভরা জল বিক্রি করছে। তার বোতল খোলার অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে। ট্রেন যাচ্ছে।

কাট - টু

দৃশ্য/৬৪

দিনু মালতির বাড়ির দিকে যাচ্ছে। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। সূর্য ভোবাব আর দেরি নেই। দূর থেকে দেখা যায় নদীর জলের রং বদলাচ্ছে। নদীর পাশে কেল্লাটাকে দেখা যায়।

দৃশ্য/৬৫

দিনু বাড়ির সামনে এসে থামে।

মালতির ঘরের দরজা বন্ধ। দিনু কড়া নাড়ে। কোন সাড়া শব্দ নেই।

দিনু ডাকে - মালতি, এই মালতি?

উত্তর দেবার কেউ নেই। দিনু এদিক ওদিক তাকায়। তারপর কি যেন ভাবে সে। হাসে।

দূরে ভাঙা কেল্লাটা দেখা যায়। দিনুর মুখ। দিনু সেই দিকে হাঁটতে শুরু করে।

দৃশ্য/৬৬

সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায়।

কেল্লার কাছে পৌঁছে এদিক ওদিক তাকায় দিনু। কোথাও মালতির কোন চিহ্ন খুঁজে পায় না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে দিনু। হঠাৎ মানুষের গলার অদ্ভুত শব্দ দিনু থমকে তাকায় ওপরের দিকে। কি যেন মনে হয় দিনুর। সে খুব আশ্তে আশ্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। ওপরে উঠে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে থাকে দিনু। ওপরে উঠে থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে একটা ঘরের কোনে দেখতে পায় মালতিকে অদ্ভুত অবস্থায়। প্রায় আধ খোলা তার



শরীর অন্য একটি পুরুষ শরীরের সঙ্গে ক্রিয়ায় ব্যস্ত। থমকে যায় দিনু। মাথা নিচু করে আগের চেয়েও পা টিপে টিপে নিচে নামতে থাকে। তার মুখে জড়ো হয়েছে রাগ ও অপমান।

নিচে নেমে জলের কাছে একটা জায়গায় বসে দিনু। জায়গাটা এমন যে কেবলা থেকে কেউ বেরোলে দিনুকে চোখে পড়বেই এবং দিনুরও চোখে পড়বে তাকে। দিনু পাকট থেকে একটা বিড়ি বার করে টোটে গৌজে তারপর ফস্ করে দেশলাই জ্বালে।

কাট্ - টু

কেবলার ভেতর একটা ঘরে শুয়ে থাকা মালতি অন্য লোকটির তার শরীর পৈচিয়ে থাকা হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে। তার মুখ একটু উদ্বিগ্ন। মালতি কাপড় ঠিক করতে করতে ভয় পাওয়া গলায় বলে - কেউ নিস্চয় এসেছিল।

লোকটির মুখে দাড়ি। বয়স ৩০/৩২। আগে দেখা গেছে। সে বলে - ধূত্, কে আবার আসবে? আমি টের পেতুম না?

মালতি - না। কেউ নিস্চয় দেখেছে।

মালতি উঠে দাঁড়ায়।

কাট্ - টু

সিঁড়ি দিয়ে একজন নামছে। নামতে নামতে লোকটি হঠাৎ দিনুকে দেখতে পায়। দিনু মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখে লোকটিকে। তার মুখে এখন আর কোন রাগ বা অন্য কোন কিছুর ছায়া নেই - বরং শান্ত ও স্বাভাবিক। লোকটি দিনুকে হঠাৎ এভাবে দেখে ভয় পেয়ে যায়। লোকটি নৌড়োতে শুরু করে।

ওপরের ঘর থেকে মালতি বেরিয়ে আসছিল। লোকটিকে ওইভাবে প্রাণপনে ছুটতে দেখে অবাক হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে আসতে থাকে। আর ঠিক এই সময়ই দিনুকে দেখে মালতি। দিনুও দেখে। ভয়ংকর ভয় পেয়ে যায় মালতি। ছুটতে শুরু করে মালতি।

মালতিকে ছুটতে দেখে দিনু উঠে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক গলায় ডাকে - মালতি শোন।

মালতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় কিন্তু দাঁড়ায় না। দিনু আবার ডাকে - মালতি দাঁড়া বলছি।

এবার মালতি দাঁড়ায়। দিনু ডাকে - এদিকে আয়।

মালতি আসে না। দিনু বলে - আয় বলছি।

মালতি দিনুর দিকে তাকায়। মালতির মুখ ধমথমে। বলে - না। তুমি মারবে।

মালতির গলায় কান্না জড়ো হয়েছে। তার গলা শুনে মনে হয় যে কোন সময় কঁদে ফেলবে মালতি।

দিনু - মারবো না। ছুটে কোথায় যাচ্ছিস?

মালতি - মা'র বাড়িতে।

দিনু - কেন? সেখানে কি কাজ?

মালতি - তুমি তো আমারে আর বাড়ি ঢুকতে দেবে না এরপর। মালতি হাউ হাউ করে কঁদে ওঠে।

দিনু একটু চুপ করে থেকে বলে - বাড়ি চ।

মালতি চোখ ভরা জল নিয়ে অবাক বিষ্ময়ে তাকায়। বিশ্বাস করতে পারে না দিনুকে।

দিনু আবার বলে - বললাম যে বাড়ি চ। সব ঠিক আছে রে মালতি।

মালতি - তুমি আমারে খারাপ ভাবছো না? তোমার যেনা করবে না আমাকে? তুমি আমারে আবার থাকতে দেবে?

দিনু - না দেবার কি হয়েছে যদি তুই থাকতে চাস। আমারটাও একটা জীবন, তোরটাও একটা জীবন। সবই অন্ধুত।

মালতি চোখ পোছে। দিনু বলে - লোকটা কে রে? ওরকম নেড়ির মত ছুটে পালালো কেন? মালতি - আমার মাসভূতো বোনের বর। বোনটা মারা গেল গত বছরের আগের বছর নদীতে নাইতে গিয়ে জলে ডুবে। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। দুখী মানুষ। কোন কাজ করে না। আমারে মাঝে মাঝে চায়। তার হাতের আঙুলগুলো ঠিক তোমার মত। আমি কি তোমারে ঠকলাম?

দিনু - আমি আমারে যদি মেনে নিতে পারি তাহলে তোকে পারবো না কেন? বাড়ি চ।

কাট্ - টু

## দৃশ্য/৬৭

একই সময়। কলকাতার রাস্তা। গাড়ি চালাচ্ছে নবীন, পাশে বসে আছে কিশোরী সিং। গার্ডেনরীচ বা ওয়াটগঞ্জের ধারে কাছের কোন রাস্তা।

কিশোরী বলে - আব সামনে গাড়ি রাখিয়ে দাগদারসাব্। আমি দেখে আসছি ইয়াসিন আছে কি (নৈ ফালতু আপ্ উতরকে কায়্য করেসে। আপ্ গাড়িমে ই বৈঠে রহিয়ে। কৈ কুছ পুছে তো ইয়াসিনের নাম বাতাবেন।

নবীন গাড়ি থামায়। কিছু বলে না। কিশোরী গাড়ি খুলে নেমে যায়।

নবীন বসে আছে গাড়ির মধ্যে। কয়েকজন লক্ষ্য করছে নবীনকে।

কিশোরী ফিরে আসছে। নবীনকে দেখে মাথা নেড়ে না ইঙ্গিত করে। তারপর গাড়িতে এসে বসে। বলে - চলিয়ে সাব। দূসরা জাগা জানা পড়গা। ইয়াসিন আব ইহা নেহি রহতা। পার্ক সাবসিকা চার নম্বর পুল হোডকে চলিয়ে।

নবীন আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়।

কাট্ - টু

## দৃশ্য/৬৮

চার নম্বর পুলের আশেপাশের কোন রাস্তা। একটা মসজিদ দেখা যাচ্ছে। নবীনের গাড়ি ঢুকছে। গাড়ি এসে থামে একটা খিঞ্জি বস্তির সামনে। ক্যামেরা গাড়ি থেকে একটু দূরে। মিড-লং - এর দূরত্বে। কিশোরীকে নামতে দেখা যায়। কিশোরী বস্তির ভেতর ঢুকে পড়ে।

একটা ব্যান্ডপার্টি ফ্রেমে ঢাকে। ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে তারা চলে যায়।

কিশোরীকে দেখা যায় মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে আসতে। গাড়ির ভেতর ঢুকে বসে।

কামেরা এবার গাড়ির কাছে যায়। কিশোরী বলে - ইহাশে ভি হোড়কে চেলা গিয়া। রাজাবাজার চলিয়ে মাঝ।

নবীন গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়ি ফ্রেম-আউট হয়ে যায়।

### দৃশ্য/৬৯

কিছুদূর গিয়ে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেয় নবীন। কোন কথা বলে না।

কিশোরী বলে - গাড়ি মে কুছ গড়বড় ছয়া ক্যা?

নবীন কোন উত্তর দেয় না। তার মুখ বেশ খমখমে।

কিশোরী - রুকু গয়া কিউ সাব?

নবীন - ভূম উত্তর যাও।

কিশোরী বুঝতে না পেরে বলে - ক্যা?

নবীন - উত্তর যাও। তার গলা বেশ অস্বাভাবিক।

কিশোরী অবাক হয়ে তাকায় নবীনের দিকে। নবীন এবার চিৎকার করে বলে - উত্তরো।

কামেরা নবীনের মুখের দিকে এগিয়ে যায়। একটু দূর ভেসে আসে সেই মুখের ওপর।

কিশোরী সিং চলে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে খালি গলায় গানের সেই সুর।

নবীনের মুখ। তাকিয়ে আছে অনেক দূরের দিকে।

কাট - চু

### দৃশ্য/৭০

নবীনের বয়স্ক মা। উল বুনতে বুনতে গান গাইছেন:

কে তুমি গো পরপারে

তরগীখানি ওই বাহিয়া যাও

বদলিন হলে এদেশে এসেছি

যাহা কিছু ছিল সব হারিয়েছি

শূন্য পরাণে বসে আছি তীরে

মিনতি করি মোরে পারে তুলে নাও।

সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে উলের বল। আগের এমনই একটি দৃশ্যের মত।

### দৃশ্য/৭১

চেরাপুঞ্জি। ভোরবেলা

প্রথম দৃশ্যে দেখা সাত-আট বছরের সেই ছেলেটি। শিশির ভেজা ঘাসের ওপর থেকে লাল

ভেলভেটের মত, গোল ও সুন্দর একটি পোকা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে মুঠি বন্ধ করে

দৌড়ে এসে দাঁড়ায় একটা গাছের নিচে। মুঠির দিকে তাকিয়ে আন্তে আন্তে বলে:

ছেটি মোটি পিপড়া বোটি

লাল-দরজা খোল দে...

### বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

এবার ধীরে ধীরে মুঠি খোলে সে। দেখা যায় লাল পিপড়েটি তার হাত পা মেলে দিয়েছে। ছেলেটি এবার পিপড়েটিকে ঘাসের ওপর নামিয়ে দেয়। পিপড়েটি ঘাসের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে আবার।

দূর থেকে পুরুষ-গলায় ডাক শোনা যায় - নবীন।

ছেলেটি তাকায়। তারপর দৌড়তে শুরু করে। কিছু দূরে একজন ৩৫/৪০ বছরের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে — ৭/৮ বছরের নবীন কাছে এলে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। ছোট নবীন সেই মেলে দেওয়া হাত ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। মেঘ এসে মাঝে মাঝে তাদের ঢেকে দিয়ে যেতে থাকে।

একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। বাড়ির ভেজানো দরজা দেখা যায়। ছেলেটি বাবার হাত ছাড়িয়ে ভেজানো দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাবার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে - বাবা, একটা জিনিস দেখবে?

বাবা মাথা নড়েন। ছেলেটি ভেজানো দরজার আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে আন্তে আন্তে বলে:

ছেটি মোটি পিপড়া বোটি

লাল-দরজা খোল দে, খোল দে...

ভেজানো দরজা আন্তে আন্তে খুলে যায়।

ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে ও আনন্দে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে - বাবা!

বাবার মুখে সুন্দর এক হাসি ফুটে ওঠে।

কাট - চু

### দৃশ্য/৭২

ভোর হচ্ছে কলকাতা শহরে। সূর্য ওঠার আগের আকাশে রং ধরতে শুরু করেছে। পাখিরা বেরিয়ে পড়েছে।

নবীন ঘুম থেকে উঠে বান্দারাম এসে দাঁড়ায়। চারদিক তাকিয়ে দ্যাখে।

তারপর আন্তে আন্তে আবার ঘরে ঢোকে।

### দৃশ্য/৭৩

অন্য একটা ঘরে শুয়ে আছে বেলা। নবীন সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকায় ঘুমিয়ে থাকা বেবার দিকে। নবীনের মুখ বিষম হয়ে ওঠে। বেলা পাশ ফিরে শোয়।

কাট - চু

### দৃশ্য/৭৪

একটা পুরোনো কান্না: সিঁড়ি দিয়ে আন্তে আন্তে ওপরে উঠছে নবীন।

সিঁড়িটা আগে দেখা।

কাট - চু



দৃশ্য/৭৫

আগের সেই ডাক্তারের ঘর।

ডাক্তারের মুখ।

নবীন - মাঝে মাঝে মনে হয় বেলার কথাই ঠিক। আমি সত্যিই কাউকে ভালবাসতে পারিনি কোনদিন। কুড়ি বছর ধরে আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে বেলা এটা বুঝতে পারে। আজ ও চলে যেতে চাইতেই পারে। কেননা সত্যিই ওকে আমি ভালবাসিনি কোনদিন। ব্যবহার করেছি শুধু। বেলা হয়তো ভালবাসতে, মানিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। কিন্তু ও চলে যাবে এটা আমি কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি না। কোথাও প্রচণ্ড ইনসালটের লাগছে। অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে ওর থাকা না থাকায় আমার কিছু এসে যায় না।

ডাক্তার - ছেলেকে ভালবাসেন না?

নবীন - বোধহয় না। ও বোধহয় সেটা বুঝতে পারে। কারো সঙ্গেই কোন সম্পর্কই আমি তৈরী করতে পারিনি মনে হয়। ভাবলে নিজের জন্য সত্যি খুব কষ্ট হয়। আরো অনেককে তো দেখি। কেমন ভালো আছে। আমিই শুধু কেমন...

ডাক্তার - কাকে সবচেয়ে ভালবাসেন মনে হয়। নিজেকে?

নবীন - বোধহয় নিজেকেও না। আমি ঠিক বুঝতে পারিনা।

ডাক্তার - এক সময় রাজনীতি করতেন বলছিলেন না? তার মধ্যেও কোন ভালবাসা ছিল না?

নবীন - সে সব অনেকদিন আগের কথা। এখন কিছু ফিল করি না।

ডাক্তার - লেগে থাকলে মন্থীটন্থী হয়ে যেতে পারতেন।

বলে ডাক্তার হো হো করে অদ্ভুত দমফটা হাসি হেসে ওঠে।

নবীন বলে - আর এই হাত-পা শক্ত, লোহার মত হয়ে আসার ব্যাপারটা? আর একবার দেখবেন? যদি আবার প্রথম শুরু করা যেত, একবারে চেরাপুঞ্জি থেকে।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে - একদিন দেখবেন নেমে আসবে সবার। আপনাকে নিয়ে যাবে রোবটদের দেশে। শুয়ে পড়ুন।

কাট - উ

শুয়ে আছে নবীন। খালি গা। খালি পা।

ডাক্তার পরীক্ষা করছে তার শরীর। ক্যামেরা আস্তে আস্তে তার মুখের ওপর এসে থামে।

নবীনের চোখের কোনায় স্তল চিক্চিক করছে।

দৃশ্য/৭৬দিনেরবেলা

কলকাতা থেকে অনেকটা দূরের একটা হাইওয়ে। দিনু একটা মার্কটি চালিয়ে আসছে। একটা ধাবার সামনে গাড়িটা পার্ক করে দিনু।

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

ধাবায় অনেকে বসে আছে। দিনু এসে বসে। বেয়ারা আসে। দিনু বলে - মাংসের তড়কা আছে না শেষ?

বেয়ারা - আছে। কপ্লেট? চাপাটি কাটা?

দিনু - কপ্লেট আবার কি। এক প্লেট চারটা চাপাটি। একটু পেয়াজ দিও ভাই বেশি করে।

বেয়ারা খাবার দিয়ে যায়। দিনু খেতে শুরু করে।

একটু দূরে একটা বেনচে একটি মেয়ে বসে আছে। খাচ্ছে একা একা। তাকে দেখে একটু অবাক হয় দিনু। এই ধাবায় এ মেয়েটি বোমানান। মেয়েটির বয়স ২৩/২৪, চেহারা ও বেশবাসে নিম্নবিত্তের ছাপ। যদিও চেহারায় একটা চটক আছে। মেয়েটিও দেখেছে দিনুকে। তাদের মধ্যে চোখাচোখি হয় কয়েকবার।

বেয়ারা এসে বলে - আর কিছু লাগবে?

দিনু - এখন কিছু লাগবে না। প্যাক লাগবে। একটা মাংস কথা আর চারটে পরটা। এখনো সাত আট ঘন্টা গাড়ি চালাতে হবে। কলকাতা পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সন্দেশ।

দিনু উঠে পড়ে। হাত ধুয়ে পয়সা মিটিয়ে সামনের পানের দোকানে আসে। - একটা পান। তিনশো বিশ দিয়ে।

দিনু পান নিতে নিতে আড় চোখে ধাবায় বেনচে তখনো বসা মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে থাকে। মেয়েটির লক্ষ্যও দিনুর দিকে। মেয়েটি এবার উঠে পড়ে।

দিনু গাড়ির দিকে এগোয়। দরজা খোলে চাবি দিয়ে। তারপর ভেতরে উঠে বসে। গাড়ি স্টার্ট দেয় দিনু। গাড়ির ভেতরের আয়নায় দেখতে পায় মেয়েটি তার গাড়ির দিকেই আসছে। দিনু একটু দেরি করে।

মেয়েটি গাড়ির কাছে এসে দিনুকে বলে - কিস জদি মনে না করেন তো একটা কথা জিগাইমু?

দিনু - বাঙাল? ওরে বাস! জিগান।

মেয়েটি - আপনোও ওই দিকের নাকি?

দিনু - না। একটু একটু জানি। কি কথা?

মেয়েটি - আপনে কি এই গাড়ি নিয়া কইলকাতা যাইতাছেন?

দিনু - কেন?

মেয়েটি - না, তাইলে আপনি জদি আমারে একটু নিয়া জান।

দিনু - উঠে পড়ুন।

মেয়েটি পেছনে উঠতে যায়। দিনু তার পাশের দরজা খুলে দিয়ে বলে - সামনে সামনে।

মেয়েটি দিনুর পাশে উঠে পড়ে। দিনু গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যায়।

ধাবায় দুটি লোক বাচ্ছিল। একজন বলে - শালা তুলে নিল দেখালি।

কাট - উ

দৃশ্য/৭৭

হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছে দিনু। পাশে মেয়েটি। দিনু বলে - কলকাতা কোথায় যাবেন? আমার রাস্তায় পড়লে নামিয়ে দেবো।

মেয়েটি চুপ করে থাকে। দিনু আবার বলে - কোথায় যাবেন কলকাতায়?

মেয়েটি বলে - জানিনা কোথায় যামু। কইলকাতায় তো আমার কেউ নাই।

কাট - টু

দিনু রাস্তার একপাশে গাড়িটা দাঁড় করায়। তারপর বলে - তাহলে বললেন যে কলকাতায় যাবেন? আবার বলছেন কলকাতায় কেউ নাই? কি ব্যাপার বলুন তো? কোত থেকে আসছেন? মেয়েটি - আমার বাড়ি ছিল বাংলাদ্যাশে, সাত কুলে কেউ নাই। গত বছর গ্রামে দাঙ্গা লাগনের পর একটা দলের সঙ্গে পলাইয়া আইছিলাম ইন্ডিয়ায়। একজন কাজের খোঁজ দিয়া এখানে লইয়া আইয়া তারপর...। মেয়েটি থেমে যায়। হঠাৎ কান্নার দমকে ভেঙে পড়ে মেয়েটি। কাদতে কাদতে বলে - যার জন্য পলাইয়া আইলাম হেই আমার সর্ব্ব্ব গেল এইখানে!

দিনু বলে - ও। তা এই খাবায় এলেন কি করে?

মেয়েটি - লোকটা আমারে আজ সকালে কিছু টাকা দিয়া এইখানে নামাইয়া দিয়া যায়। বলে আর রাখতে পার্লাম না। কইলকাতায় গিয়া কাম কাজ দ্যাখ কিছু না পাইলে সোনাগাজি না কি কইল, চইলা যাইতে। সেখানে নাকি কাম মিলবেই। জায়গাটো জানেন নাকি আপনে? আমারে না হয় ওইহানেই নামাইয়া দিবেন। তারপর যা আমার কপালে আছে হইবো। ষন্ডাইবো কে?

কাট - টু

দেখা যায় দিনু গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কাট - টু

দিনু গাড়ি চালাতে চালাতে একবার মেয়েটিকে দ্যাখে। তারপর বলে - নাম কি তোমার।

মেয়েটি - প্রতিমা পুরকাইয়েত।

দিনু - তুমি তো খুব চিন্তায় ফেলে দিলে। এমন সব কথা বললে যে নামিয়েও দেওয়া যায় না। এখন কি-য়ে করি!

প্রতিমা - আমার জন্য চিন্তা কইরেন না। কইলকাতায় নামাইয়া দিলেই হইবো। তারপর আমি জিগাইয়া জিগাইয়া চইলা যামু।

দিনু - কোথায় চইলা যাবে?

প্রতিমা - ওই সোনাগাজি না কি? সেইহানে।

দিনু বলে - হুঃ

কাট - টু

দৃশ্য/৭৮

নবীনোর বাড়ি। সকাল

বেলা চলে যাবার জন্য তার জিনিসপত্র গুছোচ্ছে।

বাথরুমে দাড়ি কাটছে নবীন। নবীন ডাকে - মিনু।

মিনু সাড়া দেয়। তারপর বাথরুমের কাছে এসে বলে - কি বলছেন দাদাবাবু? মিনুর মুখ একটু গম্ভীর।

নবীন বলে - দিনু আজো আসে নি না?

মিনু বলে - না।

মিনু বেলার ঘরে ঢোকে। তারপর বলে - তুমি তো চলে যাচ্ছে। আমাকেও ছুটি দিয়ে যাও তাহলে।

বেলা মুখ ঘুরিয়ে বলে - কেন, তোকে ছুটি দিয়ে দিতে হবে কেন?

তারপর কি ভেবে বলে - ও। ঠিক আছে তুইও আমার সঙ্গে চল।

যাযি?

মিনু হেসে মাথা নাড়ে।

বেলা বলে - ওখানে কিন্তু টিভি নেই!

মিনু বলে - হয়েছে। আর কথা শোনতে হবে না। আমি আমার জামাকাপড় গুছিয়ে নি তাহলে?

বেলা বলে - দাঁড়া, দাদাবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলে নি।

কাট - টু

নবীনের ঘর। নবীন তৈরী হচ্ছে চেষ্টার যাবার জন্য। বেলা এসে দাঁড়ায়। নবীন তাকায় বেলার দিকে। বলে - আজই চলে যাবে?

বেলা - হ্যাঁ। কাল তো বললাম তোমাকে। মিনু একা এখানে থাকতে চাইছে না। আমার সঙ্গে যেতে চাইছে, কিন্তু ও চলে গেলে তোমার রান্না...

নবীন বলে - ওর তোমার সঙ্গে যাওয়াই ভালো। দিনে তো আমি বাইরেই খাই। রাতেটা আনিয়ে নেবো। একটা লোক দেখতেই হবে। ছেলে। দিনকে বলবো। তারপর একটু থেমে বলে - বেলা।

বেলা তাকায়। বলে - কি বলছে?

নবীন - নাই বা গেলে।

বেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে - দেখি। আপাতত আমার কিছুদিন একা থাকা উচিত। তোমারও। রোজকার দুজন দুজনের এই ওঠা বসা হাটাচলা দেখতে দেখতে আমার দুজনেই ক্লান্ত। তাছাড়া...। বেলা কথা শেষ করেন।

নবীন তাকায় বেলার দিকে। বলে - বেলা তাছাড়া কি?

বেলা - তোমার ভেতর আমার জন্য ভালবাসা নেই অথচ সন্দেহটা আছে। যেটা ভুল। আর



আমারও... যাকগে, এসব কথা থাক। আমি যাচ্ছি। ঘরের ডালা বন্ধ করে ঠিক মত। আমি মাঝে মাঝে ফোন করবো। আমার স্কুলের নাচার তোমাকে কাল দিয়েছি। ও, কাল অর্ধব ফোন করেছিল। ওকে বুঝিয়েছি। সামনের ছুটিটা ও আমার কাছে থাকতে চায়। তোমাকে চিঠি লিখতে বলেছি। একটু দাঁড়ায় বেলা। তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। নবীন চূপচাপ বসে থাকে।

কাঁট - টু

দৃশ্য/৭৯

নবীনের চেয়ারের সামনে রাস্তায় গাড়ি পার্ক করা। গাড়ির জানলা দিয়ে দিনুর পা-জোড়া বেরিয়ে আছে। আগে নবীনের চেয়ারে দেখা সেই বুদ্ধ রুগী সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে চেয়ারের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

দৃশ্য/৮০

তারা নবীনের কাছে দেখাতে আসা রুগীদের অপেক্ষার ঘরে এসে ঢোকে। আরো অনেকে বসে আছে।

দৃশ্য/৮১

ভেতরে দাঁত দেখে চলেছে নবীন। পাশে তার সহকারী। নবীন তাকায় তার দিকে। তাকানোটা অন্য রকম। সহকারী বলে - কি হয়েছে স্যার?  
নবীন - কিছু না। হাত-ফাতগুলো কেমন যেন শক্ত লাগছে। নাড়তে পারছি না। তুমি এই দাঁতটা তুলে দিতে পারবে? দেখেছো তো, পেছনের ওপরের দিকের শেষটা ছেঁড়ে।  
সহকারী - দিচ্ছি স্যার।

নবীন গ্রাস্‌স খুলতে খুলতে বলে - কজন আছে বলো তো আজ?  
সহকারী - অনেক। আজ তো বেশি দেখেন নি স্যার।  
নবীন - হু। আজ তুমি চালিয়ে নিতে পারবে?  
সহকারীটি উৎসাহিত হয়ে বলে - পারবো স্যার। আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?  
নবীন - এই হাত-পাগুলো...। কিছু না।  
নবীন ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের আর একটা ছোট ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

দৃশ্য/৮২

আশেপাশে তাকিয়ে দাঁত তোলার একটা যন্ত্র তুলে নেয়। তারপর হাত ও পায়ের পাতায় ঠুকতে থাকে। কান পেতে আওয়াজ শোনার চেষ্টা করে। থপ থপ অঙ্কুর আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

কাঁট - টু

দৃশ্য/৮৩

বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে নবীন।

কাঁট - টু

নবীন ঘরের ভেতর ঢুকে আলো জ্বালে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়। হঠাৎ বেল বাজে। দরজা খোলে নবীন। দিনু। চাবি আর একটা পলিথিনের থলি এগিয়ে দিয়ে বলে - আপনার খাবার।

নবীন নেয়। দিনু বলে - আমি যাবো স্যার?

নবীন মাথা নাড়ে। দিনু নেমে যেতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে। নবীন তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। ডাকে - দিনু শোন।

দিনু ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে নবীনের। তারপর ওপরে উঠে আসতে থাকে। নবীনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

নবীন বলে - তোমার বৌদের আমাকে একদিন দেখাবে?

দিনু অবাক হয়ে তাকায় নবীনের দিকে। বলে - কি বলছেন স্যার?

নবীন - তোমার দুজন বৌ-এর কাছে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

দিনুর বিশ্বাস যায়নি। সে বলে - কানো স্যার? ওদের দেখে আপনি কি করবেন?

নবীন বলে - এমনিই।

দিনু একটু চূপ করে থেকে বলে - তালে, কাল চলুন না স্যার? কাল রোববার? যাবেন?

নবীন - যাবো।

কাঁট - টু

দৃশ্য/৮৪

লোকাল ট্রেনে দিনু আর নবীন যাচ্ছে।

কাঁট - টু

দৃশ্য/৮৫

হেঁটে হেঁটে আসছে দিনু আর নবীন। পাশে নবী। দূরে কেম্পাটা দেখা যাচ্ছে। দিনু বলে -

হাটতে বসে হচ্ছে না স্যার?

নবীন - না। আমি নিজেইতো হাটতে চাইলাম। জায়গাটা খুব সুন্দর।

দিনু বলে - স্যার, আপনি ঐ কেম্পাটার কাছে গিয়ে দাঁজন। আমি মালতিকে নিয়ে এখনি আসছি। বাড়িতে স্যার একটাই ঘর। আপনি এসেছেন জানলে একটু সাজগোজ করতে চাইবে। নবীন হেসে বলে - ঠিক আছে। তুমি এসো।

নবীন এগিয়ে যায় জলের সামনে। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে।

কাঁট - টু

নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে নবীন। পাশে কেঁদা। দূরে দেখা যায় দিনু আর মালতি আসছে। ওরা এসে নবীনের সামনে দাঁড়ায়। দিনু বলে - এই যে স্যার, এ হচ্ছে সেকন্ড ওয়াইথ, মালতি।

মালতি দিনুর কথা শুনে অল্প হাসে। একটু সেজে এসেছে সে। মালতি মাথা নিচু করে নবীনকে হঠাৎ প্রণাম করে। নবীন বাধা দেবার সুযোগ পায় না। দিনু বলে - আপনি স্যার কথা বলুন মালতির সঙ্গে। আমি চা নিয়ে আসছি।

নবীন বলে - না না, চা লাগবে না।

দিনু - দোকানে বলে এসেছি স্পেসাল বানাতে। কেটলি আর ভাড় নিয়ে আসতে কোন সময় লাগবে না স্যার।

দিনু চলে যায়। নবীন সেই দিকে তাকায়। তারপর মালতির দিকে চেয়ে বলে - তোমার নাম মালতি না?

মালতি লাজুক হেসে মাথা নিচু করে।

নবীন - তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

মালতি বিভ্রিড় করে কর ওনে বলে - পাচ বছর সাত মাস।

নবীন - ওর আর একটা বোী আছে জানো? দেখেছো?

মালতি - জানি। দিদিকে দেখিনি কোনদিন? আর দেকে কি হবে। সে তার মত ঘর সংসার করছে, আমি আমার মতো।

নবীন - তোমার তাকে হিংসে হয় না?

মালতি সামান্য হাসে। বলে - মাঝে মাঝে হয়, তারপর ভুলে যাই। দূরে দিনুকে কেটলি আর ভাড় নিয়ে আসতে দেখা যায়। নবীন সেইদিকে তাকিয়ে বলে - দিনু তোমাকে ভালবাসে? মালতি এই প্রশ্নে লজ্জা পায়। মুখ নিচু করে মাথা নাড়ে।

নবীন বলে - পুরোটা তো ভালবাসে না। তোমার ভাগে তো অর্ধেকটা।

মালতি - কতটা কি জানি। যেটুকু আছে তাতেই আমি খুশি। সবটা চাইও না। তখন না পেলে কষ্ট হবে। আমি তারে যতটুকু দিয়েছি তাতে সেও খুশি। একটু থেমে অবাক হয়ে বলে - এ সব জিগান ক্যান বাবু?

দিনু এসে গেছে। ভাড়ে চা ঢালতে ঢালতে বলে - চা খান স্যার।

নবীন চলে যাচ্ছে। দিনু পেছন ফিরে মালতি বলে - শনিবার আসবো রে।

মালতি মাথা নাড়ে। তারপর থাকে - বাবু?

নবীন ঘুরে দাঁড়ায়। বলে - কিছু বলবে?

মালতি মাথা নাড়ে।

নবীন বলে - বলো।

মালতি - আর একদিন গাড়ি নিয়ে আসবেন। আপনার ডাইবাররে অনেকদিন বলেছি। কোনদিন চড়ায় নাই।

নবীন হাসে।

কাট - টু

## দৃশ্য/৮৬

ট্রেন। দিনু আর নবীন ফিরে আসছে।

কাট - টু

## দৃশ্য/৮৭

দিনুর ঘর

দিনু বলে - সুখী, কাকে নিয়ে এসেছি দ্বাখ।

সুখী - কাকে আবার নিয়ে এলে এখন?

দিনু বলে - বাবু।

সুখী অবাক হয়ে বলে - সে কি গো? কোথায়?

দিনু - বাইরে। আমি নিয়ে আসছি। তুই কাপড়টা ঠিক করে নে। একটু মোঁ মেখে নে।

সুখী - কত মোঁ পাউডার কিনে দিচ্ছে একেবারে!

দিনু বলে - তাড়াতাড়ি কর।

## দৃশ্য/৮৮

দিনু বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকা নবীনকে বলে - ছোট ছোট দুটো ঘর স্যার। এইখানেই আমার জন্মো। আসুন স্যার, ভেতরে আসুন। এই সুখী বাইরে আয়।

সুখী বেরিয়ে আসে। এইটুকু সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ফিটফিট হয়ে নিয়েছে সে। সুখীর মাথায় ঘোমটা। সে বলে - ভেতরে আসুন বাবু। আজ কত বছর আপনার কাছে কাজ করছে, এইবার আপনারকে প্রথম দেখলুম।

নবীন হাসে। ভেতরে ঢেকে।

## দৃশ্য/৮৯

সুখী ইসারা করে দিনুকে কিছু বলে। দিনু মাথা নেড়ে হাঁ বলে। তারপর নবীনকে বলে - স্যার, আমি এফুনি আসছি। বলেই দিনু বেরিয়ে যায়। নবীন বলে - কোথায় যাচ্ছে?

সুখী - এসে পড়বে এফুনি। আপনি বসুন।

নবীন একটা মোড়ায় বসে চারদিক তাকিয়ে দেখে। দেওয়াল জুড়ে হুমান অন্যান্য ঠাকুর দেবতার ছবি, ক্যালেন্ডার। দরজার সামনে বাসন্তি এসে দাঁড়ায়। নবীন তাকে দেখে সুখীকে বলে - তোমাদের মেয়ে?

সুখী বলে - হাঁ বাবু। ওই একটাই।

নবীন - কি নাম তোমার?

- বাসন্তি। বলে বাসন্তি সুখীর কাছে দাঁড়ায়। তার মুখে কৌতুহল নবীনকে দেখে।

নবীন বাসন্তিকে হেসে বলে - পড়াওনা করো?

বাসন্তি মাথা নাড়ে।



নবীন - বাবা বেশি ভালবাসে না মা?

বাসন্তি মা'র দিকে তাকায় ভয়ে ভয়ে। তারপর ধরা ধরা গলায় বলে - বাবা।

নবীন হাসে। বাসন্তি আবার মা'র দিকে চায়।

নবীন বলে - আচ্ছা তুমি যাও।

বাসন্তি চলে যায়।

নবীন সুখীকে বলে - দিনুতো আর একটা বিয়ে করেছে। যখন করলো তুমি কিছু বলোনি?

সুখী একটু অবাক হয়ে নবীনের দিকে তাকায়। বলে - এসব কেন জানতেছেন বাবু?

নবীন - এমনি।

সুখী - ও যাই করুক বাবু, এটা ওর ঠাই। এখানে সব সময় ফিরে আসবে।

নবীন - তোমাদের দেখাশুনো ঠিক মত করে?

সুখী - খুব করে বাবু। আমার কথা ভাবে, বাসন্তির কথা ভাবে। বাসন্তিকে খুব ভালবাসে।

মানুষটা ভালো।

নবীন - কিন্তু...

সুখী বাধা দিয়ে বলে - কোন কিন্তু নাই বাবু। দু দশটা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হতেই পারে।

আমারো থাকতে পারে। কিন্তু ও আমার সোয়ামী, আমি ওর ধর্মোদ্বাসী ইস্ত্রী।

দেওয়ালে ঝোলানো একটা ফটোর দিকে তাকিয়ে বলে - কার ছবি?

সুখী সেই দিকে হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। তারপর বলে - আমার শ্বশুর শাশুড়ি। মারা গেছে।

দিনু ফিরে আসে। হাতে একটা ছোট মিষ্টির ভাড়া। সুখীকে বলে - নে নে তাড়াতাড়ি দে।

নবীন বলে - এ সব আবার কি।

সুখী ভাড়াটা হাতে নিয়ে যেতে যেতে বলে - প্রথম দিন এলেন বাবু, একটু মুখে না দিলে অকল্যাণ হবে আমাদের।

কাট - টু

দৃশ্য/৯০

রাস্তায় দাড়িয়ে আছে নবীন আর দিনু। নবীন দিনুকে বলে - একটা ট্যাক্সি ধরে দাও দিনু।

এবার বাড়ি যাই।

দিনু বলে - না স্যার।

নবীন অবাক হয়ে বলে - মানে?

দিনু - আর একটু বাকি আছে স্যার। আর এক জায়গায় নিয়ে যাবো আপনাকে। সবটা দেখে যান।

কাট - টু

দৃশ্য/৯১

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

একটা বস্তির গলি দিয়ে নবীন দিনু আসছে। একটা ঘরের সামনে এসে দিনু ডাকে - নুরুল।

এই নুরুল।

দরজা খুলে যায়। প্রতিমা বেরিয়ে আসে। নবীনকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়। তার মাথায় সিঁদুর। বলে - নুরুলভাই এখানে ফেরেনি।

দিনু বলে - ঠিক আছে। নবীনকে দেখিয়ে বলে - স্যার। আমি ইনার গাড়ি চালাই। খুব বড় দাঁতের ডাক্তার। প্রণাম কর।

দিনু বলে - প্রতিমা স্যার। আমার লাভার স্যার।

নবীন অবাক বিষ্ময়ে তাকায়। কিছু বলতে পারেনা।

দিনু - কিছুদিন আগে দেখা হয়েছিল। দিল্লী থেকে গাড়ি নিয়ে...

নবীন তাকায় দিনুর দিকে। দিনু থেকে গিয়ে অন্য কথা বলে - এটা নুরুলের বাড়ি, আমার খুব চেনাশোনা, রিক্সা চালায়। পাশে ওর বাবার বাড়ি। রাগে ওখানেই শোয়। ও শীঘ্রী বিয়ে করবে। তখন ছেড়ে দিতে হবে। একটা ঘর খুঁজছি প্রতিমার জন্য।

নবীন প্রতিমাকে একবার দেখে নিয়ে বলে - এত চালাবে কি করে দিনু?

দিনু - ওরটা ওই চালিয়ে নিতে পারবে। দু বাড়িতে রান্নার কাজ দেখে দিইচি, আরো দু'একটা পেয়ে যাবে। ও স্যার খুব ভালো গান করতে পারে। এই প্রতিমা স্যারকে ওই গানটা শুনিয়ে দে না।

প্রতিমা ফিক্ করে হেসে ওঠে। দিনু বলে - গা না।

প্রতিমা মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ে।

দিনু বলে - লজ্জা পাচ্ছে স্যার।

নবীন বলে - গাও।

প্রতিমা গান ধরে : তোমার বাড়ি আমার বাড়ি

এক বিছানায় আড়াআড়ি

সন্ধ্যা থেকে মধু লুটে

রাতে ছোটো একগাছা...

কাট - টু

দৃশ্য/৯২

ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে নবীন আর দিনু।

নবীন বলে - তোমার ভয় করে না দিনু?

দিনু অবাক হয়ে বলে - কেন স্যার ভয় করবে কেন?

নবীন - তুমি বেশ ভালো আছো দিনু!

দিনু হাসে।

কাট - টু

দৃশ্য/৯৩

রাত্রি। নবীনের বাড়ি

টিভি চলছে। সংবাদ-পাঠক বলছে : 'সম্প্রতি ওয়াশিংটনে প্রকাশিত একটি সংবাদ-এ জানা গেছে ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর আমেরিকায় পড়তে আসার জন্য আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গতবছর তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার লক্ষেরও বেশি এই সংখ্যা ভবিষ্যৎ-এ আরো বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আজ নিউ দিল্লীতে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসকের দল এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন যে দিল্লী বোম্ব কলকাতা মাদ্রাজ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে নতুন একটি রোগ প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে অদূর ভবিষ্যৎ-এ। রোগটি ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে মূলত এ দেশ ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে সংক্রামিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই রোগে অক্রান্তদের শরীরের বিভিন্ন অংশ আস্তে আস্তে শুক হয়ে উঠে ধীরে ধীরে ধাতব আকার ধারণ করছে ও তাদের মন কোন কিছুতেই বিচলিত হচ্ছে না। যদিও তারা জানিয়েছেন দেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে এই রোগ এখনো দেখা যায়নি। গতকাল প্রধানমন্ত্রী দেশের বন্য-কবলিত এলাকাগুলি হেলিকপ্টারে পরিদর্শনের পর সুইডেন রওনা হয়ে যান।'

সংবাদ-পাঠের শুরু থেকেই ক্যামেরা টিভির স্ক্রীন থেকে আস্তে আস্তে পেছনে ঘুরে যেতে শুরু করে। নবীনকে দেখা যায় ক্রমশ। চেয়ারের একদিকে মাথা কাঁচ করে সে ঘুমোচ্ছে। তার নাক ডাকার অল্প অল্প শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্যামেরা তার মুখের কাছে এগিয়ে এসে ঘুরে যাওয়ার আগে হঠাৎ টিভির ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে গিয়ে ঝিরঝির শব্দ শোনা যেতে থাকে। এই শব্দ মিলিয়ে গিয়ে সাত-আট বছরের ছেলের গলায় 'নবী-ই-ন' ডাক শোনা যায়।

ক্যামেরা এই ডাকের মধ্যেই ঘুরে গিয়ে নবীনের মাথার পেছনে চলে আসে।

দেখা যায় ফ্রেমের বাঁ-দিক থেকে নবীনের মাথার পেছনের অংশ ও ফ্রেমের বাকি অংশে টিভি। টিভিতে সাত আট বছরের বাচ্চা নবীনকে দেখা যায়।

সে আবার ডাকে - নবী-ই-ই-ন। নবী-ই-ই-ন ওঠো, উঠো পড়ো।

নবীনের মুখ। ঘুম ভেঙে বিম্বলিত চোখে তাকিয়ে আছে টিভির দিকে।

বাচ্চা নবীন টিভি থেকে আবার বলে - নবী-ই-ই-ন, পালাও।

বড় নবীনের মুখ।

কাট - টু

দৃশ্য/৯৪

দিনের বেলা। নবীনের চেম্বারের সামনে।

গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে দিনু পা মুড়ে পাশ ফিরে। ঘুমের মধ্যেই ঘুরে সোজা হয়ে শোয়। তার পা-জোড়া সোজা উঠে যায় গাড়ির জানালার বাইরে।

বাইরে থেকে দেখা যায় গাড়ির বাইরে দিনুর পা-জোড়া।

কাট - টু

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

দৃশ্য/৯৫

বসার ঘরে রুগীরা বসে আছে। সেই বুড়ো রুগীকেও ছেলের সঙ্গে দেখা যায় হাত দিয়ে গালে রুমাল ধরে বসে আছে। বুড়ো রুগী বলে - আমার নতুন দাঁতের পাটি আজ ঠিক পরাবে তো?

ছেলে - মহা মুশকিল। নতুন দাঁতই তো পরে আছে। কাল ছোট ডাক্তার পরিয়েছিল। আজ বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে নিতে বলেছে।

বুড়ো মাথা নাড়ে।

কাট - টু

দৃশ্য/৯৬

একজন হাঁ করে আছে। দাঁত দেখা হচ্ছে। ক্যামেরা সরে এলে দেখা যায় দাঁত দেখছে নবীনের সহকারী। ক্যামেরা ঘুরে অন্য একটা বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কাট - টু

ভেতরে দেখা যায় নবীন বসে আছে একা।

কাট - টু

দৃশ্য/৯৭

শেষ বিকেল

নিচে দিনুর গাড়ির বাইরের পা-জোড়া থেকে টুলিতে ক্যামেরা সরে আসে চেম্বারে ওঠার সিঁড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে দেখা যায় নবীন নামছে আস্তে আস্তে। গাড়িতে উঠে দিনুর জায়গায় বসে দরজা বন্ধ করে দেয়।

কাট - টু

দৃশ্য/৯৮

নবীনের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নবীন আগের মতই দ্রুত উঠছে।

কাট - টু

নবীনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুশল।

নবীন দাঁড়ায়। দ্যাখে কুশলকে। কুশল চোখ অন্য দিকে ফেরায়।

নবীনের মুখে সামান্য খুশির ছায়া পড়ে। বলে - কতক্ষণ এসেছিস? ফোন করিসনি তো।

আমি স্টেশনে যেতাম।

কুশল - মা কোথায়?



নবীন চুপ করে যায়।

কুশল থমথমে মুখে কিছুটা চিৎকার করে বলে - মা কোথায়?

নবীন - ঘরে আয়, বলছি।

কুশল - না। মা কোথায় আছে বলে।

নবীন - তুই জানিস না?

কুশল ধরা গলায় আগের মত করেই বলে - বাড়ি চিনি না।

নবীন তাকায় কুশলের দিকে। তার মুখ বিষম হয়ে ওঠে।

কাট - টু

দৃশ্য/৯৯

কলকাতার রাস্তা। সন্ধ্যা

গাড়ি চালাচ্ছে নবীন। পেছনে বসে আছে কুশল।

গাড়ি দূরে চলে যায়; মিশে যায় অনেক গাড়ির সঙ্গে।

কাট - টু

দৃশ্য/১০০

একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়।

নবীন জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে - চার তলায়। ফ্ল্যাট বি।

কুশল নেমে যায়। এগিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার এগিয়ে যায়। হারিয়ে যায় কুশল।

নবীনের মুখ।

কাট - টু।

দৃশ্য/১০১

কার্টের সেই সিঁড়ি দিয়ে নবীন প্রায় দৌড়ে ওপরে উঠছে। নবীনের পা, নবীনের মুখ উঠছে। করিডোর দিয়ে দ্রুত হেঁটে গিয়ে একটা আধ ভজানো দরজার সামনে দাঁড়ায় নবীন। তারপর ছেলে ভেতরে ঢোকে।

খালি ঘর। জিনিসপত্র সব আগের মতই আছে। শুধু কেউ নেই। যেন অনেকদিন ধরে কেউ নেই। ধূসো ও কাল জমে আছে চারদিকে। ঘরের খোলা জানলাগুলো দিয়ে মেঘ ঢুকে পড়ছে ভেতরে। ঢেকে দিচ্ছে নবীনকে।

নবীন বাইরে বেরিয়ে আসে। ছুটে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে সেতে গিয়ে কি যেন দেখে থমকে দাঁড়ায়।

দ্যাখে ওপর থেকে নেমে আসছে কিশোরী সিং। কিশোরী একবার দাঁড়ায়। অদ্ভুত ভাবে চেনা-

অচেনার দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর নেমে যেতে থাকে নিচে। তলা থেকে মেঘ এসে ঢেকে দিতে থাকে তাকে।

এ দৃশ্যের শেষ অংশটি স্লো-মোশনে দেখা যাবে।

কাট - টু

দৃশ্য/১০২

বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠছে নবীন। তার মুখে ভয়। ঘরের দরজার সামনে এসে দরজা খোলার চাবির জন্য পকেটে হাত দেয়। চাবি খুঁজতে থাকে। আতঙ্কিত তার মুখ। নবীন বুঝতে পারে চাবি সে ফেলে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে থাকে নবীন। হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে নিজেকে। পেছনে ফিরে তাকায় তার বন্ধ দরজার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসে। চারপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। কেউ নেই। নবীন তার বন্ধ দরজার সামনে এসে আস্তে আস্তে বলে :

ছোট মোটি পিঁপড়া বোটি

লাল দরজা খোল দে।

দরজা খোলে না। আবার বলে নবীন। দরজা বন্ধই থাকে।

এই দৃশ্যের সঙ্গেই মিশ্র করে চেরাপুঞ্জির দৃশ্য।

দৃশ্য/১০৩

মেঘ ও কুয়াশা এসে ঢেকে দিচ্ছে চারদিক। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছে বড় নবীন।

নবীন ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে তার মুখ চোখ ভরে ওঠে খুশিতে।

কাট - টু

একটু দূরে দেখা যায় বাচ্চা কয়েকটি ছেলে ঘাসের ওপর থেকে লাল পিঁপড়ে কুড়িয়ে মুঠিতে নিচ্ছে। একজন মুঠি বন্ধ করে ছুটে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে :

ছোট মোটি পিঁপড়া বোটি

লাল দরজা খোল দে।

আস্তে আস্তে মুঠি খোলে ছেলেটি। এতক্ষণ অস্পষ্ট মুখটি মুখ ঘুরিয়ে তাকায় নবীনের দিকে। ছেলেটি ছোট নবীন।

নবীনের মুখ। নবীন দেখছে।

ছেলেটি এগিয়ে আসতে থাকে। বোঝা যায় ওদের পরস্পরের দৃষ্টিতে অনেক দূর। ছেলেটি কাছে আসে নবীনের। তার হাত ধরে। তাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

কাট - টু

দৃশ্য/১০৪

মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আস্তে এগিয়ে এসে ওরা নিজেদের বাড়ির পুরোনো দরজার সামনে দাঁড়ায়।

ভেজানো দরজা আস্তে আস্তে খুলে যায়।

এগিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় দুজন। দরজা বন্ধ হয়ে যায় আবার।

দরজাটি একের পর এক কেটে কাছে এসে স্ত্রীন জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেঘ ও কুয়াশা এসে ঢেকে দেয় দৃশ্যটিকে।

শেষ টাইটেল উঠতে থাকে।

শেষ



Price Rs 40  
Vol. 19. NO 2.

**BIVAV**  
**Special Autumn issue**  
**July - Sept 1997**  
**Published in October 1997**  
**INTERNATONAL STANDARD**  
**SERIAL NO ISSN 0970 - 1885**

Reg. No 30017/76  
69th Issue

**With Compliments from**  
  
**EAST**  
  
**INDIA**  
  
**PHARMACEUTICAL**  
  
**WORKS**  
  
**LIMITED**